শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন

শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন

তাপস বসু



পত্রপুট
৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :

শ্রীমা সাবদাদেবীব ১৪৬তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি, ১০ ডিসেম্বব ১৯৯৮

প্রকাশিকা :

আবতি চক্রবর্তী

৩৭/৯, বেনিযাটোলা লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :

হবিলাল সাহু

অক্ষব বিন্যাস ও মুদ্রক :

অরুণকুমাব দে

ব্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন

৪৩, বেনিযাটোলা লেন,

কলকাতা ৭০০ ০০৯

বামকৃষ্ণ মঠ ও বামকৃষ্ণ মিশনেব দশম অধ্যক্ষ

পবম পূজনীয

স্বামী বীবেশ্ববানন্দজী মহাবাজেব

পুণ্য স্মৃতিব

উদ্দেশে নিবেদিত

গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থ :

অন্তর্গত রক্তের ভিতরে (কাব্যগ্রন্থ)
ভাঙনের থিয়েটাব (প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত)
রক্তাক্ত চরণে যাঁর পথ চলা [স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি অধ্যায]
(প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত)
বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন কৃষক জীবন ও সাহিত্য
সিপাহী বিদ্রোহ ও একটি নাটক (প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত)
টি. এস. এলিযট : বাঙালী মন ও মননে [সঃ]
মার্কসবাদীদেব চোখে বিবেকানন্দ [সঃ] (দ্বিতীয় সংস্করণ)
জীবনানন্দ দাশ ও সমকালীন ভাবনাক্রম [সঃ] (প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত)
আরণ্যকের অনন্যতা [সঃ]

গ্রন্থকারের প্রকাশিতব্য/যন্ত্রস্থ গ্রন্থ :

শ্রীরামকৃষ্ণ : আধুনিক মন ও মনন
বিবেকানন্দের ভাবতবর্ষ
ইস্‌লামধর্মীদের চোখে বিবেকানন্দ [সঃ]
জীবনানন্দ : কাব্যের বৃত্তে
গিরিশচন্দ্র : পুনর্বিচার
জন কীট্‌স : বাঙালী মননে [সঃ]
শক্তি চট্টোপাধ্যায় : মুখ মুখশ্রী মুখাবযব
পদ্য নিযে গদ্য
স্মরণীয় জীবন : কেশবচন্দ্র সেন
প্রসঙ্গ : পথের পাঁচালী [সঃ]
বাংলা নবনাট্য আন্দোলন

ভূমিকা

তরুণ অধ্যাপক ড. তাপস বসু পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী পাওয়ার পর ডি. লিট্. ডিগ্রী পেয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়নি, বিধাতা বরং দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তার পড়াশোনা। শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কিছু এখনও অজানা। তাঁর অবদান অশেষ। তাই ড. বসু উঠে পড়ে লেগেছে তাঁর জীবন ও বাণীর তাৎপর্য ভালোভাবে লোকগোচরে আনতে।

এই সূত্রে রচিত 'শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন' বইটি। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন তো শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীরী রূপ। তিনি নিজের হাতে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বীজটি বপন করে গিয়েছেন। ১ মে ১৮৯৭ তারিখে তার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্ণ হল। বইটি এই উপলক্ষে রচিত। সমগ্র বইটি জুড়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষের ইতিহাস। রামকৃষ্ণ মিশন ও তার ইতিহাসের মধ্যমণিতো শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বিরাট এক জগৎ। এই জগৎকে চেনা ও জানা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জানতে পারলে নিজেকে জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ নিজে নিজের কাছে বিস্ময়! আমি নিজেকে কি জানি? জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে নিজেকে জানতে পারলে তবে আমার স্বরূপকে আমার জানা হবে। তাই ড. বসু শ্রীরামকৃষ্ণকে নানাভাবে আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছে তাঁর নির্দেশিত ও তাঁর নামে নামাঙ্কিত রামকৃষ্ণ মিশনের একশো বছরের ইতিহাস নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার মাধ্যমে।

'কথামৃতে' আছে রেলের গার্ড সাহেবকে এক যাত্রী বলছেন—'সাহেব, তুমি একবার তোমার হাতের আলোটি নিজের মুখের উপর ফেল তো? তোমাকে ভালো করে দেখি।' শ্রীরামকৃষ্ণ যদি দয়া করে তার মুখের উপর তাঁর আলোটি ফেলেন, তাহলে আমরা ধন্য হয়ে যাই। এই বই-এ ড. বসুর সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার অনুনয় তিনি যেন তাঁর স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

'শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন' বইটির মধ্যে অনেক নূতনত্বের স্বাদ আছে। পাঠক পড়ে আনন্দ পাবেন।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৯৮

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব

বহু সাধকের
বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার
মিলিত হয়েছে তারা,
তোমার জীবনে
অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ
রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ বিদেশের
প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার
প্রণতি দিলাম আনি ॥

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব' নামে এই কবিতাটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের লেখায় সংশ্লিষ্ট কবিতাটির প্রতিলিপি।,

('উদ্বোধন' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

প্রসঙ্গত

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী পার্ষদ বলরাম বসুর বাসগৃহ সংলগ্ন হলঘরে 'আনুষ্ঠানিক' ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন—শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ সত্তা, আর একটু সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়—তাঁর সার্বিক অবয়ব। শ্রীমা সারদাদেবী এই প্রতিষ্ঠানের আলোকবর্তিকা। সংঘজননী রূপে তাঁর নেতৃত্বের আলোয় একদিকে যেমন 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবের তাৎপর্যটি বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ-মানুষীরা অনুধাবন করতে পেরেছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর আলোয় বিভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণের অবয়ব—রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম থেকেই সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং পল্লবিত ভাবে প্রসারিত হয়েছে, ভারতে ও বহির্ভারতে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বাস্তবিক রূপকার হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। লব্ধ অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-চেতনার সংযুক্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনকে তিনি একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। আমরা আগেই আনুষ্ঠানিক শব্দটি ব্যবহার করেছি, আসলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবের দিন থেকে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের দরিদ্র পরিবারে, ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠাপরায়ণ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন তিনি। শৈশব-কৈশোর থেকেই একদিকে লোকায়ত সংস্কৃতির সূত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের অন্বেষণ এবং তার মধ্য দিয়ে উত্তরণ, অন্যদিকে গরীব দুঃখী দরিদ্র মানুষজনেদের, তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে এসে দুঃখীর দুঃখ নিবারণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। তারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দক্ষিণেশ্বরে আধ্যাত্মিকতার চরম ও পরম অন্বেষণের পথটি সুচিহ্নিত-করণ। এই সূত্রেই সর্বধর্মসমন্বয়ের মালাটি হলো গ্রথিত। তিনি অতীত ঐতিহ্য বাহিত চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করলেন আধুনিক যুগপোযোগী অনুভব নিষিক্ত মনন। আর বৈদ্যনাথধাম (দেওঘর) এবং কলাইঘাটায় (নদিয়া) দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের নিজের হাতে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ত্যাগী যুবক পার্ষদদের হাতে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' গেরুয়া বস্ত্র তুলে দিয়ে তিনি নবপ্রবাহে যুগপোযোগী ভাবান্দোলনের যথার্থ দিক নির্দেশ করলেন। তাঁর সমস্ত দায় এবং দায়িত্ব অর্পণ করে গেলেন শ্রীমা সারদাদেবীর উপর। নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে গেলেন সাংগঠনিক রূপ নির্মিতি, কার্য নির্দ্ধারণ—প্রচার ও প্রসারের নেতৃত্ব।

বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমায় তারই অভিযাত্রার সূত্রপাত। একদিকে এই ভারতবর্ষ পরিক্রমায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের হাজারো স্খলন পতন প্রত্যক্ষ করলেন তিনি, অন্যদিকে দরিদ্র তাপিত নিপীড়িত মানুষের কান্নাকে হৃদয়ে লেপটে দিলেন। একদিকে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ, অন্যদিকে 'চলমান শ্মশান' অজ্ঞ-কাতর-নিপীড়িত মানুষদের উত্থান—এই দুটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়ে তাঁর অভিযাত্রার অভিমুখটি ঘুরিয়ে দিলেন পাশ্চাত্যে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় অংশ নিয়ে যেমন তিনি আলোড়ন তুললেন, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, তেমনই খ্যাতির কোলাহলে তাঁর চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল অবিরত

অশ্রু। সেই অশ্রু ছিল রক্তাশ্রু। যে দুটি মহাব্রত পালনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়ে তিনি পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন, তার বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়ে দেখলেন ধর্মের নামেই অহেতুক বিবাদ-সংঘাতের রক্তারুণ ছবিটি। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না করে শুধু মিছে কোলাহল / সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।' তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণাহীন পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন মেলে ধরে বৈদান্তিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক জীবনের উত্তরণ ও মুক্তির পথটি শুধু উন্মোচিত নয়, প্রশস্ত করেছিলেন বিবেকানন্দ। এজন্য পাশ্চাত্যে তাঁকে কাটাতে হল প্রায় চার বছর—সেখানকার মানুষজনের তাগিদে। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যের মানুষদের চূড়ান্ত বৈভব-আভিজাত্য-অর্থবিত্তের সম্যক রূপটি দেখে তিনি মর্মাহত হলেন, ভারতবর্ষের দুঃখী মানুষদের কথা ভেবে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা তাই তিনি প্রথম উচ্চারণ করলেন। এই সমন্বয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে দেবে উন্নত ধর্ম-দর্শন অধ্যাত্ম চিন্তা; আর পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে দেবে উন্নত কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যা, উপলব্ধ পরীক্ষিত বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক মনস্বিতা।

ভারত পরিক্রমার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত প্রতিজ্ঞার 'মহাব্রত' রূপায়ণের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য-পরিক্রমা শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সেই প্রতিজ্ঞারূঢ় অভিযাত্রার রূপায়ণই আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারত প্রব্রজ্যা এবং পাশ্চাত্য পরিক্রমা কালে উপলব্ধি করেছিলেন সংঘ ব্যতীত স্থায়ী কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তাই সংঘ চাই। কলম্বো থেকে আলমোড়া এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তাই প্রতিটি সম্বর্ধনার উত্তরে তাঁর মহাব্রত পালনের-বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন সকলকে। তাঁর সেই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম তামাম ভারতবর্ষের যুবকের দল তাঁর মহাব্রত বাস্তবায়নে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাই তিনি ভগ্ন শরীরে দার্জিলিং-এ বসে সতীর্থ সন্ন্যাসী-গৃহী পার্ষদ, অনুরাগীদের নিয়ে ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারই ফলশ্রুতি আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাসমাধি লাভের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর বরাহনগরে এক ভগ্ন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠ। সেখানে ত্যাগী সন্তানেরা নিত্য জপ-ধ্যান-আরতি শাস্ত্র আলোচনা ইত্যাদি সহ অসহনীয় ক্লেশ স্বীকার করেও আনন্দযজ্ঞে নিয়োজিত ছিলেন। পরে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছিল আলমবাজারে।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে মঠের নিয়মাবলী লিখে পাঠিয়েছিলেন। আলমবাজার মঠে গৃহী ভক্তেরা মঠের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। এই আলমবাজার মঠেই সন্ন্যাসী সংঘের একটি প্রাথমিক রূপ চোখে পড়ে। বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তন ও আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও তার উদ্দেশ্য-ব্রত-কার্যাবলী নির্ধারণ এবং সংঘজননী রূপে শ্রীমা সারদাদেবীকে বরণ এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করে। আলমবাজার মঠে বসেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের বিস্তৃত নিয়মাবলী, কার্যাবলী ও গঠনপ্রণালী তৈরী করেন। গৃহী ভক্তরাও কার্যকরী সমিতির প্রতিনিধি হন। এই কার্যকরী-পরিচালন সমিতির অধীনে প্রাথমিক স্তরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ একই সঙ্গে পরিচালিত হয়। অসুস্থ শরীরে স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয় পরিক্রমায়

গেলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রথম সেবাকার্য শুরু করেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। স্বামী অখণ্ডানন্দের এই সেবাকাজের মাধ্যমেই শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশনের সুদীর্ঘ পথ চলা। শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে প্রয়াসী হয় রামকৃষ্ণ মিশন। ত্রাণ কাজে অংশ নেন সন্ন্যাসীবৃন্দ। আবার পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে সতীর্থ সন্ন্যাসীদের ক্রম পরম্পরায় দায়িত্ব অর্পণ করেন বিবেকানন্দ। এই সূত্রেই একদিকে ভারতে, অন্যদিকে বহির্ভারতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত ট্রাস্ট ডীড ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে সরকারী নথিভুক্ত ও স্বীকৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন একই কাজে নিয়োজিত ছিল। মিশন সংক্রান্ত ভিন্ন ট্রাস্ট ডীড হওয়ার ফলে মঠের কাজ নির্দিষ্ট হয় পুজো-পাঠ-সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মসাধনার পথটিকে প্রশস্ত করে দেবার জন্য। আর মিশনের কাজ নির্দিষ্ট হয় 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্বিতায় চ'—অর্থাৎ জগতের কল্যাণ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কল্যাণ সাধন, জগতের সকলের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুক্তি। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি তুলে ধরে বলতে পারি যে, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ / ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।' শিক্ষা সম্প্রসারিত করে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করা, স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্য দিয়ে মানুষকে স্থিতিশীল জীবনে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্ম-দর্শনের রূপরেখাটিকে চিহ্নিত করা, সর্বোপরি জীবলোক থেকে শিবলোকে পৌঁছে দেওয়া।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের ধারা বিভাজিত হলেও মঠ ও মিশন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এ কাজ করে চলেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্মিলিত শাখা কেন্দ্রের বর্তমান সংখ্যা ১৩৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অতি সম্প্রতি দাঁড়িয়েছে ১৪০টিতে। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতে ও বহির্ভারতে সেবাকাজ, শিক্ষাপ্রসার স্বাস্থ্য-পরিষেবায় ব্যাপক গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে যেমন, তেমনি গ্রামীণ-উপজাতি-অনুন্নত আদিবাসী মানুষজনেদের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে নিরলস প্রয়াসী।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান, বিভিন্ন সময়ে রাজরোষের শিকার হয়ে পড়া, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ, গৃহী-পার্ষদ আর বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অনুরাগীদের ভূমিকা, রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র—'উদ্বোধন'—যা কিনা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একশো বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে—তার বিস্তৃত আলোচনা, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ইত্যাদি ষোলটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়ে 'শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটিতে সংশ্লিষ্ট আলোচনাগুলির মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষের ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে যেমন পর্যালোচনা হয়েছে, তেমনই পরিশেষে পর্বান্তরে অর্থাৎ আগামী দিনে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শ মিশনকে আরো বেশি কার্যকরী এবং ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে কেমন করে প্রসারিত করে দেওয়া যায় তা নিয়েও সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের বিগত একশো বছরের, ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে একই উদ্ধৃতি এবং বিশেষ

কোন প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক শব্দ এবং প্রিয় কয়েকটি বিশেষণ একাধিকবার প্রয়োজনে সংযোজন করতে হয়েছে। এটা না করলে আলোচ্য বিষয়টি অপূর্ণ থেকে যেত এবং সেক্ষেত্রে দ্যুতি ও লালিত্য যেত হারিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে সকলে সহমত পোষণ করবেন সম্যক প্রেক্ষাপটে আশা করি।

স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকাকালীন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগজনিত সেবাকাজের যে বিবরণী সে কালে বালগঙ্গাধর তিলকের 'মরাঠা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার অংশবিশেষ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত প্রথম লেটার হেডে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতীকের ব্যাখ্যা জনিত দুর্লভ ছবি এবং ব্রিটিশ রাজরোষ যখন রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্বকে সাময়িক কালের জন্য অস্থির করে তুলেছিল, তখন শ্রীমা সারদাদেবীর পরামর্শে স্বামী সারদানন্দ বড়লাটকে যে তিনটি চিঠি লিখেছিলেন, সেই তিনটি চিঠির শেষ চিঠিটি যা কিনা একাধারে দুর্লভ এবং ঐতিহাসিক তার প্রতিলিপি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তৎকালীন পুলিশের বড়কর্তা পি. সি. লায়নের অভিমত লিপিবদ্ধ হয়েছে সংশিষ্ট চিঠির উপর। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিলিপি এই দুর্লভ চিত্রগুলির সঙ্গে গ্রন্থের প্রথম অংশে সংযোজিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে আছে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে চার্লস টেগার্টের রোষবহ্নিদীপ্ত রিপোর্ট যা কিনা পশ্চিমবঙ্গ মহাফেজখানায় রক্ষিত। সেই রিপোর্টটি এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে কলকাতায় ভয়াবহ প্লেগের সময় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাপ্রসূত রামকৃষ্ণ মিশনের দীর্ঘ আবেদন পত্রটি। আর আছে রামকৃষ্ণ মিশনের গত একশো বছরের ত্রাণজনিত কাজের দীর্ঘ-বিস্তৃত বিবরণী ও আর্থিক ব্যয়ের পরিসংখ্যানের একটি তালিকা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ১৪০টি শাখা কেন্দ্রের সঠিক অবস্থান, দূরভাষ সংখ্যাসহ সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিগত একশো বছরে যাঁরা অধ্যক্ষ, সহাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন—আছেন তাঁদের তালিকা। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও পাঠকের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বিগত একশো বছরের সার্বিক মূল্যায়ন করার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছি। এ সত্ত্বেও অনেক অনালোচিত বিষয় অপ্রকাশিত থেকে গেলো। পরবর্তীকালের গবেষকেরা তা পরিপূর্ণ করে তুলবেন—এটাই আমার কাঙ্ক্ষিত বিশ্বাস।

একদিন চার আনা পয়সা সম্বল করে রামকৃষ্ণ মিশনের যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিলো, শতবর্ষের বছরে তার আয়-ব্যয়ের প্রামাণ্য আর্থিক চিত্রটিও তুলে ধরা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর ১৮৯৭-এর ৫ মে-র সভায় উদ্দেশ্য-ব্রত এবং প্রথম যে কার্যকরী কমিটি সর্বসম্মত ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল—তাও পরিশিষ্ট অংশে তুলে ধরা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে এটি একটি মহামূল্যবান নথি। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ত্রাণজনিত সেবাকাজ শুরু হয়েছিল মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায়, সেই সূত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ পূর্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ইসলামধর্মী বিভিন্ন স্তরের মানুষ-মানুষীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন, বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে কতটা অবহিত তা

জানার-বোঝার জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিলো। সেই সমীক্ষাটিও পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বেদান্ত দর্শনের প্রায়োগিক রূপ এবং সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই সমীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাষ্ট ডীড ও সাধারণ নিয়মাবলীও পরিশিষ্টের শেষাংশে উল্লেখিত হয়েছে। গবেষণাধর্মী এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্যালোচনার শেষে প্রামাণ্য তথ্য, উদ্ধৃতির আকর গ্রন্থের নাম, প্রসঙ্গ সূত্র শিরোনামে উল্লেখিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের নানা নথিপত্র, বার্ষিক কার্যবিবরণী, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনুসন্ধানী চোখ রেখে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট থেকেছি একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষের সার্বিক চলচ্ছবিটি প্রথম তুলে ধরতে। স্বামী গম্ভীরানন্দের প্রাসঙ্গিক বইটি অনেকাংশে সাহায্য করেছে। তবে সেখানেও রয়েছে অনেক অপূর্ণতা। সেদিক থেকে বিচার করলে এই গ্রন্থটিতে অপরিপূর্ণতার সিংহভাগ সরে গেছে। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যের যেটুকু অপূর্ণতা রয়েছে, তা নানা ভাবে চেষ্টা করেও পূর্ণ করতে পারি নি। আগামীদিনের গবেষকরা তা পূর্ণ করবেন নিশ্চয়। রামকৃষ্ণ মিশনের মত প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষের সার্বিক ইতিহাস সবটাই একক প্রয়াসে প্রথম আমি তুলে ধরবো—এমন ধারণা করাটা যেমন ঠিক নয়, তেমনি তা দাবী করার ধৃষ্টতা প্রকাশও অমার্জনীয় অপরাধ আমার পক্ষে। তবে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি এবং সর্বশেষ তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি গ্রন্থটিতে।

এই গ্রন্থটিতে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ব্যস্ততা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর জীবন নিষিক্ত সুচারু অনুভব-উপলব্ধির নিরিখে একটি সুললিত মহামূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এজন্য তাঁর কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁকে জানাই আমার আভূমি-প্রণতি।

এই গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজনীয় দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করতে পেরে আমি আনন্দিত। কেননা তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপক কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত হয়েছে। তাঁর আশীর্বাদ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সঙ্গে যেমন আমাকে গভীরভাবে যুক্ত করেছে, তেমনই এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে করেছে উদ্বুদ্ধ। পূজনীয় স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে অবহিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকেও জানাই আমার প্রণতি।

গ্রন্থটি লেখবার সময় নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ দিয়েছেন এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জ্ঞাপন ও গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন বেলুড় মঠের গবেষক-সন্ন্যাসী স্বামী বিমলাত্মানন্দ। পরিশিষ্টে সংযোজিত রামকৃষ্ণ মিশনের গত একশো বছরের ত্রাণজনিত কাজের বিবরণী সরবরাহ করেছেন স্বামী মুক্তিনাথানন্দ। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ গ্রন্থটি রচনাকালে দু-তিনটি অংশ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশ করে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদদের জার্নালে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জার্নালে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রের স্মারক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচনাকালে প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতায় আমি আবিষ্ট। রামকৃষ্ণ

মিশন ইন্‌স্টিটিউট অফ্‌ কালচারের গ্রন্থাগারিক স্বামী গীতাত্মানন্দ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নানা গ্রন্থ দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন, প্রকাশনা বিভাগের প্রধান স্বামী বলভদ্রানন্দ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য উপহার দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাপীঠের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই সকলকে। স্বামী সোমাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রুতিচৈতন্য নেপথ্যে থেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। নির্দেশিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীপশুপতি দে মুদ্রণ প্রমাদ যাতে না থাকে সেজন্য বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁকেও জানাই কৃতজ্ঞতা।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় 'পত্রপুট' সংস্থার কর্ণধার শ্রীবিজয়কুমার চক্রবর্তী প্রথম থেকেই যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতা দেখিয়েছেন সেজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার নানা ব্যস্ততার মাঝে তিনি উৎসাহ না দেখালে এ গ্রন্থ শেষ করা সম্ভব হতো না। গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করে সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন ইণ্ডিয়ান কলেজ আর্ট এণ্ড ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানসিপের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীহরিলাল সাহু। তাঁর কাছেও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থটি প্রকাশে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে আমার ছাত্র-অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিক্ষক কার্তিককুমার মণ্ডল, ছাত্র-প্রতিম তাপস চক্রবর্তী, গবেষক-ছাত্রী সংযুক্তা সাঁতরা, গবেষক শিক্ষিকা-ছাত্রী রুমা দে প্রমুখ — এদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশনের কর্ণধার অরুণকুমার দে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী অগ্রজ অধ্যাপক আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়, অধ্যাপক শ্যামল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দোপাধ্যায় সহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতার জন্যও কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি আমার শিক্ষাচার্য কল্যাণী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি রচনার সময় নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদেরও জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। আর আমার অগ্রজ শ্রীসুকুমার বসু গ্রন্থটি রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না নিলে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের শতফুলে বিকশিত শতবর্ষের ইতিহাসের নানা দিক তুলে ধরে এই গ্রন্থ রচনা কোন ভাবেই সম্ভব হতো না।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী-ভক্ত-পাঠক, সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-সমাজ বিজ্ঞানের গবেষক ও সন্ধিৎসু ইতিহাসপ্রেমী প্রমুখ এই গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত ও তৃপ্ত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

ভোলা বসু

১ ডিসেম্বর ১৯৯৮

আই/বি-১
অবন্তিকা সরকারী আবাসন
পিকনিক গার্ডেন
কলকাতা-৭০০ ০৩৯

সূচীপত্র

ক.

প্রাসঙ্গিকী

খ.

আলোচনা

গ.

পরিশিষ্ট

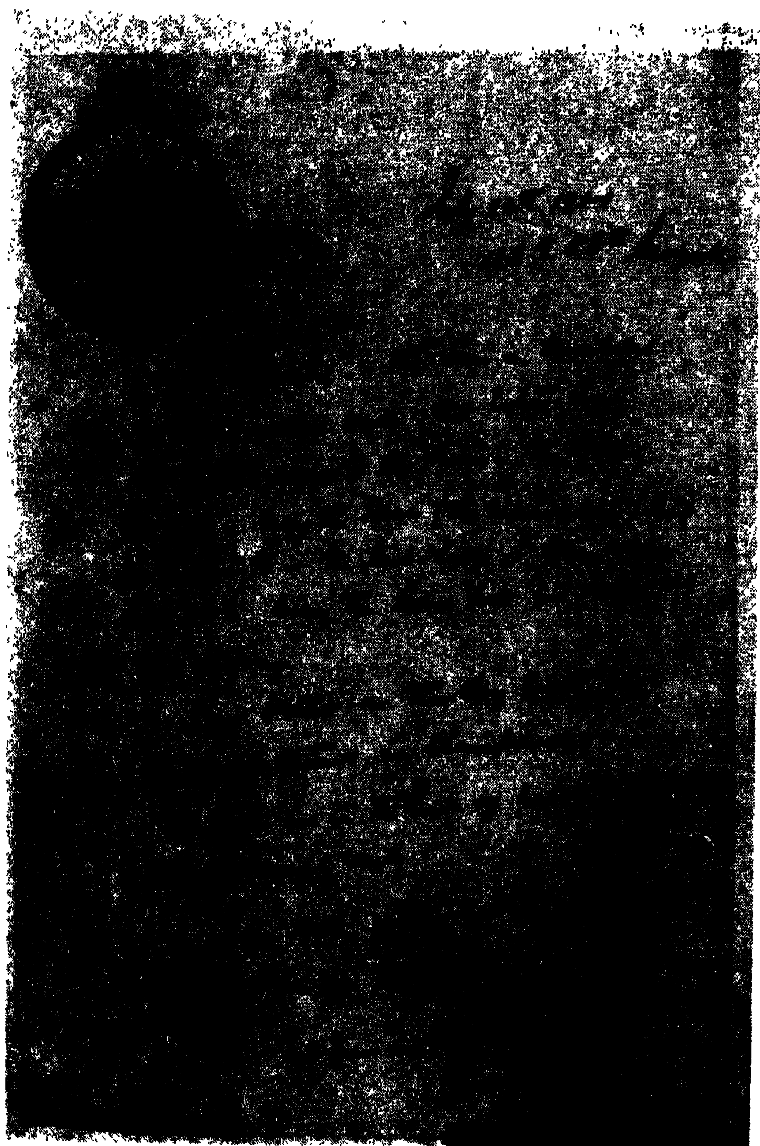
ঘ.







ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।।



১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই আমেরিকান শিষ্যা মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি। এই চিঠিতে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তার প্রতিলিপি।

All letters &c. to be addressed to the President R. K. Mission.

No. R. ——



Ramkrishna Mission,
Belur P. O., Howrah Dist.

Dated, the 7th April 1917.

To
The Hon'ble Mr P. C. Lyon C.S.I.
Calcutta

Dear Sir,

I crave leave to remind you of your very kind promise to me to have the police guards [illegible] on two young members of our Belur Math taken off [illegible] the police authorities. We earnestly hope you will kindly leave the matter [illegible] decided [illegible] that effect.

Yours faithfully
Saradananda
Secy. Ramkrishna Mission

[illegible]

P.C.L.
7/4/17

পি. সি. লায়নকে লেখা স্বামী সারদানন্দের একটি চিঠির প্রতিলিপি ও চিঠির উপর পি. সি. লায়নের নোট।

The Ramkrishna Mission and the work against Plague.—It is reported by a correspondent of the *Times of India* that the Ramakrishna Mission in Bengal has initiated a movement with the object of securing voluntary services of the natives in cleansing the insanitary districts and adopting plague preventive measures Swami Vivekananda, the present leader of the mission, is reported to have interested himself in the matter and called upon Bengalees to belie by practical action the aspertions thrown upon them by the advocates of the Calcutta Municipal Bill. It is somewhat strange, that the native press in Bengal does not give adequate information upon this piece of news But those that know intimately the spirit of the teachings of the Swami, will, by no means be surprised if they find the favourite disciple of Rama Krishna Parmahansa thus apparently going out of his way to enroll volunteers in the cause of improving sanitation and preventing plague The gospel of the Swami though based upon the seemingly un-worldly principles of the *Vedanta* is in essence only the gospel of active work in worldly affairs From the exoteric point of view Swami Vivekananda's religion may appear to some to consist only in the spirituality of asceticism, but the esoteric view of the same as disclosed in some of the finest speeches of the Swami shows that nothing lies nearer to his heart than the idea of attempting a regeneration of his country through a highly purified materialism in its best sense. The reformer cleaning with his own hairs the W C. of the pariah is the worldly ideal of the Swami, and no wonder if he interests himself in the improvement of sanitation and prevention of plague more than any secular city father.

The Work of the Ramkrishna Mission

In this connection the work of the Ramkrishna Mission as summarised in the Famine Relief Report November 1899 to 1900 issued by Swami Brahmananda, the President of the mission deserves notice The Ramkrishna mission have set a noble example to their countrymen of being serviceable to humanity under the changed conditions of modern life The creed of self-denying and self-sacrificing Swamis was upto now to lead a holy life of abstinence and seclusion and resignation far off from the busy hives of humanity But it is really more laudable, more meritorious to devote a life of entire resignation and self denial to relieve distress and help destitution of our fellow creatures The Ramkrishna mission have followed this principle in practice and their work both in plague and famine cannot but inspire great respect The mission had opened orphanages at Kishengar Khandawa and Bellur Matha They collected by appeal for help nearly 7000 rupees and spent them on the maintenance of nearly 444 orphans and the distribution of money clothe blankets and doles of grain to nearly 15000 men Medical help was given gratis the orphans were given khichari in the morning and Dal Roti in the evening The able-bodied were sent to carpet and cotton mills The success of the Kishengar orphanage was entirely due to the substantial help of Diwan Sham Sunder Lal The Famine Commissioners have reported favourably about the management of this institution It may be worth that out of the funds nearly 4500 were contributed by the Americans and English friends

A good object lesson

The Ramkrishna mission also did the thankless task of performing sanitary work in connection with the plague of 1900 The volunteers of the mission confined themselves solely to the house of the poorest classes who were unable to pay or cleansing and disinfecting them The filthy habitations of the poor were carefully disinfected without causing the least irritation to their ignorant owners or residents at a great cost by the zealous members of the mission. We hope the admirable record of the practical Vedantists who have organised themselves under the Ramkrishna mission will call forth better instincts amongst the religious in this part of the country and arouse them to work in a co-operative spirit and systematic organisation.

বাঁদিকে : ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের 'মরাঠা' পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতায় প্লেগ সেবা কাজের বিবরণী। ডানদিকে : ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত পরবর্তী দুটি প্লেগ সেবার বিবরণী ও স্বীকৃতি। এই বিবরণীতে দুর্ভিক্ষ জনিত সেবা কাজের কথাও উল্লেখিত।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব

রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার তারিখ ১মে ১৮৯৭। রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল একটি অধ্যায়ের সূচনা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আর বহির্ভারতে সম প্রবাহের বর্ণময় এক বিভাবনা। আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আগে—বহু আগেই সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, একরৈখিক 'পৌরোহিত্য শক্তি'র জাল ছিন্ন করে, বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায়ের আবর্ত পার হয়ে, বৃহত্তর মানবিকতার অর্গল মুক্তি ঘটিয়ে, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' কাজটিকে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে, 'আত্মোনং মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'-এর পথটিকে প্রশস্ত করে, জীবনে জীবন যোগ করার প্রত্যয়দৃপ্ত সহস্র আলোর দীপ প্রজ্জ্বলনে এগিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। প্রসঙ্গত আমরা পাঁচটি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো।

১. ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী যাওয়ার পথে বৈদ্যনাথধাম-দেওঘরে উপস্থিত হলে সেখানকার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষজনেদের চরম দুঃখ, দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে, আপন হৃদয়ে ও তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উপলব্ধির নিগড়ে মথুরবাবুকে বললেন,—'তুমি তো মা-র দেওয়ান; এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।'[১] মথুরবাবু এই কথা শুনে জানালেন যে তীর্থ-পর্যটনে অনেক অর্থ খরচ হবে, এদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করতে গেলে সংশ্লিষ্ট অর্থে টান পড়বে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঐ প্রপীড়িত মানুষদের দুর্দশায় কাতর, কারুণ্য নিষিক্ত অনুভবে অশ্রুসিক্ত। তিনি মথুরবাবুর কথা শুনে বলে উঠলেন,—'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।'[২] শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাঘন আচরণে

এবং বজ্রদীপ্ত ঘোষণায় তৎপর হয়ে ঐ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষদের শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো সেবা করলেন মথুরবাবু। এই সেবাযজ্ঞের মধ্য দিয়েই সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়নি কি রামকৃষ্ণ মিশন! রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারের বীজ সেদিন প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল—এ বিষয়ে দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই। 'অচল শিব দর্শন অপেক্ষা সচল শিব'—মানুষের সেবা সেদিন রামকৃষ্ণের কাছে গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার পেয়েছিল। আর তাই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের লক্ষ্যটিও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ২. ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গী হলেন নদীয়া জেলার রানাঘাটের কাছে চুর্ণী নদীর তীরে কলাইঘাটায় জমিদারি পরিদর্শন ও খাজনা আদায়ে। অজন্মার ফলে সাধারণ প্রজারা দিশেহারা—দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে ঐ দেওঘরের মতোই মথুরবাবুকে নির্দেশ দিলেন—'প্রত্যেককে একমাথা করে তেল, একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া ভোজনের ব্যবস্থা করতে।'[৩] মথুরবাবু তা করলেন নির্দ্বিধায়। সেবাযজ্ঞের দ্বিতীয় কাজটি শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতেই সংঘঠিত হল। ৩. ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণবধর্ম প্রসঙ্গ আলোচনা কালে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। ক) যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে নামকীর্তন। খ) ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে। গ) কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করে, 'সর্বজীবে দয়া' (প্রকাশ করবে)! 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। অর্ধবাহ্য দশায় উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' নরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনে সেদিনই প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েছিলেন—যদি কোন দিন সুযোগ পান তো প্রভুর এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করবেন।[৪] তারই বাস্তবায়ন ঘটেছিল আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ৪. মহাসমাধির অল্প কিছুদিন আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নরেন্দ্রনাথ যখন জীবনের চরম উদ্দেশ্য রূপে নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার অভীপ্সা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জ্ঞাপন করলেন, তখন ধিক্কারে ফেটে পড়লেন রোগভারে ক্লান্ত-শ্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন,—'ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো

হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে, তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এতো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, এত ছোট নজর করিস নি।"[৫] শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধিক্কার নরেন্দ্রনাথকে সচেতন করেছিল, অবশ্যই করেছিল। তাই আমরা দেখবো অব্যবহিত পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথ আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়েছিলেন জগতের কল্যাণে, প্রশস্ত প্রসারণে ও 'আত্মোনং মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'-এর সূত্রে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর কাজ তারই ফলশ্রুতি। ৫. ঐ কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই শ্রীমা সারদাদেবীকে ডেকে 'সমস্যায় কিলবিল করা' তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী, আন্তর্জাতিক মহানগরী কলকাতার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তামাম বিশ্বের সমস্যাদীর্ণ মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোকস্নাত পথ, অবরুদ্ধ থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। উত্তরকালে শ্রীমা সারদাদেবী নিরবচ্ছিন্ন ৩৪টি বছর নেতৃত্ব দিয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে, সব মানুষের জীবনে শতফুল বিকশিত করে দেবার প্রয়াসে থেকেছেন নিরলস।

॥ ২ ॥

উপরের এই পাঁচটি ঘটনার মধ্য দিয়েই রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের, প্রসারের উৎস মুখ গিয়েছিল খুলে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বীজও হয়েছিল প্রোথিত। আর এই কাজের উদ্‌গাতা ছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাই প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজী যখন ১ মে ১৮৯৭-এ ত্যাগী সন্ন্যাসী পার্ষদ ও গৃহী-ভক্ত পার্ষদদের উপস্থিতিতে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে বৈকালীন সভায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন তখন সম্মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্তগুলি নিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হল— 'আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্য ক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানে দশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্যনাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে এই সংঘ তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একাজে সহায় হোন।"[৬]

রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ও কার্যাবলী ঠিক হল—

১. সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।

২. উন্নত চরিত্রের কর্মী তৈরী করা, যারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে, জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করবে।
৩. ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলার উন্নতি ও বিস্তার সাধন করা।
৪. শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা।
৫. জাতি-ধর্মনির্বিচারে নরনারায়ণ জ্ঞানে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।[৭]

আমরা আগে যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছি তারই প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সামনে রেখে, তাঁরই ভাবপ্রসারে গঠিত হল রামকৃষ্ণ মিশন। এই রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই পূর্ণাঙ্গ দেহ। বামকৃষ্ণ সংঘ — যার দুটি ধারা — ১) রামকৃষ্ণ মঠ ২) রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণ মঠ সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠান। আর রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী ও গৃহী পার্ষদ-ভক্ত অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের গঠন প্রণালী অনুযায়ী, প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহী যে সমিতি গঠিত হয়েছিল — তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে দেখবো সেখানে সন্ন্যাসী ও গৃহী পার্ষদদের অবস্থান।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সভাপতি হলেন — স্বামী বিবেকানন্দ। উপ-সভাপতি — স্বামী যোগানন্দ। কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি — স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সম্পাদক — এটর্নি নরেন্দ্রনাথ মিত্র। যুগ্ম সহকারী সম্পাদক — ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ ও শরচ্চন্দ্র সরকার। একশো বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হয়েছে বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথেই অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের সমন্বয়ে। শতবর্ষ অতিক্রম করে রামকৃষ্ণ মিশন আজ বিশ্ববন্দিত।

॥ ৩ ॥

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বতোজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্বামী শিবানন্দ প্রগাঢ় ভাবে উচ্চারণ করেছেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ প্রদর্শনকালে বড়লাট লর্ড মিন্টোর পত্নী লেডি মিন্টোর কাছে এই ভাষায়,— 'এ সংঘ আমরা সৃষ্টি করিনি। ঠাকুরের অসুখের সময় এই সংঘ তিনিই নিজেই সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর সকলকে শিক্ষা দিয়ে এই সংঘ

গঠন ও কিভাবে চালনা করতে হবে শিখিয়েছেন। সেই হল মঠের গোড়াপত্তন।'[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাবী সংঘের ধারক-বাহক রূপে বেছে নিলেন ১৫ জন তাজা ত্যাগী যুবা ও ১ জন বৈরাগ্যপ্রবণ বৃদ্ধকে। নরেন, রাখাল, তারক, শশী, শরৎ, বাবুরাম, হরি, নিরঞ্জন, যোগেন, লাটু, সারদা, কালী, গঙ্গাধর, সুবোধ, হরিপ্রসন্ন ও বুড়ো গোপাল দা। এঁদের সকলকে শিক্ষা দিয়ে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে নিলেন। নরেন্দ্রকে নির্বাচিত করলেন দলনেতা রূপে। এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের বীজ পুঁতেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে—শ্যামপুকুর বাটিতে তা অংকুরিত—কাশীপুরে উদ্যানবাটিতে পূর্ণবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনু ব্যাধিকে অবলম্বন করে এবং তাঁরই উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ইংগিতে সংঘ দ্রুত রূপ পরিগ্রহ করেছিল কাশীপুরে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকে উপলক্ষ করে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ত্যাগী যুবা-ভক্তেরাও সংঘবদ্ধ হবার যেমন চেষ্টা করেছিলেন তেমনি ভাবগাম্ভীর্য, চিন্তায় পবিশুদ্ধ হয়ে চেষ্টা করেছিলেন পরস্পরের প্রতি প্রীতিবদ্ধতায় আবদ্ধ হতে।

॥ ৪ ॥

আমরা যদি সমকালের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি ওল্টাই তাহলে দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল রামকৃষ্ণ সংঘের বীজ। হতচকিত, বিভ্রান্ত, দীর্ঘ পরাধীনতায় আত্মসম্বিতহারা মানুষের মধ্যে ও জীর্ণ, দীর্ণ, সংস্কারের রুক্ষতায় আবর্তিত সমাজে নতুন প্রাণের বন্যা প্রবাহিত করে দিতেই তাঁর আবির্ভাব। সাধারণ ভাবে, সাধারণ ঘরে আবির্ভূত হয়ে তিনি সাধারণ অজ্ঞ-নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের কথা ভাবলেন। সেই ভাবনায় ডুব দিয়ে ভারতের শাশ্বতবাণী ধর্ম-দর্শনের মর্মমূলে পৌঁছে ব্যবহারিক দিক থেকে লোককল্যাণে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' কথাটি উচ্চারিত করলেন যেমন, তেমনি সার্বিক মুক্তির পথটিকে করলেন চিহ্নিত। আর এরই মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন 'বসন্তের দেবতা'। রবীন্দ্রনাথের কথায় শুষ্ক বেড়াজালে মানুষকে, ধর্মকে আবদ্ধ না রেখে বসন্তের নির্যাস—প্রাণোচ্ছলতা ছড়িয়ে দিলেন সর্বত্র। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাঁর আবির্ভাব বসন্তকালে। সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, ইতিহাসের প্রেক্ষিত—অধ্যাত্ম চিন্তার আঙিনায় আমাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করলে এই বসন্তকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে

পারব চিন্তা-চেতনায়, অনুভব করতে পারব শিরা-উপশিরায়। এই উপলব্ধি, অনুভবের অনুরণনে রামকৃষ্ণ সংঘের পত্তনের আবহটি আমরা শুনতে পারব আর তার বাস্তবায়নের অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠার রূপটিও প্রত্যক্ষ করতে পারব।

ঋতুচক্রের সুচিহ্নিত আবর্তনে শীতের পরই আসে বসন্ত। শীতের ম্লানিমায় ধরায় নেমে আসে জীর্ণতা, শীর্ণতা, প্রাণহীন এক রুক্ষতা। বসন্তের সমাগমে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। বসন্ত ছড়িয়ে দেয় রঙের বন্যা। সমস্ত জীর্ণতা, শীর্ণতা, রুক্ষতার প্রেক্ষিতে অচঞ্চল-নৈঃশব্দের অবসানে বসন্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি, রিরংসা, আবর্জনাকে সরিয়ে দিয়ে নব জীবনের, নব চেতনার প্রসারণে নব দিগন্তের বলয়টিকে করে তোলে নিটোল। নতুন আশা, ভালোবাসা, উৎসাহ-উদ্দীপনার সংযুক্তিতে, জীবনে জীবন যোগ করার প্রত্যয় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় আকাশে-বাতাসে, নিসর্গ প্রকৃতির বুকে পত্র মর্মরে, সমাজের শিরা-উপশিরায়। বসন্ত তাইতো ঋতুরাজ।

এই ঋতুরাজ বসন্তের ঊর্মিমুখর দিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি সর্বার্থেই বসন্তের দেবতা। আমরা বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক নানা দেবদেবীর নাম ও রূপের সঙ্গে পরিচিত। তাঁদের জীবন্ত রূপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমাদের হয় নি; সাধারণত হয়ও না। পরম ব্রহ্মের প্রকাশ যেমন তাঁদের মধ্যে প্রকটিত তেমন অন্যান্য জীবের মধ্যেও তাঁর অবস্থান। তবে তারতম্য আছে। তা থাক্। তবুও 'জীবে জীবেই তাঁর অধিষ্ঠান',—একথা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানিয়ে গেলেন উচ্চকণ্ঠে। আমরা জীবনের, 'তলাতল', পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—সবই খুঁজে পেলাম। এ কথা সু-প্রাচীন, উজ্জ্বল, উচ্ছল, শাশ্বত হলেও আমাদের কাছে তা ছিল আবৃত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজে-অনায়াসে সেই আবরণ সরালেন, মাতালেন এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দিলেন।

আসলে তিনি যে বসন্তের দেবতা। মানুষই দেবতা, 'মান' আর 'হুঁশে'র সংযুক্তিতে সে সত্যি দেবতা হয়ে ওঠে, উঠতে পারে শাশ্বত চেতনার সম্প্রসারণে, দুঃখীর দুঃখ মোচনে, শৃংখলিত সমাজের উত্তরণে সে হয়ে উঠতে পারে নবীন নায়ক এবং তা যুগে-যুগান্তরে দেশে-দেশান্তরে সর্বোপরি সর্বকালেই,—একথা জানিয়ে দিতেই শরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। এবং আবির্ভাব বসন্তকালেই।

আসলে তিনি শীত রূপ সমাজের রুক্ষতা, রিক্ততা, জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়, আত্মগত সংকট থেকে মুক্তির পথ প্রসারিত করে

বসন্তরূপে নতুন আশা-ভালোবাসা, অবারিত প্রাণপ্রাচুর্যের মিলমিশে নবীন জীবনের, নতুন যুগের, নব দিগন্তের দিশারী, ঋত্বিক; অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দের কথায় 'অবতার বরিষ্ঠ'। আর আমাদের কথায়—বসন্তের দেবতা।

॥ ৫ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা প্রাসঙ্গিক বিষয়টি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারবো।

গত শতাব্দীর শুরু থেকেই রাষ্ট্র-সমাজ জীবনে নেমে এসেছিলো যে তমোনিশা তার প্রচ্ছায়া প্রসারিত হয়েছিল ব্যক্তি জীবনে, স্বভাবতই পারিবারিক জীবনেও। একদিকে বণিককুলের শাসন-শোষণের পাশে ধর্মান্তরকরণ ও প্রবাহিত সু-প্রাচীন ভারত ঐতিহ্যকে দুমড়ে, মুচড়ে ফেলার সু-চতুর প্রয়াস ছিল অব্যাহত। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু-ধর্মধ্বজী মানুষজন ধর্মের ভণ্ডামিতে ছেয়ে ফেলেছিল চেতনার আকাশ। শিক্ষা-মননের সংযোগ রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রসারণের মুখে রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দিশেহারা হয়ে পড়ল। এরই পাশাপাশি নব্য শিক্ষিত যুবকেরা পাশ্চাত্য ধর্ম-সংস্কৃতির টানে আত্মগত সংকটে (আইডেনটিটি ক্রাইসিস) হচ্ছিল আবর্তিত। শেষোক্ত সংকট ছিল ভয়াবহ,—'পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত, হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও'র ব্যক্তিত্বে অভিভূত এবং আচার-আচরণে প্রচলিত সংস্কার বিরোধী। যে কারণে, মুসলমান খানসামার রান্না ছিল তাঁদের প্রিয়, বিস্কুট, বিফস্টিক, ফাউলকারীর তাঁরা ছিলেন ভক্ত। মদ খেতেন প্রকাশ্যে, প্রণাম বা কোলাকুলির পরিবর্তে তাঁরা করতেন করমর্দন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রতি তাঁরা বিতৃষ্ণ (বাড়ি বাড়ি গো মাংস ছুঁড়ে মারতেন), আর দেব-দেবীতে বিশ্বাস হারা।'[১] তাদের মদ্যাসক্তি, মিথ্যাচরণ, নারী-আসক্তি সভ্যতার নামে সভ্যতা বিনাশী নগ্ন রূপটি তুলে ধরেছেন স্বয়ং মধুসূদন দত্ত; 'একেই কি বলে সভ্যতা'—প্রহসনে কামিনী আর কাঞ্চনের প্রতি সাধারণ মানুষের দুরন্ত লোভ তখন জেঁকে বসেছে। তথাকথিত হিন্দুধর্মধ্বজীদের ছবিও আঁকলেন মধুসূদন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। এই প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় নৈরাজ্য গীতোক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র অনুকূল। সেই অনুকূলে বসন্তের হাওয়ায় পাল তুলে তমিস্রা ঘন অন্ধকারে আলোর দ্যুতি নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

বসন্তের নির্যাস বুকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগান্তকারী এই আবির্ভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য,—'পরমহংসদেবকে আমি শ্রদ্ধা করি কারণ তিনি ধর্মীয় নৈরাজ্যের শুষ্ককালে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা নিজ উপলব্ধিব দ্বারা প্রমাণ করেছেন, কারণ তাঁর মহান সত্তা আপাতবিরোধী সাধনা সমূহকে নিজ সত্তার অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিত্তের কারুণ্য চিরদিনের জন্য ম্লান করেছে, পুরোহিত ও পণ্ডিতদের আড়ম্বর, বিদ্যাভিমানকে।'[১০] নোবেল লরিয়েট রোমাঁ রোলাঁ তাঁর ফরাসী অনুভবের বাইরে এসে আবিষ্কার করেছেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, — 'শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন দু-হাজার বছরের ভারতীয় সাধনার ঘনীভূত রূপ।'[১১]

বসন্ত যেমন কুহেলিকা আচ্ছন্ন ধরাতলকে ফিরিয়ে দেয় তার চিরন্তন সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপকে নবভাবে এবং নব সাজে, শ্রীরামকৃষ্ণও ধর্মের শাশ্বত-প্রগাঢ় রূপটি শ্যাওলাদাম থেকে তুলে এনে নতুন রূপে নতুন ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি পরধর্মসহিষ্ণুতা নয়, তা গ্রহণ এবং সব ধর্ম একই সত্যে উপনীত হয়েছে তা সোচ্চারে জানিয়ে দিলেন। এজন্য তিনি ডুব দিয়েছিলেন সব ধর্মের গভীরে, পৌঁছেছিলেন মর্মমূলে। তাইতো তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনতে পেয়েছি, প্রগাঢ় অনুভবের বাণী,— 'যত মত তত পথ'।

এই অনুভব, এই কথাকে তিনি করে তুললেন বিশ্বজনীন। তাইতো তিনি 'বাহির হয়েছিলেন' প্রধান তিনটি ধর্মের পথে পথে, পৌঁছেছিলেন উৎস মূলে। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনার ধারার সমন্বয় সাধনের রূপটিও করেছিলেন বিকশিত। রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্য ঐ 'বাহির' এবং সেই সাধনার সম্মিলনকে কেন্দ্র করেই। নোবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ এই দিকেই দৃষ্টি দিয়ে তাঁর প্রণতি পৌঁছে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে,— 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,/ ধেয়ানে তোমার/ মিলিত হয়েছে তারা। / তোমার জীবনে / অসীমের লীলাপথে/ নতুন তীর্থ/ রূপ নিল এ জগতে / দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি।/ সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'[১২] শুধু রবীন্দ্রনাথের অনুভব নয়, 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুভব মিলে যায়, এইভাবে,— 'রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক; রূপ ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় ব্যক্ত করিতেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া আমি ধর্মের

সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।'[১৩] প্রকৃত ধর্ম তো আমাদের উদার হতে শেখায়, আত্মায় আত্মা যোগ করতে শেখায়; অন্তর্নিহিত সমগ্র শক্তি দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলতে শেখায়। এই 'উদারতা'—পরমতসহিষ্ণুতার হাত ধরলে বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধ সংঘঠিত হবে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতার অভিমুখে পৌঁছে তাই আনর্ল্ড টয়েনবি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন,—'বর্তমান পৃথিবীকে বিধ্বংসী আনবিক যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এবং শতসহস্র ফুল বিকশিত করে দিতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী।'[১৪] এ প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর কথাও উল্লেখ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন,—'তিনি ঈশ্বরকে মুখোমুখি দর্শন করেছেন। তাঁর জীবনের মূলে ছিল সত্য, প্রেম ও অহিংসা।'[১৫] খুব খাঁটি কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যকে ছুঁয়েছেন, নিজের সঙ্গে লেপটে দিয়েছেন। সত্যানুসরণের জন্য তাই তাঁর আকর্ষণীয় আহ্বান আমরা শুনেছি বারে বারে। প্রশ্ন জাগে 'সত্য বিষয়টি' কি? তার উত্তরও দিয়েছেন তিনি,—'সত্য হল—মন আর মুখকে এক করা।' এর জন্য নিয়ত অভ্যাস প্রয়োজন। গীতার সেই 'অভ্যাসযোগ'। এ ছাড়া তো আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। তাই শ্রীমা সারদাদেবী বলতে পারেন অনায়াসে,—'সত্যই হল কলির তপস্যা।' আরো বলেন, 'যে সত্যকে ধরে আছে সে ঈশ্বরের কোলে শুয়ে আছে।' কলির মানুষ অন্নগত প্রাণ তাই ঈশ্বর-আরাধনা (যা আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ারই নামান্তর) করার সময় নেই, সেজন্য সত্যানুসরণের প্রতি এতো গুরুত্ব আরোপ। বিবেকানন্দও একই সুরে পরবর্তীকালে বললেন গুরুত্বকে যথার্থভাবে অনুধাবন করে,—'সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়া যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ছাড়া যায় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। ব্যক্তি সংকট থেকে রাষ্ট্রীয় সংকট, সামাজিক সংকট থেকে আন্তর্জাতিক সংকট—সব সংকটের সমাধানের কথা তিনি বসন্তের সজীবতা নিয়ে মেলে ধরেছেন। তাঁর সেই অমৃতকথা গ্রথিত হয়েছে, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'—গ্রন্থে। এই কথামৃত পড়ে, অভিভূত হয়ে পাকিস্তানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মহম্মদ দাউদ রববর সুন্দর করে জানিয়েছেন,—'রামকৃষ্ণের বাণী মনোমুগ্ধকর, আমাকে তা অনুপ্রাণিত করে মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে।'[১৬] মহম্মদ দাউদের অভিমতের মূলে আছে সেই সর্বধর্মের মূল সত্যকে অন্বেষণ এবং গ্রহণ। আর খ্রীষ্টফার ঈসারউডও অনুপ্রাণিত হয়েছেন ধর্মীয় উদারতার

সূত্রে। জওহরলাল নেহরু ভারত ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষ্ণের আত্যন্তিক উদারতার স্বরূপটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,—'আত্মানুভূতির মধ্য দিয়ে অন্যান্য ধর্মের মূল সত্যটি তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন বলেই ইসলাম ও খ্রীষ্টানধর্মের সাধনা করেছিলেন। তিনি সকল সংকীর্ণতা, সকল ধর্মের বিরুদ্ধে সর্বধর্মের সত্যতাকে প্রকাশ করে সমন্বয়ের যথার্থ পথ দেখিয়ে গেছেন।'[১৭] তাইতো জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণকে চিহ্নিত করেছেন 'প্রকৃত মহাত্মা' রূপে।[১৮] ভারতবর্ষের শাশ্বত ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যে রক্ষা করেছিলেন—একথা ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে বলতে হয়েছে।[১৯] শুধু ঐতিহ্যরক্ষা নয়, ভবিষ্যত ভারতবর্ষের স্থিতিশীলতা ও পল্লবিত প্রসারের কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাই বলেছেন জোরের সঙ্গে,—'যাঁহার পদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছিল, তিনি যুগধর্মের প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ; তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস কবি না।'[২০] তাঁর জীবন, তাঁর বাণী, তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের প্রতীতি আরো দৃঢ় হয়—তিনি অবতার; যুগাবতার—আর তার আগে বসন্তের দেবতাও। তিনি সকলকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। সয়েছেন অশেষ কষ্ট। তবুও ক্ষান্ত হন নি। পিছিয়ে পড়েন নি। মানুষকে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে এগিয়েছেন অশেষ রোগযন্ত্রণা সহ্য করেও। তাই ক্রুশে আর ক্যানসারে কোন ভেদ নেই।

ভেদ নেই বলেই সব মানুষের উপর তাঁব অগাধ আস্থা। সকলকে তিনি পৌঁছে দিতে চান সুস্থিত জীবনে, পরম প্রাপ্তির পথে। যে প্রাপ্তির মূলে মানুষ খুঁজে পায় তার অস্তিত্বের উৎস, আর সেই উৎস থেকেই নির্মাণ। তাই তিনি ছুটে বেড়ান যে যেখানে আছে—সবাইকে পথের হদিশ দিতে। আর তাইতো দেখি অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, জীবনের প্রথম পর্বে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপ সহ্য করেছেন তীব্রভাবে, সেই অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর জীবন পাল্টে গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে। আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন তিনি সেই কথা—'আমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়। আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিত পাবন পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরমপূজনীয় দেবতা, 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ...তাহার পর উভয় হস্ত আমার

মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা, তোমার চৈতন্য হউক"। তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি আমার ন্যায় অধমজনের প্রতি কি করুণাময়দৃষ্টি!'[২১] বিনোদিনীর কথা যখন এল তখন তাঁর নাট্যশিক্ষক গিরিশচন্দ্রের কথাও আসবে। গিরিশচন্দ্র নিজের সম্পর্কে বলতেন,—'মাতাল গিরিশ যেখানে বসে তার আশপাশের সাত হাত দূরের মাটি অপবিত্র হয়ে যায়।' সেই 'মাতাল গিরিশ'কে ভক্ত ভৈরব গিরিশে রূপান্তরিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তা করেছিলেন অপরিমেয় প্রেম-ভালোবাসার স্পর্শে।

সাধারণ মানুষের জন্য, অত্যন্ত সাধারণভাবে যাঁর আসা, তাঁর করুণাময় দৃষ্টি সাধারণ মানুষের উপর সম্প্রসারিত হবে—এটাই স্বাভাবিক। কাশী যাওয়ার পথে বৈদ্যনাথধামে (দেওঘর) কিংবা রাণাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, অসহায়, নিরালম্ব মানুষ-মানুষীর মধ্যে নিজে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' যে কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করলেন—তাই হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ। বাস্তবিক পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মযজ্ঞের প্রায়োগিক সূত্রপাত। এ তথ্যটি ভালোভাবে নেড়েচড়ে রুশ চিন্তাবিদ, প্রাচ্য বিশারদ ড. রিবাকভ লিখলেন,—'আমি ওঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) একটু আলাদা করে দেখি। সবার উপরে রামকৃষ্ণ ছিলেন কবি। ...আকাশে মেঘ দেখলে তাঁর ভাবোদয় হচ্ছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি আত্মহারা হচ্ছেন, তাঁর ভাবসমাধি আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু এটা বুঝি, তিনি সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ভাবেই এসেছেন।'[২২] আর তাইতো তিনি আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলেন না, আমের মিষ্টতার আস্বাদ গ্রহণ করতে সবাইকে আহ্বান জানান। পাঁচিলের উপর উঠে আনন্দরাজ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন না, সবাইকে নিয়ে সেই আনন্দরাজ্যে পৌঁছতে চান। কণ্ঠে বারবার ঝরে পড়ে অমেয় আকুলতা। মার্কিন জ্যোতির্বিদ হার্লো সেপলের অনুভব আরো জমজমাট,—'জগৎ পরিকল্পনায় মানুষের নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কীয় সমস্যাগুলি সমাধানে যাঁরা কাজ করেন এবং চিন্তা করেন—রামকৃষ্ণের হৃদয় মন তাঁদেরই ঠিক পরিবেষ্টন করে থাকে।'[২৩]

আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করবো শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের কথা। ঘর ছেড়ে, প্রিয়জন, পরিজন ছেড়ে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে ছুটে এলেন তাঁর কাছে সেই 'নক্ষত্রগুলি'র জন্য তাঁর হৃদয়—মনের দরোজা ছিল সর্বক্ষণের জন্য উন্মুক্ত। শুকদেবের মতো নির্বিকল্প সাধনায় যিনি ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন সেই 'নক্ষত্র সম্রাট' বিবেকানন্দকে ধিক্কার দিয়ে ভুল ভাঙালেন, 'বহুজন

হিতায় বহুজন সুখায়'-এর কাজে নিয়োজিত করলেন। আর সেজন্য নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিলেন তাঁকে। বৃটিশ বুদ্ধিজীবী উইলিয়াম ডিগ্‌বি এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল রূপটি যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল,—'আমরা যাকে পাণ্ডিত্য বলি তাঁর সেসব কিছু না থাকলেও রামকৃষ্ণ যেসব কথা বলে গেছেন, জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করেছেন, মানবকল্যাণে এবং মানবমুক্তির যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তেমনটি তাঁর যুগে আর কেউ বলেননি বা করেননি। তিনি একদিকে অবসাদগ্রস্ত মানুষের কাছে সুন্দরকে প্রকাশ করেছেন অন্যদিকে অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।'[২৪]

কথামৃতের পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা দেখবো, শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার 'কামিনী-কাঞ্চন' থেকে দূরে সরে থাকতে বলছেন। উনিশ শতকের টালমাটাল পরিবেশই শুধু নয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এবং সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা দেখতে পাবো 'কামিনী' (যে ক্ষেত্রে অবিদ্যার স্বরূপিণী) আর 'কাঞ্চন' কৌলিন্যের ঝলসানি তরবারির থেকে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে মানুষকে অ-সুন্দরের, রিরংসার মাঝে ঠেলে দেয়, ক্লান্ত করে, রিক্ত করে, সিক্ত করে রক্তের ফেনিলোচ্ছলতায় উন্মাদ করে তোলে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এ সম্পর্কে বারবার সাবধান করে দিয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন। আর প্রতিবাদ? সে তো গুনে শেষ করা যাবে না। উপনয়নের সময় জাতপাতের বিরুদ্ধে যে বজ্রঘোষণা এবং অর্গলমুক্তির মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদের শুরু, চালকলা বাঁধা বিদ্যা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে মাত্রাছাড়া প্রজা শোষণের অর্থ এবং সেই অর্থে বিত্তবান বাবু কালচার (বুর্জোয়া অর্থ-বিত্তের বিভাবনায় 'টাকা মাটি মাটি টাকার' ঘোষণায় যা দৃপ্ত), নিষেধের শক্ত বেড়া টপকে একবার নয় একাধিকবার থিয়েটার দেখতে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীদের কৃপা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার বিস্তার। সামাজিক অসংগতির অবগুণ্ঠন সরিয়ে বসন্তের নির্যাস বইয়ে দেবেন বলেই তো তাঁর আবির্ভাব।

সবার কথা বলতে গিয়ে নিবেদিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নারীদের কথা, নারীমুক্তির কথা।[২৫] বৈদিক উত্তর কাল অর্থাৎ পৌরাণিক কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নারীর উপর যে অত্যাচারের-অবিচারের বন্যা বয়েছে তার প্রতিবাদ নীরবে করে তার দেদীপ্যমান ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণ মেলে ধরলেন—শ্রীমা সারদাদেবীকে ফলহারিণী কালীপুজোর রাতে, পুজো করে, সাধনার অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিষয়টি

বিচার করলে আমরা দেখব, দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচারিত নারীর প্রতি এ যথার্থ সম্মান জ্ঞাপন। উত্তরকালে নারী শক্তির বিকাশ সাধনে বিবেকানন্দের তৎপরতা এবং 'মহামায়ার শক্তিস্বরূপিণী' নারীর সার্বিক উন্নতিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ জ্ঞাপন,—যা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তারই দ্যোতনা।

এভাবেই, এসব কিছুকে আপন জীবনে, আচরণে গ্রথিত করে বসন্তের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ জাগ্রত আমাদের দ্বারে ভুবনমোহন রূপে। তাই আজ 'দিকপ্রান্তে বনবনান্তে,/ শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,/ সরোবরতীরে নদী নীরে,/নীল আকাশে, মলয় বাতাসে,/ ব্যাপিল অনন্ত তব মাধবী/নগরে গ্রামে কাননে, দিনে নিশীথে,/ পিকসঙ্গীতে, নৃত্যগীত কলনে বিশ্ব আনন্দিত / ভবনে বীণাতান রণ—রণ—ঝংকৃত / মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে / নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,/ বিচলিত। চিত উচ্ছলি উন্মাদনা।'[২৬] এই বসন্তের উন্মাদনায় মেতে উঠে, 'বসন্তের দেবতা' শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত পথ ধরেই তো পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে। এখন শুধু প্রতীক্ষা সেই দিন-ক্ষণের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নামাঙ্কিত রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য, রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ দেশে-দেশান্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নির্দেশে শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্ন-নিরলসভাবে রূপায়নের মধ্য দিয়ে সেই ক্রমমুক্তির কাজটি নীরবে করে চলেছে। পরিশেষে আবার আমরা বলব এই রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্‌গাতা স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আর আলোকবর্তিকা শ্রীমা সারদাদেবী। কাণ্ডারী বিবেকানন্দ তাইতো বলতে পারেন আনুষ্ঠানিক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিন—'প্রভু পেছনে থেকে আমাকে দিয়ে এই সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।'[২৭]

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৮০. পৃঃ ১৫১
২. ঐ
৩. ঐ
৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৮৩, ঠাকুরের দিব্যভাব, একাদশ অধ্যায়, পৃঃ ২৩৯–২৪০।
৫. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ১৮২
৬. History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Swami Gambhirananda, 1983. P. 95.
৭. স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১৪০০, পৃঃ ৩৭

৮. মহাপুরুষ শিবানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ, ১৩৫৯, পৃঃ ১৩৮
৯. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, ১৯৮৫, পৃঃ ৩২।
১০. The Religion of the world, Published by the Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1983, P. 124.
১১. The life of Ramakrishna, 1979, P. 11.
১২. পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ২১৬।
১৩. আত্মচরিত. প্রবাসী সংস্করণ, ১৩২৮, পৃঃ ২১৬।
১৪. Sri Ramakrishna & His Unique Message. Swami Ghanananda, Forwarded by Arnold J Toyenbee, London (1970)
১৫. Life of Sri Ramakrishna, 1977, P. II.
১৬. Clude Alan Stark, God of all, 1974, P. 190-99.
১৭. Discovery of India, Ist Edition, P. 338.
১৮. A Real Mahatma, August, 1986.
১৯. The Cultural Heritage of India, Published by the Ramakrishna Mission Institute of Culture
২০. ধর্ম, ১৮ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃঃ ৩
২১. আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, বিনোদিনী দাসী, সম্পাদনা—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য, ১৩৭৬
২২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৮৭
২৩. Prabuddha Bharat, 1 January, 1956, P 18.
২৪. Prosperous British India, 1901, P. 99.
২৫. Kali the mother গ্রন্থে নারীশক্তির আলোচনায় উল্লিখিত।
২৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১, সংগীত সমূহ সংকলিত খণ্ড, পৃঃ ৪০২।
২৭. স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পৃঃ ৩৮।

রামকৃষ্ণ মিশনের আলোকবর্তিকা : শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে স্বামী শিবানন্দকে একটি চিঠিতে লিখছেন—

> 'মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেউ পারে না, ক্রমে পারবে। .....আমার জীবন থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি তাতে ভিত নয়। মা-ঠাকুবাণি গেলে সর্বনাশ।'[১]

স্বামীজী শ্রীমা সারদাদেবীকে নিয়ে আরো চিঠি লিখেছেন, বিভিন্ন সময়ে নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন—সেগুলি থেকে সরে এসে আমরা এই একটি মাত্র চিঠিকে আঁকড়ে ধরতে পারি। এই চিঠিতে স্বামীজী স্পষ্টতর করে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ সংঘের প্রস্তুতি, প্রসার ও অগ্রগতির মধ্যমণি শ্রীমা সারদাদেবীর উজ্জ্বল—প্রাণোচ্ছল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। শিহড় গ্রামের শান্তিনাথতলায় মায়ের কোলে চড়ে যাত্রা দেখতে গিয়ে শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আঙুল তুলে ভাবী জীবনসঙ্গী নির্বাচনের যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তারই মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের রূপচ্ছবিটিও চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। সাধনপথে, বাস্তবিক ক্ষেত্রে যা ভারতবর্ষ ও তামাম বিশ্বে বর্ণময় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে যোগ্য সহধর্মিণী রূপে 'আদ্যাশক্তি মহামায়া' সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ১৮৭২-এ প্রথম উপস্থিতির পর রামকৃষ্ণ সংঘের প্রোথিত বীজটিকে আলো-হাওয়ায়, ঝড়-ঝাপটায় আগলে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে শ্রীমা সারদাদেবীকে, অঙ্কুরিত রামকৃষ্ণ সংঘকে লোককল্যাণে বিশাল মহীরুহে পরিণত করার জন্যে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালিপুজোর রাতে (৫ জুন ১৮৭২) ষোড়শীরূপে পুজো করে সাধনালব্ধ অর্ঘ নিবেদন করেছেন যেমন, তেমনই উদ্বোধনী মন্ত্রে অভিষিক্ত করেছেন মহাশক্তি সারদাদেবীকে। চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মহাসমাধির আগে শ্রীমা সারদাদেবীকে

একদিকে সমস্যা-সংকটের আবর্তে 'কিলবিল করা' মানুষ-মানুষীদের স-সম্মানে আলোকস্নাত কুসুমের নির্যাসবাহী মুক্তির পথ দেখাতে এবং অন্যদিকে অঙ্কুরিত রামকৃষ্ণ সংঘের নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে।

মহাশক্তির অভিব্যক্তির আলোক স্পর্শ করল নীলিম আকাশকে। ১৮৮৬ থেকে ১৯২০ টানা ৩৪টি বছর রামকৃষ্ণ সংঘের জননী রূপে শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর সুকঠিন দায়িত্ব অনায়াসে পালন করলেন। পালন করলেন কঠোরে-কোমলে, মননে-আবেগে। তাই তো তিনি স্বামীজীর কথায়, 'রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের হাইকোর্ট'। আমরা বলবো, তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সুপ্রিম কোর্ট।

রামকৃষ্ণ সংঘের দুটি ধারা — ক) রামকৃষ্ণ মঠ খ) রামকৃষ্ণ মিশন। দুটি ধারারই উদ্দেশ্য বামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে লোককল্যাণ। রামকৃষ্ণ মঠ অধ্যাত্ম পিপাসু মানুষজনের পিপাসা মেটানোর কাজে তৎপর। শ্রীরামকৃষ্ণ আরাধনা এবং ভারতীয় শাশ্বত, ধর্ম-দর্শন-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির চর্চা এবং তারই মাধ্যমে জীবন গঠন ও 'জীবনের উদ্দেশ্য' সম্পর্কে অবহিত হওয়া সেই সঙ্গে 'জীবনেব লক্ষ্যে' উপনীত হওয়া। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি দেশে-দেশান্তরে প্রচার ও প্রসার। সেই সঙ্গে বেদান্তবাণী 'অমৃতস্যপুত্রা'র বাস্তবায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় — 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কাজকে রূপায়ন। এরই অন্তর্গত হাসপাতাল, সংস্কৃতি কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, স্কুল, কলেজ পরিচালনা। পল্লীগ্রামে দরিদ্র-দুঃস্থ মানুষের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ। বয়স্ক নিরক্ষর ও গণশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং পরবর্তী স্তরে তাদের সমাজে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো। আধুনিক উপায়ে অধিক ফসল ফলানো, ফসল সংরক্ষণ, হাঁস-মুরগী, মাছ চাষ ইত্যাদি জনহিতকর কাজের পাশাপাশি খরা, বন্যায় কবলিত, অগ্নিতে, ঝড-ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত মানুষ-মানুষীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা সেই সঙ্গে চিকিৎসার মধ্য দিয়ে মহামারীকে রোধ করার চেষ্টা ও শবীর-স্বাস্থ্য স্থিতিশীল রাখা। পরবর্তী স্তরে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন বাড়ি-ঘর নির্মাণ এবং স্বনির্ভব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। মঠ ও মিশনের কর্মধারার মধ্য দিয়ে আসলে পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা সংঘটিত হয়।

সংঘ জননীরূপে শ্রীমা সারদাদেবীকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি ধারার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হত। রামকৃষ্ণ মঠের কার্যাবলীর

সঙ্গে নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত রেখেছিলেন তিনি আর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে সঞ্চালিত হতো। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট কর্মপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করতেন নেত্রীর নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে। ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতেন, আবার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তার নিরসনে এগিয়ে আসতেন। আর সেক্ষেত্রে তাঁর গভীর মননশীলতা, তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ, অপরিমেয় প্রজ্ঞা প্রকাশ পেতো। বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমকে (রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস) কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী পার্ষদদের মধ্যে গড়ে ওঠা বড় মাপের সংকটের এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা মুহূর্তের সংকটের সমাধান শ্রীমা সারদাদেবী সারল্যের সঙ্গে উত্তুঙ্গে পৌঁছে, দৃঢ় প্রত্যয়ে যেভাবে করলেন তা এককথায় অনবদ্য। পরবর্তীকালে এ জাতীয় সংকট আর কখনই মাথাচাড়া দিতে পারে নি। জপধ্যান, শাস্ত্র চর্চা, নিত্য আরাধনা যেমন ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাজ তেমনি আর্ত-পীড়িত মানুষদের সেবাও ঠাকুরের কাজ। অদ্বৈত সাধনায় পট নয়, পট পরিবর্তন নয়, সর্বধর্ম সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরাকার, নিরবয়ব ব্রহ্মের অন্বেষণই যথার্থ। শ্রীমা সারদাদেবীর এই ব্যাখ্যা শুধু সংকট থেকে উত্তরণের রাঙা পথটাই দেখালো না রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের দ্বিধারাকে স্পষ্ট করে দিলো। তাই আমরা বলতে পারি সংঘজননী শ্রীমা সারদাদেবী বামকৃষ্ণ মঠের সুগন্ধী কুসুম—যার নির্যাসে সমাজের সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসেছে। আর রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি আলোকবর্তিকা—তাঁর দ্যুতিময় পথ ধরেই তার জয়যাত্রা।

'অবতার বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমা সারদাদেবীর স্বরূপটি উম্মোচন করে গেছেন নানা ভাবে। ১. ও সারদা-সরস্বতী-জ্ঞান দিতে এসেছে।[২] ২. ও কি যে সে! ও আমার শক্তি![৩] ৩. ঐ যে মন্দিরে মা (ভবতারিণী) রয়েছেন, আর এই নহবতের মা (সারদাদেবীকে) অভেদ।[৪] ৪. গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়? না, তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকে (সারদাদেবীকে) তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না। ওকে (আর) একে (নিজেকে দেখিয়ে) অভেদ জানবে।[৫] (স্বামী বিরজানন্দকে শ্রীমা সারদাদেবীও শেষোক্ত কথাটি বলেছিলেন)। ৫. ও রাগ করলে এর (নিজেকে দেখিয়ে) সব নষ্ট হয়ে যাবে।[৬] ৬. নহবতে যে আছে সে যদি কোনও কারণে কারও উপর বিরূপ হয় তো তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যাতীত।[৭] ৭. (স্বামী অদ্ভুতানন্দের উদ্দেশে) আরে, তুই যাঁর ধ্যান কচ্ছিস, তিনি তোর জন্যে নহবতে ময়দা মাখছেন।[৮] শ্রীমা সারদাদেবীর স্বরূপ সম্পর্কে 'আদ্যাশক্তি

মহামায়া', 'জ্যান্ত দুর্গা', 'জগৎজননী'—এ তো আমরা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দের কাছ থেকে ক্রমানুসারে জেনে গিয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রগাঢ় অনুভব শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদেরা, ভক্ত অনুরাগীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যথার্থভাবেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে শ্রীমা সারদাদেবীই সংঘ জননী রূপে সমাদৃত হয়েছেন সকলের কাছেই। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ শ্রীমা সারদাদেবী পালন করেছেন অবিচল ভাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরবর্তী দিনগুলি মোটেও সুখের ছিল না। ঘর-বাড়ি-প্রিয়জন-পরিজনদের ছেড়ে আসা তরুণ পার্ষদেরা নানা প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতার মাঝে অসহায়। সামান্য সহানুভূতি জানানোর মানুষও তখন বিরল। বরং উপহাস করার মানুষের সংখ্যা অগণিত। অথচ একটা বিরাট সুমহান আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। সেই আদর্শ লোককল্যাণে—আধুনিক জগৎ-জীবনের উত্তরণের রাঙা পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের উপর দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন। সেই আর্দশ রূপায়ণে তাঁদের উপযুক্ত অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান জুটছে না। পরন্তু আত্মীয়-স্বজনের নিন্দাবাক্যের ফোয়ারা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধারাবাহিক নির্যাতনের স্রোত তাঁদের বিচলিত করে তুলছে প্রবল ভাবে। তখন শ্রীমা সারদাদেবী দাঁড়ালেন তাঁদের পাশে, নিজের দু-বাহুকে প্রসারিত করে, জননীর স্নেহ-মমতা উজাড় করে দিয়ে, 'চরৈবেতি'-উজ্জীবনের মন্ত্র মেলে ধরে।

প্রভাতী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগে থাকে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অগণন নক্ষত্রের মাঝেই রচিত হচ্ছিল দুঃসহ যন্ত্রণায় কিন্তু নীরবে রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস। সব প্রভাত কোকিলের ডাক বয়ে আনে না। সেদিন রামকৃষ্ণ সংঘেও আনেনি। তখন প্রভাতের আগমনেও অদৃশ্য গভীর অন্ধকার! সেই অন্ধকারের বুক চিরে মহাশক্তি, আলোকবর্তিকা শ্রীমা সারদাদেবী আলোকস্নাত পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নবজাতক রামকৃষ্ণ সংঘকে। রামকৃষ্ণ সংঘ সম্পর্কে যখন অনেকের মধ্যে সন্দেহ, অনিশ্চিয়তা বাসা বেঁধেছে তখন শ্রীমা সারদাদেবীর প্রার্থনা, অবিচল আস্থা এবং আশ্রয়ের ঐকান্তিকতায় নিশ্চয়তা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ সেই চরম পরীক্ষার দিনগুলির কথা একটি বক্তৃতায় নিটোল ভাবে তুলে ধরেছেন,—

'আমি যেন তখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। ...অথচ এমন

কেউ ছিল না, যে-একটু সহানুভূতি জানাবে আমাকে। শুধু একজন ছাড়া। সেই একজনেরই আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম। আর তাঁর সহানুভূতিই আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিল। তিনি একজন নারী। ... একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। যদিও তিনি নিজে ছিলেন অসহায়, আমাদের চেয়ে দরিদ্র।"[১]

দারিদ্র্যের কারুণ্যনিষিক্ত অনুভবে অনুভাবে ত্যাগী সন্তানেরা শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, কিন্তু তাতে তাঁরা অশান্ত নন, নন দিক্‌ভ্রান্ত-দিশেহারা কেননা তাঁদের সামনে রয়েছেন সূক্ষ্ম দেহে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ আর 'তাঁর শক্তি' শ্রীমা সারদাদেবী—সংঘজননী। আপন দারিদ্র্য, আপাত অসহায়তা, পারিবারিক বিবাদে-বিমূঢ় শ্রীমা সংঘজননীর দায় বহন করেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা জানালেন কখনও কামারপুকুরে-জয়রামবাটীতে বসে, আবার বুদ্ধগয়ায় গিয়ে কিংবা কাশী-বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে। তাই তো এক এক করে প্রতিকূলতা সরে গেল। বরাহনগরে প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠিত হল তারপর তা স্থানান্তরিত হল আলমবাজারে (এই পর্বটি রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা-প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) অবশেষে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি হয়ে বর্তমান বেলুড় মঠে। সময়ের পট পরিবর্তনে শুধু স্থানিক পরিবর্তনই ঘটল না, রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ দেশ-দেশান্তরে প্রসারের ক্ষেত্রেও গতি সঞ্চারিত হল। কেমন করে সেটা সম্ভব হল? শ্রীমা সারদাদেবীর কথায় কান পাতলে খুঁজে পাবো এর উত্তর,—

> 'আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব এক সঙ্গে জুটল।
>
> তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, "ঠাকুর তুমি এলে, এই ক'জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে

ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমরা প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা! ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।—

তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।'[১০]

পরবর্তীকালে স্বামী সারদেশানন্দকে যোগেন মা বলেছিলেন, —'যা কিছু দেখছ (মঠ-মিশন) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়! যেখানে যা দেখছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, "ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।" মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।'[১১]

॥ ২ ॥

১৮৯৭-এর ১মে বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী পার্ষদ-ভক্তদের সম্মিলিত বৈকালীন সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে, শ্রীমা সারদাদেবীই যে প্রকৃত সংঘ জননী সে কথা স্বামী বিবেকানন্দ আবেগময় ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন,—

'শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর? তিনি শুধু তা নয় ভাই, আমাদেব এই যে সংঘ হতে চলেছে, তিনি তাঁর রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সংঘজননী।'[১২]

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে শিবানন্দকে যে কথাগুলি শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে লিখেছিলেন, এই ঘোষণা তারই সম্পূরক। পাশ্চাত্যে যাওয়ার আগে বিবেকানন্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে হেঁটে যাচ্ছেন আর স্বামীজীকে সেই পথ অতিক্রম-অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। স্বামীজীর পাশ্চাত্য যাওয়া যখন চূড়ান্ত ভাবে স্থির, মাদ্রাজবাসী যুবকেরা উৎসাহের সঙ্গে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, শিষ্য খেতড়ির মহারাজা অন্যান্য ব্যবস্থা করেছেন—তখন স্বামীজী অপেক্ষমান শ্রীমা সারদাদেবীর অনুমতির জন্য। মাকে চিঠি লিখেছেন কিন্তু উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে।

আর মা'র অনুমতি ছাড়া তো স্বামীজী সাগরপাড়ি দিতে পারেন না। মা'র মন প্রথমেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছে। তাঁর ত্যাগী সন্তান নরেন যাবে অতো দূর—সায় দিতে চায় না যে মন। কিন্তু ঠাকুরের কাজ করতেই তো সে যাবে। বিলম্বে হলেও শ্রীমা সারদাদেবী অনুমতি দিলেন। এই অনুমতি একদিকে যেমন স্বামীজীর কাছে পাশপোর্ট অন্যদিকে শ্রীমা সারদাদেবীর আকাশ ছোঁয়া—উদার মানসিকতার টলটলে দৃষ্টান্ত। সে সময়ে সাগর পাড়ি দেওয়াকে সাধারণ মানুষের মতো শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী মানুষেরাও বাঁকা চোখে দেখতেন। 'কালাপানি' পার হওয়া মানে একটা কুকর্ম করে ফেলা, 'ম্লেচ্ছ' বনে যাওয়া। তাই তাকে একঘরে—অচ্ছুৎ করে রাখা হত। এ সবকিছু জেনেও শ্রীমা স্বামীজীকে পাশ্চাত্যে যাওয়ার সার্বিক অনুমতি দিলেন। আর এই পাশ্চাত্যে যাওয়ার সূত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিলেন, দিলেন শুধু না, শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে শ্রেষ্ঠ বক্তা—নায়কের শিরোপা নিয়ে তুমুল আলোড়ন জাগালেন। সাড়ে তিন বছর আমেরিকা-ইউরোপে ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী পৌঁছে দিয়ে, মানুষের আত্মশক্তি, আত্মমহিমা সম্পর্কে অবহিত করে, জীবনের উদ্দেশ্য-মুক্তির ক্রম প্রসারিত পথের সন্ধান দিয়ে—পাশ্চাত্য জয় করে ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনে পরাধীন ভারতবর্ষ শাশ্বত চেতনার আলোয় স্নাত হল। ভারতবাসী ফিরে পেল আত্মমর্যাদা, আত্মশক্তিতে ভর দিয়ে—আত্মবোধের উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উত্তরণের রাঙা পথের সন্ধান পেল, পেল সর্বস্তরের মানুষ-মানুষী। ফিরে এসে ভারত প্রব্রজ্যার প্রত্যক্ষ অনুভব ও পাশ্চাত্য পরিক্রমার লব্ধ অভিজ্ঞতার সূত্রেই স্থায়ী সংঘের মাধ্যমে লোককল্যাণের—'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' কাজকে বাস্তবায়িত করতে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রীমা সারদাদেবীর অনুমতি ও আশীর্বাদে যে জয়যাত্রা সম্ভব হয়েছিল সেই জয়যাত্রার শেষে নবগঠিত লোকগুরুর লোককল্যাণের অভীপ্সাকে বাস্তবায়িত করতে তাঁরই নামে যে সংঘের পত্তন হল তার নেতৃত্বে রইলেন সংঘজননীরূপে শ্রীমা সারদাদেবী।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর প্রথম দেখা হল বাগবাজারে। পুত্র গর্বে মা-ও গৌরবান্বিতা। শ্রীমা বললেন, 'তুমি যা করেছ এমনটি আর কেউ করেনি।' স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে এ মহিমা সম্পূর্ণ তাঁরই (শ্রীমায়ের) কৃপাতে সম্ভব হয়েছে।[১৩] অব্যবহিত পরবর্তী কালে স্বামীজীর স্বীকারোক্তি ছিল আরো

জম-জমাট,—'মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানকার মানুষ আমার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, আমাকে বিপুল সংবর্ধনা জানাচ্ছে, তখন বুঝলাম, মা-র আশীর্বাদের জোরেই এই অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে।'[১৪] শ্রীমা সারদাদেবী জানতেন যে, স্বামীজীর 'পাশ্চাত্য বিজয়ের' মধ্য দিয়ে ঠাকুরের কাজই সাধিত হয়েছে। তাই তিনি স্বামীজীকে বললেন যে, ঠাকুরই তাঁর ভিতর দিয়ে এসব করছেন; স্বামীজী তাঁর (ঠাকুরের) সুচিহ্নিত শিষ্য এবং বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্তান। জানা যায়, স্বামীজী সেদিন শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন যাতে রামকৃষ্ণ সংঘকে তিনি একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারেন। মা স্বামীজীকে সেই আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন যে ঠাকুর অচিরেই তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।[১৫] সংঘজননীর আশীর্বাদ অচিরেই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য পরিক্রমা করছেন তখন প্রতি মুহূর্তে সংঘের কথা ভেবেছেন। আসলে এই ভাবনা লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন নানা ভাবে—নানা ঘটনার উপস্থাপনায়। আগে সে কথা বিস্তৃতভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। ভারত প্রব্রজ্যাকালে সেই ভাবনা গাঢ় হতে থাকে। পাশ্চাত্যে গিয়ে তা স্থায়ী রূপ পায়। স্বামীজী পাশ্চাত্যে গিয়ে প্রগাঢ় উপলব্ধির নিগড়ে বুঝেছিলেন যে একটা ভাব বা আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে দরকার একটা সংঘের। পাশ্চাত্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন, সংঘ শক্তির শৌর্য-মহিমা। পাশ্চাত্যের সমস্ত সাফল্যের পিছনে এই সংঘশক্তি। তাই তিনি চান তাঁদের সংঘও দৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে উঠুক। এজন্য চাই একটুকরো জমি। আর সেই জমি হবে গঙ্গার ধারে। যেখানে তাঁর গুরুদেব যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহাবশেষ রক্ষিত হবে এবং তাঁরা সবাই একত্র থেকে তাঁর ভাব প্রচার করবেন। পাশ্চাত্য থেকে জমির জন্য পেলেন অর্থ। আর দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী কালেই পেলেন জমির সন্ধান। বেলুড় গ্রামে গঙ্গার পশ্চিম কূলে। 'গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল।' তা-ই হল। কিন্তু সে জমি সংঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীকে না দেখানো পর্যন্ত স্বামীজীর তৃপ্তি নেই। শুধু দেখা নয়, পদচারণাও। আসলে এ দেখা তো শুধু দেখা নয়, বা পদচারণা নয় আপাত পরিক্রমণ! আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীমা সারদাদেবীর দেখাও পদচারণার মধ্য দিয়ে স্বামীজী শুদ্ধ করে নিলেন বেলুড় মঠের জমি। আদ্যাশক্তি মহামায়ার পদচারণায় ঐ জমি শুদ্ধ না হলে ওখানে তো আন্তর্জাতিক পীঠস্থান, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হতে পারে না। সার্বজনীন

উপাসনালয় স্থাপিত হতে পারে না। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রধান কার্যালয় গড়ে উঠতে পারে না। তাই স্বামীজীর প্রয়াসে এই শুদ্ধিকরণ। মাকে নতুন কাপড় পরিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, নিজে সব ঘুরে দেখিয়ে স্বামীজী অশ্রুপূর্ণ নয়নে কড়জোড়ে বললেন,—'মা, এতদিনে আমার মাথায় যে বোঝা ছিল তা নেমে গেল—তোমাকে তোমার নিজের জমিতে এনে। এখন তুমি হাঁফ ছেড়ে চারিদিকে বেড়াও, ঘুরে ফিরে দেখ।'[১৬] সংঘের স্থায়ী জমি পরিদর্শন ও পদচারণার মধ্য দিয়ে সংঘজননীর জমি পছন্দের কথাটি স্বামীজী ও অন্যান্য পার্ষদেরা জেনে নিলেন। জমি প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে শ্রীমা বলেছিলেন,—'আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপর ঐ জায়গাটিতে—যেখানে (বেলুড়) মঠ, কলাবাগান উদ্যান তার মধ্যে ঘব, সেখানে বাস করছেন।'[১৭]

॥ ৩ ॥

রামকৃষ্ণ সংঘের (রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন) নিজস্ব জমি হওয়াতে শ্রীমা সারদাদেবীর কি আনন্দ। সেই আনন্দমথিত কথাগুলি মা উচ্চারণ করলেন এইভাবে,—'এতদিনে আমার ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হল—এসব ঠাকুর মুখ তুলে করেছেন।'[১৮]

সংঘের সূচনায় কাজের পথ নিয়ে সতীর্থদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন। যে কোন সমস্যার সমাধান মা সঙ্গে সঙ্গেই করে দিতেন এবং সকলেই তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। ১৯০১-এ স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপুজো করতে চাইলে অনেকে তাতে আপত্তি জানান। স্বামীজী মাকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। মা মত দেন তবে বলি দিতে নিষেধ করেন। মায়ের আদেশ স্বামীজী শিরোধার্য করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐ দুর্গাপুজোর সঙ্কল্প হয় শ্রীমা সারদাদেবীর নামে। সংঘ জননীর প্রতি সংঘ নায়কের সেই আদেশ আজও বহমান।

কলকাতার প্লেগ মহামারীর সময় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে সেবাকাজ শুরু হবার পর কাজের ব্যাপকতা এবং যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের কথা বিবেকানন্দ ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তিনি বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য যে জমি কেনা হয় তা বিক্রির প্রস্তাব দেন কিন্তু শ্রীমা সারদাদেবীর নির্দেশে তা বাস্তবায়িত হয় নি। সংঘজননী সেদিন যদি ঐ কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বামীজীকে ডেকে না বলতেন—'সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি

করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সংকল্প করেছো এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছো, তোমার ঐসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়?'[১৯] সেদিন শ্রীমা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা না দিতেন তাহলে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিগণিত হত না। সেখান থেকে সঞ্চালিত হত না দেশে দেশান্তরে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজ, হত না মানব কল্যাণের শুভঙ্করী দিকটির সার্বিক রূপায়ন, জীবনে জীবন যোগ করে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তবায়ন। সর্বোপরি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'এর সমগ্র রূপটি। মা সারদাদেবী সেদিন রামকৃষ্ণ আন্দোলনের পূর্ণায়ত রূপটি প্রত্যক্ষ করে বলে উঠেছিলেন স্বামীজীর উদ্দেশে—'বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের) কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এইভাবে চলবে।' সেই চলা আজও অব্যাহত। আগামী দিনেও থাকবে অব্যাহত। স্বামীজী নিজের ভুল স্বীকার করে সেদিন লজ্জিতভাবে বলে উঠেছিলেন—'তাই তো আবেগ ভরে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম, সত্যি তো মঠ বিক্রি আমি করতে পারি না, সে অধিকার আমার নেই।'[২০]

স্বামীজী শ্রীমা সারদাদেবীকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 'হাইকোর্ট' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে সংঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর কথা বা আদেশই যে শেষ কথা তা আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করব। মঠের এক বেতনভুক ওড়িশাবাসী কর্মচারীকে চুরি করার অপরাধে স্বামীজী বরখাস্ত করেন। সে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে উদ্বোধনে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে গিয়ে সব দোষ স্বীকার করে এবং বলে কাজ না থাকলে সে ও তার বাড়ির লোকেরা না খেতে পেয়ে মরবে। মা সব শুনে তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং বিশেষ কার্যোপলক্ষে স্বামী প্রেমানন্দজী উদ্বোধনে সেই সময় মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। মা তখন প্রেমানন্দজীকে বললেন ঐ কর্মীটিকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এবং পুনরায় তাকে কাজে বহাল করতে। প্রেমানন্দজী খানিকটা ইতস্তত করছিলেন যে চুরির অপরাধে স্বামীজী তাকে বরখাস্ত করেছেন, যদি তাকে আবার মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে স্বামীজী আবার ক্ষুব্ধ হবেন। এই কথা শুনে মা প্রেমানন্দজীকে বললেন—'আমি বলছি নিয়ে যাও; আর নরেনকে বলবে ওকে যেন ওর কাজে পুনর্বহাল করা হয়।'[২১] মায়ের আদেশে প্রেমানন্দজী

মাথা নিচু করে কর্মীটিকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বিকেলে স্বামীজী মঠে যখন পায়চারি করছেন তখন দূর থেকে সকালে বরখাস্ত ঐ কর্মীটিকে প্রেমানন্দজীর সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে স্বামীজী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গেল। প্রেমানন্দজী স্বামীজীকে সব খুলে বললেন এবং মায়ের আদেশের কথা জানালেন তখন স্বামীজী সহাস্যে বলে উঠলেন—'ব্যাটা হাইকোর্ট চিনে গেছিস।' 'হাইকোর্ট'—অর্থাৎ যার পরে অন্য কোন কথা চলে না। শুধু স্বামীজী নন, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীমা সারদাদেবীর উপদেশ ও পরামর্শ সব সময় বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করে চলতেন। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা সুন্দর করে লিখেছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করবার আগে তাঁর (শ্রীমায়ের) পরামর্শ সবসময় নিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরাও তাঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন।'[২২]

তাই আমরা দেখি স্বামী প্রেমানন্দজী একটি চিঠিতে লিখছেন— 'শ্রীশ্রী মার আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম-কর্ম। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; যাকে যা বলবেন সে তাই করতে বাধ্য।'[২৩] আনুমানিক ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনা। আমেরিকায় আছেন এক সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ করছেন অক্লান্তভাবে। তাঁকে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে একটু সাবধান করা দরকার। কিন্তু কে করবেন মা ছাড়া! একটি চিঠি খসড়া করলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ মিলে। মাকে পড়ে শোনালো হল। মা বললেন—'রাখাল, যোগেনকে বল চিঠি সুন্দর। আমার মত এতে ঠিকঠিক ভাবে দেওয়া হয়েছে।'[২৪] মার নামে যখন ঐ চিঠি সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসীর কাজে পৌঁছল তখন তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কার সাধ্য। এ যে সাবধানবাণী, সংঘজননীর সাবধানবাণী! সংঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীকে সুচারুরূপে দেখাশোনার দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন কি জয়রামবাটীতে, কি কলকাতার উদ্বোধনে। আরও একটি তথ্য আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। স্বামী শিবানন্দ তখন বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধায়ক। এক ব্রহ্মচারী কিছু অন্যায় করে শিবানন্দজীব ভয়ে মঠ ছেড়ে পালিয়ে উদ্বোধনে মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মা শিবানন্দজীকে চিঠি লিখে তাঁকে মঠে পাঠিয়েছেন। ব্রহ্মচারী তাঁর চিঠি নিয়ে মঠে ফিরলে শিবানন্দজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন—'ব্যাটা তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গেছিলি।'[২৫]

জননীর পরিপূর্ণ স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে শ্রীমা সারদাদেবী রামকৃষ্ণ সংঘকে সুনির্দিষ্ট আলোকস্নাত পথে এগিয়ে নিয়ে সংঘজননীর

দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছিলেন। মা যেমন অবোধ শিশুর হাত ধরে চলেন শ্রীমা সারদাদেবীও নিজের জীবন দেখিয়ে সংঘকে পরিচালনা করেছেন—প্রতিকূল পরিবেশে কি করে লক্ষ্যে স্থির থাকতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন সেইসঙ্গে ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরনির্ভরতা, সত্য নিষ্ঠা, নিস্পৃহতা, আপামর জনসাধারণের প্রতি সন্তানবাৎসল্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। গৃহী-ভক্তকে গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ দেখিয়েছেন, ত্যাগী সন্ন্যাসী-ভক্তের সামনে তুলে ধরেছেন সন্ন্যাসীর আদর্শ। রামকৃষ্ণ সংঘের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস শ্রীমা সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদরা প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তেজস্বী ও যুক্তিবাদী। স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভর। শাস্ত্রজ্ঞ ও অনুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু শ্রীমার কাছে তারা প্রত্যেকেই যেন শিশু। এ কি তিনি গুরুপত্নী বলে'? না। শুধু গুরুপত্নী হলে মায়ের কাজে আত্মবিলুপ্তি তাঁদের কখনো সম্ভব হত না। মায়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের যে প্রসঙ্গগুলি এতক্ষণ আমরা তুলে ধরলাম তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে কি চোখে তাঁরা মা সারদাদেবীকে দেখতেন। সংঘজননীর প্রতি ভক্তি-ভালবাসা-বিস্ময়-সম্ভ্রম — সব কিছু মিশিয়ে মায়ের সঙ্গে এক অদ্ভুত অপ্রাকৃত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন — 'তাঁর (শ্রীমা) সম্পর্কে সন্ন্যাসীদেব বীরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মত। সংঘ পরিচালনার প্রতি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। সবকিছুই চলত তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী। তাঁর ইচ্ছাকেই তাঁরা চূড়ান্ত আদেশ বলে মেনে নিতেন। আর তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন বিশেষভাবে কয়েকজন। এ এক দর্শনীয় সম্পর্ক। শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি যথোচিত সম্মান — শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।'[২৬]

॥ ৪ ॥

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাসমাধির আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁর ত্যাগী পার্ষদদের সম্পর্কে শ্রীমা সারদাদেবীকে বলে গিয়েছিলেন — 'এরা সব রত্ন ছেলে।' এই রত্নদের নিয়েই রত্নহার গেঁথেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। ক্ষুদ্র থেকে বিশাল আকারে শক্তিশালী সংঘ নির্মাণে এঁদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের একত্রিত করেছিলেন আর শ্রীমা সারদাদেবী তাঁদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছিলেন। শুধু বেলুড় মঠ স্থাপন নয় কিংবা পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার নয়, শ্রীমা চেয়েছিলেন দেশে দেশান্তরে বহু সংখ্যক কেন্দ্রের মাধ্যমে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত ভাবাদর্শ প্রচারের

মধ্য দিয়ে মানবমুক্তির পথটাকে প্রশস্ত করে দেওয়া। তাই তো তাঁর ইচ্ছায় তাঁর জীবৎকালে দেশে দেশান্তরে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য কেন্দ্র।

শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর ত্যাগী সন্তানদের অহেতুক কঠোরতা প্রত্যক্ষ করতে পারতেন না তাই সে পথ ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন। আবার ইষ্ট সাধনার ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে তাও তিনি শুধরে দিতেন। আগ্রহী সন্তানকে গৈরিক বসন তুলে দিয়ে মা যেমন আনন্দ পেতেন তেমনই তাঁকে সেই গৈরিক বস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যথাযথ উপদেশ দিতেন। সন্ন্যাসীর কর্তব্য তাঁর চলার পথের প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা এসব কিছু সম্পর্কে যা অবহিত করে তাঁর চলার পথটি ঠিক করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে দুটি কথা আমাদের উল্লেখ করা দরকার—

১) একবার ঠাকুরের গৃহীভক্তের সঙ্গে স্বামী শান্তানন্দের কাশী যাওয়ার কথা হয়। তাতে স্বামী শান্তানন্দের পাথেয় তাঁরাই বহন করবে ঠিক হয়। মা শুনে তাঁকে কাছে ডেকে বললেন—'তুমি সাধু। তোমাব কি আর যাওয়ার ভাড়া জুটবে না। ওরা গৃহস্থ, ওদের সঙ্গে কেন যাবে। তুমি সন্ন্যাসী, তোমার মতন করে যাবে।'[২৭]

২) মা সন্ন্যাসীদের সাবধান করে দিতেন। সন্ন্যাসীর সব ব্যক্তিপূজা সমর্থনযোগ্য নয়, তা সোচ্চারে জানিয়েও দিতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিটি চমৎকার—'সাধু সব মায়া কাটাবে। সোনার শিকল বন্ধন লোহার শিকলও বন্ধন। মায়ার শৃঙ্খলে জড়াতে নেই।'[২৮]

যে ভুল করেছি মা মাতৃসুলভ অপার স্নেহ দিয়ে তার ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। কিন্তু ভুল ভুল নয় একথা কখনও বলেন নি। দুর্বলকে ক্ষমা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সে দুর্বলতাকে জয় করুক তার পথও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু স্নেহান্ধ হয়ে দুর্বলকে প্রশ্রয় দেননি। সন্ন্যাসীর আদর্শ মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শের অবমাননাকে কখনও ক্ষমা করেননি তিনি। এ প্রসঙ্গে একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন—'তিনি স্নেহময়ী ছিলেন, কিন্তু স্নেহদুর্বলা ছিলেন না। শ্রীমার রামকৃষ্ণ সংঘের উপর একটা অদৃশ্য প্রভাব অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। সংঘের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ যাতে অবনত না হয় সেদিকে ছিলো তার শতদৃষ্টি।'[২৯] শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রয়োজনে কঠোর, কঠিনও হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা একটি দৃষ্টান্ত মেলে ধরব বেশি নয়। একবার তাঁর এক ত্যাগী সন্তান সন্ন্যাসের পবিত্র ব্রত ভঙ্গ করে অনুতপ্ত হন। মা তাঁকে বলেছিলেন—'তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি, তুমি আমার সন্তানই থাকবে, কিন্তু ব্রতভঙ্গকারীর কোন প্রায়শ্চিত্তেই সন্ন্যাসী

সংঘে স্থান হতে পারে না।'[৩০] এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন—'যখন কঠোরতার প্রয়োজন হত তখন মা কোনরকম যুক্তিহীন ভাবুকতায় বিভ্রান্ত হতেন না। কোন ব্রহ্মচারীকে হয়ত আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে সে মুহূর্তে সে স্থান ছেড়ে চলে যেতে হবে, কারণ এ তাঁর আদেশ। সন্ন্যাসের ব্রত যে লঙ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সম্মুখে আসতে অনুমতি চাইবে না।'[৩১]

শ্রীমা সারদাদেবীর এই কঠোর কঠিন বিষয়টি সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত জরুরী। আর তা ছিল বলেই শতবর্ষ অতিক্রম করতে পেরেছে রামকৃষ্ণ সংঘ আপন ঔজ্জ্বল্যে। কঠোর কঠিন সিদ্ধান্তের বহমানতা আজও রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কেউ যদি উৎসাহের আধিক্যে কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়তেন তাহলে তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যে তপস্যা শুধু অর্থহীন, আত্মনিগ্রহ তাকে মা কখনও সমর্থন করতেন না। শ্রীমা বিশেষ করে বিচলিত হতেন, যখন দেখতেন তাঁর কোন ত্যাগী সন্তান বিদ্যা লাভ করে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বিশেষভাবে চাইতেন সন্ন্যাসীরা সব একসঙ্গে থাকুক এবং শিব জ্ঞান জীব সেবার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করুক।

রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশাল নিষ্কাম কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন সে বিষয়ে গুরু ভাইদের মধ্যে কিছু কিছু মতবিরোধ ছিল—মা সেই মতবিরোধ দূর করেছেন। এই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রতি মার পূর্ণ সমর্থন ছিল। মা মনে করতেন নিষ্কাম কর্ম পুজোরই সমান। এক সন্ন্যাসী এই কর্মযজ্ঞ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পাহাড়ে তপস্যার অনুমতি চাইতে গেলে মা বলেছিলেন—'সে কি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, এ কি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে, হাওয়া গুনতে কোথায় যাবে।'[৩২] স্বামী অরূপানন্দ একবার মায়ের কাছে এমনই এক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে এই কর্ম সাধনা করা উচিত কিনা! মা তখন তাঁকে বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—'কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? ...মঠ মিশন কি এই ভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।'[৩৩] সর্বদা সাধনভজন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় বলে মা সন্ন্যাসীদের ঠাকুরের কাজ ভেবে সব কাজ করতে বলতেন।[৩৪] আশ্রমের কাজে জপ-ধ্যানে বিঘ্ন হতে পারে ভেবে মা বলেছিলেন—'কাজ আর কার? কাজ তো তাঁরই।'[৩৫]

এই নিষ্কাম কর্মসাধনা সম্পর্কে তিনি চরম কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন স্বামী ঈশানানন্দকে—'কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপ-ধ্যান কর।

প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যে একবার বসতেই হয়। এটি হল যেন নৌকার হাল ... কিন্তু সব সময় জপ-ধ্যান করতে পারে কখন। প্রথমটা একটু করে। ... শেষে বসে থেকে থেকে নিচের গরম মাথায় ওঠে (অহঙ্কারী হয়)। গাছ, পাথর ভেবে নানা অশান্তি মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাঁধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।'[৩৪]

শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজ বাস্তবায়নে স্বামীজী যখন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তখন নিজের মুক্তি এবং জগতের সকলের মুক্তি দুটিকেই একই সূত্রে গেঁথেছিলেন। অবশ্যই প্রাধান্য দিলেন জগতের মুক্তিকে, তারপর নিজের মুক্তিকে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর 'আত্মনোং মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই আদর্শকে সামনে রেখে যখন এক এক করে সেবাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে শুরু করল তখন শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত কেউ কেউ এই কাজকে মেনে নিতে পারলেন না। এমনকি শিক্ষিত গুরুভাইরা যাঁরা ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরাও স্বামীজীর এই আদর্শকে সমর্থন করতে প্রথমে দ্বিধাবোধ করেছিলেন (স্বামী যোগানন্দের কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে)। শ্রীমা সারদাদেবী অকুণ্ঠ চিত্তে এই কাজকে সমর্থন শুধুই করেন নি, নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন—স্বামীজীর দেহান্তরের পর নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাই তো রামকৃষ্ণ মিশন আজ সেবাকাজের মধ্য দিয়ে এক অসাধারণ প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সেবাশ্রম গড়ে উঠেছিল তা প্রত্যক্ষ করে শ্রীমা আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুর সেখানে নিরন্তর অবস্থান করছেন এবং প্রেরণা যোগাচ্ছেন এই কথা বলে মা একটি ১০ টাকার নোট তাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে পারিতোষিক রূপে দেন (ঐ টাকাটি এখনও কাশী সেবাশ্রমে রক্ষিত আছে), ঐ সময় জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা জানিয়েছিলেন—'দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—এ সব তো তাঁরই কাজ।'[৩৭] এই ঘটনার পর শ্রীম সহ অন্যান্য রামকৃষ্ণ পার্ষদরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। মায়াবতীর ঘটনাটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। মার লেখা যে চিঠির মধ্য দিয়ে সমাধানের পথটি প্রশস্ত হয়েছিল তাঁর একটি লাইন তুলে ধরতে পারি—'আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত—তোমরা সেই গুরুর শিষ্য—তোমরাও অদ্বৈতবাদী—আমি জোর করে বলতে পারি তোমরাও অদ্বৈতবাদী।'[৩৮]

শ্রীমা সারদাদেবী সংঘজননীরূপে যে সিদ্ধান্ত নিতেন তাতে তিনি শেষ পর্যন্ত অটল থাকতেন। সহস্র বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের পর বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন দুরন্ত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। এক সময় যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন অতীতে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু), স্বামী চিন্ময়ানন্দ (শচীন্দ্রনাথ সেন), স্বামী আত্মপ্রকাশনন্দ (প্রিয়নাথ দাশ) প্রমুখের কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা রাজনীতি থেকে সরে এসে রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথে জীবনযাপন করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। তখনকার ব্রিটিশ সরকার কিন্তু এই বিষয়টিকে নিছক চোখে ধূলো দেবার সামিল বলে মনে করতেন। তাঁরা ঐ সব সন্ন্যাসীদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের, ১১ ডিসেম্বর বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল প্রত্যক্ষ্য এবং পরোক্ষ ভাষণে দরবারী এমন কিছু মন্তব্য করেন যার মমার্থ দাঁড়ায় এরকম—দেশে সন্ত্রাসবাদী তরুণ ও যুবকেরা রামকৃষ্ণ মিশনের মদতপুষ্ট এবং তাঁরা মিশনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের আনুকূল্যে এবং মিশনের ত্রাণকার্য করার ছলে প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদী কার্য চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরলমতী, আদর্শবান, অনভিজ্ঞ তরুণদের প্রভাবিত করে দল বাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশবাসী যেন এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের ছেলেদের যোগাযোগ এবং সন্ত্রাসবাদীতা যা কিনা রাষ্ট্রদোহিতার নামান্তর—সে সম্পর্কে সাবধান হন।[৩৯]

তৎকালীন গভর্ণরের এই মন্তব্যের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ মঠ-মিশনের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিলেন পুলিশের সন্দেহভাজন ঐসব ব্যক্তিদের বহিষ্কার করে দিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এক অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন দক্ষিণ ভারতে। অবশেষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মায়ের কাছে সব জানালেন। মা সব কথা ধীরভাবে শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'ওমা! এসব কি কথা ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাকে আশ্রয় করে তার ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের-দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের মুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা। তুমি একবার লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা কর। তিনি রাজপ্রতিনিধি। তোমাদের সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়

শুনবেন।'[৪০] অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, সব কথা শুনে মা বলেছিলেন—'ঠাকুরের ইচ্ছে মঠ-মিশন হয়েছে; রাজরোষ নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে না তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে তবু সত্যভঙ্গ করবে না।'[৪১] এ সংঘজননীর উপযুক্ত কথা। মায়ের পরামর্শ অনুযায়ী স্বামী সারদানন্দ লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের আদর্শও বুঝিয়ে বলেন। সুখের বিষয় এই আলোচনার পর কারমাইকেল তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেন এবং বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।[৪২] ফলে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীও পবিবর্তিত হয়। সুতরাং, কাউকে বহিষ্কার করার প্রশ্ন ওঠে না। এইভাবে আপদে-বিপদে মা সংঘকে রক্ষা করেছেন, পালন করেছেন।

॥ ৫ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আর কি করেছেন তাঁর থেকেও শতগুণ কাজ করতে হবে শ্রীমা সারদাদেবীকে। বাস্তবিকক্ষেত্রে শ্রীমা সারদাদেবী সেই কাজ করেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন পল্লবিত প্রসারের মধ্য দিয়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

শ্রীমা শান্তির নিলয়, দিশেহারা পথিকেব পথপ্রদর্শিকা আবার বিশ্ববন্দিত রামকৃষ্ণ সংঘের পরিচালিকা। রামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রীমা সারদাদেবীর অসাধারণ ভূমিকার মূল্যায়ন করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ,—'One function of hers was to solve the spiritual problem of her desciples both lay and monastry; her other function was to influence indirectly. The working of the organisation for it good.'[৪৩] অর্থাৎ গৃহী ও ত্যাগী উভয়ের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তির সমস্যার সমাধান করা এবং সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ সংঘকে কল্যাণকামী পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে তাঁর ভাব ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় আর একদল ছিলেন তাঁরা তরুণ কিন্তু প্রতিভাবান। সমাজের বৃহত্তর অংশ সাধারণ মানুষের কাজে কিন্তু তাঁর বার্তা সার্বিকভাবে পৌঁছায় নি। শ্রীমা সেই কাজ করেছেন সর্বসাধারণের মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র। শ্রীমা কোন নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তাই তো তিনি হয়ে উঠেছেন তাঁরই কথায়—'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।' জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শাস্ত্র নির্বিশেষে সকলকে কাছে

টেনে নিয়েছেন। তাদের মঙ্গলের জন্য, তাদের মুক্তির জন্য ঠাকুরের কাছে অবিরত প্রার্থনা জানিয়েছেন। এবং আত্মশক্তির জাগরণের ফলে তাদের সমস্ত প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করেছেন। আর সংঘ জননীরূপে আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপ উন্মোচনে ত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানদের চলার পথকে মসৃণ করে দিতে অবারিত প্রাণপ্রাচুর্যে আশীর্বাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব—দুর্গোৎসবের সন্ধিপূজার সময় তিনি যেচে সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে পুজো নিচ্ছেন। যে সব সন্তান অনুপস্থিত, তাঁদের হয়েই পুজো করুক অপরে। তাই বলছেন—'আরও ফুল আনো, রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, এদের সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা অজানা সকল ছেলের হয়ে ফুল দাও।'[৪৪] সংঘনেত্রী রূপে, সংঘ জননীর এই পুজো নেওয়া। তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মঙ্গল থেকে এই পুজো চেয়ে নেওয়া; সংঘজননীরূপে সকল মানুষের মধ্যে যে অনন্তশক্তি বিরাজমান—একদিকে তিনি তাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, আত্মজ্ঞানে ভর দিতে শিখিয়েছেন, অন্য দিকে ত্যাগী সন্তানদের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তির পথটিকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এর জন্য তাঁকে কোন যাদুকাঠির আশ্রয় নিতে হয় নি। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি, অন্যদিকে আত্মশক্তিতে তিনি সচল অবস্থায় রামকৃষ্ণ সংঘকে এক শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সূক্ষ্ম দেহে আজও করেছেন, সংঘজননী রূপে শ্রীমা সারদাদেবী আজও তাই রামকৃষ্ণ মিশনের আলোকবর্তিকা।

প্রসঙ্গ সূত্র:

১. পত্রাবলী অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪ পত্র সংখ্যা ১৫৪, পৃঃ ২৫৬
২. শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩৮৪, পৃঃ ১২৭
৩. ঐ
৪. উদ্বোধন পত্রিকা, শ্রীশ্রীমা শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ১০
৫. শ্রীশ্রী মায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৩৮৫, পৃঃ ২৯৮
৬. শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৯৪
৭. শ্রীমা সারদামণি দেবী, মানদাশংকর দাশগুপ্ত, ১৩৯০, পৃঃ ৮৩—৯৯
৮. ঐ
৯. Complete Works of Swami Vivekananda, First Edition Vol. VII. P. 81–82
১০. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ,. ১৩৮৫, পৃঃ ২১৫—১৬

১১. শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, স্বামী সারদেশানন্দ, ১৩৮৯, পৃঃ ২০
১২. উদ্বোধন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২০১
১৩. শ্রীশ্রীসারদাদেবী, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৮৮, পৃঃ ২২৮
১৪. Prabhuddha Bharat, V-61, LVII, 1952, P. 409–10
১৫. ঐ, পৃঃ 416
১৬. শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, স্বামী সারদেশানন্দ, ১৩৮৯, পৃঃ ২২
১৭. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৩
১৮. শ্রীমা সারদাদেবী, ১৩৮৪, পৃঃ ১৯৮
১৯. উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২০২
২০. ঐ, পৃঃ ২০২
২১. শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪০১—২
২২. Letters of Sister Nivedita, Vol-I, 1982, P. 10
২৩. প্রেমানন্দের পত্রাবলী, পৃঃ ৪৮২
২৪. শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩৮২
২৫. ঐ পৃঃ ৪৮৩
২৬. Letters of Sister Nivedita, Vol-I, P. 10
২৭. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫৭
২৮. ঐ, পৃঃ ২৬৬
২৯. উদ্বোধন, শ্রীমা জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২৪৪
৩০. ঐ
৩১. The master as I saw him. 1977, P-123
৩২. শ্রী শ্রী মায়ের কথা, যে ভাগ, পৃঃ ৩২৩
৩৩. ঐ, পৃঃ ৯৭
৩৪. ঐ পৃঃ ২৭
৩৫. ঐ, পৃঃ ৩৭১
৩৬. ঐ, পৃঃ ২১৯—২০
৩৭. শ্রীমা সারদাদেবী, ১৯০২, পৃঃ ২৯২
৩৮. ঐ
৩৯. History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 1983, P. 172 এবং পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন, লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, ১৯৮৩, পৃঃ ১০৯—১০
৪০. উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২০৩
৪১. শ্রীমা সারদাদেবী জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২৪৪—৪৫
৪২. উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২০৩
৪৩. History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Swami Gambhirananda, 1983, P. 130.
৪৪. শ্রীশ্রী মায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২১৬

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দের মানসিক প্রস্তুতি পরিকল্পনা ও প্রসারণ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১মে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী স্তরে প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদদের ভূমিকাটি স্বর্ণখচিত। 'স্বর্ণখচিত' শব্দটি ইতিহাসের নিরিখেই আজ রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষ পূর্তির পুণ্যক্ষণে স্বতোচ্ছল ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে যায়। তবে শুরুর সেই দিনগুলি ছিল সহস্র প্রতিকূলতার আবর্তে আবর্তিত। তমিস্রা ঘন রাত্রির মত গাঢ়। সেই প্রতিকূলতা, অতিক্রম করে, তমোনিশার বুকে অনির্বাণ দীপশিখাটি সযত্নে, পরম মমতায় প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রসারতা-ব্যাপ্তির জয়যাত্রায় সামিল হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নের মণি বিবেকানন্দ—তিতিক্ষা, আত্মশক্তি ও গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা আর শ্রীমা সারদাদেবীর হাজারো গোলাপের নির্যাসবাহী আশীর্বাদে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরুর পূর্ববর্তী দিনগুলির সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিতে পারি। ১. মহাসমাধির অল্প কিছুদিন আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নরেন্দ্রনাথ যখন জীবনের চরম উদ্দেশ্য রূপে নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার অভীপ্সা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জ্ঞাপন করলেন, তখন ধিক্কারে ফেটে পড়লেন রোগভারে ক্লান্ত-শ্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন,—'ছি ছি, তুই এত ছোট আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কি না শুধু নিজের মুক্তি চাস। এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা। না রে, এত ছোট নজর করিস নি।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধিক্কার নরেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য এই সূত্র ধরেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। তথ্য সহ প্রসারিত পরবর্তী আলোচনা সেই সাক্ষ্যই বহন করবে।

২. যুগ প্রয়োজনে, মানবকল্যাণে এবং ধর্ম সমন্বয়ের ভারতীয় চিন্তার নবরূপায়ণে আবির্ভূত শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথ আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়েছিলেন জগতের কল্যাণে। ৩. বিবেকানন্দের নিরবচ্ছিন্ন প্রায় সাত বছরের ভারত পরিক্রমায় লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের ব্রত নির্ধারিত করে দিয়েছিল। ৪. এরই ফলশ্রুতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শিকাগো বক্তৃতায়, পাশ্চাত্যে প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতায় এবং পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে যুবকদের কাছে, সতীর্থদের কাছে, রাজকর্মচারী প্রমুখের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে। ৫. পাশ্চাত্যে অবস্থানের সময় সামগ্রিক উপলব্ধির নিগড়ে চিন্তা-চেতনায় গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল পূর্ণায়ত সংঘ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এবং বামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নির্দেশের এবং তাঁব অনন্ত ভাবরাশি সর্বজনের মধ্যে মুক্তির প্রয়োজনে প্রচাব ও প্রসার সর্বোপরি আপাত পতিত, স্খলিত ভাবতবর্ষের জাগরণের, দুঃখী-কাতর, অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষদেব উত্তবণের পথটি চিহ্নিত কবতে সংঘশক্তির প্রয়োজনীয়তা। সব মিলিয়ে প্রথমবারের পাশ্চাত্য অভিযাত্রা তার ব্রত উদ্‌যাপনে বা বাস্তবায়নে সঞ্চারিত করেছিল তীব্র উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কর্মপদ্ধতি ও পরিকাঠামো নির্মাণে যুক্ত হয়েছিল মণি-কাঞ্চনযোগ।

পরিবর্তিত চেতনায়, শ্রীরামকৃষ্ণেব শক্তিতে শক্তিমান, পরিব্রাজক বিবেকানন্দ প্রব্রজ্যার ধূলি-ধূসবিত পদচিহ্নে, জাজ্বল্যমান, বেদনাবাহী অভিজ্ঞতার নিরিখে আমেরিকা থেকে লিখলেন যে সব কথা তাতে জোরালো ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল নররূপী ঈশ্বর সাধনাব প্রেক্ষিতে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের রূপায়ণের জন্য চাই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বশাসিত-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে বৌদ্ধ সংঘ হতে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্য থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন—রাজকীয় সংবর্ধনা এবং গণমানসে উৎসাহ-উদ্দীপনার উত্তাপ বুকে নিয়ে, গুরুভাই ও গৃহী ভক্তদের সম্প্রীতি, অনুরাগের উষ্ণতা মনের মণিকোঠায় সযত্নে স্থান দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হলেন। উদ্যোগে অন্তপ্লাবী প্রবাহিত প্রেরণার পাশাপাশি তুষারমৌলী দেবতাত্মা হিমালয় বহিরঙ্গে সঞ্চার করলো তীব্র দ্যুতি ও গতি—দার্জিলিং-এ অবস্থান কালে।

দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকদিন অতিবাহিত করেছিলেন। ঐ সময় ১৮৯৭-এর ১মে বিকেল ৩টের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী পার্ষদ, গৃহী পার্ষদ ভক্ত ও অনুরাগীরা

জড়ো হয়েছিলেন বলরাম বসুর বাড়ির দোতালার হলঘরে। যা আজও বিদ্যমান। সেই হলঘরে আয়োজিত সভায় স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ-উত্থাপন করলেন। সেই ঐতিহাসিক চিত্রটি ধরে রেখেছেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বামী শিষ্য সংবাদ'—গ্রন্থে শব্দের আলপনায়।

'সকলে উপবেশন করিলেন পর স্বামীজী বলিতে থাকিলেন:

"নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রের সংঘ তৈরি করা বা সাধারণের সম্মতি নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ওসব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত আমাদের মত দ্বেষপরায়ণ নয়, তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্যলোক, আমাকে ওদেশে কত আদর যত্ন করেছে। এদেশে শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে যখন ইতর সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত ফতের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে তখন সাধারণতন্ত্র মতে সংঘের কার্য চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সংঘের একজন ডিরেক্টর বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লইয়া কার্য করা হবে।"[২] এরপরে বললেন,—"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি। আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসার আশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্যনাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার রয়েছে এই সংঘ তারই নামে প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্যে সহায় হন।"[৩] গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের উপস্থিতিতে গৃহী পার্ষদরা এই প্রস্তাব সোল্লাসে অনুমোদন করার পর রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবী কার্যপ্রণালী আলোচিত হতে থাকল। সংঘের নাম রাখা হল 'রামকৃষ্ণ প্রচার' বা 'রামকৃষ্ণ মিশন।'[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ধিক্কৃত হওয়ার পর 'চেতনায় আঘাত হেনে' স্বামীজী জীবনের মোড়টা দিয়েছিলেন ঘুরিয়ে। 'জীবসেবার' মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারিত 'বটবৃক্ষ' হবেন তিনি। কিন্তু কীভাবে? তাও জানালেন গুরুদেব ভাবাবেশে। বৈষ্ণবীয় চিন্তন—'জীবে দয়া' নয় 'জীবেসেবা' আর তা 'শিবজ্ঞানে'। এ কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন তিনি। স্বামী সারদানন্দ সেই মুহূর্তের ছবিটি তুলে ধরেছেন চমৎকার ভাবে,—'...একমাত্র

নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন। ...ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। ...যাহা হউক, ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"[৫]

দিনের অপেক্ষা ক্রমাগত যত কমতে লাগলো ততই তার রূপায়ণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা মথিত অভিমত ভারত প্রব্রজ্যা কালেই প্রকাশিত হলো। শিকাগো যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে রাজস্থানেব আবু পাহাড়ে তপস্যারত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে চিঠি লিখে জানালেন, —'জগদ্ধিতায় বহুজনসুখায় হচ্ছে ধর্ম, আব নিজের জন্য যা করা যায় সবই অধর্ম।' বোম্বাই থেকে 'পেনিনসুলার' জাহাজে উঠবার আগে তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর একবার মুখোমুখি দেখা হয়েছিলো। সে সময় তাঁর উদ্দেশে স্বামীজী যে কথাগুলি বলেছিলেন তা স্মৃতিচারণার সূত্রে তুরীয়ানন্দজী জানিয়েছেন,—'সে সময় স্বামীজীর গোটা কয়েক মন্তব্য আমার স্পষ্ট মনে আছে—ঠিক শব্দগুলি ও স্বর এবং যে বিষাদ নিয়ে সেই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়েছিল, তা এখনও আমার কানে বাজছে। তিনি বলেছিলেন—"হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।" অতঃপর মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে এবং ভাবাতিশয্যে কম্পিত কলেবরে তিনি নিজের হাত বুকের উপর রেখে আরও বললেন, "কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।" তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আর বলতেই পারছিলেন না। চোখে জল পড়তে লাগলো।' তুরীয়ানন্দজী সেই মুহূর্তে নিজের মানস অভিব্যক্তিটিও প্রকাশ করেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিসুলভ ভঙ্গিতে,—'স্বামীজী যখন ঐ কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমার মনে কি খেলছিল বলতে পার? আমি ভাবছিলাম: "বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেন নি, আর এমন কথা বলেন নি?" ...আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা

প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরী করা হচ্ছিল।"[৬]

॥ ২ ॥

ভারত পরিক্রমার পর নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের মঞ্চে উঠেই বিবেকানন্দ প্রথম দিনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় যে আলোড়ন তুললেন তা থেকেই তিনি জগৎবিখ্যাত হয়ে পড়লেন। সভাস্থল থেকে ফিরে এলেন যেখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল সেই বিখ্যাত লায়ান পরিবারে, যথারীতি রাত্রের আহার সারলেন — কিন্তু ধর্ম মহাসম্মেলনে একটি জগৎবরেণ্য জাতির মুখপাত্রদের দ্বারা মুক্ত কণ্ঠে বিজয়ী বীর রূপে সম্বর্ধিত হইয়াও সে রাত্রে শিকাগোর এক ধনকুবেরের সুসজ্জিত গৃহে রাজোচিত যত্নাদির অধিকারী হইয়াও তিনি নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। সেই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে তাঁহার মন আনন্দ লাভ না করিয়া বিষাদে মগ্ন হইল। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ভারতের দারিদ্র্য এবং এই অতুল ঐশ্বর্যের ভয়াবহ বিরোধ তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তুলিল, পালকের শয্যা তাঁহার নিকট কণ্টকাবলী বোধ হইল, বালিশ তাঁহার চক্ষের জলে আর্দ্র হইল। শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সুদূরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। দুঃখে তিনি তখন মুহ্যমান। অবশেষে ভাবাবেগ সহ্য করিতে না পরিয়া ভূশয্যা গ্রহণপূর্বক ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন — "মা আমার স্বদেশ যেকালে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সেকালে মান যশের আশা কে করে। গরিব ভারতবাসী আমরা এমনই দুঃসহ অবস্থায় পৌঁছেছি যে লক্ষ লক্ষ জন এক মুষ্টি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করে। আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ভারতের জনগণকে কে ওঠাবে? কে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেবে?"[৮]

বিবেকানন্দের কান্না তো সাধারণ কান্না নয়, সারাভারত পরিক্রমা করে রক্তাক্ত পায়ে যিনি উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে গেছেন সেই কর্মেই এবার আমেরিকার সাফল্য, বিপুল ঐশ্বর্যের মাঝে চোখ বেয়ে নেমে এসেছে কান্নার আকারে। তাঁর মাথায় একটা চিন্তা ভারতবর্ষকে কে উঠাবে? কে জাগাবে? নিরন্ন ভারতবাসীর মুখে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা কে পৌঁছে দেবে? এই জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার উত্তরটি হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করেছিলেন।

ভারত প্রব্রজ্যায় কিংবা ভারত প্রবজ্যার অবসানে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে তিনদিন তিনরাত অনাহারে ধ্যানস্তব্ধ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর মুক্তির যে পথটি অন্বেষণ করেছিলেন অপরিসীম দুঃখ দারিদ্র্য অজ্ঞতা অত্যাচার শোষণকে ধুয়ে মুছে ফেলে ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী, আত্মশক্তিতে ভর দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আর তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে শাশ্বত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রয়াস থেকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভারতবর্ষের চিরন্তন রূপটি মানবকল্যাণে, সুচিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, সেই চাওয়ার ইচ্ছেটা দুরন্ত হয়ে উঠেছিল ভারত প্রব্রজ্যার মধ্য দিয়ে। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর ছবিটি আমাদের সামনে টাঙিয়ে দিয়েছেন এইভাবে—'তিনি অবিরাম একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ...জীবনের মহাগ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে বর্তমানের বেদনাক্লিষ্ট সকরুণ মুখখানি উন্মোচিত করিয়া ধরিল। ...তিনি শুনিলেন ভারতের তথা বিশ্বের জনসাধারণ কিভাবে সাহায্যের প্রার্থনায় কাতর আর্তনাদ করছে। তিনি বুঝিলেন তাঁহার মত নব'ইডিপাসের কর্তব্য কি—ইডিপাসের কর্তব্য ছিল ফিংসের মত হিংস্র চঞ্চুর কবল হইতে হয় থিবিসকে রক্ষা করা, নয় থিবিসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা। গ্রন্থশালার সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াও এই শিক্ষা তিনি পাইতেন না। তাঁহার ভ্রমণ বর্ষগুলি (১৮৮৬–১৮৯৩) শিক্ষা লাভের বর্ষ। আর সে শিক্ষা অপূর্ব শিক্ষা। ভারতের মুক্তি অন্বেষণ, ভারত তথা বিশ্বের অগণিত পিছিয়ে পড়া মানুষের মুক্তির সার্বিক অন্বেষণ।'[৯] এই অন্বেষণ থেকেই, ভারত পথিক, ভারত প্রবক্তা, ভারত প্রবোধক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে পৌঁছে মুক্তির প্রয়াসে দুর্বার হয়ে উঠলেন। আর সেই সূত্রেই ১৮৯৪-এর ৯ এপ্রিল মাদ্রাজবাসী যুব-শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেলেন—'এখন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালাতে হবে যা সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করবে। আর সেই আলোই প্রসারিত হবে সারা পৃথিবীতে।'[১০] গুরুদেবের ইচ্ছা ও নির্দেশের সঙ্গে বিবেকানন্দের এই অভীপ্সা একীভূত হয়ে গেল আর সেই সূত্রেই তাঁর পথে নামা, নিরন্তর পথ চলা।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ—যা স্বামীজী কথিত 'অর্পিত দায়' বা 'মহাব্রত'। এই 'দায়'—'মহাব্রত' উদ্‌যাপনের প্রয়াস তিনি তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে প্রত্যক্ষ না করে একাকী ভারত পরিক্রমায় 'বাহির' হলেন। মীরাটে গুরুভাইদের মাঝে অবস্থানের সময়ই তিনি 'মহাব্রত' উদ্‌যাপনের জন্য একাকী ভারত প্রব্রজ্যার নির্দেশ পেয়েছিলেন অন্তরে গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে। তাই তিনি ঐখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সহ ন'জন গুরুভাইকে

বলতে পেরেছিলেন—'আমার জীবনের ব্রত স্থির হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি একাকী থাকব।'

স্বামীজীর নিঃসঙ্গ, নিরলস, বিনিদ্র, অন্নবিহীন রক্তাক্ত সেই পরিক্রমার মাঝে তিনি হাতরাস রেল স্টেশনে অ্যাসিসটেন্ট স্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তকে (পরবর্তীকালে স্বামীজীর কাছ থেকে শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস নিয়ে হয়েছিলেন স্বামী সদানন্দ) কারুণ্য নিষিক্ত চলার মাঝে দৃপ্ত কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন সেই 'মহাব্রত'-এর কথা,—

> 'আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কি করে এটা উদ্‌যাপিত হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছেই পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতি ম্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতা বলে জগৎ জয় করতে হবে।'[১১]

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যে অভিনত্ব আছে, যার ফলে নবযুগের সূত্রপাত হবে, প্রাচীন-নবীনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকলেও প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি না হয়ে অভিনব সংস্কৃতির প্রেরণা দেবে ও বিশ্বকে সমসূত্রে গাঁথবে—এ ধারণাও তাঁর ছিল। সুতরাং যদি বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠাব দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত মহাব্রত সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে স্বামীজী এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না, কারুর সংগে আলোচনায় মেতে উঠতেন না। স্বামীজীর এই চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার রূপরেখা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

এরপর ভারত প্রব্রজ্যার কালে স্বামীজী তাঁর 'মহাব্রত'-এর কথা বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন জনকে বলেছেন—কখনো দেশীয় রাজা বা দেওয়ানকে, কখনো ভক্ত-অনুরাগীদের, কখনো বা যুবকদের। আলোয়ারে যুবগোষ্ঠীকে স্বামীজী বলছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের কথা, জাত-পাত নিরসনের কথা, ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির সদর্থক দিকটি উন্মোচিত করার কথা। মাণ্ডবী, ভুজ ও পোরবন্দরে স্বামীজী নানান ব্যক্তিদের সংগে আলোচনা করছেন সর্বস্তরে সর্বজনের মাঝে শিক্ষা বিস্তার, দেশের নানা স্থানে শিল্পায়ন ও মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্যমোচন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে।

সুতরাং ভারত পরিক্রমাকালে শ্রীরামকৃষ্ণব্রত উদ্‌যাপনের চিন্তাভাবনা স্বামীজীর মনে গভীরভাবে আলোড়িত হচ্ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু উপায় তখনো দূর অস্ত্, যারা স্বামীজীর চিন্তাভাবনা শুনছিলেন, তাদের ছিল আন্তরিক সহানুভূতি; কিন্তু ছিল না কোন কার্যকরী ভূমিকা। কন্যাকুমারীতে স্বামীজী পূর্ণপরিকল্পনা রচনা করলেন ব্রত উদ্‌যাপনের। ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড; ধর্মের অনুভূতি বলেই ভারতের পুনরুত্থান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর; ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ, পুরোহিত তন্ত্রের অবসান; শিক্ষার বিস্তার, নারী জাতির উত্থান, কুসংস্কার দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে এসব করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বৃন্দের, প্রয়োজন নিঃস্বার্থপর যুবকের, আর প্রয়োজন অর্থের। ভারতে অর্থসংগ্রহ সুদূরপরাহত, তাইতো তাঁর বিদেশ গমন। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতে আধ্যাত্মিক সম্পদ পাশ্চাত্যে বিতরণ করে অর্থ উপার্জন, যদিও তা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের ফলে এমন আদান প্রদান সম্ভব। তাঁর সংকল্প ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে যাবেন পাশ্চাত্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে পরিচালিত এবং সাফল্য লাভের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবেন। তাই আমরা দেখতে পাই শিকাগো যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে স্বামীজী তাঁর গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দকে আবেগমথিত হৃদয়ে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। ভারত পরিক্রমায় স্বামীজী তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের আশার আলো উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। শিকাগো যাত্রা এবং পাশ্চাত্য জয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তন সে তো শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশের বাস্তবায়ন।

কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে ধ্যানস্থ বিবেকানন্দের চিন্তার বিষয় ছিল বহু ধর্মের জন্মস্থান ও মিলনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ, 'চলমান শশ্মান' ভারতবর্ষের সিংহভাগ ভারতবর্ষের দরিদ্র-শোষিত মানুষ, ভারতের গৌরবময় অধ্যাত্মমহিমোজ্জ্বল অতীত, দুঃখ দারিদ্র্যনিমগ্ন, হৃতবীর্য, হৃতগৌরব, হৃতাধ্যাত্মসম্পদ বর্তমান এবং তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যত। অতীত বর্তমানের মেলবন্ধনে ভবিষ্যতে উত্তরণের রাঙা পথটাই তিনি খুঁজে পেতে চাইছিলেন।

॥ ৩ ॥

পথই পথের হদিশ দেয়। সমুদ্রযাত্রায় আমেরিকায় পৌঁছে পাশ্চাত্য পরিভ্রমণে লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে সামগ্রিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমশঃ পথের সন্ধান পেতে শুরু করলেন। আর তা জানাতে থাকলেন

নানা জনের কাছে লেখা চিঠিপত্রে। ২৭ এপ্রিল, ১৮৯৬ আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে দীর্ঘ পত্রটি লিখেছিলেন তাঁর মধ্যে সংঘ স্থাপনার বিষয়টি সাকার হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় রামকৃষ্ণ মিশনের গঠন ও কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট চিঠিতে স্বামীজী সূত্রাকারে তুলে ধরেছিলেন।

কার্যাবলী বিকশিত করেছিলেন তিনটি ভাগে—

১। বিদ্যাবিভাগ

২। প্রচার বিভাগ

৩। সাধন বিভাগ

এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী স্তরে রামকৃষ্ণ মিশনের গঠন-কার্যক্রম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনার মেতে উঠবো। রাজস্থানে অবস্থানের সময় দরিদ্র, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন মানুষ-মানুষীকে দেখে তাঁর ইতি কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য যখন অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীকে চিঠি লিখলেন, তার উত্তরে স্বামীজী জানালেন—'গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নয়, মহাকাজের নিশান। কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় হতে হবে। শাস্ত্রে পড়েছো "মাতৃদেবো ভব", "পিতৃদেবো ভব", আমি বলি, "দরিদ্রদেবো ভব", "মূর্খদেবো ভব"। দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক্। এদের সেবাই পরমধর্ম জানবে।'[১২] আমেরিকা থেকে রামকৃষ্ণানন্দজীকে ঘন্টা নাড়া বেশী না করে 'বিরাট' অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানালেন। প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখলেন :

১. শোনো বন্ধু প্রভুর কৃপায় আমি আবিষ্কার করেছি যে ভারতের অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষার জন্য ধর্ম দায়ী নয়। হিন্দু ধর্মতো আমাদের শিখিয়েছে, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ—কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা। আর সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের কাছে বুদ্ধ রূপে এসে শেখালেন, গরীব, দুঃখী পাপীর জন্য কিছু করো; না পারো তবে তাদের জন্যে কাঁদো, সহানুভূতি প্রকাশ কর। সমব্যথী হও। কিন্তু তোমরা তো শুনলে না। (মাসাচুটেস থেকে লেখা। তারিখ—২০ আগষ্ট ১৮৯৩)

২. যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। (ওয়াশিংটন থেকে লেখা। তারিখ—২৭ অক্টোবর ১৮৯৪)

৩. ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছো? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল — এরা সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা করো (উপাসনা অর্থে তাদের দুঃখমোচন ও সেবা করার কথা জানিয়েছেন)। (তদেব)

৪. অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন — এটা আমি কখনই বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষকে জাগাতে হবে, গরীবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে আর পৌরোহিত্য রূপ পাপ দূর করতে হবে। (নিউইয়র্ক থেকে লেখা। তারিখ — ১৯ নভেম্বর ১৮৯৪)

৫. ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারেব উপায় কি? তাদেব জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো? তাবা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো বয়ে নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমার দেবতা হোক্, এরাই তোমার ইষ্ট হোক্। তাদের জন্য ভাবো। তাদেব জন্য কাজ করো। তাদের জন্য সদা-সর্বদা প্রার্থনা করো। প্রভু তোমাদেব পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। (শিকাগো থেকে লেখা। তারিখ — ডিসেম্বর ১৮৯৪)

জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস ভাই বিহারীদাসকে লিখলেন:

'লোকে কি বলল — সেদিকে আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। আমার ধর্মকে, আমার প্রভুকে, আমার দেশকে — সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুক কে আমি ভালোবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালোবাসি। তাদের বেদনা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। কত তীব্র ভাবে অনুভব করি তা একমাত্র প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। (শিকাগো থেকে লেখা। তারিখ-নভেম্বর, ১৮৯৪)

মাদ্রাজের ডাঃ নাঞ্জাণ্ডু রাওকে লিখলেন:

'ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে। সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানদের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। অধঃপতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, উপদেশ

চারিদিকে প্রচার করতে হবে। যাতে প্রতি অনুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে প্রসারিত হয়। কে এই কাজ করবে? শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে? (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লেখা। তারিখ—৩০ নভেম্বর ১৮৯৪)[১৩]

চিঠিপত্র থেকে 'নররূপী নারায়ণ'—আর্ত, পীড়িত, দুঃস্থ, দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষ-মানুষীর উন্নতি, সেবা, শিক্ষাদানের প্রসঙ্গে স্বামীজীর বজ্রদৃপ্ত অভিমত আরো দেওয়া যেতে পারে। জীবসেবার, মানবকল্যাণের, অনগ্রসর-অজ্ঞ মানুষ-মানুষীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবার চিন্তায় স্বামীজী বিভোর তা আমরা এ থেকেই টের পেয়ে যাই। নররূপী নারায়ণের সেবা করার সূত্রটি স্বামীজী কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—আমরা তার দিকে দৃষ্টি ফেরাব। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'-এ শুনতে পাচ্ছি স্বামীজীর কণ্ঠস্বর:

—'এই দেহটা যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাকে ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ বুদ্ধি আসে। তুই (শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী) যত একাগ্রতার সঙ্গে পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এরূপ কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্বজীবে —সর্বঘটে বিরাজমান—এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর সাধনা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।'[১৪]

নরনারায়ণ-জ্ঞানে সেবা মুক্তির অন্যতম পথই শুধু নয়, দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দুর্বলতর ভিতকে শক্ত করতে, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্ভূত অবক্ষয়কে রোধ করতে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'ই সর্বোত্তম, যুগোপযোগী সাধনা। তাই স্বামীজী বললেন—'আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।'[১৫] শিষ্য সদানন্দজীকে স্বামীজী একবার বলেছিলেন —'জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবা ধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসার বন্ধন কেটে যায়।'[১৬]

বিবেকানন্দ কিভাবে ধর্মসত্য ক্ষুধাসত্যকে মিলিত করতে পারলেন?

এখানে উত্তর মিলবে বিবেকানন্দের মধ্যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে ভেদরেখা মুছতে চেষ্টা করেছেন। বৃথা যদি সর্বত্র ব্যস্ত হয়, তাহলে মূর্তি-ঈশ্বরের মতো মানবেশ্বরেও তিনি আছেন। ক্ষুধা-শ্রান্তিতে যদি ঈশ্বরের জয়ধ্বনি ওঠে, তাহলে স্বীকার করতে হবে ক্ষুধার জ্বালা চিৎকারের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর। অজস্র জায়গায় তিনি এ-সমস্ত উদাহরণ তুলে ধরেছেন। Practical vedanta সম্বন্ধে তাঁর ধারাবাহিক বক্তৃতা তো আছেই। 'কর্মযোগ' গ্রন্থেও তা পাই। লাহোরে প্রদত্ত 'বেদান্ত' বিষয়ক বিখ্যাত বক্তৃতার প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে—'অদ্বৈতবাদকে কর্মে প্রয়োগ করার সময় এসেছে। এখন আর তাকে রহস্যময় করে রাখলে চলবে না, এখন আর হিমালয়ের গুহায়, বনে-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে তাকে কার্যে পরিণত করতে হবে। ...লক্ষ লক্ষ লোক যাদের আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলেছি—অথচ প্রাণপণে ঘৃণা করেছি। মুখে বলেছি সকলই সমান। সকলেই সে এক ব্রহ্ম। কিন্তু তা কার্যে পরিণত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি। ব্যবহারিক জগতে করিনি।'

বেদান্তকে স্বামীজী মানবদর্শনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন—'বেদান্তের আদর্শ জগতের মনুষ্যের উপাসনা। ঈশ্বরের ব্যক্তিকতা তোমার ঐ মানবভ্রাতাকে যদি উপাসনা করতে না পারো তবে অন্যত্র তার উপাসনা করবে অসম্ভব!'

'বেদান্ত এক বিশাল পারাবার যার উপর যুদ্ধজাহাজ ও ভেলার সহাবস্থান সম্ভব। যে মহাসাগরে কাছাকাছি থাকতে পারে জ্ঞানী, নাস্তিক ও পৌত্তলিক—হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকলেই।' . .

'সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরের পূজা করে বেদান্ত। বেদান্তের ঈশ্বর সিংহাসনে আসীন সম্রাট নন। ইহজগতের রাজাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এসেছে গণতন্ত্র। এখন প্রত্যেকেই রাজা। রাজা-প্রজার অন্তরে। তেমনই বেদান্তের ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। স্বর্গের রাজ্যপাট বেদান্ত উঠিয়ে দিয়েছে বহুপূর্বেই।'

স্বামীজীর বিশ্লেষণে মিশনের প্রধান কর্মটি সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই বুঝে নেব যে 'জীবসেবা'র মধ্যে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা, আহার, পোশাক, বাসস্থান, স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান। এসবের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিতেই অধ্যাত্ম পথের সন্ধান। আর সব কিছুর যোগ করে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন 'অমৃতের সন্তানদের', চারিত্রিক-মানবিক গুণাবলীর মধ্য দিয়ে আপন লক্ষ্যে (যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 'ঈশ্বর' লাভ, অদ্বৈতবাদী দার্শনিক বলবেন, 'আত্মজ্ঞান' লাভ) পৌঁছবার

মাইলস্টোনগুলিকে চিনিয়ে দেওয়া। এই কাজের জন্য, এই কাজের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যই তো 'অবতার বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। আর এই কাজকে রূপায়িত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। তিনিই মিশনের নামকরণ করেছেন, নিয়মাবলী তৈরী করেছেন, অছি পরিষদ গঠন করেছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অছি পরিষদের গঠন প্রণালী নির্দিষ্ট করে গেছেন, এবং তা সরকারী নথিভুক্তিকরণও করেছেন, দেশে-দেশান্তরের কার্যাবলী ঠিক করেছেন, মিশনের বিশেষ তাৎপর্যবাহী প্রতীকটিও তাঁরই আঁকা। আর এসবই হয়েছে গুরুভাইদের ও গৃহীভক্তদের সর্বসম্মতিক্রমে। তবে মিশন পরিচালনার সব ভারই সতীর্থ সন্ন্যাসীরাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ১ মে ১৮৯৭ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রাথমিক কর্মসমিতিও গঠিত হয়। প্রথম সভাপতি ছিলেন স্বামীজী। ১৮৯৯-এর ২০জুন স্বামী ব্রহ্মানন্দেব নামে মঠ-মিশনের সম্পত্তি স্বামীজী অর্পণনামা করে দেন। তারপর মঠের অছি পরিষদ গঠিত হয় আইন অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে। নতুন অছি পরিষদ ব্যালট ভোটে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত করে। মঠের অছি পরিষদই মিশনের কাজ দেখাশোনা করতেন। স্বামীজী যতদিন সশরীরে ছিলেন ততদিন তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। তারপরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মিশনের ভিত্তি আরও সুদূর এবং কর্মধারা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে সমাজে ও দেশের মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

॥ ৪ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নের মণি, পার্ষদদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক উদ্যোগে কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশন ভাব হতে রূপ নিল—আমরা স্বল্প পরিসরে তার একটা ছবি আঁকলাম। স্বামীজী সভাপতি থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের কি কি কাজ সংগঠিত হয়েছিল এবং মিশন কতটা প্রসারিত হয়েছিল এবার আমরা সে দিকে দৃষ্টি ফেরাব। তার আগে ৫ মে ১৮৯৭ তারিখের সভায় মিশনের 'উদ্দেশ্য', 'ব্রত' এবং 'কার্যপ্রণালী' ––যা সর্বসম্মত ভাবে স্থিরীকৃত ও গৃহীত হয়েছিল এবং যা বহুশ্রুত তার সঙ্গে আরো একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নেব।

১. উদ্দেশ্য : মানবের হিতার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং কার্যে, তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রচার

এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি কল্পে যাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করা।

২. ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মেব রূপান্তরমাত্র জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করেছিলেন — তা পরিচালনা।

৩. কার্যপ্রণালী : মানুষের সাংসারিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোকশিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ জীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা জনসমাজে প্রবর্তন।

৪, ভারতবর্ষীয় কার্য : ভারতবর্ষেব নগরে নগরে আচার্য ব্রত-গ্রহণাভিলাষী, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদের শিক্ষাব আশ্রম স্থাপন এবং যদ্বতে তারা দেশ দেশান্তবে গিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করতে পারেন তার উপায় অবলম্বন।

৫. বিদেশীয় কার্য : ভারতবহির্ভূত প্রদেশ সমূহে 'ব্রতধারী প্রেরণ' এবং সেইসব দেশে স্থাপিত কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে ভারতীয় কেন্দ্রগুলির ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্ধন এবং লোকহিতার্থে নতুন নতুন আশ্রম সংস্থাপন।[১৫]

ধ্রুবতাবার মত মিশনের 'উদ্দেশ্য'কে জীবনে গ্রহণ, 'ব্রত' উদ্‌যাপনে সমর্পিত মন এবং কার্যপ্রণালী বাস্তাবায়নে সাহস অবলম্বন করে দ্রুততার সঙ্গে প্রায় সকলেই কাজে নেমে পডলেন। অসুস্থতার জন্য স্বামীজী ৬ মে আলমোড়া গেলেন বিশ্রাম নিতে ও হাওয়া বদল করতে। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলা শহর বহরমপুরের কাছে দাদপুর, ভাবতা, মহুলাতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেই দুর্ভিক্ষে ত্রাণের কাজ শুরু করলেন মাত্র চার আনা পয়সা সম্বল করে একাকী। ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে সংগঠিত ভাবে ত্রাণের কাজ শুরু হলো ১৫ মে ১৮৯৭। রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে ঐ দিনটি স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আসলে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর এটাই প্রথম রিলিফ ওয়ার্ক বা ত্রাণের কাজ, শিবজ্ঞানে জীবসেবার প্রথম বাস্তবায়ন, সর্বোপরি — রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কর্মেব সূচনা এবং এই সূত্র ধরেই গড়ে উঠল মিশনের প্রথম স্থায়ী কেন্দ্র বহরমপুরের কাছে সারগাছিতে। শতবর্ষ অতিক্রম করল ১৯৯৭-এ এই কেন্দ্রটি।

১৮৯৭-এ দিনাজপুর, ২৪ পরগণা জেলায় এবং বিহারের সাঁওতাল পরগণায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা ত্রাণের কাজে অংশ নেন। স্থানীয় যুবকদের নিয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনাজপুরে ত্রাণের কাজ পরিচালনা করেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরে ত্রাণের কাজে অংশ নিতে এগিয়ে যান স্বামী বিরজানন্দ। প্রায় একই সময়ে (আগস্ট মাস) ২৪ পরগণার দক্ষিণেশ্বরে অনহারক্লিষ্ট মানুষ-মানুষীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন স্বামী প্রকাশানন্দ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে স্বামী কল্যাণানন্দ কিষেণগড়ে গিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করতে থাকেন এবং ঐ বছরের শেষ ভাগে পঞ্চাশজন বালক ও কুড়িজন বালিকাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করেন। এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং স্বামী সদানন্দ ভাগলপুরের ঘোষা অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র গঠন করলেন। খাণ্ডোয়ার দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজ পরিচালনা করলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। দেশের যে কোন স্থান থেকেই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ পাওয়া গেলে, মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীরা সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নরনারায়ণ সেবা যজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করলেন। 'আত্মনোং মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'-এর সঙ্গে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' ব্রত সানন্দে উদ্‌যাপিত হতে থাকলো। দুঃখ-পীড়িত আর্ত মানুষকে বিভিন্নভাবে সেবা করে নবযুগের আদর্শ বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা দেশব্যাপী এক আলোড়ন তুললো রামকৃষ্ণ মিশন। যুবকদের মধ্যে এই শুভকাজে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিল।

নানাস্থানে সেবাকার্য পরিচালনা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে প্রচার ও সেবাকাজের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে গেলেন। পাশ্চাত্যে স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ বেদান্তপ্রচার স্থয়ী ভাবে সংগঠিত করতে বিশেষ ভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দেশে-দেশান্তরে রামকৃষ্ণ মিশন একটা সাড়া জাগাতে পেরেছিল সেকথা ইতিহাসই বলে।

কলকাতায় তখন আলমবাজার মঠে ত্যাগী সন্ন্যাসীদের একটা শৃঙ্খলা- পরায়ণ জীবনধারায় প্রবাহিত করতে উদ্যোগী হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার মঠে সন্ধ্যায়, সোমবার ব্ল্যাক টাউনে বিকেলে এবং শুক্রবার বিকেলে ওয়াই.এম.সি.এ. তে বেদান্ত প্রচারে নিমগ্ন হলেন। আমেরিকা থেকে স্বামী অভেদানন্দ, ইংল্যাণ্ড থেকে স্বামী সারদানন্দ তাঁদের কার্যাবলী নিয়মিত মঠে পাঠাতে লাগলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর পরই তাঁদের কর্মযজ্ঞ যেমন পল্লবিত ভাবে প্রসারিত হতে শুরু করল তেমনি সুশৃঙ্খল ভিত্তির উপর সু-প্রতিষ্ঠিতও হল।

স্বামীজী চাইছিলেন আরো দ্রুত কাজ এবং মিশনের দ্রুত সম্প্রসারণ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধুকর্মীর পক্ষে দ্রুততা বাস্তবিক ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। তবুও স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রহ্মানন্দজীকে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন: 'আমার এখন ঘড়িতে ঘোড়া ছোটে, আমি চাই তড়ি-ঘড়ি কাজ—নির্ভীক হৃদয়।' আসলে স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন এই ধূলিধূসরিত মর্ত্যভূমি ছেড়ে তাঁর চলে যাবার সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তাই তাঁরই হাতে রূপায়িত রামকৃষ্ণ মিশন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এই সুচারু রূপটিকে তিনি দেখে যেতে চাইছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে দেখা দিল এক কঠিন পরীক্ষা। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ ভাগে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা মহানগরীর বুকে দেখা দিল প্লেগ রোগ। জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক, মৃত্যুভয়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হল বিপর্যস্ত। দলে দলে মানুষ শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সমস্ত খবর জানিয়ে স্বামীজীকে একটি টেলিগ্রাম করলেন। বাগবাজার অঞ্চলে এই রোগ ব্যাপক আকার দেখা দেওয়ায় শ্রীমা সারদাদেবীকে জয়রামবাটী পাঠিয়ে দেওয়া হল। টেলিগ্রাম পেয়ে স্বামীজী দার্জিলিং থেকে ছুটে এলেন কলকাতায়। নির্দেশ দিলেন সমস্ত ত্যাগী সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ এবং অনুরাগী যুবকদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্লেগ রোগাক্রান্ত কলকাতাবাসীর মধ্যে সেবাকাজ শুরু করার। অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে স্বামীজী জানালেন প্রয়োজন হলে বেলুড়ে নতুন মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য যে জমি কেনা হয়েছে তা তিনি বিক্রি করে দেবেন। স্বামীজীর কথা শুনে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং অনুরাগীবৃন্দ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একদিকে প্লেগরোগাক্রান্তদের সেবা করতে লাগলেন অন্যদিকে রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্নও করতে থাকলেন, যাতে দ্রুত রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য প্রয়াসী হলেন এবং সকল স্তরের মানুষকে সতর্ক করে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার চালালেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ প্রচেষ্টায় অতি দ্রুত কলকাতা প্লেগ রোগমুক্ত হল। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখ্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ নানা স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে প্লেগ নিবারণের কাজে তা নিয়োগ করলেম। পরের বছর আবার কলকাতায় প্লেগ রোগ দেখা দিল। ১৮৯৯-এর ৩১ মার্চ তারিখ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সেবাকার্যে অংশ নিলেন। বিগত বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন।

সেবাকার্য পরিচালনার জন্য একটি ছোট কমিটি গঠিত হল। নিবেদিতা সেই কমিটির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা একই সঙ্গে নিযুক্ত হলেন। স্বামী সদানন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সন্ন্যাসীরা, নিবেদিতা ও যুব-ছাত্রদল শহরে রাস্তায় অলিগলিতে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল পরিষ্কারের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। রোগীদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হল। ১৫ এপ্রিল সেবাকার্যের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হল। নিবেদিতা ২১ এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ৩০ এপ্রিল শিয়ালদহ অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেবাকার্যের সমাপ্তি ঘটল।

১৮৯৮-এর ৫ মার্চ, বর্তমান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় হাওড়ার বেলুড়ে যেখানে অবস্থিত—যা আজ আন্তর্জাতিক পীঠস্থান—সেই জমিটি কেনা হয়েছিল। ঐ বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের লেখা চিঠি থেকে আমরা তথ্যটি জানতে পারছি। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কাজে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক সংযোজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৯৭-এর ১২ জুন কলকাতায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হওয়ার ফলে আলমবাজার মঠ বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। তারপর সাময়িক ভাবে মঠ ও মিশনের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল বর্তমান বেলুড় মঠ ও মিশনের সংলগ্ন জমিদার নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরবর্তী উদ্যান বাড়িতে (বর্তমানে পুরাতন মঠ)। তারিখটি ছিল ১৮৯৮-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি। ঐ বছরেরই ২৭ ফেব্রুয়ারি[১৮] প্রস্তাবিত নতুন মঠ ও মিশনের জমিতে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ও পুজোর পর নীলাম্বরবাবুর উদ্যান বাড়ি থেকে আনা ঠাকুরের 'আত্মারামের কৌটা'টি নির্দিষ্ট স্থানে একটি আসনের উপর স্থাপন করলেন। তারপর তিনি নিজেই পুজো ও হোম করে পায়াসন্ন ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী এবং আগত ভক্তবৃন্দের জয়োল্লাস, শঙ্খধ্বনির নিনাদে গঙ্গাতীরবর্তী বর্তমান বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণটি মুখরিত হয়ে উঠল। স্বামীজী পুজো সমাপ্তির পর সকলের উদ্দেশে বললেন—'আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' এই পুণ্যতীর্থে অবস্থান করে এ-কে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয় কেন্দ্র করে রাখেন।'[১৯]

স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি থাকাকালীন আরও যেসব সেবাকার্য সংগঠিত হয়েছিল নানাস্থানে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা তুলে

ধরতে পারি। সেগুলি হলো—১৮৯৯ এর দার্জিলিং-এর ভূমিকম্পে, ঐ বছরেই ভাগলপুরের বন্যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার বন্যায়।

রামকৃষ্ণ ভাব-আন্দোলনকে প্রসারিত করে দেবার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকাগুলি হল মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' (১৮৯৫), 'প্রবুদ্ধভারত' (১৮৯৬) এবং 'উদ্বোধন' (১৮৯৯)।[২০] প্রথম দুটি পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং শেষেরটি বাংলায়। একটি আন্তর্জাতিক সংঘের মুখপত্র থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তার মাধ্যমে একদিকে সংঘের নির্দেশ-নিয়মাবলী যেমন নানা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া যায় তেমনি সংঘের ভাবাদর্শ ভক্ত-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়। সেই চিন্তা নিয়েই স্বামীজী বাংলা ও ইংরেজিতে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিলেন।

গৃহীভক্ত অনুরাগীদের প্রয়াসে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও কন্‌খলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্বামীজীর উৎসাহাগ্নির জ্বলন্ত প্রকাশ। স্বামীজী সভাপতি থাকাকালীন আমেরিকার নিউইয়র্কে ও সানফ্রানসিস্‌কোয় বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মাদ্রাজ মঠও স্বামীজীর সময় প্রতিষ্ঠিত। ট্রাস্ট গঠনের পর স্বামীজী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দেব ৯ ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। পরের দিন ১০ ফেব্রুয়ারী নতুন সভাপতি হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

রামকৃষ্ণ সংঘের প্রসাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাটি নিবেদিতা স্বল্প কয়েকটি শব্দে স্বর্ণখচিত করে রেখেছেন,—

'স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া রামকৃষ্ণ সংঘ অর্থহীন। তিনি সংঘের পুরোভাগে আছেন—তাই সংঘের পূর্ণতা—উজ্জ্বলতা কাঙ্ক্ষিতভাবেই বর্তমান। আবার গুরুভাইরা তাঁর পিছনে না থাকলে বিবেকানন্দের উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ হত এবং তাঁর অভীপ্সা পরিশ্রম বিফল হয়ে যেত। প্রাচীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন সম্প্রতি আমাকে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দকে তৈরী করবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনধারণ। বাস্তবিক কি তাই। অথবা জগন্মাতার অখণ্ড মহত্তর বাণীর এক অংশকে অপর অংশ থেকে নিশ্চিত ভাবে পৃথক করে দেখা যেমন অসম্ভব, এই দুই মহাজীবনকেও পৃথক করে দেখা কি তেমনি অসম্ভব নয়? এই ভাবনার মধ্য দিয়ে যে সত্যে পৌঁছই—তা হল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবর্তিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবনালোকে রামকৃষ্ণ সংঘ সহস্র আলোর দীপনে উদ্ভাসিত।'[২১]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দীর্ঘ সময়ের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন বাস্তবিক ক্ষেত্রে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশে-দেশান্তরে নানা শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার আগে আমরা যে কথাটি উল্লেখ করব তা অবশ্যই বেদনাবাহী। ১৯০২-এর ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিতে লীন হলেন। ব্রহ্মানন্দজী সেইদিন ছিলেন কলকাতায়। খবর পেয়ে ছুটে এলেন বেলুড়মঠে। অশ্রুবিগলিত দিশেহারা চিত্তে তিনি স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সারদানন্দজী অতিকষ্টে তাঁকে তুলে ধরলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ রোরুদ্যমান অবস্থায় উচ্চারণ করলেন 'আমাদের সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।' স্বামীজীর শরীর চলে যাবার আগে স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করেছেন, দেহত্যাগ করেছেন 'ভক্তপ্রবর' রামচন্দ্র দত্ত। স্বামীজীর অন্তর্ধানে তাই সন্ন্যাসীদের মুখে উচ্চারিত হল বিষাদগ্রস্ত এক বাক্য 'একে একে নিভিছে দেউটি'।

১৯০২-এর ৪ জুলাই বিবেকানন্দের পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় নি, হতে পারে না। বিবেকানন্দ নিজে যুবক শিষ্যদের বলেছেন, 'যেদিন আমি তোদের সামনে থাকব না সেদিন আমি তোদের পেছনে থাকব।' বিবেকানন্দ আছেন। তাই নিবেদিতা বলতে পারেন,—'আমাদের গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ শাশ্বত এক জীবনসত্তা। মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করে কি সাধ্য তার!'[২২]

রোমা রোলাঁ বিবেকানন্দের পার্থিব শরীর চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালের ছবিটি তুলে ধরেছেন চমৎকার ভাবে—'মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা-বেদনার উত্থিত বিষ পান করে, ভিতরে-বাইরে অজস্র সংগ্রামে সারা জীবন রক্তাক্ত হয়েও বিবেকানন্দ ছিলেন আজন্ম সম্রাট। তিনি আছেন কোথাও কখনও দ্বিতীয় স্থানে—কল্পনা করা যায় না। তিনি ঈশ্বর প্রেরিত নেতা। নির্দেশ দেবার, চালিত করবার, জন্মগত অধিকার তাঁরই আছে। ...চল্লিশের পূর্বে তিনি চিতাসায়িত। কিন্তু আগুন জ্বেলেছেন কয়েক বছরেই। সে অগ্নি নির্বাপিত নয় আজও। তাঁর চিতাশয্যা থেকে উত্থিত হয়েছে ভারতের বিবেক পুরাণ—প্রাচীন ফিনিক্স পাখির মতো। উত্থিত হয়েছে ভারতের বিশ্বাস—সেই মহান সত্যবাণীতে। বৈদিক যুগে যার জন্ম ঋষিদের অন্তশ্চেতনায়, বিবেকানন্দে যার অমেয় উচ্চারণ। সে বাণীর হিসেব দিতে ভারতবাসীকে অবশিষ্ট মানবজাতির নিকট এবং তা বিবেকানন্দের দায় বহন করে।'[২৩]

বিবেকানন্দের দায় বহন করেই ভারতবাসী আজ দেশে-দেশান্তরে দুঃখ-বেদনায়, শোষণ-বঞ্চনায়, রোগে-শোকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, প্রতিকূল পরিবেশে, শত বাধা-বিপত্তির মাঝে বেঁচে ওঠার, বেঁচে থাকার আনন্দটুকু পৌঁছে দেবার এবং জীবনে জীবন যোগ করে উত্তরণের পথটি চিহ্নিত করার প্রয়াসে নিরলস প্রয়াসী। আর এই প্রয়াসের কেন্দ্রে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীবানন্দ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ১৮২
২. স্বামী শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১৪০০, পৃঃ ৩৬
৩. ঐ, পৃঃ ৩৭
৪. ঐ, পৃঃ ৩৭
৫. শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৮৩, ঠাকুবেব দিব্যভাব, একাদশ অধ্যায়, পৃঃ ২৩৯–৪০
৬. যুগনায়ক বিবেকানন্দ—ঐ, পৃঃ ৪২১
৭. সবাসবি শিকাগো থেকে লেখা চিঠি আলাসিঙ্গা পেকমলকে, পত্রাবলী, ১৩৮৪, অখণ্ড সংস্কবণ পৃঃ ৯৪
৮. যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীবানন্দ, ২য খণ্ড, ১৩৮৫, পৃঃ ৩৩
৯. বিবেকানন্দ জীবন, রোমা রোঁলা, ১৩৬০, পৃঃ ১৭–১৮
১০. পত্রাবলী, ১৩৮৪, অখণ্ড সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৯১, পৃঃ ১২৭
১১. যুগনাযক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪৫–২৪৬
১২. পত্রাবলী, ১৪৯ সংখ্যক পত্র, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪৭
১৩. চিঠির অংশগুলি লেখক কর্তৃক অনূদিত
১৪. স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৮৩
১৫. ঐ, উত্তরকাণ্ড, পৃঃ ২৩৭
১৬. ঐ, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ৪১
১৭. স্বামী শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১৪০০ পৃঃ ৩৭
১৮. বেলুড় মঠের জমি কেনার ও ঐ জমিতে স্বামীজী ঠাকুরের আত্মাবামের কৌটোটি নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসিয়ে পুজো, হোম এবং পায়াসন্ন নিবেদন কারোর সময়-তারিখ নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। স্বামী শিষ্য সংবাদ (৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১১০)-এ শেষোক্ত বিষয়ে প্রদত্ত তারিখ ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮। স্বামী গম্ভীরানন্দ History of Ramkrishna Math & Mission গ্রন্থে এবং 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থেও (৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৮১) ঐ তারিখ উল্লেখ করেছেন। 'দেশ' বামকৃষ্ণ মিশন শতবার্ষিকী সংখ্যায়—(৩১ মে ১৯৯৭) শংকবীপ্রসাদ বসু ও শংকর

এই তাবিখেব কথাই উল্লেখ কবেছেন। আসলে এই তাবিখটি সঠিক নয। সঠিক তাবিখ হল—২৭ ফেব্রুযাবী ১৮৯৮, ববিবাব। এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে দুটি চিঠি থেকে। ক. স্বামীজী ২৪ ফেব্রুযাবী ১৮৯৮ তাবিখে বামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখেছিলেন যে,—'যে জমি কেনা হইযাছে আজ আমবা উহাব দখল লইব। যদিও এখনই এ জমিতে ঠাকুবেব মহোৎসব কবা সম্ভবপব নহে। তথাপি ববিবাবে (২৭ ফেব্রুয়াবী ১৮৯৮) ঐ স্থানে কিছু না কিছু কবাইব। অন্ততঃ শ্রীজীব (ঠাকুবেব) ভস্মাবশেষ (যা কলসীতে বক্ষিত ছিল) ঐ দিনেব জন্য আমাদেব নিজস্ব জমিতে লইয়া গিযা পূজা কবিতে হইবে।' ৬ মার্চ ১৮৯৮ তাবিখে বামকৃষ্ণানন্দজীকে লেখা চিঠিতে প্রেমানন্দজী জানাচ্ছেন যে,—'গত ববিবাব অন্যবছবেব তুল্য ঠাকুবেব মহোৎসব ঐ নতুন জায়গায় সম্পন্ন হইযাছে। নবেন্দ্র নিজে ঠাকুব লইযা গিযা পূজা ও হোম কবিযাছিলেন। পাযাসান্ন ভোগ দেওযা হইয়াছিল। ঐ দিনটা ছিল ২৭ ফেব্রুযাবী ১৮৯৮, ববিবাব।' এই দুটি চিঠি থেকে সঠিক তাবিখ জানা যাচ্ছে। আলামবাজাব থেকে ভূমিকম্পেব ফলে ১৮৯৮-এব ১৩ ফেব্রুযাবী মঠ নীলাম্বব বাবুব বাগানবাড়িতে উঠে আসে। তাবপবই বেলুডেব জমি কেনা হয (স্বামীজীব চিঠিতে তাবিখ উল্লেখিত)। স্বভাবতই ২৭ ফেব্রুযাবী ১৮৯৮, ববিবাব ঠাকুবেব আত্মাবামেব কৌটো নিযে পুজো-হোম কবাই স্বাভাবিক। ৯ ডিসেম্বব তাবিখটি তো ন'মাস দূবে। অত দেবিতে এবং অসময়ে স্বামীজী পুজো কবতে যাবেন কেন? স্বামী প্রভানন্দ তাব 'ব্রহ্মানন্দচবিত' গ্রন্থে (১৯৯৫, পৃঃ ১২৩) ২৭ ফেব্রুযাবী ১৮৯৮ তাবিখটি সঠিক বলে উল্লেখ কবেছেন এবং প্রমাণও দিয়েছেন। আব জমি কেনা বিষযে ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রমদাদাস মিত্রকে চিঠিতে ৫ মার্চেব কথা উল্লেখ কবায আমবা এই সিদ্ধান্তে আসতে পাবি যে ১৮৯৮-এব ফেব্রুযাবী মাসেব মধ্যে জমি কেনাব অগ্রিম বাবদ টাকা দেওয়া হযে গিয়েছিল। বাকি টাকা ৫ মার্চ দেওয়া হযেছে এবং ঐ দিন জমি বেজেস্ট্রী হযেছে। প্রেমানন্দজীও ৫ মার্চ তাবিখটি উল্লেখ কবে বামকৃষ্ণানন্দজীকে ৬ মার্চ লেখা চিঠিতে জানিযেছেন যে 'গতকল্য ৩৯ হাজাব টাকায ২২ বিঘে জমি কেনা হযেছে।' এই তথ্য থেকে আমাদেব দুটি সিদ্ধান্তই সঠিক প্রমাণিত হয়।

১৯. ঐ, পৃঃ ৮৭

২০. প্রথম পত্রিকাটিব প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে, দ্বিতীয পত্রিকাটি শতবর্ষ অতিক্রম কবে এখনো প্রকাশিত হচ্ছে এবং শেষোক্ত পত্রিকাটি নিববচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষেব দ্বাবপ্রান্তে উপনীত।

২১. বিবেকানন্দকে যেরূপ দেখেছি, ভগিনী নিবেদিতা, ১৩৮৪, পৃঃ ৭১

২২ ঐ, পৃঃ ৭১

২৩. বিবেকানন্দ জীবন, বোমাঁ বোলাঁ, ১৩৯৯, পৃঃ ৩–৪

রামকৃষ্ণ মিশনের সম্প্রসারণে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধির আগেই সব কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর হাতে গড়া রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন সতীর্থদের উপর। ভবিষ্যৎ রূপরেখা, আইনানুগ প্রশাসনিক পরিকাঠামো নির্মাণ, সার্বিক লক্ষ্য স্থিরীকরণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে চিন্তামুক্ত হয়েছিলেন। তাই মৃত্যুর আগে বিষণ্ণতার পরিবর্তে সোল্লাসে জানিয়ে গেলেন—

> 'আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী, এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশী, জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী, আবার এখন যে নির্বাণের শান্তিসমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি তাতেও খুশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে এমন কাউকে আমি ফেলে যাচ্ছি না অথবা এমন বন্ধনও আমি কারুর কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা নিয়ে আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতে যদি মুক্ত হয়, সেই পুরানো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরবে না।'
>
> 'শিক্ষাদাতা, নেতা, গুরু, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে, পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চির পদাশ্রিত দাস।'
>
> '...আহা কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতিদূর অন্তস্থল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর, অস্পষ্টভাবে আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি মধুর, মধুর শান্তি। যা দেখছি, শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে কেবল শান্তি, শান্তি!"[১]

বাস্তবিক ক্ষেত্রে সতীর্থদের চোখের জলেই স্বামীজীর পার্থিব দেহের পূর্ণাহুতি হয়েছিল সম্পূর্ণ আর সেই অশ্রুসিক্ত দেহ-মন নিয়েই সতীর্থ—শিষ্য—অনুরাগীবৃন্দ রামকৃষ্ণ মিশনকে বহুযোজন পথ অতিক্রমণের অঙ্গীকার করেছিলেন। আর সেই সূত্রেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে একই সঙ্গে পল্লবিত ও সম্প্রসারিত হল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা।

ব্রহ্মানন্দজী স্বামীজীর মহাসমাধির পর বুকের মধ্যে বেদনাকে সঞ্চিত রেখেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯০১ থেকে ১৯২২ এই দীর্ঘ ২১ বছব তাঁর নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ সংঘটিত হয়। ২২ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠে আরও বাড়ি ঘরদোর তৈরী হয়, নিত্য ঠাকুরসেবা চলতে থাকে। ভক্ত সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে সঙ্গে দেশে-দেশান্তরে স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানা কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রগুলির মধ্যে আছে—১) ভারতবর্ষে —কলকাতায় বরাহনগর, বেলঘরিয়ায় ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ হোম; উদ্বোধন কার্যালয়; পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণায় সরিষা, বাঁকুড়া, জয়রামবাটী সারদা সেবাশ্রম, মেদিনীপুরের গড়বেতা, চণ্ডীপুর; ওড়িশার ভুবনেশ্বর; বিহারের জামতাড়া; দেওঘর, আসামেব করিমগঞ্জ; উত্তরপ্রদেশেব কন্‌খল (হরিদ্বার), বৃন্দাবন, কিষণপুর (দেরাদুন), শ্যামলাতাল, কানপুর, আলমোড়া, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম; মাদ্রাজে সারদা বিদ্যালয়, স্টুডেন্টস হোম, নাট্টারামপল্লী; কেরলের কালাড়ি, ত্রিরুভাল্লা, ত্রিবান্দ্রাম; কর্নাটকের বাঙ্গালোর। ২) বহির্ভারত—(তৎকালীন বাংলাদেশের অন্তর্গত) বরিশাল, বালিয়াটি, ঢাকা, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ।

কলকাতার যুবকদের মধ্যে স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্য নিবেদিতা কিছু সংখ্যক যুবকদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। মঠের সন্ন্যাসীদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাঁদের নিয়ে মঠে এসেছিলেন। উৎসাহী হলেন ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজী। ১৯০২-এর ২৩ আগস্ট অ্যালবার্ট হলে আয়োজিত জনসভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থাটির উদ্বোধন হল। সংস্থাটির নাম 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারাকে প্রসারিত করেননি, সাধু সন্ন্যাসীদের যেমন আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন তেমনই অনুরাগীদের শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় করেছেন উদ্দীপ্ত। তিনি মঠ-মিশনের প্রত্যেক কেন্দ্রে গিয়ে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে সবকিছু লক্ষ্য করতেন। কোথাও কোন ভুলত্রুটি হলে তা শুধরে দিতেন। কেউ দোষ করলে সহজেই ক্ষমা করতেন। মতবিরোধ দেখা দিলে সহজেই তা মিটমাট

করে দিতেন। তিনি বাস্তবিকক্ষেত্রেই ছিলেন শিশুর মত সরল। আবার সন্তসাধকরূপে তাঁর দৃঢ়তাও লক্ষণীয়। বারাণসী সেবাশ্রম ও অদ্বৈত আশ্রমের অধিবাসীদের মতবিরোধ তিনি যেভাবে মিটিয়েছিলেন তা তাঁর দৃঢ়তারই পরিচয় বহন করে। আর যেখানে যখনই প্রয়োজন দেখা দিত মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারী ভক্ত অনুরাগীরা তাঁর নির্দেশে—উদাত্ত আহ্বানে ত্রাণ-সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতি থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে যে সমস্ত ত্রাণ ও 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কাজ পরিচালিত হয়েছে সেগুলি হল : ১) কলেরা রোগগ্রস্তদের জন্য সেবা ও ত্রাণ। ১৯১৩তে উত্তরপ্রদেশের তেহরীতে, ১৯১৭তে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায়। ২) ১৯১৯-এ দুঃস্থ আর্ত পীড়িতদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ। ৩) ঝড়, ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ—১৯১৯-এ বরিশাল, ঢাকা, ফবিদপুর ও খুলনায। ৪) ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ—১৯০৫-এ পাঞ্জাবের ধর্মশালায়। ৫) দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মধ্যে ত্রাণ—১৯০৬–৭-এ নোয়াখালিতে, শ্রীহট্টে, ত্রিপুরায়, এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণায়। ১৯০৮-এ মুর্শিদাবাদ ও ওড়িশার পুরীতে। ১৯১৫–১৬তে ওড়িশার বালেশ্বর, বাঁকুড়ায়, ঢাকায়, ফরিদপুরে, মেদিনীপুরে, মালদা, নোয়াখালি, ত্রিপুরায়। ১৯১৯-এ বাঁকুড়ায়, মানভূমে, পুরীতে, সাঁওতাল পরগণায় এবং ত্রিপুরায়। ১৯২০তে পুরীতে। ৬) অগ্নিবিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ—১৯১৫–১৬তে পুরীতে, ১৯১৭তে মেদিনীপুরে ও বৃন্দাবনে, ১৯১৯-এ মেদিনীপুরে, ১৯২০তে পুরীতে। ৭) বন্যাত্রাণ—১৯০৯-এ হুগলী ও মেদিনীপুর, ১৯১৩–১৪তে বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া। ১৯১৫তে আসামের কাছাড়, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায়। ১৯১৬তে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে, বালিয়ায়, বর্ধমানে, ফরিদপুরে। ১৯১৭তে বর্ধমান, কাছাড়ে। ১৯১৮'য় রাজশাহীতে। ১৯১৯-এ মথুরায়। ১৯২০তে কটকে, মেদিনীপুরে। ১৯২০–২১-এ আর্মহাস্টি (ব্রহ্মদেশ)। ৮) গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে সেবাকাজ—১৯১২ এবং ১৯১৪-তে সাগরদ্বীপে। ৯) প্লেগরোগীদের মধ্যে সেবাকাজ—১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯১২। ভাগলপুরে, লাহোরে এবং পাঞ্জাবের রোহতকে। ১০) এছাড়া বাংলাদেশের নানাস্থানে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে সেবাকাজ তাঁর সময়ে পরিচালিত হয়েছিল।

যে কর্ম বন্ধনের কারণ সেই কর্মেই যুক্ত হয়ে সাধন করলে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মধ্যে এই রহস্য ও আধুনিক

আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বিদ্যমান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই আধুনিক মানসিকতা নিয়ে তাঁর গুরু নির্দিষ্ট এবং স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথে সন্ন্যাসী, অনুরাগী ভক্তবৃন্দ ও যুবকদের সহযোগে নরনারায়ণ সেবাযজ্ঞের আদর্শ রূপায়িত করেছিলেন সুচারুভাবেই। তাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর সম্পর্কে চমৎকার একটি অভিমত জ্ঞাপন করেছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবরাশিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও কর্মে প্রতিফলিত করেছেন রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)।'[২] ব্রহ্মানন্দজী অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯২১এ স্বামীজীর পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে সস্ত্রীক গান্ধীজী, মহম্মদ আলি ও মতিলাল নেহরু সহ বেলুড় মঠে এসেছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন স্বামী শিবানন্দ। তিনি ১৯২২-এর ২মে কার্যভার গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ রূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন এবং বহুলোকের সংস্পর্শে এসে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তিনি নেতৃত্বে থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের বেশ কিছু নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁরই প্রেরণায় এবং পুরানো কেন্দ্রগুলি তাঁর শুভ পদার্পণে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। স্বামী শিবানন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মিশনের কাজ আরও বেশি প্রসারিত হয়ে মানবকল্যাণে নিয়োজিত থেকেছে। বেলুড় মঠে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরের উপরের অংশটি তাঁর সময়েই নির্মিত হয়। স্বামী শিবানন্দের সময়ে মিশনের কর্মের বিপুল প্রসার ঘটে। প্রসারিত কর্মধারার মধ্যে আছে মাদ্রাজে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, বেলুড় মঠে স্বামীজীর ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, এছাড়া বোম্বাই, উটি, নাগপুর, চেরাপুঞ্জি, কোয়েম্বাটোর, জামশেদপুর, কাটিহার, মনসাদ্বীপ, দিল্লী, তমলুক, পাটনা, পনামপেট (কর্ণাটক), মহীশূর, পালাই (কেরালা), ত্রিচুর, কাঞ্চিপুরম্, পুরী, রাজকোট, ফরিদপুর, দিনাজপুর, বাগেরহাটে (শেষোক্ত চারটি বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশে আর্জেণ্টিনা, সিঙ্গাপুর, কলম্বো, শিকাগো, হলিউড, নিউইয়র্ক, পোর্টল্যাণ্ড, প্রভিডেন্সে মঠ-মিশনের কেন্দ্রের সূচনা হয়। তিনি অধ্যক্ষ থাকা কালে মঠ-মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ও ভাবাদর্শ প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে এই মহাসম্মেলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে যে সকল ত্রাণ ও সেবাকার্য পরিচালিত হয়েছিল, তা হল—১) কলেরা রোগীগ্রস্তদের সেবা ও

ত্রাণ — ১৯২৪-এ জলপাইগুড়ি, ১৯২৫-এ হুগলি এবং পূর্ণিয়ায়, ১৯২৬-এ মালদা এবং পূর্ণিয়ায়, ১৯২৯-এ বর্ধমানে, ১৯৩০-এ পূর্ণিয়া। ২) ঝড়-ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ — ১৯২৩–২৪-এ ওড়িশার গঞ্জামে, ১৯২৬-এ ফরিদপুরে, ১৯২৭-এ নেলোরে, ১৯৩২-এ ময়মনসিংহে। ৩) ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ — ১৯৩০-এ পেগুতে (ব্রহ্মদেশ), উত্তর বিহারের বিস্তির্ণ অঞ্চলে। ৪) দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষজনের মধ্যে সেবা ও ত্রাণ — ১৯২২-এ খুলনায়, ১৯২৬-এ মেদিনীপুর ও সাঁওতাল পরগণায়, ১৯৩০-এ বাঁকুড়া ও দিনাজপুরে, ১৯৩১-এ নদীয়া ও রংপুরে, ১৯৩২-এ ময়মনসিংহ ও পাটনায়। ৫) অগ্নিবিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে সেবা ও ত্রাণ — ১৯২৩-এ পুরী ও মানভূমে, ১৯২৪-এ বর্ধমান, বীরভূম ও কামরূপে, ১৯২৫-এ মানভূমে, ১৯২৭-এ মথুরা, মুর্শিদাবাদ, পুরী ও ২৪ পরগণায়, ১৯২৮-এ ২৪ পরগণা, হাওড়ায়, ১৯৩২-এ বাঁকুড়া ও পুরীতে, ১৯৩৩-এ বাঁকুড়া, বীরভূম, যশোর, মানভূম, মুর্শিদাবাদ ও পুরীতে। ৬) বন্যাত্রাণ — ১৯২৩-এ বিহারের আরা, পাটনা, ১৯২৪-এ ভাগলপুর, বৃন্দাবন, ব্রিটিশ মালাবার, কোচিন, কোয়েমবাটুর, দেরাদুন, মথুরা, হৃষিকেশ, সাহারাণপুর, সালেম, তাঞ্জোর, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিচিরাপল্লীতে, ১৯২৬-এ আরাকান (ব্রহ্মদেশ), বোম্বাই, মাদ্রাজ, মেদিনীপুরে। ১৯২৭-এ বালেশ্বরে, ১৯২৯-এ কাছাড়, নওঁগা ও শ্রীহট্টে। ১৯৩০-এ মেদিনীপুর, ১৯৩১ এ ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাটনায় ১৯৩৩-এ কটক, চাঁদিপুর, পুরীতে। ১৯৩৪-এ নওদা, শ্রীহট্টে। ৭) কুম্ভমেলায় তীর্থযাত্রীদের সেবা — ১৯৩০-এ এলাহাবাদে।

স্বামী শিবানন্দের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন স্বামী অখন্ডানন্দ। তিনি ১৯৩৭ এর ৭ ফেব্রুয়ারি মহাসমাধিতে লীন হন। প্রায় ৩ বছর অধ্যক্ষ থাকাকালীন সুযোগ্যভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা করেছেন। তাঁর সময়ে মঠ ও মিশনের যে নতুন কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হল — ভারতবর্ষে চিঙ্গেলপট্টু, শিলং, মালদা, কানপুর। বর্হিভারতে ফ্রান্সে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার। তাঁর সময়ে লোককল্যাণে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে যে সেবা ও গণমুখীকার্য সংঘটিত হয়েছিল তা হল ১) কলেরা রোগীগ্রস্তদের মধ্যে সেবা — ১৯৩৫-এ মেদিনীপুরে। ২) ঝড়ঝঞ্ঝা বিধ্বস্তদের মধ্যে ত্রাণ — ১৯৩৪-এ ২৪ পরগণা ও মাদ্রাজের গুন্টুরে ৩) দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষজনের মধ্যে সেবা ও ত্রাণ — ১৯৩৫-এ বাঁকুড়া, বর্ধমান, শ্রীহট্টে, ১৯৩৬-এ বাঁকুড়া, বীরভূম, খুলনা ও মেদিনীপুরে ৪) অগ্নিবিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে সেবা ও ত্রাণ — ১৯৩৫-এ বীরভূম, মানভূম, ১৯৩৭-এ

পুরীতে ৫) বন্যাত্রাণ — ১৯৩৫-এ বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলিতে, ১৯৩৬-এ আরকান (ব্রহ্মদেশ), মালদা, কানপুর ১৯৩৭-এ কটক ও পুরীতে। অখণ্ডানন্দের পরিচয় শুধু এটুকু তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তিনি প্রথম 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্য নিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষজনের মধ্যে একাকী সেবা ও ত্রাণের কাজ শুরু করেছিলেন। সহযোগী হয়েছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন (স্বামী সুরেশ্বরানন্দ) রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণে ও উন্মেষ পর্বে সেই সেবা ও ত্রাণ কার্য ছিল দুর্নিবার চরমতম পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং সূচনা হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞ। এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় মেতে উঠবো। এই সেবা, ত্রাণকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের কাছে গড়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম স্থায়ী কেন্দ্র ঐ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

অখণ্ডানন্দের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। তাঁর কার্যকালের ব্যাপ্তি মাত্র একটি বছর। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন তা হল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ জানুয়ারী বেলুড় মঠে নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বমহিমায় 'নয়নাভিরাম' উজ্জ্বল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। তিনি বেশির ভাগ সময় এলাহাবাদ মঠে অতিবাহিত করতেন। নতুন মন্দির ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে তিনি মহাসমাধিতে লীন হন। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ্ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বর্তমান বেলুড়মঠের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য শিল্পে অনবদ্য শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে মিশনের যে ত্রাণ কার্যগুলি সংঘটিত হয়েছিল তা হল — ১) কলেরা রোগগ্রস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ ও সেবা — ১৯৩৮-এ আলমোড়ায়। ২) ঝড়-ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ ও সেবা — ১৯৩৮-এ ওড়িশার গঞ্জাম ও পুরীতে। ৩) অগ্নিবিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ ও সেবা — ১৯৩৮-এ বীরভূম ও মানভূমে। ৪) বন্যাত্রাণ — ১৯৩৮-এ ঢাকা ও ফরিদপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদে। তিনি অধ্যক্ষ থাকাকালীন কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কাল্চার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ব্রত ও কার্যপ্রণালী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের মধ্যে আর যিনি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন

স্বামী সারদানন্দ। শুধু পাশ্চাত্যে নয় ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি রামকৃষ্ণ এবং বেদান্ত ভাব প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি বাংলাদেশে বিশেষ প্রচার কার্যে অংশ নিয়েছিলেন। স্বামীজীর তিরোধানের পর সারদানন্দজী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন, আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি দুঃস্থ, অনাথ ছাত্রদের থাকা এবং পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিল। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন আমৃত্যু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমৃত্যু সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিচালনা এবং নতুন নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপনে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। জয়রামবাটীতে শ্রীমা সারদাদেবীর থাকাব ব্যবস্থা এবং কলকাতায় তাঁর থাকা শুধু নয় দেখভাল্ করার পুরো দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ১৯২৬-এর মহাসম্মেলনে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্মযোগী হিসেবে সারদানন্দজীকে চিহ্নিত করা হলে ভুল করা হবে। জ্ঞান, রাজ, ভক্তি ও কর্ম—এই চারযোগেব সমন্বয়ে তাঁব জীবন গঠিত হয়েছিল। স্বামীজীর 'পদানুগ' স্বামী সারদানন্দ মনে প্রাণে বিশ্বাস কবতেন প্রত্যেক আত্মা স্বরূপ-স্বাধীন। তাই তিনি কোন কর্মীর কর্মে বাধা দিতেন না। আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিয়ে দিতেন সকলকে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম পর্বে বিশাল কর্মযজ্ঞে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রজ্ঞা। আর এই দুয়ের সংযোগেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে বহুযোজন পথ অতিক্রম করে নিয়ে গেছেন এবং আরো পথ অতিক্রমণের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও মননের পরিচয় বহন করে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম প্রামাণ্য জীবনী এটি।

স্বামী যোগানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে বিশেষ ভাবিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ বিবেকানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ দুজনেই গ্রহণ করতেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে তাঁর মহাসমাধি ঘটায় মিশনের কোন বড কাজে তিনি অংশ না নিলেও তাঁর সুচিন্তিত অভিমতগুলি সবসময় গুরুত্ব পেত একথা আমাদের বলতেই হবে।

স্বামী প্রেমানন্দজী ছিলেন বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পুজো সুষ্ঠুভাবে যাতে অনুষ্ঠিত হয় সে দিকে তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি। তিনি ছিলেন ভক্তগত প্রাণ। ভক্তদের অসুবিধার কথা জানতে পারলে তার সমাধানে তিনি সবসময় এগিয়ে আসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসবের সময় তিনি ভক্তদের দাঁড়িয়ে থেকে প্রসাদ খাওয়াতেন। ভক্তদের তৃপ্তি করে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়া দেখে তাঁর মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতো। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারের জন্যে তিনি পূর্ববঙ্গের নানা জেলা পরিক্রমা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ববঙ্গের ভার স্বামী প্রেমানন্দের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৮—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বরিশাল, বিদগাঁ (বিক্রমপুর), কলমা, ঢাকা, রাড়িখাল, ময়নময়সিংহ, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ ছাড়া উত্তরবঙ্গের মালদায়ও তিনি প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। ১৯১৬তে প্রেমানন্দজী ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছিলেন নতুন গৃহ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য।

প্রেমানন্দজীর আবির্ভাব ভূমিতে দাঁড়িয়েই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অপর আট গুরুভায়ের সঙ্গে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর রাতে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সংসার ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আর এই ব্রত ছিল 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের জীবসেবার মাঝে প্রেমানন্দজীর ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অগ্নিদাহ এবং অন্যান্য সাধারণ জনহিতকর কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীগণ নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন মরণ অগ্রাহ্য করে ভারতের নানা প্রদেশে স্বামী প্রেমানন্দজীর স্নেহাশীস নিয়ে এবং তাঁরই নির্দেশে রুগ্ন আর্ত, অনশনক্লিষ্ট নররূপী নারায়ণের সেবায় ব্রতী হয়ে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেত। মঠে সাধু ব্রহ্মচারীর সংখ্যা প্রথমদিকে কম থাকায় প্রেমানন্দজী তাঁদের প্রায় সকলকে আর্ত-ত্রাণ—সেবা কাজে পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজেই মঠের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন। এই তথ্য আমরা জানতে পারি স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দের লেখা 'প্রেমানন্দ জীবন চরিত' থেকে (১৩৫৯, পৃষ্ঠা ২০৫—৬)।[৩] ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে যখন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধারণ সম্পাদক বেলুড় মঠে কর্মী সংগ্রহে এলে তত্ত্বাবধায়ক (ম্যানেজার) প্রেমানন্দজী সব সাধু কর্মচারীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে কে যাবে পূর্ববঙ্গে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষজনের সেবা করতে? শরৎ এসেছে।'[৪] তখন সকলেই যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রেমানন্দজী দশজন উদ্যোগী ও বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সারদানন্দজী সব দেখে মন্তব্য

করলেন—'মঠের বাইরের সেবার কাজের ভারও যখন বাবুরামদা নিয়েছেন তখন জানলেম স্বামীজীর কাজ ঠিকভাবে চলতে থাকবে। আমি নিশ্চিন্ত!'[৫] স্বামী প্রেমানন্দ আজ্ঞাবহ সেবকদের ত্রাণ-সেবা কার্যে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন না। তাঁদের ইহ-পারলৌকিক বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল সমান। চিঠি লিখে তিনি তাঁদের অনুপ্রাণিত করতেন। স্বামীজীর কথা স্মরণ করে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। জনৈক ভক্তসেবক-কর্মীকে তিনি লিখেছেন,—'তিনি পরম কল্যাণময়, আমরা মাটির খেলনা নিয়ে ভুলে আছি। কামিনীকাঞ্চন মান, ইজ্জত পেয়ে সব বিস্মরণ। তাই কৃপানিধান দয়া করে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে "বহুজনহিতায়"ও আনেন। শেখো, দেখে দেখে কেবল শিক্ষা করো। কেবলমাত্র দু মুঠো চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান নাই, পাঠিয়েছেন মহত্ত্ব ও দেবত্ব দেবার জন্য। উচ্চ মন, উদার মন কেমন করে লাভ করতে হবে শিখে নাও। এমন সুযোগ আর পাবে না। এ যুগের অবতার বলছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"—এ ভাব প্রত্যক্ষ কর; মানবজীবন ধন্য কর; স্বামীজীর কৃপায় আদর্শ জীবন লাভ কর। বুঝছো না আমরা কি এখানকার কর্তা? ভগবৎশক্তির বিকাশ এখানে। এই শক্তিবলে তোমরা এই সব কাজ করতে সমর্থ। জানো না কী, স্বামীজী লিখে গেছেন, তিনি সূক্ষ্ম দেহে এ সংঘের মধ্যে বর্তমান।' আর একজনকে লিখছেন, 'লোকহিতায়ে কাজ কর' তোমাদের কর্মপাশ কেটে যাবে, পরাভক্তি লাভ হবে, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে।... অনন্ত আকাশে লম্বা, লম্বা কল্পনা নিয়ে থাকলেই কি বড় হওয়া চলে। কবিত্ব ছেড়ে কাজে লেগে যাও। জীবন দেখাও, আদর্শ তো রয়েছে সামনে, ভয় কী? হও আগুয়ান, তোমরা লক্ষ্যস্থলে নিশ্চয় পৌঁছাবে, তোমাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবে।' আর একটি চিঠিতে লিখেছেন—'খুব খরচ করে যাও দানের জল জমানো ভাল নয়। প্রাণ খুলে সেবা কর।'[৬] স্বামী প্রেমানন্দের এই তিনটি চিঠির অংশবিশেষ পাঠ করে এবং রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর ভূমিকা স্মরণ করে আমরা বলতে পারি তিনি নিঃস্বার্থ সেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞান-সাধনা-ভক্তি—জনহিতকর কাজের অন্তরায় নয় একথাও জানিয়েছেন। ব্রহ্মানন্দজীর উক্তি প্রতিধ্বনিত করে সকলকে বলতেন—'তোমাদের কোটি কোটি তপস্যার কাজ হয়ে যাচ্ছে ঐ দরিদ্রনারায়ণের সেবায়।' কাজে স্নেহ, প্রীতি, প্রেম যেন মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে সেদিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ঐ কাজে তরুণের দল মেতে উঠবে

প্রাণ দেবে, এটাই ছিল তাঁর অভীপ্সা। বিহারের রাঁচী পরিভ্রমণ করে আদিবাসী সমাজের কল্যাণের বিষয়টি তাঁর মনে গ্রথিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই আদিবাসীদের কল্যাণে রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেকথা সকলেই আমরা জানি।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ বিদেশে রামকৃষ্ণ বেদান্ত ভাবাদর্শ প্রচারে বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। বিদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবাদর্শ প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাশ্চাত্য থেকে এদেশে ফিরলে একটি সাময়িক পত্র জানায়—' The return of Swami Abhedananda in 1906, to his motherland after his long stay in Europe and America created great enthusiasm throughout India. Every where people waited to welcome him and to express these deep apriciason of the novel work which he had accomplish in spreading the laughtly spirutual teaching of India through the western world. All who have read his books and followed his labours during this years cannot but admire his unselfish service to humanity...'[৭] তাঁর এই কাজ ছিল নিঃস্বার্থপর সেবারই তুল্য। ভারতে ফিরে তিনি কলকাতা, মহীশূর, হাওড়া, চন্দনগব, এলাহাবাদ, আগ্রা, আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে নানা বক্তৃতায় অংশ নিয়ে রামকৃষ্ণ ও বেদান্তের বাণী প্রচার করেছেন।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ। তিনি সকলের চেয়ে ছিলেন বয়সে বড়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথমবার পাশ্চাত্য পরিক্রমা করছেন তখন তিনি কাশীতে তপস্যারত ছিলেন। কাশী ত্যাগ করার কথা তিনি কোনদিনও ভাবতে পারতেন না। তবুও দেশে ফেরার পর স্বামীজীর আহ্বানে তিনি আলমবাজার মঠে এলেন। স্থানান্তরিত হয়ে যখন বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে মঠের নির্মাণকার্য শুরু হল তখন এই বৃদ্ধ তপস্বী—সকলের আদরের গোপালদা অর্থাৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ বেলুড় মঠ নির্মাণের কাজে বিশেষভাবে যুক্ত হলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তিনি। বেলুড়ের ঐ জমিতে আগে নৌকা ও জাহাজ সংস্কার হত বলে তখন তা ছিল বড়ই বন্ধুর এবং গৃহ নির্মাণের পক্ষে অনুপযুক্ত। স্বামী অদ্বৈতানন্দের প্রথম কর্তব্য হল শ্রমিকদের সাহায্যে ভূমি সমতল করা। তিনি এই কাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব প্রচারের ভিত্তি ও তপস্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এই কাজে তাঁর অত্যন্ত মনোনিবেশ লক্ষ্য করে অন্যান্য গুরুভাইয়েরা অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর একনিষ্ঠ পরিশ্রমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থায়ী রূপে গড়ে উঠেছিল। যা আজও বিদ্যমান। মঠের নতুন বাড়ির দেখভাল্ তিনিই করতেন। সেই সঙ্গে মঠের জমিতে সবজী বাগান ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। মঠ নির্মিত হলেও দৈনন্দিন অভাব তখনও ছিল যথেষ্ট। সেই খাদ্যাভাব থেকে উত্তরণের দায় বর্তেছিল অদ্বৈতানন্দজীর উপর। তাই অদ্ভুতানন্দজী তাঁর সম্পর্কে চমৎকার একটি উক্তি করেছেন, 'আরে, বুড়ো গোপালদা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের উপর তরকারী জুটত না।'[৮]

স্বামী অদ্ভুতানন্দজী ছিলেন অন্তর্মুখী। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দিনগুলিতে তিনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফিরে এসে কিছুদিন যোগোদ্যানে অতিবাহিত করেছিলেন। তারপর তিনি মঠ ছেড়ে 'বসুমতী' পত্রিকা দপ্তরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষজনের সঙ্গে মিশে শিবের স্পর্শ অনুভব করতেন। স্বামীজী তাঁকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে এসে ট্রাস্টী নিযুক্ত করে কাজের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি সম্মত হন নি। তবুও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজীর প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা আর ঠাকুরের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ।

স্বামী সুবোধানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের আরও একজন পার্ষদ। মিশনের কাজের ব্যাপ্তিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় একটি কথা উচ্চারণ করতেন—'মন করোনা কাজে হেলা; / সঙ্গী জোটে বা না জোটে—একাই কর মেলা।'[৯] ২১ আগস্ট ১৯২৫-এ লেখা একটি চিঠিতে মিশনের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে লিখছেন—'সৎকর্ম করিতে কখনো পিছ্পা হইবে না। ভাল কাজে বাধাবিঘ্ন অনেক। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কাজ করা ভাল। যাহার মন সন্দেহপূর্ণ তাহার দ্বারা ভাল কিছু হইবার আশা নাই।'[১০] স্বামী সুবোধানন্দ ব্যক্তিগতভাবে পরের দুঃখ মোচনে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। ১৯০৮—০৯ ওড়িশার চিলকায় দুর্ভিক্ষে তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ ও জ্ঞান ব্রহ্মচারীর সঙ্গে গিয়ে প্রাণপাত সেবা করেন। ফেরার পথে একটি দুঃস্থ বালককে সঙ্গে আনেন এবং কলকাতায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। পরে সে একজন চরিত্রবান মানুষ হয়ে ওঠে। বেলুড়ে একটি নিঃস্ব পরিবারকে নানা অর্থ ও দ্রব্য দিয়ে তিনি সাহায্য করতেন। আর্তের সেবায় তিনি ছিলেন উন্মুখ। পরের দুঃখে হতেন বিচলিত। অসুস্থ মানুষের

পাশে থেকে সেবা করেছেন বহুবার। বিশেষতঃ মঠ, মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীরা অসুস্থ হলে তিনি তাঁদের দেখভাল্ করতেন। একবার একটি যুবক বসন্তে আক্রান্ত হলে সবাই তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পাশে থেকে সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনজ্যোতিতে বিগলিত করুণার ন্যায় বিবেকানন্দ চিত্ত গোমুখ থেকে সত্য ধারায় প্রবাহিত। সেই পবিত্র ভাবগঙ্গা থেকে মঙ্গল কলস পূর্ণ করে রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গ স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদেরা বিশ্বমানবের মাঝে অনিবার শান্তি বারি সিঞ্চন করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদের ত্যাগ-তপস্যায়, তিতিক্ষায়, ভালবাসায়, দূরদৃষ্টিতে মমতায় এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতায় মিশনের কর্মের প্রসার হয়েছিল। মিশনের কর্মধারাকে তাঁরা সুদূর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। জগৎ-কল্যাণসাধন-যন্ত্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত অধ্যাত্ম শক্তি অবলম্বন করে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বিশ্ববাসীর জীবনধারাকে কল্যাণাভিমুখী করবার কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদেরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয় এবং প্রেরণাসঞ্চারীও বটে। সেই প্রেরণায় শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্ণ মিশন দেশে দেশান্তরে হয়ে উঠেছে বন্দিত এবং নন্দিত।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. ১৮ এপ্রিল ১৯০০তে মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত
২. সৎ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ, পৃ: ১৪৫
৩. প্রেমানন্দ জীবন চবিত, স্বামী ওঁকাবেশ্বরানন্দ, ১৩৫৯, পৃঃ ২৩৪—৬
৪. ঐ, ২০৫—৬, প্রকাশকাল-১৩৫৯, দেওঘর, বিহার
৫. ঐ, পৃঃ ২০৬
৬. ঐ, পৃ: ২০৭
৭. আমাব জীবনকথা-স্বামী অভেদানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৯৮৪, পৃ: ১৬১
৮. শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, ১ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ: ৫১১
৯. শ্রীবামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, ২য় খণ্ড, ১৩৬১, পৃঃ ৭৬
১০. ঐ, পৃঃ ৭৬

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-গৃহী পার্ষদদের ভূমিকা

আগে উল্লেখিত হয়েছে যে রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী ও গৃহী পার্ষদ-ভক্ত অনুরাগীদের মিলিত প্রতিষ্ঠান।

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে, রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য পূরণে রামকৃষ্ণের গৃহী পার্ষদ ভক্ত অনুরাগীদের ভূমিকা বর্ণোজ্জ্বল। আমরা সেদিকেই এবার দৃষ্টি ফেরাব। গৃহী পার্ষদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে তিনি হলেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রাণ পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের জীবনের রূপান্তরের কথা আমরা জানি। রামকৃষ্ণ ভাব প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। স্বামীজীর প্রথমবার পাশ্চাত্য পরিক্রমায়, তার আগে দীর্ঘ ভারত প্রব্রজ্যায় এবং প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের নানা স্থানে সংবর্ধনা গ্রহণ ও ভারতবাসীকে উজ্জীবনের মন্ত্র শোনাতে গিয়ে তাঁর শরীর ভেঙে পড়লো। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য প্রধানত স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রচেষ্টায় এবং অনুরোধে স্বামীজী দার্জিলিং-এ গেলেন কিছুদিন বিশ্রামের জন্য। সময়টা ১৮৯৭ এর মার্চ মাসের প্রথম পর্ব। স্বামীজী বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং এলেও নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া আলোচনায়, তাঁকে অংশ নিতে হতো। এই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন্দ, মি: গুডউইন, ডা: টার্নবুল, আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্য, সিংহারভেলু মুদালিয়ার এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার জন্যে দার্জিলিং-এ উপস্থিত ছিলেন। ঐ দার্জিলিং-এ অবস্থানকালীন এক আলোচনা সভায় গুরু ভাইদের উপস্থিতিতে দৃঢ় ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারের বিষয়টি আলোচিত হল। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় এই আলোচনা সভাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজী বুঝেছিলেন স্থায়ী

সংঘ ছাড়া রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যাবে না। গুরুভায়েরা স্বামীজীর সঙ্গে একমত হলেন। এই আলোচনা সভায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৭-এর ১ মে বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেও গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকে শিরোধার্য করে নিয়ে 'লোকশিক্ষা'র জন্য থিয়েটার করেছেন, নাটক লিখেছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে অর্থ যুগিয়েছেন এই থিয়েটার থেকেই এবং আমৃত্যু থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন।

নাটক ও নাট্যাভিনয় যেহেতু প্রায়োগিক শিল্প—তাই ভাবপ্রসারের দিক থেকে এটি একটি উপযুক্ত মাধ্যম। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে ও প্রচারে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের উপরই বিশেষভাবে ভর দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে প্রচলিত নাট্য সমালোচকেরা কয়েকটি নাটকের কথা উল্লেখ করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরিত্রের প্রতিফলনে সেগুলি রচিত বলে উল্লেখ করে থাকেন। গিরিশচন্দ্রের এই জাতীয় সব-কটি নাটকের কিরণ-রেখাগুলিকে একত্র করলে রামকৃষ্ণ-সূর্য বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের ধারণার কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যাবে, সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ নয়, গিরিশচন্দ্র তা নিজেই জানিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, কত না গভীর কথা তাঁর কানে জাগছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে, কিন্তু নাটকে তাদের প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে কোথাও আছে ঈশ্বর, উন্মত্ততা, ভক্তিবিহ্বলতা বা যোগসমাহিতি; কোথাও উচ্চ দার্শনিকতা কিংবা আশ্চর্য লোকপ্রজ্ঞা; বালগোপাল লীলার পাশে ঈশ্বরের পতিতপাবন রূপ; গুরুতত্ত্ব, শিষ্যভক্তি, লোকশিক্ষা, ত্যাগব্রত, সেবাধর্ম, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, সংসার ধর্ম, সংসার বিরাগ, জড় ও অধ্যাত্মবাদের সামঞ্জস্য, সাকার-নিরাকার—আরও অনেক কিছু। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে এ সবকিছুই গিরিশচন্দ্র দর্শন করেছিলেন। তাঁর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ কেবল 'কালাপাহাড়', 'মায়াবসান', 'পূর্ণচন্দ্র', 'নসীরাম, 'বিল্বমঙ্গল', প্রভৃতিতে নেই—আছেন 'নিমাই সন্ন্যাসে'র নিমাইয়ে, 'বুদ্ধদেব চরিতে'র বুদ্ধদেবে, 'শংকরাচার্যে'র শঙ্করে। কর্মবাদ নিরসনকারী বুদ্ধদেবও রামকৃষ্ণ, আবার ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎসাদনকারী বলে কথিত শংকরাচার্যও রামকৃষ্ণ।

সমন্বয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকাটি এখানে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্র যে প্রচলিত ভক্তির চোখে রামকৃষ্ণকে দেখেন নি—'শঙ্করাচার্য'

নাটকই তার চরম প্রমাণ। এই নাটকের উৎসর্গপত্রে গিরিশচন্দ্র পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন, —'দক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্তকে তিনি দর্শন করেছিলেন।' 'শংকরাচার্য' নাটকে বিবেকানন্দকেও পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অখণ্ড সত্য বিবেচনা করতেন। গিরিশচন্দ্র তা স্বীকারও করেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুপ্রাণনায় এই নাটকটি লেখা তাও জানিয়েছেন। সমকালের মননশীল-প্রাজ্ঞজনেরা সবিস্ময়ে সেদিন ভেবেছিলেন—শংকরাচার্যের প্রচলিত জীবনের কাঠামোর মধ্যে অতখানি বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা গিরিশচন্দ্র কিভাবে আবিষ্কার করলেন—কোন্ শক্তিতেই বা তিনি কঠিন বেদান্তকে লোকগ্রাহ্য করতে পারলেন! এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছিল 'বেঙ্গলী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও। জ্ঞান ও কর্মের সংযুক্তিতে গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রচলিত অর্থে ভক্তির সরোবরে ডোবান নি, তিনি তাঁকে চৈতন্যময় করেছিলেন।

চৈতন্যের সম্প্রসারণে মানুষের জীবনকে সহস্র আলোর দীপনে উদ্ভাসিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রসারে চৈতন্যের সম্প্রসারণই বড় কথা। বিবেকানন্দও তাই মনে করতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন—১. তা হল, 'যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের মর্ম বুঝিতে চান... বিবেকানন্দের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহাকে সম্মুখে রাখিতে হইবে।' ২. 'কেহ কেহ... পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম।' গিরিশচন্দ্র এই দুটি উজ্জ্বল উক্তির মধ্য দিয়ে এই সত্যে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন যে বিবেকানন্দের কর্ম-দর্শন অতি অবশ্যই রামকৃষ্ণ-ভাবানুগত।[১]

গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিতে প্রবন্ধ রচনার জন্য কলম ধরেছিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ আক্রান্ত হয়েছিল খ্রীষ্টান যাজকদের দ্বারা। আক্রমণের বন্যা বয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দের কর্মপন্থার বিরুদ্ধে। বিবেকানন্দ অন্ধ তমোনিশা থেকে উত্তরণের রাঙা পথটি এ দেশের সামনে মেলে ধরেও প্রচণ্ডভাবে যখন আক্রান্ত হন, তখন গিরিশচন্দ্র ভবিতব্যের 'পোড়ো মানসিকতা' লক্ষ্য করে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন,—'নিন্দুক এক আশ্চর্য সৃষ্টি; বোধহয় সকল মহাকার্যেই তাহাদের প্রয়োজন।'

রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী—উভয় মহলেই সমালোচিত হয়েছে বিবেকানন্দের দুই অবদান—সেবাব্রত এবং সন্ন্যাসী সংঘ। গিরিশচন্দ্র ঐ

দুই মহলেরই মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর সেই প্রয়াসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। বিবেকানন্দের পক্ষ সমর্থনে গিরিশচন্দ্রের পল্লবিত প্রয়াস থেকে বোঝা যায় যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কিভাবে বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। 'বিবেকানন্দের সাধনফল' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের সেবাধর্মের উৎকৃষ্ট চরিত্রব্যাখ্যা আছে। এই সেবার সামাজিক ফল হল জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেবাধর্মের মূলগত অন্বয়—চেতনার রূপ গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছেন বিবেকানন্দের জীবন থেকে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। একই সঙ্গে দেখিয়েছেন যে—এই সেবা প্রচলিত 'ফিলানথ্রপি' নয়, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—এই সেবা উপাসনারই অঙ্গ। কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম এবং সেবাশ্রম পাশাপাশি অবস্থিত। এই বিষয়টি গিরিশচন্দ্রের কাছে প্রতীক রূপে উপস্থিত। অদ্বৈত আশ্রমে যার তত্ত্বসাধনা, সেবাশ্রমে তার কর্ম—পরিণতি। 'বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ' প্রবন্ধেও গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দের সেবাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উৎস মুখ রামকৃষ্ণে পৌঁছেছেন। সেবার দ্বারাই এই নানা ধর্মের দেশে ভাবৈক্য স্থাপন সম্ভব। গিরিশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের মূলে আছে রামকৃষ্ণের সমন্বয় সাধনের ভাবাদর্শ। সেবার প্রধান কথা প্রেম আর বিবেকানন্দের প্রধান 'সম্পত্তি'ও প্রেম। তারই অধিকার তিনি দিয়ে গিয়েছেন বঙ্গীয় যুবকদের। গিরিশচন্দ্রের আবেগদীপ্ত অভিমত এটি। 'রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী' প্রবন্ধটি মিশন সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অনুচিত সমালোচনার প্রচণ্ড প্রতিরোধ। যারা "জামা জুতা পরা সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করে, তারা জামা জুতাই দেখেছে—দেখেনি মৃত্যুশ্মশানে সন্ন্যাসীদের সেবাকে (প্লেগ সেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন)। ভারতবর্ষের নানা স্থানে... এই সন্ন্যাসী দল শিক্ষাদান, অন্নদান, রুগ্ন-সেবা প্রভৃতি কঠোর সন্ন্যাসব্রত সাধনে রত আছেন"—এহেন সন্ন্যাসীদের পর্বত গুহায় প্রেরণ করলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হবে না কোনভাবেই, কোন পথেই—একথা জানাতে গিরিশচন্দ্র ভোলেন নি। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শ' প্রবন্ধেও সেবাধর্মের কথা আছে। এই প্রবন্ধটিতে 'কর্ম' বিষয়ে কিছু গভীর উক্তি পাই। রামকৃষ্ণ অনুরাগীরা সর্বোচ্চ কর্মাদর্শকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন, নিষ্কাম মনোভঙ্গি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গিরিশচন্দ্র তার উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন। উল্লেখিত প্রবন্ধগুলিতে গিরিশচন্দ্র 'জগদ্ব্যাপী' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন। রামকৃষ্ণের ভাবশিষ্য-অনুরাগীদের কাছে বিস্তারচেতনার ও বিশ্বচেতনার সূচক ঐ শব্দটি।

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে গিরিশচন্দ্রের বড় অবদান তিনটি—১. তাঁর হাত ধরেই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা 'নাটক'-এ প্রবেশ করেছিলেন। নাটক, রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় এই তিনের সমন্বয়েই 'নাটক' প্রায়োগিক শিল্প রূপে জনমানসে বিশেষ প্রভাব সঞ্চারিত করে। গিরিশচন্দ্র ও সমকালীন নাট্যকারদের রচিত নাটকে, গিরিশ অনুগামী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী মন ও বাংলা সাহিত্য গভীরভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় আন্দোলিত হয়েছে এবং সেই ধারা আজও অব্যাহত। ২. গিরিশচন্দ্র রচিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ মিশন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি একদিকে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে বড় মাপের ভূমিকা নিয়েছে অন্যদিকে বিরোধী সমালোচকদের যোগ্য জবাব রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। ৩. স্বামী ব্রহ্মানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বেলুড় মঠে গঙ্গার পার বাঁধানোর কাজে, পুরসভার কর মেটানোর জন্যে বা বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রের সম্প্রসারণের জন্য যখন অর্থাভাবে ঋণগ্রস্ত হয়েছেন তখন গিরিশচন্দ্র বিশেষ নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের অনেকটাই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ সর্বোপরি শ্রীমা সারদাদেবী 'পতিতপাবন' শ্রীরামকৃষ্ণের নাট্যাভিনেতা-অভিনেতৃদের 'অহেতুকী কৃপা' ধারা টগর প্রাণের উষ্ণতা নিয়ে অব্যাহত রেখেছিলেন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, বারাঙ্গনা পল্লী থেকে আগত তারাসুন্দরীদেবীর 'আত্মকথা' এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

॥ ২ ॥

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে উল্লেখযোগ্য অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 'মাষ্টার মহাশয়' নামেই তিনি সর্বজন পরিচিত। পাণ্ডিত্য, মেধা, মনন ও প্রজ্ঞায় মহেন্দ্রনাথ ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সাংসারিক জীবনের অভিঘাত তাঁর জীবনকে ঘন তমিস্রায় পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। বেঁচে থাকার ন্যূনতম পথটিও যখন চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে, তখন নিজের হাতে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন—আত্মহত্যা মহাপাপ জেনেও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারী নিকট আত্মীয় সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হলেন। প্রথম সাক্ষাতেই অভিভূত মহেন্দ্রনাথ। এই সাক্ষাতেই তাঁর আত্মহত্যার অভীপ্সা সঙ্গমা-চুমকীর মতো খসে পড়ল। বসন্তের প্রচ্ছায়ায়, বসন্তেরই রাজা'র (শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বসন্তকালে)

সান্নিধ্যে মহেন্দ্রনাথ পেলেন নতুন জীবন, বেঁচে ওঠার-বেঁচে থাকার জন্য নবীন পথের সন্ধান। কান্ট, হেগেল, হার্বার্ট স্পেনসার পড়া মহেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের অভিমান স্বল্প পরিসরেই দূরে সরিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পাণ্ডিত্যের অভিমান ঘুচে যাবার পর, নতুন ভাবে মুকুলিত বসন্তের নির্যাস বুকে নিয়ে রূপান্তরিত মহেন্দ্রনাথ নতুনভাবে বেঁচে উঠে চার বছর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে অতিবাহিত করে যে 'অমৃতকথা' তন্নিষ্ঠভাবে ডায়েরিতে লিখে রাখলেন তাই পাঁচটি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'রূপে প্রকাশিত হল। এই কথামৃতকে শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা এবং তা পূর্ণায়তভাবেই—এই স্বীকৃতি দিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের ভূমিকা দেশে-দেশান্তরে সর্বজনবিদিত এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। আজও তা অম্লান এবং প্রবহমান। তাই আজ পৃথিবীতে 'বেষ্ট সেলার' অর্থাৎ সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থের শিরোপা পেয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। ১৮৯৭-এ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বছরে দিনলিপি অবলম্বনে ছাপার অক্ষরে 'Gospel of Sri Ramakrishna' প্রকাশিত হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে স্বামী বিবেকানন্দ সহ অন্যান্য পার্ষদেরা অকুণ্ঠ প্রশংসা জানিয়েছিলেন এবং বিস্তৃত ভাবে গ্রন্থ রচনার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' কোটি কোটি মানুষের তপ্ত জীবনে শান্তির বারি সিঞ্চন করে চলেছে। মহেন্দ্রনাথ বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার পর অর্থ সাহায্য করেছেন। স্বামীজীর মা ভুবনেশ্বরীদেবীকে গোপনে সকলের অগোচরে মাঝে মাঝেই অর্থ পৌঁছে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের সংশয় ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে কাশী গিয়ে, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (Home of Service) 'বিরাটের উপাসনা মন্দির' দর্শনে এবং শ্রীমা সারদাদেবীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' উপল অনুমোদনে সংশয় ঘুচেছিল মহেন্দ্রনাথের। তাইতো দেখি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের নীচে গহীন রাতে ফুটপথবাসী 'সচল শিবদের' নৈশ যাপনে সঙ্গী হতে মহেন্দ্রনাথকে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকে যিনি বাণীরূপ দিয়েছেন, তিনি সেই কথার তাৎপর্য অনুধাবনে মন আর মুখকে এক করে নিতে চেয়েছেন এইভাবেই।

॥ ৩ ॥

গিরিশচন্দ্রের জীবনের রূপান্তর, মহেন্দ্রনাথের মধ্যে নবজীবনের প্রাণোচ্ছলতা প্রবাহিত করে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নজির স্থাপন করেছিলেন।

যুগধর্মের সংস্থাপনে এমন কত শত নজিরইতো তাঁকে গড়তে হয়েছে। এ একাধারে তাঁর মহিমা ও লীলা। মদ্যপ, অস্থির চিত্তের অধিকারী, সাংসারিক জীবন নির্বাহে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত-ধিকৃত আত্মহত্যার জন্য উদ্বেলিত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে সংসার জীবনের স্বতোচ্ছল পথে সাবলীলভাবে চালিত করার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন যাদুকাঠির সাহায্য নেন নি। আপন অস্তিত্বে আর অপার মহিমায় সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথের মতো রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে প্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ, ভূমিকা ছিল না সুরেন্দ্রনাথের,—যা ছিল তা অপ্রকাশ্যে, অপ্রত্যক্ষে, নেপথ্যে।

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। অপ্রকাশ্যে, অপ্রত্যক্ষে, নেপথ্যে থেকে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে কয়েকটি ঘটনার কথা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে। সূত্রাকারে সাজালে তা দাঁড়াবে,—১. দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর অবস্থান কালে সকল ভক্ত-শিষ্যের, বিশেষতঃ যুবক শিষ্যদের রাতের খাবারের সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এজন্য মাসিক ১০ টাকা বরাদ্দ ছিল। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম প্রমুখ ত্যাগী পার্ষদেরা স্ব-স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন না 'রসদদার' সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-পবিত্র সঙ্গ করার সুযোগ পেয়েছেন সন্ন্যাসী পার্ষদেরা দিনে-রাতে, অহরহ। শ্রীরামকৃষ্ণের বকলমায় নিরন্তর রসদ যুগিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। ২. কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকার সবার্থেই ঐতিহাসিক এবং ভারতবর্ষ তথা তামাম বিশ্বের রুদ্ধ মানবিকতার শৃঙ্খল মুক্তি এবং অধ্যাত্ম সাধনার নবায়নও। ৩. কাশীপুর উদ্যানবাটীর ভাড়া মাসিক ৮০ টাকা মেটানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ডষ্ট কোম্পানীর মুৎসদ্দী সুরেন্দ্রনাথ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণ সংঘ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বড় মাপের ভূমিকা নিয়েছিলেন নেপথ্যে। ঐ কাশীপুর উদ্যানবাটীতেইতো শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছেন, ঘর ছাড়া যুবকদের ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বসন তুলে দিয়েছেন, 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপনে উদ্যোগী করে তুলেছেন, ত্যাগী যুবকদের সেই সংঘের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন শ্রীমা সারদাদেবীকে আর 'পতিতপাবন' যুগাবতার তাপিত-ক্ষুধিত-ব্যথিত- শোষিত-অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী-অবিবেকী- আত্মজ্ঞানশূন্য মানুষের তপ্ত বিষ কণ্ঠে ধারণের

মধ্য দিয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে লীলা সংবরণে 'সত্যযুগে'র (নতুনযুগের) প্রবর্তন করেছেন। ৪. রামকৃষ্ণ মঠ ১৮৮৬'র ১৯ অক্টোবর বরাহনগরে প্রতিষ্ঠার পর বাড়িভাড়া মেটানোর দায়িত্ব বহন করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয় সন্ন্যাসী পার্ষদদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছেন। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে প্রতিমাসে আমৃত্যু দান করে গেছেন। বরাহনগর মঠের পত্তন না হলে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন প্রসারিত হতে পারতো না; বরাহনগর থেকে আলমবাজার হয়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি ছুঁয়ে বর্তমান বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্রও গড়ে উঠতে পারতো না। তাই রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে সুরেন্দ্রনাথের বহুমুখী অবদান নৈঃশব্দের তর্জনীতে যেভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে তা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কথামৃতকার শ্রীম রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অবদান নির্ণয় করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন,—'ধন্য সুরেন্দ্র। এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়া। তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। ...ভাই তোমার ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে—আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।'[২] ৫. ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে প্রথম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই প্রথম জন্মোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮২তে দ্বিতীয় জন্মোৎসবের ব্যয়ভারও পুরোটাই বহন করেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ থেকে অন্যান্য ভক্তগণ এই ব্যয়ভার বহনে এগিয়ে আসেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব তিথি প্রথম উদ্‌যাপনে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাও এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। ৬. বেলুড় মঠ নির্মাণে সুরেন্দ্রনাথ বহু আগে সর্বপ্রথম একহাজার টাকা দিয়েছিলেন এবং আরো টাকা দেবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে, সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি। স্বামীজী এই কথা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।[৩] রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষ পূর্তির মুহূর্তে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অক্ষয় কীর্তির কথা আমরা যথোচিত ভাবে স্মরণ করবো।

॥ ৪ ॥

রামচন্দ্র দত্ত প্রথম জীবনে ছিলেন প্রচণ্ড ঈশ্বর বিশ্বাসী। মধ্য জীবনে চিকিৎসাবিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে, রাসায়নিক পদার্থ নিত্য নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়ে

আমাশার প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন কুর্চি গাছের ছাল থেকে। ওষুধটির নাম 'কুর্চিসিন'। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে এই মধ্য বয়সে হয়ে পড়লেন নাস্তিক—ঈশ্বরের প্রতি দেখা দিল বীতরাগ। তাঁর 'প্রাণসম' এক কন্যার অকালমৃত্যুতে সম্বিত ফিরে পেলেন। ব্যথিত প্রাণে শান্তির প্রলেপ দেওয়ার জন্যে সাধু সঙ্গের জন্য অন্বিষ্ট রামচন্দ্র কেশবচন্দ্রের সূত্র ধরে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে। তারপরই জীবনের রূপান্তর ঘটল। রামচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন এবং অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদের ভূমিকায় সকলে তাঁকে প্রত্যক্ষ করলেন। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে রামচন্দ্রের অবদানও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর তাঁর পূত চিতাভস্ম রাখার উপযুক্ত স্থায়ী কোনো আবাস না থাকায় রামচন্দ্র পূর্ব কলকাতায় তাঁর নিজস্ব উদ্যানবাটীতে সেই পবিত্র চিতাভস্মপূর্ণ কলসীটি রাখার সুব্যবস্থা করেন। এই সংরক্ষিত চিতাভস্মপূর্ণ কলসীটি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণের পর স্থানান্তরিত হয়। পবিত্র চিতাভস্মের খানিকটা রামচন্দ্রের উদ্যানবাটীতে রেখে দিয়ে সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মন্দির। পরবর্তীকালে ঐ মন্দির সংলগ্ন উদ্যানবাটীতে রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠের পত্তন। বর্তমানে তা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

রামচন্দ্র দত্ত তাঁর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চিতাভস্ম যথোচিতভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন বলেই, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠে সেই পবিত্র চিতাভস্মের উপরেই নির্মিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পীঠস্থান—সার্বজনীন উপাসনালয় রামকৃষ্ণ মন্দির। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারের ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের এবং এই আন্তর্জাতিক পীঠস্থান রামকৃষ্ণ মন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম। রামচন্দ্র রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে আরো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজ করেছিলেন। ১. ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্টার, সিটি ও মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে মোট আঠারোটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও বাণী মানবকল্যাণে, সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরার কাজটি রামচন্দ্র দত্তই প্রথম করেছিলেন। ২. শারীরিক অসুস্থতায় যখন তিনি শয্যাশায়ী তখন মনের জোরে 'তত্ত্বমঞ্জরী', 'সখা', 'বেদব্যাস'—পত্রিকায় নিয়মিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে চললেন। উদ্দেশ্য একটাই—মানবকল্যাণে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসার। ৩. রামচন্দ্র 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থটি রচনা করে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে একটি

স্বতন্ত্র মাত্রা যুক্ত করেন। সম্ভবত এই গ্রন্থটিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনীগ্রন্থ। তাঁর 'লীলামৃত' গ্রন্থটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

লীলাসংবরণের অল্পকিছুদিন আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্ত-পার্ষদদের সামনে বলেছিলেন, —'দেখ, আমি মাকে বলেছিলাম যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না; রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ... এদের একটু শক্তি দে—এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব।'[৪] শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র 'চাপরাশ' পেয়েছিলেন, তাই মানবকল্যাণে রামকৃষ্ণ মহিমা অবলীলাক্রমে প্রচার করে গেছেন।

॥ ৫ ॥

বলরাম বসু ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বা রামচন্দ্রের মতো বলরামের জীবনের রূপান্তর ঘটাতে হয় নি শ্রীরামকৃষ্ণকে। বরং বলা যায় বলরাম তাঁর 'চির চেনা জন'। শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যভাবে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আগেই দর্শন করেছিলেন। বলরামের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। নিষ্ঠাবান ভক্ত বলরাম ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছের মানুষ। শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী বলরামের কলকাতার বাড়ি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 'দ্বিতীয় কেল্লা'। শুধু কলকাতার বাড়ি নয়, পুরী ও বৃন্দাবনে অবস্থিত বলরামের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং সন্ন্যাসী পার্ষদেরা নানা সময়ে থেকেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রকাশের অন্যতম স্থান হল বলরামের কলকাতার বাড়ি। এই বাড়িতে তিনি বহুবার এসেছেন, কীর্তন করেছেন, ভাবসমাহিত হয়েছেন, খেয়েছেন। তাঁর এই দ্বিতীয় কেল্লায় ১৮৯৭-এর ১ মে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনে, ভাবপ্রসারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। আজও সেই গুরুত্ব একটুও ফিকে হয়ে যায় নি। বরং কালান্তরে একাধারে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। এই বাড়িতে শ্রীমা থেকেছেন, সন্ন্যাসী পার্ষদেরা থেকেছেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই বাড়িতেই গৃহীত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বাড়িতেই রথযাত্রার দিন রথ টেনে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সেই রথ আজও বর্তমান। শ্রীরামকৃষ্ণের রসদদার বলরামের নাম রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

॥ ৬ ॥

স্বামীজী ১৮৯৪-এ শিকাগো থেকে লেখা একটি চিঠিতে প্রশ্ন করছেন 'গৌর-মা কোথা? একহাজার গৌর-মার দরকার—ঐ Noble Stirring Spirit [মহতী ও চেতনাদায়ী শক্তি]।'[৫] স্বামীজীর এই মন্তব্যেই গৌরী-মার স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর আদরের গৌরদাসী ছিলেন গৌরাঙ্গগত-প্রাণা। শ্রীচৈতন্যের নামে তাঁর অবিরত অশ্রু ঝরত। তিনিই প্রথম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য—এই দুয়ে অভেদ।' সাধন-ভজন-তীর্থ পর্যটনে যখন তাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছিল তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে বললেন যে সাধন-ভজন-তীর্থপর্যটন অনেক হয়েছে এবার কাজে লাগ। আরো বললেন, 'আমি জল ঢালছি তুই কাদা চটকাবি।' এদেশে অবহেলিত নারী শক্তির জাগরণের যে মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশাকারে দিলেন তারই ফলশ্রুতি শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম। ১৩০১ বঙ্গাব্দে বারাকপুরে গঙ্গার তীরে যার প্রতিষ্ঠা ১৩১৮'য় কলকাতার গোয়াবাগানে তার স্থানান্তর এক ভাড়া বাড়িতে। ১৩৩০-এ বর্তমান নিজস্ব জমিতে সারদেশ্বরী আশ্রম প্রাণবন্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময়ে আশ্রমবাসিনী নারীর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ এবং বিদ্যালয়ে দৈনিক ছাত্রী সংখ্যা ছিল তিনশো। সহায়-সম্পদহীনা সন্ন্যাসিনীর পক্ষে এই সাফল্য সে সময়ে সহজ ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি, শ্রীমার আশীর্বাদ আর গৌরীমার অপরিমেয় সাধনায় এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। স্বামীজীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তা আমরা বুঝতে পারি। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে গৌরীমার এই আন্তরিক উদ্যোগকে শ্রীমা সারদাদেবী আশীর্বাদ জানিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি যে উসকে দেবে তার স্থান বৈকুণ্ঠে। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা গৌরীমা শ্রীরামকৃষ্ণর অভীপ্সা পূর্ণ করেছেন। তাইতো হাজারো বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি হয়েছে বিশ্বাসভরে, প্রত্যয়ের সঙ্গে গৌরী মা বলতে পেরেছেন,—'যিনি কাজে নাবিয়েছেন তিনিই চালিয়ে নেবেন। এতে বাধাবিঘ্ন এলেও আমার কোনো দুঃখ নেই, প্রশংসা পেলেও তাতে আমার নিজের কিছু কেরামতি নেই।'[৬] রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে গৌরীমা প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রম আজ শতবর্ষ অতিক্রম করে মহীরুহে পরিণত।

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে আরো অনেক গৃহী পুরুষ ও নারী ভক্ত-অনুরাগী পার্ষদ ছোট-বড় ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁদের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা না করেও তাঁদের অবদানের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে আমরা স্মরণ করছি। রামকৃষ্ণ

ভাবপ্রসারে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নন্দিত এবং বন্দিত। শতবর্ষ পূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা এই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর প্রেক্ষাপটটি প্রত্যক্ষ করলাম ইতিহাসের নিরিখে। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে একশো বছর আগে ভক্ত-অনুরাগী গৃহী পার্ষদদেব ভূমিকাটি ছিল বর্ণবিভায় উজ্জ্বল। একশো বছর পরেও সেই উজ্জ্বলতা একটুও কমেনি বরং তা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বলতব এবং পল্লবিত।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. 'শ্রীবামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' এবং 'শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবেব সহিত স্বামী বিবেকানন্দেব সম্বন্ধ' —প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।

২. শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য ভাগ, পবিশিষ্ট, ১ম পবিচ্ছেদ।

৩. পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ৬৭ পৃঃ, ১ম সংস্কবণ

৪. শ্রীবামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, ২য় খণ্ড, স্বামী গম্ভীবানন্দ, ১৩৮০, পৃঃ ৩০৯

৫. পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্কবণ ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা ১৩৮, পৃঃ ২৪৮

৬. শ্রীবামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, ২য খণ্ড, পৃঃ ৪৯৫

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অনুরাগীদের ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকায় গিয়ে (১৮৯৩) শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় যে আলোড়ন তুলেছিলেন তার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল পাশ্চাত্যের নানা দেশে। তাই বিবেকানন্দের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন বেশ কয়েকজন আমেরিকা ও ইউরোপের অধিবাসী। আমেরিকার বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ বিবেকানন্দকে এই ধর্ম্মমহাসভায় যোগ দেবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের খ্যাতি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিশেষত আমেরিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর অনুরাগীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমরা যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে পারি তাঁরা হলেন,—মিস্টার ও মিসেস হেল, মিস্টার ও মিসেস লেগেট, কেন্ট স্যানবরণ, জন হেনরী রাইট, মিসেস ওলিবুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, ই. টি. স্টার্ডি, লিয়োঁ ল্যাণ্ডসবার্গ, ইন্ডা আনসেল, মিসেস বাগলি, মিস হেনরিয়েটা মূলার প্রমুখ। এ ছাড়া আর যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের অনুরাগী হয়ে ভারতের জন্য আত্মদান করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন মিস মার্গারেট নোবেল (পরবর্তীকালে যিনি নিবেদিতা নামে খ্যাত), সিস্টার ক্রিস্টিন, জে. জে. গুডউইন, মিস্টার এ্যান্ড মিসেস সেভিয়ার প্রমুখ।

॥ ২ ॥

প্রথমেই আমাদের স্মরণ করতে হবে নিবেদিতার কথা। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন,—'ভারতবর্ষে হাজার হাজার নর-নারী প্রতীক্ষা

করে রয়েছে। পশ্চিমের এক নারী যদি তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, তাদের পথ দেখিয়ে দেয় তবে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে।'[১] পশ্চিমের সেই নারী হলেন নিবেদিতা।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুন, লণ্ডন থেকে বিবেকানন্দ লিখছেন নিবেদিতাকে, 'তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরো অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম।'[২] প্রথম সাক্ষাতেই বিবেকানন্দ নিবেদিতার অন্তর্গত সত্তার স্বরূপটি অনুভব করেছেন। নিবেদিতার মধ্যে একটা সংশয় ছিল, ছিল জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা। তাই নিবেদিতা খানিকটা চঞ্চল, খানিকটা অস্থির। স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায় নি তা! তাই ঐ চিঠিতে শেষের দিকে স্বামীজী আরো লিখলেন—'হে মহাপ্রাণ ওঠ, জাগো, জগৎ পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ আছে?' স্বামী বিবেকানন্দ বড় কাজের জন্য নিবেদিতাকে তৈরী করছিলেন। সমস্ত মোহ মুক্তির অবসানে, সমস্ত সংশয়ের নিরসনে স্বামীজী নিবেদিতাকে সজোরে নাড়া দিচ্ছেন, 'ওঠো জাগো।' কাজের সূচনা, কাজের ব্যাপ্তি, কাজের সাংগঠনিক ভূমিকা সম্পর্কে তাই উল্লেখ করলেন, 'আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্যসাধন করে। আমি শুধু বলি ওঠো জাগো।' এই চিঠিরই প্রথম অংশে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে জগৎ-সংসারের ছবিটি তুলে ধরে বোঝাতে চাইলেন মানুষের জীবনের নৈরাশ্য কোথায়। ধর্মীয় নৈরাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চাইলেন। আর তাই লিখলেন,—'আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই—মানুষের কাছে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

'কুসংস্কারের শৃঙ্খলে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত—সে নর বা নারীর হোক, তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়নকারী, সে আমার আরও বেশী করুণার পাত্র।

'এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে

আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন "বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়" আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধেব আবির্ভাব প্রয়োজন।

'জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মত শক্তিশালী করে তুলবে।

'এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত।'

পুরো চিঠিটি আমরা তুলে ধরলাম। তার কারণ চিঠিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; গুরুত্বপূর্ণ যেমন নিবেদিতার কাছে, তেমনি বিবেকানন্দেব কাছেও। চিঠিটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে ধবা পড়েছে নিবেদিতাব জিজ্ঞাসার উত্তর। নিবেদিতা অস্থির চিত্তে এই আত্মজিজ্ঞাসা—সংশয়ের মধ্যে ডুঁবে ছিলেন। কি করবেন, জীবনটাকে কোন খাতে প্রবাহিত কববেন, ধর্মের স্বরূপটিই বা কি? এসব প্রশ্ন তাঁকে আলোড়িত করছিল। বিবেকানন্দ তাঁর সবটা কি বুঝতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই পেরেছিলেন, তাই প্রতিটি শব্দকে বিশেষভাবে বাক্যবন্দী করে নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সূত্রাকারে আমরা কয়েকটি শব্দকে ও বাক্যকে আলাদা কবে নিতে চাই গুরুত্বটাকে বিশেষভাবে বোঝবার জন্যে—ক) সর্বকার্যে সেই দেবত্বের বিকাশের পন্থাকে নির্ধারণ করে দিতে হবে। খ) কুসংস্কাবের শৃঙ্খলে এই সংসাব আবদ্ধ। গ) জগতকে আলো দেবে কে? ঘ) আত্মবিসর্জন। ঙ) অজস্র প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন। চ) জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন চরিত্র। ছ) জগৎ এখন তাঁদের চায় যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থশূন্য। জ) এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয নিশ্চিত। ঝ) তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে। ঞ) হে মহাপ্রাণ; ওঠ জাগো! জগৎ পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? —এই সমস্ত শব্দ-বাক্য আমাদের মধ্যে বিদ্যুতের সঞ্চার ঘটায়। আর নিবেদিতার জড়তা মোচনে, তাঁর ভিতর যে শক্তি আছে তার সচেতনে, জগৎ আলোড়নে প্রেমময়ী, স্বার্থশূন্য হয়ে আত্মবিসর্জনে,বিবেকানন্দ একটা বড় রকমের ধাক্কা দিলেন, নাড়িয়ে দিলেন নিবেদিতার সত্তাকে। এই জড়তা সংশয়াচ্ছন্নতাকে বিবেকানন্দ তাঁর অনুভব শক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। আর তা পেরেছিলেন প্রথম সাক্ষাতেই।

প্রথম সাক্ষাতের আগে নিবেদিতার মনের অবস্থা কেমন ছিল তার ছবিটি আমরা প্রত্যক্ষ করে নিতে চাই প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাজীর বর্ণনা থেকে—'স্বামীজীর সহিত পরিচয়ের পূর্বে বহির্জীবনে মার্গারেট যে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চিত্তকে পূর্ণ করিতে পারে নাই। সংশয় ও দ্বন্দ্ব তাঁহার অন্তর রাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বাল্যকালে ধর্মের প্রতি তাঁহার যে সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল, যৌবনের প্রখর বিচার বুদ্ধি ও সংশয়ের নিকট তাহার পরাজয় ঘটিয়াছিল।'[৩] এই শুরু, তারপর তা আরও আকারে প্রকারে বেড়েছে—'অতঃপর মার্গারেট ইংলণ্ডের ব্রডচার্চ স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু ইহার মতবাদও আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিল না। এখানে শুধু শুষ্কনীতির ব্যাখ্যা। ভক্তহৃদয় সুলভ আকুল আবেগের অভাবে ধর্মানুষ্ঠানগুলি প্রাণহীন। উপরন্তু এখানে ছিল মানবতার প্রতি বিদ্বেষ। আর অপর ধর্ম মাত্রই কুসংস্কার অথবা অজ্ঞানমূলক বলিয়া প্রচণ্ড অবজ্ঞার। মার্গারেটের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা অপরিপূর্ণ রহিয়া গেল।'[৪]

নিবেদিতার বিচারশক্তি, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা সে সময়ে লক্ষ্য করে অলডাক্স হাক্সলি প্রমুখ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী মানুষেরা অবাক হয়েছিলেন। আমরা জানি যে যত যুক্তিবাদী তাহার সংশয়ও তত প্রবল। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তাঁর চিন্তাশক্তি এতটা পরিণত হয়েছিল যে যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগল।

এর পরের দৃশ্যটি মুক্তিপ্রাণাজী বর্ণনা করেছেন—'ক্রমে মার্গারেট গীর্জায় যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। প্রাণহীন, শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও সময়ে সময়ে মানসিক যন্ত্রণার তীব্রতা ও নৈরাশ্য যখন হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া তুলিত, তখন অভ্যাস বশতঃ তিনি আবার গীর্জায় ছুটিয়া যাইতেন—ভাবিতেন ইহার অনুষ্ঠানগুলিতে মগ্ন হইয়া হৃদয়-ভার লাঘব করিবেন কিন্তু সমস্তই মনে হইত বৃথা আড়ম্বর। পরমার্থ লাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় যাঁহার অন্তরাত্মা নিপীড়িত, তাঁহার জন্য সেখানে কোন শান্তি নাই; এমন কোন অবলম্বন নাই; যাহার সাহায্যে মার্গারেট এক চিরন্তন অবিরুদ্ধ অখণ্ড তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে পারেন।'[৫]

পরবর্তী দীর্ঘ সাত-বছর কাটল নিবেদিতার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে। নানা বই পড়েছেন, আলোচনায় মেতেছেন, দার্শনিক মতবাদগুলি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছেন, এমন কি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের প্রতি ঝুঁকেছেন।

'মার্গারেটের মনে হইল তিনি ক্রমাগত চলিয়াছেন এক কূল হইতে অপর কূলে। এই সংশয় ক্ষুব্ধ, বিস্তীর্ণ সাগর হইতে কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে?'[৬]

এমন সময় বুদ্ধের জীবনী তাঁকে খানিকটা আকৃষ্ট করলেও তাঁর সংশয় চিত্ত মনে প্রশ্ন—'ধর্ম কি সত্য হইতে পৃথক? মার্গারেটের যুক্তিবাদী মন বলে—"না ধর্ম ও সত্য এক"। তবে কোথায় সেই ধর্ম, যে ধর্মে সকলের স্থান, যাহা উদার এবং অকপটে সকলকে আলিঙ্গন করিতে পারে? যে ধর্মে মুক্তি কেবল নির্দিষ্ট প্রথাবলম্বী কয়েকজনের পক্ষে নহে, পরন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে লভ্য।'[৭]

নিবেদিতা খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আচার্যকে, কাঙ্ক্ষিত পথকে, মুক্তির আলোয় আবৃত গোটা জগৎকে। আর তা সম্ভব হল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে। ১৮৯৫-এ বিবেকানন্দ ইংলন্ডে এসেছিলেন। নানা স্থানে নানা বক্তৃতায় ছিলেন ব্যস্ত। প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটি আমরা মুক্তিপ্রাণাজীর বর্ণনা থেকে পুরোটাই তুলে ধরব। ঐতিহাসিক এই সাক্ষাৎকারের তারিখটি ছিল ১৫ নভেম্বর ১৮৯৫। স্থান ওয়েস্ট এন্ডের একটি ড্রইংরুম।

'অভ্যাগতের সংখ্যা বেশি নয়, মাত্র পনেরো ষোলো জন। শ্রোতৃবর্গ অর্ধবৃত্তাকাবে উপবিষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে অগ্ন্যাধারে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। একটি ঘরোয়া ক্লাসে। মার্গারেট যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন।'[৮]

নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ স্বামী বিবেকানন্দের, পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। স্বামীজীব পরিধানে গৈরিক পরিচ্ছদ, উন্নত শির, পদ্মপলাশ নেত্র, প্রেমোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। সেই মুখে বিরাজ করছে এক শিশুর সারল্য।

ঘরোয়া আসরে স্বামী বিবেকানন্দ নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। প্রসঙ্গগুলির মধ্যে ছিল—ক) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ বিনিময়। খ) সর্বত্র ব্রহ্মের উপস্থিতি। গ) হিন্দুদেব বিশ্বাস ও চরম সত্যানুভূতি হল— শরীর ও মন 'আত্মা'র দ্বারা পরিচালিত। ঘ) হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সম্পর্ক। ঙ) সকল ধর্মের এক কথা—'ত্যাগ'ই শ্রেষ্ঠ পথ। চ) সকল ধর্ম সত্য—সকল অবতার পুরুষই ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র। ছ) গীতার শ্লোক 'উদ্ধৃতি'—চরম সংকটে অবতার পুরুষের আবির্ভাব।

এবার ফিরে তাকাব নিবেদিতার দিকে—নিবেদিতার সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব অনেকটাই প্রশমিত হল। তিনি উপলব্ধি করলেন এই প্রাচ্য সন্ন্যাসীর বাণীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা উপেক্ষণীয় নয়। নিবেদিতার মধ্যে তরঙ্গ আছড়ে

পড়ছে, তিনি আরো জানতে চান, শুনতে চান। তাই ১৬ ও ২৩ নভেম্বর বিবেকানন্দ যে আরো দুটি বক্তৃতা দিয়েছেন তা শুনতে নিবেদিতা ছুটে গেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আলোচনার নোট নিয়েছেন। নিবেদিতা এতদিনে যেন পথ খুঁজে পেয়েছেন। তখন আমরা তাঁর বুকে কান পাতলে শুনতে পেতাম—'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে। আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।' এতদিন দ্বন্দ্বে, সংশয়ে, যন্ত্রণায় যে রক্তক্ষরণ হয়েছে ভিতরে ভিতরে আজ যেন তার থেকে উত্তরণ। আর সেই উত্তরণের পথ দেখিয়ে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। উত্তরকালে তাঁর সেই উত্তরণের কথা স্মরণ করে ১৯০৪-এর ২৬ জুলাই 'Web of Indian life' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন যে চিঠি, আমরা একবার ফিরে তাকাব তার দিকে।

'মনে কর, যদি সে সময়ে স্বামীজী লণ্ডনে না আসতেন? জীবনটা নিরর্থক হয়ে যেত। কারণ আমি সর্বদাই জানতাম আমি এক সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি। সব সময় বলে এসেছি একটা আহ্বান আসবে, আর সত্যই সে আহ্বান এল। যদি নিজ জীবন সম্পর্কে আমার আরও নিবিড় পরিচয় থাকত, তাহলে হয়ত সংশয় জাগত, পরম লগ্ন যখন আসবে তাঁকে চিনতে পারবো কিনা। ভাগ্যবশত আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাই সংশয়-পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এই মুহূর্তে বইখানির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে "যদি তিনি না আসতেন!" সকল সময়ে আমার মধ্যে এই জ্বলন্ত আকুতি আমি অনুভব করেছি। কিন্তু ছিল না প্রকাশ করবার ক্ষমতা। কত সময় গেছে যখন কলম নিয়ে বসে আছি কথা বলব বলে—কিন্তু ভাষা জোটেনি। আর আজ মনে হয় কথার যেন অন্ত নেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জগতে আমি যে কাজের যোগ্য হয়েছি সেই কাজে আমার আরো প্রয়োজনও আছে।'[২]

স্বামী বিবেকানন্দ ঐ বছরের ২৭শে নভেম্বর ফিরে গেছেন আমেরিকায়। জানিয়ে গেলেন পরের বছরে এপ্রিলে তিনি আবার আসবেন। এলেনও তাই—১৬ এপ্রিল। ইতিমধ্যে লণ্ডনে তাঁর ক্লাস শুরু হয়েছে। অনুরাগী-অনুরাগিনীরা নিয়মিত যোগ দিচ্ছেন। এঁদেরই অন্যতমা ছিলেন নিবেদিতা। নিয়মিত ক্লাস করতে করতে নিবেদিতা বুঝলেন এতদিন পরে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন যিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী। যুক্তি এবং তর্ক প্রয়োগ করলেও মার্গারেট স্থির করলেন, স্বামীজীর মতবাদ আয়ত্ত করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিবেদিতা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, তাব ফলে নিবেদিতার চোখে স্বামীজীর রূপচ্ছবিটি প্রত্যক্ষ করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রধান অনুরাগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই স্বামীজীর লেখা চিঠিপত্র, নিবেদিতা সম্পর্কে অন্যান্যদের কাছে লেখা চিঠিপত্রের উপর আমাদের চোখ রাখতে হয় আর ঘটনার পারম্পর্য রক্ষায় নিবেদিতার জীবনীর পৃষ্ঠাগুলি ওলটাতে হয়। নিবেদিতাকে নিয়ে যে দুটি কবিতা বিবেকানন্দ লিখেছিলেন তাও আমাদের সহায়ক এক্ষেত্রে। প্রথমে আমরা সেই চিঠিগুলির উল্লেখে স্বামীজীর চোখে নিবেদিতার স্বরূপ কি ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা জানার চেষ্টা করব। শুরুতেই স্বামীজীর লেখা নিবেদিতাকে এক দীর্ঘ চিঠিব উল্লেখ কবে স্বামীজী নিবেদিতাকে প্রথমেই কোন চোখে দেখেছিলেন তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি।

স্বামীজীর অবর্তমানে লণ্ডনে স্বামীজীর প্রচার কাজেব দায়িত্ব নিয়েছিলেন ই. টি. স্টার্ডি, নিবেদিতা প্রমুখ। দেশে ফিবে আলমোডা থেকে ৩ জুন ১৮৯৭ যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে জানিয়েছিলেন যে, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পবে তিনি স্বদেশবাসীকে জাগাতে পেরেছেন। এটাই একটা বড কাজ। এখন জগৎ আপন ধাবায় চলুক। সমস্ত স্বার্থেব ঊর্ধ্বে উঠে তিনি কাজ কবেছেন, সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন,—'এখন দেহটা জোয়ার ভাঁটায় ভেসে চলুক—তাতে কিছু আসে যায় না।'[১০] এ চিঠির মধ্যে স্বামীজীর নিজের আত্ম-অনুভবের কথা আছে। নিবেদিতাকে বিশ্বস্ত মনে করেই এতসব কথা লিখেছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীব চোখে ফুটে উঠতে দেখলাম নিবেদিতার বিশ্বস্ত রূপটি। তা না হলে আপন অনুভবের কথা কি এমন ভাবে জানানো যায়? এই বিশ্বস্ততার চিত্রটি পরিচ্ছন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করল আলমোডা থেকে ২০ জুন ১৮৯৭-এ লেখা চিঠিতে—'তোমাকে সরলভাবে জানাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার কাছে মূল্যবান, তোমার প্রত্যেকখানি চিঠি আমাকে আনন্দ দেয়। যখনই ইচ্ছা ও সুযোগ হবে, তখনই তুমি নিঃসংকোচে লিখো এবং জেনো যে তোমার একটি কথাও ভুল বুঝব না। একটি কথাও উপেক্ষা করব না।'[১১] আসলে নিবেদিতার নিবেদিত প্রাণ, আকাশছোঁয়া আন্তরিকতা, আত্যন্তিক একনিষ্ঠতা স্বামীজীকে অভিভূত করেছিল। আলমোড়া থেকে ৪ জুলাই ১৮৯৭ নিবেদিতাকে লেখা চিঠিতে আমাদের ধারণা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে—'তোমাদের সমিতির কার্য-প্রণালীর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত; ভবিষ্যতে তুমি যাই কর না

কেন, তুমি ধরে নিত পারো, তাতে আমার সম্মতি থাকবে। তোমার ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।'[১২] এই বিশ্বস্ততাই নিবেদিতাকে টেনে এনেছিল ভারতবর্ষে, নারী-শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিল তুলে। যদিও ২৩ জুলাই ১৮৯৭-এ লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন—'তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।'[১৩]

স্বামীজী না চাইলেও নিবেদিতা ভারতে আসবার জন্যে পা বাড়িয়ে রেখেছেন, শুধু অপেক্ষা স্বামীজীর সম্মতির। স্বামীজী সম্মতি এবং স্বাগত জানিয়ে ভারতবর্ষের হতশ্রী ছবিটি তুলে ধরলেন। আলমোড়া থেকে ২৯ জুলাই বহু প্রত্যাশিত সেই দীর্ঘ চিঠিটি লিখলেন বিবেকানন্দ,—'স্টার্ডির একখানা চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে তুমি ভারতের আসতে এবং সব কিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ় সংকল্প।... তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালোবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন।'[১৪] এই চিঠির মধ্যেই নিবেদিতার স্বরূপটি স্বামীজী এক লহমায় আলোকিত করে তুললেন। সূচনাংশের চিঠির মধ্যে লিখেছিলেন—'তোমার মধ্যে জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে।' এবার বললেন—'প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।' এইসব শব্দ প্রয়োগ থেকে বিবেকানন্দের চোখে নিবেদিতার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করতে পারি। স্বামীজী এই চিঠিতেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন—'কর্মে ঝাঁপ দিবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পর যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই জেনো যে আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত ধর্ম ত্যাগ কর আর ধরেই থাকো।'[১৫] কি অপূর্ব স্নেহশীলতা—এ স্বামী বিবেকানন্দই প্রকাশ করতে পারেন। পরের চিঠিতে এই স্নেহশীলতা শিখরস্পর্শী হয়েছে। জম্মু থেকে লিখছেন এ চিঠি, ১৮৯৭-এর নভেম্বরে। লিখছেন—'আমি শীঘ্রই স্টার্ডিকে

লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে। বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে থাকব। ভারতে আমি যদি এক টুকরো রুটি পাই, নিশ্চয়ই জেনো, তুমি তার সবটুকু পাবে।'[১৬]

নিবেদিতা কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারী। তারপর নানা স্তর পেরিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন ভারতের কাজে। ১১ মার্চ স্বামীজী স্টার থিয়েটারের সভায় সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ১১ মার্চ শ্রীমা সারদাদেবীর সাক্ষাৎ ঘটে, ২৫ মার্চ বেলুড়ে স্বামীজী দীক্ষা দেন এবং নতুন নামকরণ করেন—'নিবেদিতা'। এরপর কাজ আর কাজ। নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, নারীকে সচেতন করতে হবে। এরই মধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয় ঘুরে এসেছেন নিবেদিতা। কাজের চাপের খবর পেয়ে বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে লিখলেন—

'কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলোনা যেন। ওতে কোন লাভ নেই; সর্বদা মনে রাখবে, কর্তব্য হচ্ছে যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো—তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনী-শক্তি ক্ষয় করে। সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক মূল্য আছে বটে তার বেশি করতে গেলে তা দুঃস্বপ্ন মাত্র।'[১৭] এই চিঠির মধ্যে স্বামীজী নিবেদিতার কর্মমুখীন জীবনের ছবিটি দেখে গুরু রূপে সাবধান করে দিয়েছেন। নিবেদিতার ভারতে আগমন যে সার্থক হয়েছে, স্বামীজীর তাতেই আনন্দ। এই আনন্দের মাঝে নিবেদিতার বিষাদগ্রস্ততাকে প্রত্যক্ষ কবতে ভোলেন নি বিবেকানন্দ। ১৮৯৯-এর ১ নভেম্বর আমেরিকার রিজলি থেকে লিখছেন—'...মনে হচ্ছে তোমার মনে যেন কি একটা বিষাদ রয়েছে। তুমি ঘাবড়িও না, কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাই করনা কেন, জীবনে কিছুই অনন্ত নয়। আমি তার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাঁদের বিধিলিপি।'[১৮] বিবেকানন্দ প্রিয় শিষ্যাকে আরো একটু সাহসী করে তুললেন, নিজের পায়ে পুরোপুরি ভর দিতে শেখালেন। ১৮৯৯-এর ৬ ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলস্ থেকে লেখা চিঠির মধ্যে দেখতে পাই বিবেকানন্দ লিখছেন—'যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত থাকো, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ করো, কিন্তু তোমার বিলাপ অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়।'[১৯] বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা পুরুষ। তাই নিবেদিতা ক্রমশ কি হয়ে উঠবেন, কি হয়ে উঠতে চলেছেন, তার ইঙ্গিত পেয়ে নিবেদিতাকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে বললেন। উত্তরকালে বিবেকানন্দের ধারণা মিলে গিয়েছিল। ভারতীয় জনজীবনে নিবেদিতা 'লোকমাতা'য় রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

এবাব আমরা দৃষ্টি ফেরাব—নিবেদিতা সম্পর্কে অন্যান্য চিঠিতে বা মুখে বলা নানা উক্তির দিকে; আর তারই মধ্যে দিয়ে নিবেদিতাকে স্বামীজী কোন চোখে দেখেছিলেন তার রূপচ্ছবিটিকে।

১. নিবেদিতা ভারতে আসার আগে তাঁর বিষয়ে জানাবার সময়ে স্বামীজী তাঁর কর্মশক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমন আলাসিঙ্গাকে লেখা ১৮৯৬-এর ২০ নভেম্বরের চিঠিতে—'উইম্বলডনের মিস্ নোবেল মস্ত কর্মী।'[২০]

২. ২৫ জুলাই ১৮৯৭-এ মেরী হলবয়েস্টারকে লিখছেন—'উইম্বলডনের মিস্ মার্গারেট নোবেলকে জানো নাকি? আমার জন্যে সে কঠোর পরিশ্রম করছে। যদি পারো তার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করো।'[২১]

৩. ১৮৯৭-এর ১৯ আগস্ট মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন—'মিস্ মার্গারেট নোবেল নামে এক ইংরাজ তরুণী ভারতে আসতে এবং এখানকার অবস্থা জানতে খুবই আগ্রহী যাতে সে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ভারতের জন্য কিছু কাজ করতে পারে।'[২২]

গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে জানিয়েছিলেন নিবেদিতার কথা। ভারতে আসার আগে নিবেদিতা ভারতবর্ষের অবস্থা এবং স্বামীজীর কার্যধারা সম্পর্কে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন। বিবেকানন্দ কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে ঐ সব প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে তা লিখে পাঠিয়েছিলেন।[২৩]

১৮৯৮-এর মার্চ মাসে বেলুড় মঠ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে যে চিঠি লেখেন তাতে নিবেদিতার উল্লেখ আছে—'মিস্ নোবেলের মত মেয়ে দুর্লভ! আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস (এনি) বেসান্তকে ছাড়াইয়া যাইবে।'[২৪] এটা লেখার প্রধান কারণ ১১ মার্চ ১৮৯৯ স্টার থিয়েটারে আয়োজিত সভায় নিবেদিতাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়াছে—মিস্ মার্গারেট নোবেল।' এরপর নিবেদিতা চমৎকার এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারই সূত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে বিবেকানন্দ উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

স্বামীজী নিবেদিতাকে দুটি কবিতা লিখে উপহার দিয়েছিলেন। এই কবিতা দুটির বঙ্গানুবাদ অনেকেই করেছেন। আমরা মুক্তিপ্রাণাজীর অনূদিত কবিতা দুটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে বিবেকানন্দ কোন চোখে নিবেদিতাকে দেখেছিলেন তা বুঝতে পারব। প্রথম কবিতাটি লেখা হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর। ইংরেজিতে লেখা কবিতাটির নাম Benediction। আদর্শ

নারীরূপে নিবেদিতার জীবন উৎসর্গের জন্য দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অনুভব 'আশীর্বাণী' হয়ে দেখা দিল—

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা,
মলয় সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র কান্তি, বীর্য, আর্য বেদীতলে,
নিত্য রাজে বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে,
এসব তোমার হোক—আরো হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত;
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।

দ্বিতীয় কবিতাটি রচনার তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯। 'রিজলি ম্যানর'-এ আসার পর নিবেদিতা সিদ্ধান্ত নিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর কর্তব্য তিনি পালন করবেন সর্বার্থে। তাঁর এই আদর্শ স্বামীজীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাই নিবেদিতা নিজেকে যেদিন ব্রহ্মচারিণীর পোশাকে আবৃত করলেন, সেইদিনই স্বামীজী খুব খুশি হয়ে 'শান্তি' (Peace) কবিতাটি নিবেদিতাকে উপহার দেন—

'হের, ঐ আসে মহাবেগে/ শক্তি, তবু সে শক্তি নয়/ যে আলোক আঁধার মাঝে/ ছায় সম উজ্জ্বল আলোকে/ যে আনন্দ চির ভাষাহীন/ গভীর বেদনা সে নহে অনুভূত,/ অমৃত জীবন যাহা হয়নি যাপিত,/ অশোচিত শাশ্বত মরণ।/ আনন্দ বা দুঃখ এ যে নয়,/ উভয়ের মাঝখানে রাজে,/ নহে রাত্রি, নহে উষালোক—/ মিলনের সেতু এ দুয়ের।/ সংগীতের মধুর বিরতি;/ পবিত্র শিল্পের ছন্দ, যতি,/ নীরবতা ভাষার অন্তরে/ কামনার দ্বন্দ্ব মাঝে—/ হৃদয়েব অপূর্ব প্রশান্তি।/ সৌন্দর্য সে চির অবিদিত,/ প্রেম যাহা একাকী বিরাজে,/ অগীত যে মহান সংগীত, পূর্ণজ্ঞান চির অজানিত।/ মৃত্যু দুই জীবনের মাঝে,/ ঝটিকাদ্বয়ের মাঝে ক্ষণিক স্তব্ধতা,/ মহাশূন্য, যাহা হতে সৃষ্টির বিকাশ, পুনর্বার যাহাতে বিলয়।/ যার লাগি অশ্রুজল ঝরে,/ স্মিত হাসি বিলাবার তরে/ জীবনের লক্ষ্য সুনিশ্চিত—/ শান্তি এর একান্ত আশ্রয়।'

কবিতাটির প্রতিটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদিতাকে 'আশীর্বাদ' করে আগে যে কবিতাটি বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, তাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতার ছোঁয়া ছিল স্পষ্ট। আর এই দীর্ঘ কবিতায় বিবেকানন্দ জীবনের অনাবিল 'শান্তি'র কথা বলেন নি, বলেছেন—মানুষের জীবনে নানা

কর্মভারে মানুষ যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত, তখন সহস্র আলোর দীপনে উদ্ভাসিত হোক চতুর্দিক, 'যে আনন্দ চির ভাষাহীন' তা ছুঁয়ে যাক কপোল-কপাল, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের মাঝে তার সহাবস্থান, মৃত্যুর বলয়ে পা রেখে তার চলা, আর শান্তির বলয়ে তার দুনির্বার কথা বলা।

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে তৃতীয় আরেকটি কবিতা লিখেছিলেন 'অ্যান আরবার' থেকে। ৩ জানুয়ারী ১৯০০তে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে তা আমরা জানতে পাচ্ছি। কিন্তু সে কবিতার হদিশ আমরা পাইনি।

সব মিলিয়ে বিবেকানন্দ নিবেদিতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সহস্র সম্ভাবনার আলো। যে আলোতে অধ্যাত্ম জীবনের প্রশস্ত পথটি চিনে নেওয়া যায়, মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়। নারীজাগরণ ও নারীশিক্ষাকে অন্ধ তমোনিশার মাঝে আলোকদ্যুতিতে প্রসারিত করে দেওয়া যায়। নানা দিক থেকে মাতিয়ে তোলা যায় এক পরাধীন জাতিকে। উত্তরকালে নিবেদিতা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সেবা, সর্বোপরি পরাধীন ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিবেদিতার যে ভূমিকা বা স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাতে প্রমাণিত হয়ে যায়—বিবেকানন্দের নিবেদিতাকে আবিষ্কার কতটা সপ্রাণ, কতটা সুদূরপ্রসারী এবং কতটা বাস্তবজনিত ছিল।

তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচার, সর্বোপরি নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত ছিলেন। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজে বিশেষ করে তৎকালীন কলকাতার প্লেগ রোগে আক্রান্ত মানুষজনদের সেবায় তিনি নিয়েছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। কলকাতায় ১৮৯৯-এর মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার প্লেগ রোগাক্রান্তদের মধ্যে সেবা কার্য পরিচালনার জন্য যে কমিটি রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করেছিল, নিবেদিতা ছিলেন একাধারে তার সভানেত্রী ও সম্পাদিকা। লণ্ডন ত্যাগ করার আগে বিবেকানন্দ তাঁকে চিঠিতে যে কথা লিখেছিলেন, আমরা তা আগে একবার উল্লেখ করেছি, প্রসঙ্গত আরো একবার সেই কথাগুলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নেব,—'ভারতবর্ষ তোমার আপন ধাম। কিন্তু তার জন্য তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে। ...কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা ক'রো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখন কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাকো।'[২৫]

বিবেকানন্দের এই আশ্বাস বাণী তাঁকে ভারত প্রেমে ভাসিয়ে দিল। নিবেদিতা একাধারে ভারতবর্ষের লোকমাতা, দুহিতা, ভগিনী। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি, নারী সচেতনতা প্রসারের জন্য। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন নারীকে সচেতন করতে না পাবলে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। আর এর জন্য চাই শিক্ষা। সে কালে রামমোহন-বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়ে তেমন ভাবে সফল হতে পারেননি। বিবেকানন্দ সার্বিক ভাবে নারী শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর কালী পুজোর দিন ১৬, বোস পাড়া লেনে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দের উপস্থিতিতে, সারদাদেবী প্রথম নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন। গোলাপ মায়ের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্বোধনের পর 'শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন যেন এই বিদ্যালয়ের উপব জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখানের মেয়েবা যেন আদর্শ মেয়ে হয়।' নিবেদিতা তখন একপাশে জোড় হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, জননীর এই আশীর্বাদ যেন তাঁর যাত্রাপথের পরম সঞ্চয়—এই কথাই সেদিন তাঁর বারবার মনে হয়েছিল।[২৬] সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে আশীর্বাদ চাইলেন—'মহামায়ার শুভাশীষ বিদ্যালয়ে শত ধারে বর্ষিত হউক।'[২৭] শ্রীমা সারদাদেবীর প্রার্থনা ও আশীর্বাদ বাস্তবিক ক্ষেত্রে শতধারে এই বিদ্যালয়ের উপর বর্ষিত হয়েছিল। এ যেন মহানিশায় মহামায়া আবরণ ছিন্ন করে মহাশক্তির উদ্বোধন করলেন। নিবেদিতার এই বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বটি খুব সুখের ছিল না। ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে তেমন আসত না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করতে হত। দ্বিতীয়বার বিবেকানন্দের সঙ্গে পাশ্চাত্যে গিয়ে নিবেদিতা ভারতের নারীদের সম্পর্কে নানা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এবং সেই বক্তৃতার সূত্রে ঐ বিদ্যালয়েব জন্য অর্থসংগ্রহে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বক্তৃতার পর তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে বলেছিলেন, 'বছরে একটি করে ডলার দিন, অন্তত দশটি বছর।' অনেকে সেদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন এই অল্প পয়সায় কি হবে? নিবেদিতা জানিয়েছিলেন—'ভবিষ্যতের গোড়াপত্তন হবে।' বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিবেদিতার পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। এই সময় তিনি অপর এক গুরুভগিনীকে তাঁর কাজের সাহায্যের জন্য পেয়েছিলেন, তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন। তাঁর ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠাকে লক্ষ্য করে সরলাবালা সরকার জানিয়েছেন—'বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাজে তিনি নিজেকে একান্তভাবে

সমর্পণ করিয়াছিলেন... বলা বাহুল্য তিনি এটিকে আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাছে ইহা সহজ হইয়াছিল। বালিকা বিদ্যালয়েব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন নিবেদিতা কিন্তু মাতার ন্যায় ইহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন ক্রিস্টিন।'[২৮] আব নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন— 'ক্রিস্টিনের একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের ঐকতান এবং আত্মত্যাগের ফলেই এই বিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। ভগিনী ক্রিস্টিন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে বিধবা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন।'

প্লেগ সেবা কাজে নিবেদিতার ভূমিকা পরে বিস্তারিত ভাবে আমবা আলোচনা করব। নিবেদিতার মধ্যে যে আগুন বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই আগুন নিবেদিতা বিপ্লবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীঅববিন্দেব মূল্যায়নে তিনি হলেন—'শিখাময়ী'। শুধু তাই নয়, ভাবতের সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানেব অগ্রগতিতে তার ভূমিকা স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল। সমকালীন স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেব সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এঁবা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ।

নিবেদিতা নামটি, নিবেদিতার বিষয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য, বহু বক্তব্যের হৃদয়—কৌস্তুভ মণি। কবিতা দুটিতে রয়েছে উদ্ভাসিত দ্যুতি। প্রথম কবিতায় ভারতের নিবেদিতা, দ্বিতীয় কবিতার নিত্য-সত্যের নিবেদিতার স্বরূপ উন্মোচিত। প্রথম কবিতায় নিবেদিতাকে আত্মসাৎ করে গুরু দায়িত্ব পালনের ভার দিয়েছিলেন। নিবেদিতা কতটা সেই দায়িত্ব পালন করতে পেবেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথেব কথায় জানা গেছে; যখন নিবেদিতাকে তিনি 'লোকমাতা' বলে সম্বোধন করেছেন তখনই।

॥ ৩ ॥

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অনুরাগী-অনুবাগিণীদের মধ্যে যাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারী নিউইয়র্ক শহরের ওয়েস্ট ষ্ট্রীটের একটি ড্রয়িং রুমের আলোচনা সভায়। জোসেফিন ম্যাকলাউডের বোন হলেন বেটী লেগেট। ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন বিবেকানন্দের নিউইয়র্ক নিবাসী অনুরাগীদের মধ্যে অন্যতম। পরে তাঁর বাড়ীতে বিবেকানন্দ কিছুদিন বাস করেছিলেন এবং

একসময় তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। জোসেফিন ম্যাকলাউডের দিদি স্টারজিসের সঙ্গে ফ্রান্সিস লেগেট পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। বিবেকানন্দের আমেরিকান অনুরাগী-অনুরাগিনীদের মধ্যে মিস্টার ও মিসেস লেগেটের স্থান ছিল প্রথম সারিতে। জোসেফিন ম্যাকলাউড ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকান এই নারীর পিতার নাম ছিল জন ডেভিড ম্যাকলাউড ও মা ছিলেন মেরী অ্যানি। তাঁর নামকরণ হয়েছিল নেপোলিয়ানের পত্নী সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের নামে। আমেরিকা থেকে তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে গত শতাব্দীর আশীর দশকে। যৌবনে তিনি ছিলেন শিখান্বিত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। আপন যৌবনের চাঞ্চল্যে প্যারিসে তাঁকে ঘিরে চলে বহু পুরুষের স্বপ্ন দেখা। জোসেফিন সব স্বপ্ন ভেঙে শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের চরণে নিলেন ঠাঁই। তারিখটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর বাইরের চলচঞ্চল রূপের গভীরে ছিল আর এক জোসেফিন, অনন্তের যাঁকে নিত্য আক্রমণ। সেই 'অনন্তে'র মানবাকার ধারণ করেই জোসেফিনের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের পর জোসেফিন হারিয়ে ফেললেন তাঁর চেনা জানা নিজের ভুবনকে। জোসেফিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে গেছেন, কিন্তু জোসেফিনের অন্তরে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন উত্তরণের এক মুঠো গৈরিক আবীর। তাই তাঁর অবর্তমানে জোসেফিনের মনে হয়েছে—এই পৃথিবীতে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যিনি যবনিকার অন্তরালের সংবাদ জানেন। জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেবার ভালবাসার অস্ত্রটি তাঁর করায়ত্ত।

তাইতো জোসেফিন পরিবর্তিত জীবনে ভারতবর্ষে আসতে চান, আসতে চান বিবেকানন্দের সংস্পর্শে, সাহায্য করতে চান তাঁর কাজে। তাই তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে চিঠি লিখলেন ভারতবর্ষে যাওয়ার কথা জানিয়ে। স্বামীজী ১৮৯৭-এর ১০ জুলাই সেই চিঠির উত্তরে তাঁকে জানালেন—'আসতে চাও? অবশ্যই এস। কেবল মনে রাখবে ইউরোপীয়গণ ও হিন্দুগণের (যাদের ইউরোপীয়রা নেটিভ বলে থাকেন) পারস্পরিক সম্পর্ক তেল-জলের মতো। ইউরোপীয়দের পক্ষে নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা গর্হিত ব্যাপার। এমনকি (প্রাদেশিক) রাজধানীগুলোতেও ভাল বলা চলে এমন হোটেল নেই। ...কৌপিন পরা লোকেদের দেখে দেখে চোখ সইয়ে নিতে হবে। আমাকে ঐ রকম পোশাকে তুমি দেখতে পাবে। সর্বত্র নোংরা, আবর্জনা আর কালা আদমী। হয়তো আমি তোমাদের সঙ্গে একত্রে খেতেও পারব

না। ...কিন্তু তুমি দার্শনিক আলোচনা করার মতো অজস্র লোক পাবে। ...আর আমি আশ্বাস দিচ্ছি—তোমাদের সঙ্গে অনেক জায়গা আমি ভ্রমণ করব, আর তোমাদের ভ্রমণকে আনন্দময় করার জন্য সবকিছু করব।'[২৯]

১২ জানুয়ারী ১৮৯৮ আমেরিকা থেকে মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড সব জেনে শুনে ভারতবর্ষে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন মিসেস ওলিবুল এবং একই জাহাজে স্বামীজীর আহ্বানে স্বদেশে ফিরলেন স্বামী সারদানন্দ। ১২ ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে তাঁরা পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে ট্রেনে করে ১৪ ফেব্রুয়ারী হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন। স্বামীজী ও তাঁর দশ-বারো জন শিষ্য সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বাগত জানালেন তাঁদের। স্বামী সারদানন্দ গেলেন মঠে এবং জোসেফিন ও ওলিবুল গেলেন হোটেলে।

ভারতে এসে সঙ্গিনী রূপে পেলেন মিস মার্গারেট নোবেলকে। আর মিসেস ওলিবুল তো তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন। বিবেকানন্দের এই তিন পাশ্চাত্য অনুরাগিনী বেলুড়ের গঙ্গাতীরে ভাঙা এক বাড়িকে 'ভালবাসার কুটিরে' রূপান্তরিত করে বাস করতে লাগলেন। তারপর ঐ বছরই উত্তর ভারতের নানা স্থানে এবং হিমালয়ের নৈনিতালে, আলমোড়া, কাশ্মীরে স্বামীজী ও তাঁর অনুরাগী-অনুবাগিনীদের সঙ্গে তাঁরা ভ্রমণ করলেন। এই ভ্রমণকালে স্বামীজী তাঁদের সামনে মেলে ধরলেন গোটা ভারতবর্ষকে—জাগ্রত করলেন তার অতীতকে, দীপ্ত করলেন বর্তমানকে আর উন্মোচন করলেন ভবিষ্যৎকে।

জোসেফিন ম্যাকলাউড তাঁর গুরু বিবেকানন্দকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনাকে আমি কোন সর্বোত্তম উপায়েও সাহায্য করতে পারি?' বিবেকানন্দ উত্তরে বলেছিলেন 'ভারতবর্ষকে ভালবেসে।' জোসেফিন ম্যাকলাউড গুরু-বাক্যকে শিরোধার্য করে নিয়ে আমৃত্যু ভারতবর্ষকে ভালবেসেছেন, ভালবেসেছেন শুধুই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে তিনি একক প্রচেষ্টায় সাধ্যাতীত ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন পাশ্চাত্যে। ভারতবর্ষের জন্য তিনি কি করেছিলেন—সে ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে না, তবু তিনি গুরুদেবের ভারত প্রেমের বাহিত ক্রুশ বহন করেছেন যথার্থ ভাবেই। আমরা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে জানতে পারি তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনায় অর্থ সাহায্য করেছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলনের পিছনেও তাঁর অবদান কম নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উচ্চ মহলে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল বলে তিনি নিবেদিতা অপেক্ষা নিরাপদে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালাতে পেরেছিলেন। আমেরিকায় পলাতক ভারতীয় বিপ্লবীদের

তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। রাজনীতিতে উৎসাহী না হলেও বিবেকানন্দের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সমর্থন ছিল অনিবার। তিনি গোপনে বেলুড় মঠের গেস্ট হাউসে তাঁর বাসস্থানে লর্ড লিটন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা পর্যন্ত কবেছিলেন।

এ তো গেল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের একটি দিক। ম্যালেরিয়া জর্জরিত বিবেকানন্দের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করবার জন্য তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বন্যা-দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত অঞ্চলে সুষ্ঠু নদী পরিকল্পনার দ্বারা কৃষি উন্নয়ন করা প্রয়োজন—সে জন্য নিজ অর্থ ব্যয়ে মিশরের নদী বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইলকক্সকে এদেশে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর প্রস্তাব ও পরিকল্পনা তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড ওয়াভেলের হাতে তুলে দিয়ে তা কার্যকরী করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এর পরেই আসবে বামকৃষ্ণ মিশনের কথা। আমরা জার্নি, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের জন্য নিবেদিতার স্কুলে সর্বাধিক অর্থ সাহায্য করেছিলেন মিসেস ওলিবুল। জোসেফিন ম্যাকলাউডের অবদানও এই স্কুলের পিছনে কম ছিল না। পরবর্তীকালে স্কুলের পরিচালিকা সিস্টার ক্রিস্টিন জার্মান বংশোদ্ভব বলে ঐ স্কুলের উপর নেমে এসেছিল ব্রিটিশ সরকারের রাজরোষ। তখন জোসেফিন ম্যাকলাউড-ই সরকাবী উচ্চ মহলে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলটিকে সরকারের বিষ-নজর থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি বাঁচিয়েছিলেন বামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠকেও। বেলুড় মঠে বিপ্লবীরা অনেক সময় আশ্রয় পেয়েছে। অনেক বিপ্লবী রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসও নিয়েছে—এজন্য ব্রিটিশ সরকারের রোষবহ্নি নেমে এসেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর। বেলুড় মঠের জমির পাশ দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের ইয়ার্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। সেই সর্বনাশা কালোদিনগুলিতে জোসেফিন ম্যাকলাউড জ্বলে উঠেছিলেন অগ্নিশিখার মতো। পৌঁছে গিয়েছিলেন সরকারী মহলে। তাঁদের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়ে বেলুড় মঠের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি থেকে সবকারকে নিরস্ত করেছিলেন। এবং রেলের ইয়ার্ড স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের পর তিনি স্টীমারে করে যখন বেলুড় মঠেব ঘাটে এসে পৌঁছলেন তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন 'Victory to you tantine'; (বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে tantine

অর্থাৎ পিসিমা বলে চিনতেন, জানতেন এবং ডাকতেন) তখন জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, 'Victory to me swami? Victory to that piece of solid rock which is seated over there', অর্থাৎ আমার জয় নয়, ঐ দেখ অচল, অটল জয় ওঁর অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের।

বিবেকানন্দ রচিত গ্রন্থগুলি বিদেশে প্রচারের বিষয়ে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। এজন্য তিনি প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। ইউরোপীয় নানা ভাষায় বিবেকানন্দের নানা বই অনুবাদ করিয়েছেন নিজের টাকায়। বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনী রচনার জন্য ফ্রাঙ্ক আলেকজান্ডারকে ডেট্রয়েট থেকে ভারতে পাঠানোর ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। বিবেকানন্দের প্রধান বাণীবাহী নিবেদিতার গ্রন্থ প্রচারেও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিমেয়। লিজেল রেমঁ নিবেদিতার জীবনী লেখার সময় জোসেফিন ম্যাকলাউডের কাছ থেকে তথ্যগত বিস্তর সাহায্য পেয়েছিলেন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ জীবনী 'The Face of Silence' রচনা করেন প্রধানত তাঁরই প্রেরণায় (বাংলায় রূপান্তরিত গ্রন্থের নাম 'নৈঃশব্দের রূপ')। ধনগোপালের গ্রন্থ পড়েই রোমা রোঁলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিষয়ে আগ্রহী হন—যার পরিণতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে তাঁর রচিত দুটি অসাধারণ জীবনী গ্রন্থ। সেই দুটি গ্রন্থ রচনাতেও জোসেফিন ম্যাকলাউড অক্লান্ত সাহায্য করেছেন—তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। রোমা রোলাঁর ডায়েরীতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মে তারিখে মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডের যে লেখচিত্র আঁকা আছে তা হল—

> 'ভদ্রমহিলা আমেরিকান, বছর ষাট বয়স (না বয়স তখন ঊনসত্তর) সাদা চুল, লম্বা, রোগা, মুখে বলিরেখা, কিন্তু খুব প্রাণপূর্ণ, প্রখর বুদ্ধিমতী, মনটি উদগ্র ও কৌতূহলী, বেশ ভাল ফরাসীতে বাক্পটুতার সঙ্গে কথা বলেন, না থেমে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান। তিনি ধনী, মার্জিত রুচির। দীর্ঘকাল ভারতে থেকেছেন—যাঁদের সম্পর্কে তিনি বিশেষ ভাবে জানতে আগ্রহী, যেমন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ ঘোষ—সবাইকে তিনি জেনেছেন। কিন্তু সর্বোপরি জেনেছেন বিবেকানন্দকে, যিনি হয়ে আছেন তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও আবেগের উৎস। বিবেকানন্দের সৌন্দর্য, মাধুর্য বিচ্ছুরিত আকর্ষণী ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর বলা শেষ হতে চায় না।'

বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্যা জোসেফিন ম্যাকলাউড, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে আর্থিক, কায়িক, মানসিক, বৌদ্ধিক—নানাদিক থেকে তার প্রসারে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন সে কথা কোন ভাবেই বিস্মৃত হবার নয়।

॥ ৪ ॥

শিকাগোর হেল পরিবার বিবেকানন্দকে নানা ভাবে সাহায্য করে ও আশ্রয় দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আর পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসারের ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা আমবা আগেই উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে জে. জে গুডউইনের ভূমিকা অপবিমেয়। তিনি পাশ্চাত্যে এবং ভারতে বিবেকানন্দের সমস্ত বক্তৃতা শর্টহ্যান্ডে লিপিবদ্ধ কর্বে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। Complete works of Swami Vivekananda গ্রন্থের এ পর্যন্ত নটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই প্রচেষ্টায়। তাঁর জীবন ছিল একজন আদর্শ ব্রহ্মচারীর মতো। জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিসেস ওলিবুল, ই. টি. স্টার্ডি, মিস্টার লেগেট—প্রধানত এই চারজনের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল বিবেকানন্দের গ্রন্থ-রচনাবলী। ম্যাকলাউড তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় শুধু দান করেননি, তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একজন শুভার্থী। সে কথা আমরা আগে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। মিস্ হেনরিয়েটা মূলারের অর্থ দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর দেওয়া ৩৯ হাজার টাকায় বেলুড় মঠেব ২২ বিঘা জমি কেনা হয়েছিল ১০০ বছর আগে।[৩০] আজ সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং চিরস্মরণীয়।

বিবেকানন্দের দেহত্যাগের আগেই গুডউইন প্রাণত্যাগ করেন। গুডউইনের মৃত্যু সংবাদ বিবেকানন্দকে বিচলিত করেছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এই ভাবে—‘গুডউইনকে মারিয়া ফেলার জন্য এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে নহে কি? গুডউইন বাঁচিয়া থাকিলে বড বড় কাজ করিতে পারিতেন।’[৩১]

নিবেদিতা গুডউইনের মৃত্যুতে একটি কবিতা লিখতে শুরু করলে বিবেকানন্দের হাতে পড়ে তা আমূল বদলে যায়,—এই পরিবর্তনে নিবেদিতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হন তাই বিবেকানন্দ ছন্দ ও মাত্রা মিলিয়ে কবিতার

সার্বিক নির্যাস বজায় বেখেছিলেন। কিরণচন্দ্র দত্ত অনূদিত সেই কবিতাটি আমরা তুলে ধবছি,—

শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম

চল আত্মা, শীঘ্র গতি, তারকা-খচিত তব পথে,
ধাও হে আনন্দময়,
যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ,
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ!
সার্থক তোমাব সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান
অপার্থিব প্রেম পূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান;
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে,
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে!
টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছে সে আনন্দ সন্ধান,
জন্মমৃত্যু রূপে যিনি, তার সাথে হলে এক প্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়,
আগে চল, সংসার সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়![৩২]

এই কবিতাটি সহ গুডউইন জননীকে বিবেকানন্দ একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন,—'তাঁর কাছে আমার যে ঋণ তা কখনও শোধ করা যাবে না। আমার কোন চিন্তার দ্বারা যদি কেহ লাভবান হয়ে থাকে জেনে রাখুন, তার প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পেরেছে তাঁর জন্যে। তাঁকে হারিয়ে আমি ইস্পাতের মতো খাঁটি বন্ধু হারিয়েছি। অপরাজেয় ভক্তিপূর্ণ শিষ্য হারিয়েছি। এমন একজন একনিষ্ঠ কর্মী হারিয়েছি, যিনি ক্লান্তি কাকে বলে জানতেন না। যিনি সর্বদাই অপরের জন্য দেহ ধারণ করেন, পৃথিবী তাঁকে হারিয়ে এক 'অমূল্য সম্পদ হারিয়েছে।' কবিতা ও চিঠি পেয়ে গুডউইন জননী তাঁর পরলোকগত পুত্রের প্রতি বিবেকানন্দের কি জাতীয় অনুভব প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রত্যুত্তর জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা গুডউইনের প্রতি উজাড় করে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার ডানহাত খসে গিয়েছে। ক্ষতির সীমা রইল না। আমার বক্তৃতা শেষ।'[৩৩]

ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের জন্য গুডউইন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। এই আত্মোৎসর্গ ভারতবর্ষ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা

থাকবে। মিসেস ওলিবুল জানিয়েছেন তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল সাংবাদিকতায়। নিউইয়র্কে স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার রূপে কাজ করার অভিজ্ঞতার পরে স্বামীজীর সঙ্গে গুডউইন অনেক দিন কাটিয়েছিলেন। আমরা জানি নিউইয়র্কের স্টেনোগ্রাফার গুডউইন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিবেকানন্দকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ভারতবর্ষ ও বিশ্বকে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলী। তিনি পেয়েছিলেন জীবনের পরম প্রাপ্তি। স্বামীজী তাঁকে অপরিসীম ভালবাসতেন। গুডউইন পুত্রাধিক ছিলেন স্বামীজীর কাছে। স্বামীজীর অশেষ ভালবাসার জন্য অন্যান্যরা ঈর্ষা করতেন তাঁকে। বিবেকানন্দ বলে উঠেছিলেন গুডইনের মৃত্যুতে,—'বুঝলাম পুত্রশোক কি ভয়ঙ্কর।'[৩৪]

গুডউইন বিবেকানন্দের সঙ্গে আসেন ভারতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি সব সময় বিবেকানন্দের সঙ্গে থাকতেন। তারপব অর্থ কষ্ট দেখা দেওয়ায় বাধ্য হয়ে 'মাদ্রাজ মেল' পত্রিকা বেব করেন এবং উটকামাণ্ডেতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ওলিবুল তাঁর সম্পর্কে জানিয়েছেন—'আমাদের অভিজ্ঞতা ও আনন্দেব ভাণ্ডারে তিনি মহা ঐশ্বর্যতুল্য।' গুডউইন যখন মারা যান তখন বিবেকানন্দ ছিলেন আলমোড়ায়।

॥ ৫ ॥

বিবেকানন্দ কানাডার ভ্যাঙ্কুবর শহরে পৌঁছনোর পর ১৮৯৩-এর শেষে মিস কেন্ট স্যানবরণ্-এর সান্নিধ্য পান। ট্রেনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তিনি যখন জানতে পারেন ধর্মমহাসভা দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে তখন তিনি আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কেন্ট স্যানবরণের খামার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এর পিছনে ছিল স্যানবরণের আমন্ত্রণ। তাই বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে বোস্টনে গিয়ে গোটা আগস্ট মাস অতিবাহিত করেছিলেন। স্যানবরণ্ বোস্টনের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরী রাইট। যিনি বিবেকানন্দের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এ কথা বহুশ্রুত এবং আজ তা ইতিহাস।

এর পরই আসে মিস্টার হেলের কথা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণের প্রাক্কালে বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল বাসস্থানের। অধ্যাপক রাইটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও শিকাগোয় পৌঁছে পথে পথে তাঁকে রাত কাটাতে হতে পারে এরকম চিন্তা বিবেকানন্দের ছিল। তিনি ধর্মমহাসভার কর্ণধার

ড. ব্যারোজের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেন। শিকাগোয় পৌঁছে প্রথম রাত্রে তিনি মালগাড়ির কামরায় রাত কাটান। মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার সংকল্প নেন। তাঁর অভীপ্সা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। শেষে তিনি শিকাগোর সমৃদ্ধ অঞ্চলে পৌঁছে সুন্দর একটি বাড়ির সামনে ক্লান্ত ভাবে বসে পড়েন। একটু পরে মিস্টার হেল বেরিয়ে এসে বিবেকানন্দকে আশ্রয় দেন। তাঁর সব কথা শুনে সস্নেহে আপ্যায়ন করেন। তাঁর বাড়িতে যাঁরা ছিলেন, হ্যারিয়েট ও ইসাবেল তার মধ্যে অন্যতম। বাড়ির সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এই বাড়িটি ছিল বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয়। ড. ব্যারোজের ঠিকানা হারিয়ে ফেললে তাঁরা তাঁকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকে সেদিন মিসেস এলেন হেল সাহায্য না করলে শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর যোগ দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হত না। তাঁর চরিত্র নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করলে এই হেল পরিবার রুখে দাঁড়িয়েছেন বহুবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তায় শিকাগো-আমেরিকার মানুষজনেদের বিরুদ্ধাচরণে তাঁরা পিছিয়ে যাননি। ভারতে এসেও বিবেকানন্দ তাঁদের সঙ্গে স্নেহমধুর সম্পর্ক রাখতেন। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের উজ্জ্বলতার দিকটি প্রত্যক্ষ করতে পারি তাঁদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ের মধ্যে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে, বিবেকানন্দ যখন ডেট্রয়টে পৌঁছলেন মিসেস ব্যাগলি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা শুনে তাঁর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তায় সংকীর্ণমনা খ্রীষ্টান যাজকদের কথায় বিবেকানন্দ ভীত হয়ে উঠলে মিসেস ব্যাগলি নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। ডেট্রয়টে তিনি সম্বর্ধনা সভারও ব্যবস্থা করেন। এই সভা সম্পর্কে সেখানকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়—'বহু বছরের মধ্যে উজ্জ্বলতম সভা এটি। মিসেস ব্যাগলি তাঁর চিকন কেশরাশি নিয়ে বিবেকানন্দের পাশে উপস্থিত থেকে সকলকে একটি চমৎকার দৃশ্য উপহার দিয়েছেন।'[৩৫]

এরপরে আমরা উল্লেখ করব সিস্টার ক্রিস্টিনের কথা। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে এঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ক্রিস্টিন গ্রীণ স্টাইডেল তাঁর পূর্ণ নাম। তিনি বিভিন্ন ভাবে বিবেকানন্দকে সাহায্য করেন। নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের পর বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ক্রিস্টিনের উপর বর্তেছিল। দীর্ঘ একযুগ এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। বিধবা মা ও ছ'টি বোন নিয়ে তাঁর বিরাট পরিবার। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ আগস্ট জার্মানীর নুরেমবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। ২৮

বছর বয়সে ১৮৯৪-এ ডেট্রয়েটে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। ক্রিস্টিন ও তাঁর বান্ধবী মেরী ফ্রাঙ্কী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর বিবেকানন্দ তাঁদের মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরা বিবেকানন্দের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন হোটেলে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন পাশ্চাত্যে যান তখন তাঁদের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। এরপর ক্রিস্টিন ভারতে আসার কথা মনে মনে অনুভব করতে থাকেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। মায়াবতীতে প্রতিষ্ঠিত মিশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। নিবেদিতার বিদ্যালয়ে দীর্ঘ এক দশক অতিবাহিত করার পর আবার মায়াবতীতে চলে যান। নিবেদিতার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আসেন ভগিনী সুধীরা। শারীরিক কারণে তিনি তখন আমেরিকায় যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি আমেরিকায় থেকে যান। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসে বিদ্যালয়ের কাজে পুনরায় যোগ দেন। বিদ্যালয় চললেও তাঁর ঈপ্সিত পথে নয়, তখন বিদ্যালয়ের ভার ভগিনী সুধীরার হাতে ছেড়ে দিয়ে আলমোড়ায় চলে যান। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্ন শরীরে চলে যান আমেরিকায়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ ২৭ মার্চ জাহাজে ওঠার আগে একটি নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচনা ও বক্তৃতা থেকে বোঝা যায় তিনি বেদান্তের বাণী সম্যকভাবে বুঝেছিলেন। তাঁর অসুস্থ শরীর থেকে নির্গত হোত এক অসাধারণ শক্তি। সেই শক্তির সঞ্চালক ছিলেন অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ।

॥ ৬ ॥

এরপর আমরা যাঁর কথা বলব তিনি হলেন সারা এলেন ওয়াল্ডো। বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল একজনকে যিনি তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীকে সযত্নে রক্ষা করতে পারবেন। তিনি অবহিত ছিলেন যে ঐ প্রেরণা- দায়ী উক্তিগুলি তাঁর নিজের নয়। বস্তুত পৃথিবীর মানুষ যখন ভুল পথে চলছে তখন তিনি রামকৃষ্ণের প্রেরণাদায়ী মন্ত্রের বার্তাবহ মাত্র। সারা এলেন ওয়াল্ডো সেই কাজ যথাযথ পালন করেন। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে শিকাগোয় প্রথম বক্তৃতার দিন বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন করেন এবং বক্তৃতা শুনে তাঁর দার্শনিক সত্তা তৎপর হয়ে ওঠে। ওয়াল্ডোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির দায়িত্ব তাঁর উপর ছেড়ে দিলেন বিবেকানন্দ। এছাড়া বিবেকানন্দের রান্না ও সেবাযত্ন তিনিই করতেন।

বিবেকানন্দের বাণীকে তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি সেই সময় ছিলেন 'বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ'। 'Inspired talks' গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের কথা ও বাণীকে তিনি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থটিরই বঙ্গানুবাদ 'দেববাণী'। ওয়াল্ডো সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন—'আমার চিন্তা ও শব্দগুলি এত সঠিক ভাবে কিভাবে তুমি ধরে রাখ? মনে হচ্ছে আমি যেন নিজেই আমার কথা শুনছি।' রাজযোগ গ্রন্থটি শ্রুতিলিখনের জন্য তাঁর উপর স্বামীজী নির্ভর করেছিলেন। ওয়াল্ডো বলতেন এই গ্রন্থটি লেখার পূর্বে বিবেকানন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন আর ওয়াল্ডো থাকতেন কালিতে কলম ডুবিয়ে নিমগ্ন। স্বামীজী যখন যা বলতেন তখন তাঁর সেই ধ্যানানুভূত উপলব্ধির প্রেরণাদায়ক কথা ওয়াল্ডো লিখে চলতেন নিবিষ্ট চিত্তে। পরবর্তীকালে তিনি স্বামীজীর অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দৃষ্টিশক্তি কমে এলে অন্য ভক্তের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। ওয়াল্ডোর বিবেকানন্দের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল। বিভিন্ন অবস্থায় তিনি বিবেকান্দের আচরণের যে পরিচয় রেখে গেছেন তা অমূল্য। তাঁর বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বর্ণনা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। 'বিবেকানন্দের উদ্বুদ্ধ' হওয়া চিন্তা চেতনা সম্বলিত গ্রন্থ আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

॥ ৭ ॥

ইংলণ্ডে বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচারে এবং বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যিনি বিবেকানন্দকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি ই. টি স্টার্ডি। বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যে তখন স্টার্ডি আলমোড়ায় তপস্যানিরত ছিলেন। ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে তাঁর তীব্র আগ্রহ ছিল। আলমোড়ায় স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে ইংলণ্ডে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে পত্রালাপ করেন। মিস হেনরিয়েটা মূলার স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শুনে স্টার্ডিও তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অগাস্ট স্বামীজী প্যারিসে উপস্থিত হলেন। ঐ বছরই তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে মূলারের অতিথি হলেন। জুয়ানডাফ হাউজ, রিজেন্ট স্ট্রীট, কেমব্রিজে থাকার পর তিনি স্টার্ডির বাড়িতে চলে যান। তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল হাই ভিউ, ক্যাভার্শ্যাম্, রিডিং। ইংলণ্ডে আসার অভিপ্রায় স্বামীজীর অনেক আগে থেকেই ছিল। শ্রীমতী মূলার ও শ্রীযুক্ত স্টার্ডির আহ্বান তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

ইংলণ্ডে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাব প্রচারে এঁরাই প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এঁদের সূত্রেই বহু মানুষের সংযোগ স্থাপিত হল এবং চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। তিনি নিয়মিত বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য আগন্তুকের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। এখানেও তিনি কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্টার্ডির সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন বলে ইংলণ্ডে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবপ্রসারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ফলপ্রসূ হয়েছিলেন। এছাড়া শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলার তো ছিলেনই। লেডি ইসাবেল তাঁর কাজে সহায়ক হয়েছিলেন। লণ্ডনে নানা বক্তৃতা দেবার পর শিক্ষিত ইংরেজরা স্বামীজীর অভিমত, বাগ্মিতা বিষয়ে উৎসুক হয়ে উঠলেন। আর জ্ঞানস্পৃহা বাড়াবার জন্য হলেন উদ্যোগী। স্টার্ডি 'ভক্তি' সম্পর্কে বিবেকানন্দের একটি পুস্তকের অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। স্টার্ডি 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় লিখেছিলেন—'স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে আগমনের ফলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঠিকঠিক খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে এবং তাঁহাদের নিকট শুধু উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে যে এদেশে চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত একদল লোক আছেন যাঁহারা ভারতের প্রাণপ্রদ চিন্তাধারার দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হইতেন।'[৩৬]

ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনোয় বিবেকানন্দ তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন সতীর্থ সন্ন্যাসীকে ভারতবর্ষ থেকে আনবার জন্য প্রয়াসী হলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস তখন ফলপ্রসূ হয়নি। অগত্যা তিনি ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় ফিরে গেলেন। এই সময় বেদান্ত প্রচারে খানিকটা ভাঁটা পড়ল। তবুও স্টার্ডি এবং মিস হেনরিয়েটা মূলার বিবেকানন্দের ভাবপ্রসারের পরিবেশটি ধরে রাখতে চাইলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে দ্বিতীয়বার এসে পৌঁছলেন এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে। এর মধ্যে ১ এপ্রিল স্বামী সারদানন্দ কলকাতা থেকে ইংলণ্ডে এলেন বেদান্ত প্রচারের জন্য। স্টার্ডির বাড়িতেই তিনি উঠেছিলেন। এই সূত্রেই বিবেকানন্দের সঙ্গে সারদানন্দের দীর্ঘ তিন বছর পর মুখোমুখি দেখা হল। বিবেকানন্দ লণ্ডনের ৬৩ নং সেন্ট জর্জেস রোডের ভাড়া বাড়িতে মূলার-এর অতিথি হিসাবে বাস করতেন। জ্ঞানযোগ-রাজযোগ ও ভক্তিযোগের আলোচনা তিনি এখানেই শুরু করেন। তাঁর বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্য যেমন পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করতো তেমনই বহু হৃদয়ে ভগবত ভাবের উদ্দীপনা জাগাতো। লণ্ডনে বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের ক্ষেত্রে মূলার ও স্টার্ডির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

বিবেকানন্দের দুই অনুরাগী-ভক্ত সেভিয়ার দম্পতির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। একসময়ে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে ক্যাপ্টেনের কাজ করতেন মিস্টার সেভিয়ার। শেক্সপীয়রেব জন্মস্থানে তিনি বাস করতেন। সেভিয়ার ৪৯ বছর বয়সে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হন। স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে সেভিয়ার দম্পতির জীবনের ধারা পাল্টে যায়।

নিবেদিতা যেমন ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে স্বামীজীর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, তেমনি সেভিয়ার দম্পতির আত্মত্যাগ ছিল স্বামীজীর কাছে অসাধারণ। দ্বিতীয় বার লণ্ডনে যাবার পর, সেভিয়ার দম্পতি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁবা স্বামীজীর সঙ্গে ভারতেও আসেন। 'মায়াবতী' কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। হেনরিয়েটা মূলাব ও সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর ইউরোপ যাত্রাব খরচ যুগিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের লণ্ডন থেকে স্বদেশে যাত্রাকালে তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন। ইংলণ্ড থেকে বিদায় উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় স্টার্ডি একখানি বিদায় অভিভাষণ সমর্পণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। অতে বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সময় তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি সেই বক্তৃতায় উল্লেখ করেন—'বোম সাম্রাজ্যের শান্তির সুযোগ পেয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারিত হয়েছিল।' নিবেদিতা তা উপলব্ধি করে পরবর্তী কালে জানিয়েছেন—'তাঁহার কথার তাৎপর্য হয়তো এই ছিল যে, এরূপ সময়ও আসিবে তখন ভারতীয় প্রচারবর্গের এমন এক সুবিশাল দলকে পাশ্চাত্যে দেশে দেখা যাইবে যাহারা, স্বামীজী যে ফসল অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহা কাটিয়া ঘরে তুলিতে ব্যস্ত থাকিবে এবং দূর ভবিষ্যতে কাটিবার জন্য নিজেরাও নতুন ফসল প্রস্তুত করিবে।'[৩৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমেরিকায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার মিসেস ওলিবুলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই আতিথ্য গ্রহণের ফলে তিনি হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের উপরে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রাচ্য দর্শন বিষয়ে অধ্যাপনা করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানান, কিন্তু বিবেকানন্দ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিবেকানন্দের কাছে এই আমন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত গৌরবের। সেই গৌরব পরাধীন ভারতবাসীর কাছে অবশ্যই স্বর্ণখচিত। একথা আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমেরিকায় বিভিন্ন বক্তৃতা ও আলোচনায় বিবেকানন্দ যে আলোড়ন তুলেছিলেন তার আয়োজনের

নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে মিসেস ওলিবুল অন্যতমা।

বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলের স্ত্রী মিসেস সারা ওলিবুল আমেরিকায় বিবেকানন্দের অবস্থানকালে রামকৃষ্ণ ভাব প্রচার ও বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তাঁর বাড়িতে তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বাড়িতে আসার পর বিবেকানন্দ গ্রীণ একরে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘন্টা বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন ও শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মিসেস ওলিবুল বিবেকানন্দকে পাঁচশো ডলার দিয়েছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার করছিলেন তখনও তাঁকে ওলিবুল সাহায্য করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম মানুষী যিনি বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনেব প্রাণকেন্দ্রে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন। নিবেদিতা ও জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল এই সূত্রেই। তিনি জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধানকেন্দ্র বেলুড মঠ ও সন্ন্যাসীদের বাসভবন তৈরীর সময় অর্থ সাহায্য করেছিলেন। বিবেকানন্দের সান্নিধ্য তিনি গভীর ভাবে পেয়েছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকা পরিভ্রমণের সুযোগও পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবপ্রসারে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিসেস ওলিবুল শুধু স্বামীজীকে নয়, বিবেকানন্দের সতীর্থদেরও সেবা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতে এবং বহির্ভারতে অগ্রগতির ক্ষেত্রে মিসেস ওলিবুলের ভূমিকা স্মরণীয়। তাই বিবেকানন্দ তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করে অধ্যাত্ম সচেতন অভিমত জানিয়েছেন তাঁর প্রতি একটি চিঠিতে—'You have been the one friend with whom Sri Ramakrishna has become the goal of life that is the secret of my trust in you.'[38]

লিঁয়ো ল্যাণ্ডসবার্গ রাশিয়ার এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পরে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে স্বজাতিসুলভ সব গুণই বিদ্যমান ছিল—আবেগ, কল্পনা, বিদ্যোৎসাহ ও প্রতিভাশালী

মানুষের সান্নিধ্যে যাওয়া ইত্যাদি। ইউরোপের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় — দর্শন, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি — তাঁর চিন্তা রাজ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য ও পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিল যা অনন্যসাধারণ। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন তেজোপূর্ণ ও সৌন্দর্যময়। বসন, ভূষণ ও নিজের শরীর সম্পর্কে তাঁর ঔদাসীন্য দেখে এবং স্বার্থচিন্তাহীন ভাবাবেগেরই মতো প্রতীয়মান তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করে স্বামীজী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পয়সাটি পর্যন্ত লিঁয়ো ভিক্ষুক-দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দিতেন। আর তিনি যে ভাণ্ডার থেকে দান করতেন তা ছিল যাচকেরই ভাণ্ডার সদৃশ শূন্য। তিনি নিউইয়র্কে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার পব তিনি সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে স্বামীজীর কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বাড়ি ভাড়া করলেন, গৃহস্থালির কাজ সহস্তে তুলে নিয়েছিলেন এবং বিবেকানন্দের সেক্রেটারি বা সচিবের ভূমিকা নিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন স্বামীজীর দক্ষিণ হস্ত। তিনি স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীব কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন এবং পরবর্তী কালে সন্ন্যাসধর্মও গ্রহণ কবেছিলেন, তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী কৃপানন্দ। তিনি ছিলেন স্বামীজীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ব্রুকলিন ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াতের ফলে বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। সেই সময় লিঁয়ো আমেরিকার অভিজাত পরিবেশের বাইরে অনুন্নত একটি অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া করে স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা করলেন। স্বামীজী ১৮৯৫-এর ২৭ জানুয়ারী রবিবার ঐ গৃহে পদার্পণ করলেন এবং জুন মাস পর্যন্ত ঐ বাড়িটিই হল তাঁর স্থায়ী কর্মকেন্দ্র। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের ভার তিনি ইউরোপ যাত্রার পূর্বে লিঁয়ো এবং মিসেস ওয়াল্ডোর উপরে অর্পণ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের ক্ষেত্রে এই ভাবে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যের শিষ্য-শিষ্যা-অনুরাগীরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁরা ছাড়া আরো অনেক পাশ্চাত্য অনুরাগী-অনুরাগিনী পাশ্চাত্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাব প্রসারে স্বামীজীকে সাহায্য করেছিলেন নানা ভাবে এবং পরবর্তীকালেও, তাঁদের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করলেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে তাঁদের ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয় এবং বরণীয়। পাশ্চাত্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে সেদিন এই সব অনুরাগীরা নিরলস ভাবে সাহায্য করেছিলেন বলে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের নানা স্থানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বেদান্ত কেন্দ্র যা আজ পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে

এবং দিচ্ছে। আর ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, ও শিক্ষাপ্রসারে এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা কাজে পাশ্চাত্য অনুরাগীদের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্থিক, মানসিক, কায়িক এবং বৌদ্ধিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এঁরাই। এঁদেরই উদ্যোগে বিবেকানন্দের রচনাবলী আর অন্যান্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। সর্বোপরি বেহিসেবী নিঃস্বার্থপর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এঁরাই রামকৃষ্ণ মিশনকে শতবর্ষের আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা ৩৭১, পৃঃ ৫৮৬
২. পত্রাবলী, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা ২৮৮, পৃঃ ৪৬২-৪৬৩, (পরের অংশগুলি এই পত্রাবলী গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃত)
৩. ভগিনী নিবেদিতা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৯৯২, পৃঃ ১৪
৪. ঐ. পৃঃ ১৫—১৬
৫. ঐ. পৃঃ ১৬
৬. ঐ. পৃঃ ১৭
৭. ঐ. পৃঃ ১৭
৮. ঐ. পৃঃ ২৫
৯. উদ্ধৃত হয়েছে ঐ গ্রন্থ থেকে, পৃঃ ২৮
১০. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা—৩৫৩, পৃঃ ৫৫৬
১১. ঐ, পত্রসংখ্যা—৩৫৭, পৃঃ ৫৬০
১২. ঐ, পত্রসংখ্যা—৩৬১, পৃঃ ৫৬৬
১৩. ঐ, পত্রসংখ্যা—৩৬৭, পৃঃ ৫৮০
১৪. ঐ, পত্রসংখ্যা—৩৭১, পৃঃ ৫৮৫—৫৮৬
১৫. ঐ, পৃঃ ৫৮৬
১৬. ঐ, পত্রসংখ্যা—৩৯৪, পৃঃ ৬১০
১৭. ঐ, পত্রসংখ্যা—৪২১, পৃঃ ৬৩৯
১৮. ঐ, পত্রসংখ্যা—৪৫২, পৃঃ ৬৬৭
১৯. ঐ, পত্রসংখ্যা—৪৬৩, পৃঃ ৬৭৭
২০. ঐ, পত্রসংখ্যা—৪৬৩, পৃঃ ৬৭৭

২১. ঐ, পত্রসংখ্যা—৬৬৯, পৃঃ ৫৮২
২২. ঐ, পত্রসংখ্যা—৩৭৬, পৃঃ ৫৯২
২৩. নিবেদিতা লোকমাতা,—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব, ১৩৯৮, পৃঃ ১৩
২৪. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা—৪০৮, পৃঃ ৬২৫
২৫. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা—৩৭১, পৃঃ ৫৮৫—৫৮৬
২৬. রচনা সংগ্রহ, সরলাবালা সবকার, চিত্রা দেব সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৯, পৃঃ ২০৭
২৭. 'শতরূপে সারদা', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১৩৯২, পৃঃ ১৪৭
২৮. রচনা সংগ্রহ, সরলাবালা সরকার, চিত্রা দেব সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫
২৯. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৩৩৪, পৃঃ ৫৭৩
৩০. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ—তৃতীয় খণ্ড, ১৩৭৩, পৃঃ ৮৪
৩১. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ—তৃতীয় খণ্ড, ১৩৭৩, পৃঃ ১২৭
৩২. নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, ১৩৯৮ পৃঃ ২৭
৩৩. ঐ, পৃঃ ২৭
৩৪. ঐ, পৃঃ ২২
৩৫. Western Women in the Foot steps of Swami Vivekananda, Ramkrishna Sarada Mission, New Delhi, 1995, p.209

৩৬. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৮৫, পৃঃ ২৩৩
৩৭. ঐ, পৃঃ ৩২৯
৩৮. Western Women in the Foot Steps of Swami Vivekananda Ramkrishna Sarada Mission. p.80

রামকৃষ্ণ মিশন : নিয়মাবলী প্রতীক উদ্দেশ্য কার্যাবলী-গঠনপ্রণালী আদর্শ ও বিশেষত্ব

স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডের রিডিং থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তাতেই প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়মাবলী, কার্যাবলী ও গঠনপ্রণালী কেমন হবে তা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন,—

১) মঠের জন্য একটি যথেষ্ট স্থান সহিত বাটী ভাড়া লইবে, অথবা বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট ঘর হয়। একটি বড় হল পুস্তকাদি রাখিবার জন্য এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোটঘর—সেখানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয়—আরো একটি বড় হল ঐ বাটীতে থাকা আবশ্যক, যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা সাধারণের জন্য হইবে।

২) কোন লোক মঠে আসিলে, সে যাহার সহিত দেখা করিতে চায়, তাহারই সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে, অপরকে (অপরের) অসুবিধা না করে।

৩) এক-একজন পরিবর্তন করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা উক্ত হলে সর্বসাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাকিবে—যাহাতে সাধারণ লোক যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চায়, তাহার সদুত্তর পায়।

৪) যে যাহার আপনার ঘরে বাস করিবে—বিশেষ কার্য না পড়িলে আর এক জনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুস্তকাগারে যাহার পড়িবার ইচ্ছা হইবে, যাইয়া পড়িবে। কিন্তু তথায় তামাক খাওয়া বা অপরের সহিত কথা বলা নিষেধ করিবে। নিঃশব্দে পাঠ করিতে হইবে।

৫) সারাদিন সকলে পড়ে (অর্থাৎ সকলে মিলে), একটা ঘরে বাজে

কথা কওয়া ও বাহিরের লোক, যে-সে আসছে ও সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে, তাহা একেবারেই নিষেধ।

৬) কেবল যাহারা ধর্মজিজ্ঞাসু, তাহারা শান্তভাবে আসিয়া সাধারণ হলে বসিয়া থাকিবে ও যাহাকে চায় তাহার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে। অথবা কোনো সাধারণ জিজ্ঞাস্য থাকে, সেদিনকার জন্য যিনি সেই কার্যের ভার পাইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবে।

৭) একজনের কথা আর একজনকে বলা বা গুজোগুজি, পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করিবে।

৮) একটি ছোট অফিস ঘর হইবে। যিনি সেক্রেটারি, তিনি সেই ঘরে থাকিবেন, ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লেখার সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্ত থাকিবে। তিনি সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন, ও যে-সমস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি আসে, তাহা তাঁহার নিকট আসিবে, ও তিনি পত্রাদি না খুলিয়া যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাঁটিয়া দিবেন। পুস্তক ও পত্রিকাদি পুস্তকাগারে যাইবে।

৯) একটি ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য। তদ্‌ভিন্ন অপর কোনো স্থানে তামাক খাইবার আবশ্যক নাই।

১০) যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদি করিতে চান, তাঁহাকে ঐ সকল কার্য মঠের বাহির যাইয়া করিতে হইবে। ইঁহার অন্যথা তিলমাত্র না হয়।

শাসন সমিতি:

১) একজন মহান্ত প্রতি বৎসর নির্বাচন করিবে অধিক লোকের মত লইয়া। দ্বিতীয় বৎসর আর একজন ইত্যাদি।

২) এ বৎসর রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মহান্ত কর। তদ্বৎ আর একজনকে সেক্রেটারি কর; তদ্বৎ আর একজন পূজাপত্র ও রান্নাবান্নার তদারক করিবার জন্য নির্বাচন কর।

৩) সেক্রেটারির আর এক কাজ—তিনি সকলের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখিবেন। এই বিষয়ে তিনটি উপদেশ আছে: প্রথম—প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটি নেয়ারের খাটিয়া ও তোষক ইত্যাদি থাকিবে। প্রত্যেককে আপনার আপনার ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে। দ্বিতীয়—রান্না ও খাওয়ার জন্য জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোষহীন হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; কারণ দুষ্ট বা অপরিষ্কৃত জলে ভোগ রাঁধিলে মহাপাপ হয়। তৃতীয়—শরৎকে (স্বামী সারদানন্দ) যে প্রকার কোট করিয়া

দিয়াছ, ঐ প্রকার গেরুয়া আলখাল্লা প্রত্যেককে দুটি করিয়া দিবে এবং কাপড়-চোপড় যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহা দেখিবে, বাটী অত্যন্ত পরিষ্কার যাহাতে হয়—নীচের উপরের সমস্ত ঘর—সেদিকে নজর রাখিবে।

৪) যে-কেউ সন্ন্যাসী হইতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে—এক বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে—তাহার পর সন্ন্যাসী করিয়া দিবে।

৫) ঠাকুরপূজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে একজনকে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে।

কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ:

১) কোন স্ত্রীলোক যদি কোন সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিতে আইসে তাহা হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্তা কহিবে। কোন স্ত্রীলোক, অন্য কোন ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবেনা, ঠাকুরঘর ছাড়া।

২) কোন সন্ন্যাসী মেয়েদের মঠে বাস করিতে পাইবে না। যদি না শুনে, মঠ হইতে দূর করিবে। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভালো।

৩) দুশ্চরিত্রলোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। কোন অছিলায় তাদের ছায়া যেন আমাদের ঘরে না পড়ে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দুশ্চরিত্র হয়, যে-কেহ হউক—তৎক্ষণাৎ বিদায় কর। দুষ্ট গরুর দরকার নাই। প্রভু অনেক ভালো ভালো লোক আনিবেন।

৪) শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে এবং প্রচারের গৃহে ও সময়ে যে-কোন স্ত্রীলোক আসিতে পারেন; কিন্তু উক্ত সময় অতীত মাত্রেই চলিয়া যাইতে হইবে।

৫) কোন ক্রোধ বা ঈর্ষা প্রকাশ বা গোপনে একজনের নিন্দা আর একজনের কাছে কদাচ করিবে না।... একজন আর একজনের দোষ দেখিতে খুব মজবুত—আপনার দোষগুলি কেহ ছাড়িবে না!

৬) আহারের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় যেন ঠিক হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্য একটি আসন ও খাইবার জন্য একটি ছোট চৌকি থাকিবে। আসনে বসিয়া চৌকির উপর থালা রাখিয়া খাইবে—যে প্রকার রাজপুতানায় খাওয়া হয়।

কর্মচারী সভা (Office-Bearers)

সমস্ত অফিসার-কর্মকর্তা নির্বাচন—তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারা। 'যে প্রকার বুদ্ধ মহারাজের আজ্ঞা' অর্থাৎ একজন প্রপোজ (প্রস্তাব)

করিল, 'অমুক এক বৎসরের জন্য মহান্ত হউক'—সকলে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কাগজে লিখিয়া কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। যদি 'হ্যাঁ' অধিক হয় তিনি মহান্ত হইবেন ইত্যাদি।

যদিও তোমরা উক্ত প্রকারে অফিসার-কর্মকর্তা বাছিয়া লইবে তথাপি আমি suggest (প্রস্তাব) করি যে, এ বৎসর রাখাল মহান্ত, তুলসী সেক্রেটারি ও ট্রেজারার, গুপ্ত লাইব্রেরিয়ান, শশী, কালি, হরি ও সারদা পর্যায়ক্রমে পড়াইবার, উপদেশ দিবার ভার ইত্যাদি লউক।

মতামত সম্বন্ধে এই যে,—যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার ইত্যাদি বলে মানে উত্তম কথা, না মানে তাও উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং progressive (প্রগতিশীল) অর্থাৎ পুরনোরা সব একঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি-জ্ঞান ও কর্মে উৎকৃষ্টভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারী করতে হবে।... পুরানোরা বেশ ছিলেন বটে। কিন্তু এই যুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তিদান। আবাল বৃদ্ধবনিতা ও সকল কেষ্ট বিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক। অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে অন্য সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের, নিষ্ঠা ভিন্ন-তেজ হয় না—তা না হলে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয়না। আব ও সব পুরনো ঠাকুরদেবতা বুড়িয়ে গেছে—এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ।

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বোধ হয় এবং এই সকল নিয়ম পালন কর, তাহলে আমি মঠ ভাড়া এবং সমস্ত খরচ পাঠিয়ে দেব নতুবা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ একদম... মনে রেখো যে তাঁর কৃপায় বড় বড় মানুষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তাঁর দয়া পড়বে... এখনও সময় আছে সাবধান! Obedience is the first duty (আজ্ঞাবহতাই প্রথম কর্তব্য)—যা বলি, করে ফেলো দেখি। এই কটা ছোট ছোট কাজ কর প্রথমে দেখি—তারপর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে।[১]

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল ইংলন্ডের রিডিং থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী-কার্যাবলী (যা আগে উল্লেখিত) কি হবে এবং কিভাবে তা রূপ পরিগ্রহ করবে সে সম্পর্কে বিবেকানন্দ দীর্ঘ নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন, তা থেকেই বোঝা

যায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবার ধ্যান-ধারণা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়-চেতনায় বহু আগেই সাকার হয়ে উঠেছিল। এই নির্দেশনামাই সামান্য অদল-বদল করে পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী-কার্যাবলী রূপে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণও বটে—এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমতটিও চমৎকার। নিয়মবদ্ধ হওয়া ভালো নয় বটে, কিন্তু অপক্ক অবস্থায় নিয়মের বশে চলা আবশ্যক—অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি; দ্বিতীয়ত—অলসমনে অনেক পরচর্চা, দলাদলি প্রভৃতি ভাব সহজেই আসে।'[২] মঠ-মিশন পরিচালনার জন্যে তিনি কতগুলি বিভাগের কথা সংশ্লিষ্ট চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলি আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করবো—

বিভাগ: মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা—১) বিদ্যাবিভাগ, ২) প্রচারবিভাগ, ৩) সাধনবিভাগ।

বিদ্যাবিভাগ: যাহারা পড়িতে চায় তাহাদের জন্য পুস্তকাদি ও অধ্যাপক সংগ্রহ—এই বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে তাহাদের জন্য অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবে।

প্রচারবিভাগ: মঠবাসী ও প্রবাসী। মঠবাসী প্রচারকেরা প্রত্যহ শাস্ত্রাদি পাঠ ও প্রশ্নোত্তরাদি দ্বারা জিজ্ঞাসুদের শিক্ষা দিবে। প্রবাসীরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠস্থাপনের চেষ্টা করিবে।

সাধনবিভাগ: যাঁহারা সাধনভজন করিতে চান, তাঁহাদের আপন আপন ঘরে সাধনভজনের যাহা আবশ্যক—তাহার সহায়তা করা ইত্যাদি। কিন্তু একজন সাধন করেন বলিয়া আর কাউকে যে পড়িতে দিবেন না, অথবা প্রচার করিতে দিবেন না—এ প্রকার হয় না। যিনি উৎপাত করিবেন, তাঁহাকে অন্তর (তফাত) হইতে তৎক্ষণাৎ বলিবে—ইহাতে অন্যথা না হয়।

মঠবাসী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি-জ্ঞান-যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিবেন, এবং তৎ সম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে লটকাইয়া দিবেন—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তি জিজ্ঞাসু জ্ঞান শিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি। বামাচার সাধনের উপযুক্ত তোমরা কেহই নহ। অতএব বামমার্গের নামগন্ধও মঠে যেন না হয়। যিনি একথা

না শুনিবেন, তাঁহার স্থান বাহিরে। ও-সাধনের নাম পর্যন্ত যেন মঠে না হয়। 'তাঁর' ঘরে যে-দুর্বৃত্ত বিকট বামাচার ঢোকায়, তার ইহ্-পরকাল উৎসন্ন হইবে।'[৩]

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিভিন্ন নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চরিত্রের সাধারণ দোষগুলিও ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যেমন পুস্তকাগারে তামাক খাওয়া বা অপরের সঙ্গে কথাবার্তা একেবারে নিষেধ। একজনের কথা আর একজনকে বলা বা 'গুজোগুজি' বা পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করতে হবে। সমস্ত আয়ব্যয়ের যথাযথ হিসেব রাখতে হবে। সেক্রেটারি বা সম্পাদকের ওপর সবিশেষ ন্যস্ত হবে। পত্রাদি না খুলে যার নামে আসবে তাকে বিতরণ করতে হবে অর্থাৎ একজনের চিঠি আরেকজন পড়তে পারবে না। যিনি গালমন্দ বা ক্রোধাদি করতে চান তাঁকে এইসব কাজ মঠের বাইরে গিয়ে করতে হবে। সঙ্ঘের কর্মধারার প্রতি সংগতি রেখেই তিনটি বিভাগের কথা বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। তা হল,—বিদ্যাবিভাগ, প্রচারবিভাগ ও সাধনবিভাগ। মঠে আগত নারীদের সঙ্গে সন্ন্যাসীরা কিভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন এবং কিভাবে মঠবাসীরা আসনে বসে চৌকির ওপর থালা রেখে রাজস্থানী স্টাইলে খাওয়া-দাওয়া করবেন তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

পাশ্চাত্য থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর আলমবাজারের মঠে বসে বিবেকানন্দ যে নিয়মাবলী রচনা করলেন তা আরও সুবিন্যস্ত—ঘনীভূত। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও তার নিয়মাবলী ও কার্যাবলী প্রসঙ্গে এই সময়ে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। এখানে তিনি তন্নিষ্ঠ ভাবে যা বলেছিলেন তা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ, যিনি পরে মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এই সময়েই বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন : 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে—সু-নিয়মের দ্বারা এই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।'[৪]

স্বামী বিবেকানন্দের তৈরী মঠের নিয়মগুলি বিশেষ চিন্তা প্রসূত, প্রজ্ঞাদৃপ্ত এবং সুবিস্তৃত। আমরা এবার সেদিকে দৃষ্টি ফেরাবো কেননা এই নিয়মাবলীর মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশনের চলার পথটিও বিশেষভাবে গ্রথিত।

স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত নিয়মাবলী :

মঠ (ক) :

১) শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে।

২) যেভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে, স্ত্রীলোকদিগের মঠও ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে। বিশেষ এই, স্ত্রীলোকদিগের মঠে পুরুষের কোনো সংস্রব থাকিবে না এবং পুরুষদিগের মঠে স্ত্রীলোকের কোনো প্রকার সংস্রব থাকিবে না।

৩) হিমাচলে কোনো উপযুক্ত স্থানে ঐ প্রকার দুইটি মঠ স্থাপিত হইয়া ঐ প্রকার নিয়মে পরিচালিত হইবে।

৪) স্ত্রী মঠ—যতদিন পর্যন্ত কার্য সম্পাদনের সমর্থা স্ত্রী না পাওয়া যায়, ততদিন দূর হইতে পুরুষদের দ্বারা চালিত হইবে; তাহার পর উঁহারা আপনাদের কার্য আপনারাই করিয়া লইবে।

৫) বিদ্যার অভাবে ধর্ম সম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকিবে।

৬) ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অতএব ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।

৭) প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না।

৮) এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোনো দেশে আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রেরই প্রয়োজন। কোনো দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অতীব প্রয়োজন। এই প্রকার যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে।

৯) ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধার্মিক হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

১০) সমাজ সংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে না। কারণ সামাজিক দোষ বা কুরীতি সমাজরূপ-শরীরের ব্যাধিবিশেষ। ঐ শরীর বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঐ সকল কুরীতি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। অতএব, সামাজিক কুরীতির উদ্ঘোষণে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া সমাজশরীর পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য।

১১) চরিত্রবল না হইলে মনুষ্য কোনো কার্যেই সক্ষম হয় না। এই চরিত্রবল বিহীনতাই আমাদের কার্যপরিণত-বুদ্ধির অভাবের একমাত্র কারণ।

১২) আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়। অতএব এই মঠে প্রত্যেক কার্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে।

১৩) গুরুর উপর শিষ্যের একান্ত বিশ্বাস থাকা উচিত। সেই প্রকার গুরুও শিষ্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাসবান না হইলে শিষ্যের উন্নতি হইতে পারে না। গুরু শিষ্যের উপর বিশ্বাস করিলে শিষ্যের শক্তি স্ফুরিত হয়। শিষ্যের বিশ্বাসে গুরুর শক্তি স্ফুরিত হয়। শিষ্যের বিশ্বাসে গুরুর শক্তি বিপুলতা লাভ করে।

১৪) এই মঠের সমস্ত কার্যই মঠস্থ সর্বাঙ্গের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত হইবে। সর্বসম্মতির অভাবে অধিক সংখ্যকের সম্মতিতে হইবে।

১৫) যে কেহ কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান—ইহাদের এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণ তৎপর, তিনি এই মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারিবেন।

১৬) মঠের অঙ্গগণ দুইভাগে বিভক্ত—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শব্দে যাহারা আকুমার ব্রহ্মচারী ও যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিবে, তাহাদিগকে বুঝাইবে।

১৭) খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ যাহারা পুনর্বার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে।

১৮) পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যে সকল বালককে স্বেচ্ছায় শিক্ষার নিমিত্ত এ মঠে পাঠাইবেন, অথবা যে সকল বালক অনাথ, তাহারাও এই মঠে গৃহীত ও শিক্ষিত হইবে, কিন্তু মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে না। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করা বা না-করা তাহাদের ইচ্ছাধীন।

১৯) আপাতত, কেবল সদ্বংশজাত হিন্দু বালকই গৃহীত হইবে।

২০) ধর্মের মধ্য দিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোনো ভাব চলে না। এই জন্য অর্থ, বিদ্যা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্মের মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে।

২১) এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত কবিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ 'টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' করিতে হইবে; এইটি প্রথম কর্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে সংযুক্ত হইবে।

২২) ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল—'নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হওয়া;' এই ভেদ নাশ না হইলে কোনো কল্যাণের আশা নাই। এই জন্য সকল স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে।

২৩) অতএব এই মঠে যাঁহারা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহারা সর্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, এই মঠ কোন মতেই বাবাজীদিগের ঠাকুরবাড়িতে পবিণত না হয়।

২৪) ঠাকুরবাটী দ্বারা দুই-চারিজনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই-দশজনের কৌতূহল চরিতার্থ হয়; কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।[৫]

মঠ (খ) :

১) প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ।

২) সর্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যের একতা ঐক্যবন্ধনের প্রধান কারণ।

৩) আমাদের ঠাকুর মানেব জন্য আসেন নাই; আমরা তাঁহার দাস, আমরাও মান ভোগের আকাঙ্ক্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৪) এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থাতেই থাকুন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে।

৫) এই ভাবটি সদা মনে জাগরূক থাকিলে আর বেচালে পা পড়িবে না।

৬) আজ্ঞাবহতাই কার্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্যন্ত

পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাপালন করিতে হইবে। সকল দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই মহাপাপ, সেই ভয় একেবারেই ছাড়িতে হইবে।

৭) অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোনো ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে তো একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।

৮) তাঁহার সেবক বা সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ হইলে কেহ এখানে আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার অগ্রে, 'আমি মন্দ দেখি কেন?' প্রথম ভাবা উচিত।

৯) পুরুষানুক্রমে উদ্দেশ্যের ঐকতান (Continuance of Policy) মহৎ কার্য সাধনের ও উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ আমাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ যে কার্যপ্রণালী পরিচালিত করিবেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহাই যেন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয়েন।

১০) সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তি-সংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সঙ্ঘের অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহ-পরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১১) যদি কাহারও পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সমস্ত সঙ্ঘের নিকট আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ যাহা বিধান করেন, তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে।

১২) যে কেহ অপরাধ করিয়া তাহা অস্বীকাবপূর্বক সঙ্ঘের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হন, তিনিও ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১৩) কারণ, এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদাবিরাজিত।

১৪) একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।"

বিবেকানন্দ মঠ সম্পর্কে যে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করালেন তা শুধু মঠ পরিচালনার ক্ষেত্রেই নয়, একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মঠ ও মিশনের কর্মধারা স্বতন্ত্র হলেও ব্যাপক অর্থে দু'য়েরই উদ্দেশ্য এক—তা হল মানুষ-জগতের কল্যাণ সাধন। তাই

বিবেকানন্দ নির্দেশিত মঠের নিয়মের মধ্যেও মিশনের নিয়মাবলী মগ্ন ও সংযুক্ত হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ শুধু পথ চলারই হদিস দিলেন না, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অভিমত সংশ্লিষ্ট সংঘের সঙ্গে যুক্ত সন্ন্যাসী ও অনুরাগীদের সাধনপ্রণালী, ভক্তি ও উপাসনালয়ের প্রসঙ্গটিও তুলে ধরলেন। তবে এই শেষোক্ত নিয়মগুলি নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হওয়ার পর লিপিবদ্ধ হয়।

মত :

১) ঠাকুরের উক্তিসকল একত্র করিয়া তাহাকে একমাত্র শাস্ত্র করিলে তাঁহার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এইমাত্র ফল হইবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইব ও বহু বিবদমান ভাবে বিভক্ত এই সমাজকে আরও কোলাহলময় করিয়া তুলিব।

২) অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইবে ও গীতা যে প্রকার পুরাকালের ছিল সেই প্রকার ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্বাঙ্গসুন্দর বেদমতেব ব্যাখ্যা।

৩) অর্থাৎ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকারেরাই এক এই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন যে, সমগ্র বেদরাশিই এক কথা বলিতেছেন। সেই জন্য আপাত বিসংবাদী উক্তি সকলের মধ্যে স্বীয় মতের বিরুদ্ধে উক্তিগুলিকে বলপূর্বক আপন মতানুযায়ী অর্থকরণ দোষে দূষিত হইয়াছেন।

৪) পুরাকালে যে-প্রকার একমাত্র গীতা-বক্তা ভগবানই এই সকল আপাতবিবাদমান উক্তিসকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন, কালে অতীব বিশালতাপ্রাপ্ত সেই বিবাদ নিঃশেষে ভঞ্জন করিবার জন্যই তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

৫) এইজন্য তাঁহার উক্তি সকলের মধ্য দিয়া না পড়িলে ও তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া না দেখিলে বেদ-বেদান্ত বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। অর্থাৎ, এই যে সকল স্থূল দৃষ্টিতে বিসংবাদী শাস্ত্রোক্তি অধিকারী বিশেষে উপদিষ্ট ও ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নির্দিষ্ট, ইহা শ্রীভগবানই প্রথমে নিজের জীবনে প্রকাশ ও উপদেশ করেন এবং সমস্ত জগৎ বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে যে ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইবে, তাহা এই কেন্দ্র হইতেই ক্রমশ দূরবিসর্পী প্রভাবচক্রবাল দ্বারা অনুমিত হইতেছে।

৬) অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র এতদিন অজ্ঞানান্ধকাবে লুপ্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রদীপ উহাকে পুনঃপ্রকাশিত করিল।

৭) অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নূতন শাস্ত্র অনাবশ্যক। প্রাচীন অনাদি শাস্ত্র হইতে নূতন আলোক আসিতেছে; শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।

৮) ঠাকুরের উক্তিসকল উত্তমরূপে সংগৃহীত ও যে-সকল সেবক ঠাকুরের নিকট সর্বদা থাকিতেন তাঁহাদের দ্বারা পরিগৃহীত হইলে বেদের টীকারূপে পূজিত হইবে।

৯) ঠাকুরের ভাবের অনুকূল বেদার্থ করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা এই ভাব যেন সর্বদা মনে থাকে যে, তাঁহার সমস্ত উপদেশই জগতের হিতের জন্য। যদি কেহ কখনও কোনো অহিতকর বাক্য শুনিয়া থাকেন তাহা হইতে বুঝা উচিত যে, সে বাক্য অধিকারী বিশেষে প্রযুক্ত এবং অন্য লোকে পালন করিলে অকল্যাণকর হইলেও সে অধিকারীর জন্য মঙ্গলপ্রদ।

১০) ঐ প্রকার ঠাকুরের সমস্ত উক্তির মধ্যে ব্যক্তি বিশেষে উপদিষ্ট ও সার্বজনিক কল্যাণের জন্য উপদিষ্ট উক্তি বাছিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে সার্বজনিক-কল্যাণ প্রযুক্ত উপদেশসমূহই পুস্তকাগারে সংগৃহীত হইবে ও জনসাধাবণে প্রচারিত হইবে।

১১) অধিকারী বিশেষে উপদিষ্ট উপদেশ সকলও সংগৃহীত হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে—যাহা দ্বারা মঠের প্রচারকগণ ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ উপদেশ প্রদানে শিক্ষিত হইবেন।

১২) প্রভুব নিজের মুখের একটি উপদেশ এই যে, যাহারা বহুরূপী একবার দর্শন করিয়াছে, তাহারা বহুরূপীর একটিমাত্র রঙই জানে। কিন্তু যাহারা বৃক্ষের তলায় বাস করিয়াছে তাহারা বহুরূপীর সকল বর্ণই জ্ঞাত থাকে। এই জন্য যাঁহারা প্রভুর নিকটে সর্বদা বাস করিতেন ও যাঁহাদিগকে তিনি স্বীয় কার্যসাধনের জন্য পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মতি-ব্যতিরিক্ত কোনো উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে না।

১৩) জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের পরাকাষ্ঠা সমষ্টি স্বরূপ এরূপ অপূর্ব পুরুষ আর মানবজাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর যাঁহার চরিত্র, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী।

১৪) ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠনই এই যুগের উদ্দেশ্য ও তাহার জন্যই সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য।[৭]

সাধন প্রণালী :

১) শ্রীভগবান ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন সাধন শিক্ষা দিতেন। এই জন্য সাধন প্রণালীর কোনও সার্বজনীন নিয়ম হইতে পারে না।

২) তবে লোকসাধারণের জন্য কিঞ্চিত ভক্তি, ভজন ও কর্মে-পরিণত জ্ঞান (Practical Advaitism—'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর') শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৩) প্রভুর প্রদর্শিত সমুদয় সাধন-প্রণালী পূর্বোক্ত প্রকারে সংগৃহীত হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে এবং শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য থাকিবে, কারণ ব্যক্তিবিশেষের উদ্দিষ্ট সাধন অপর ব্যক্তির অনিষ্টকারকও হইতে পারে।

৪) জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্ত যে সকল সাধন প্রয়োজন সেই সকল সাধনই এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

৫) অতএব সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি একটিতেও ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ সুধায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই।

৬) আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তিসাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন তিনি মহত্তর কার্য করেন।

৭) এই শিক্ষার জন্য প্রথমত এই মঠ চতুর্বিভাগে বিভক্ত হইবে। যথা—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ। এবং প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপদেশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

৮) প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপযোগী পুস্তকাদি পাঠ হইবে ও অনুভূতির নিমিত্ত সাধন-শিক্ষিত হইবে।

৯) কিন্তু সকল বিভাগেরই অঙ্গদিগকে কিছু না কিছু কর্মবিভাগেব কার্য করিতে হইবে।

১০) 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। অতএব শরীর রক্ষার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনে যদি শরীর পাত হয়, পরম কল্যাণ বুঝিতে হইবে।

১১) গীতাদি শাস্ত্র এবং শ্রীভগবান স্বয়ংও বৃথা কঠোর তপস্যার প্রতিপক্ষ ছিলেন। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যে-সকল তপস্যা শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইলেও বিশেষ কল্যাণকর, সকলেরই ঐ সকল তপস্যা অভ্যাস করা আবশ্যক; নতুবা বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ করিবে।

১২) আমাদের উদ্দেশ্য বিলাসিতাও নহে, তপস্যাও নহে অথবা যোগও নহে। উদ্দেশ্য — ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভ।

১৩) অতএব যে কোনও উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্যসাধিত হইবে, আমরা মহাসমাদরে তাহাই গ্রহণ করিব।

১৪) শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ এখনও তাঁহাকে সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে-পাইতে পারেন, যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূল শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে। সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; তাহা না হইলে এই নগণ্য, অত্যল্পসংখ্যক অসহায় পরিতাড়িত বালকদিগের দ্বারা এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সংগঠিত হইত না।

১৫) অতএব এই সঙ্ঘের মধ্যে যদি কেহ শ্রীভগবানের উপদেশের অবিসংবাদী কোনো নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং তাহার সুফল যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে উহাও শ্রীভগবানের আদেশরূপে গৃহীত, আদৃত ও পালিত হইবে।

১৬) শ্রীভগবান কামিনী কাঞ্চনের ন্যায় আর কোনও ভাবকে যদি বারংবার ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন তাহা এই যে, ঈশ্বরের অনন্ত-ভাবকে ইতি-উতি করিয়া সীমাবদ্ধ করা।

১৭) যে কেহ ঐ প্রকারে শ্রীভগবানের অনন্ত-ভাবকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে সে নরাধম তাঁহার দ্বেষী।

১৮) সঙ্কীর্ণ সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯) কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণ শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

২০) ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি-বিশালতা, অতি-উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।

এরপরে 'ভক্তি' ও 'সাধনকক্ষ' সম্পর্কে ইংরেজিতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৮]

BHAKTI :

1. The methods of practising Bhakti such as the service unto the Lord, repetition of His name, singing devotional songs, etc. which were taught in the ancient times or are being taught in modern days or will be taught in future, will all be cordially accepted. But the point of caution in this regard is that often character is not built by Bhakti alone. It has to be specially borne in mind that nobody is qualified for Bhakti unless he is moral.

2. It also should be remembered by all that merely exhausting the nerves by capering about in the excitement of Sonkirtana and falling into swoon do not mean Bhakti.

3. The high state of Yoga is reached through the intensity of Bhakti. But it is not to be concluded that mere capering or falling into swoon or seeing extra ordinary visions in that state of ecstasy means that a person has attained the state of Samadhi.

4. It should be ascertained whether it is a state of Samadhi brought about by Bhakti or a case of hallucination due to nervous exitement.

5. The visions the Master used to see or the prophecies. He used to make in the state of Bhava-Samadhi are all being gradually fulfilled. Moreover, every realisation of His in that state was unselfish and moral and for the good of mankind.

6. If anybody has that kind of Bhava-Samadhi, it should be understood to be the result of practising Bhakti. If, on the other hand, it is selfish, immoral and fruitless, we must understand that the person is a victim of nerve-disease and steps should be taken to cure him of that disease.

7. The authorities should also take special care that any one of the different forms of practice such as Bhakti, etc. does not become too strong and suppress others.

8. For the growth of the devotional mood, the Lord's praises will be sung in the form of devotional music; and in that attention should be paid to time, rhythm, etc.[9]

THE WORSHIP-ROOM :

1. Every member of this Math will be entitled to enter the worship-room and worship there.

2. Sri Ramakrishna left no instruction for installing His image and offering worship, food etc., to Him. We have introduced these things in His honour.

3. Yoga, Dhyana (meditation), Bhajana (devotional music), Japa (repetition of the Lord's name), etc., constitute His principal teaching. None of the present inmates of the Math admits that Sri Ramakrishna instructed anyone to instal His image and offer worship of food, etc. to Him. Only during His last days, he used to instruct some disciples to meditate on His form.

4. To act according to the Master's teaching is in itself the proper way to honour Him.

5. Therefore this Math has been founded for the culture and realization of the high grades of discipline like meditation, Vhajana, etc, conductive to Bhakti and Mukti, which the Master preached and illustrated by His own life, and for popagating those ideas among the whole of mankind down to the Mlechchha and the Chandala.

6. Whoever in any way adopts with a pure heart the path shown by Him may be selected as a member of this Math, provided he is a man of renunciation. Whether he accepts the Master as God or as an Avatara or as an ordinary guru, is of no consequence.

7. Other things such as, image-worship etc. will also be retained in their proper place. But the method of Sadhana (spritual practice) as shown by the Master will alone have the highest place and be worthy of the greatest endeavour.

8. In other words, everyone should particularly remember that whoever gives up meditation, Bhajana etc. and remains busy only with image-worship, offering of food, etc. is disregarding the method of Sadhana shown by the Master. There is no harm if, along with the principal duties of meditation, Bhajana, etc, the image worship and other practices are retained.[10]

ভক্তি ও উপাসনালয় প্রসঙ্গে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ আড়ম্বর, জাঁকজমক, আভিজাত্য পরিহার করে সহজাত-সরলীকরণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতে বলেছেন। সাধনার ও 'পূজার' ক্ষেত্রে আকুলতা, নিষ্ঠাই যে বড় কথা তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ নির্দেশিত মঠ ও মিশনের নিয়মাবলীতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে কেউ কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান-এর এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস করে যিনি জীবন অতিবাহিত করতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণে তৎপর, তিনি মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হতে পারবেন। আরো গুরুদায়িত্ব চাপানো হয়েছে। যাঁরা সঙ্ঘগুরু আছেন বা পরে হবেন, তাঁদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, এই মঠ কোনমতেই যেন বাবাজিদের ঠাকুরবাড়িতে পরিণত না হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভূমিকা সম্বন্ধেও নির্দেশ অতি স্পষ্ট,—'আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই; আমরা তাঁহার দান, আমরাও মানভোগের আকাঙ্ক্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে পবিত্র শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।'[১১] আরও একটি নিয়মে মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা রয়েছে—আমাদের উদ্দেশ্য বিলাসিতাও নহে, তপস্যাও নহে, অথবা যোগও নহে; উদ্দেশ্য—ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভ।

'পূজা-পদ্ধতি' নিয়মাবলী থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট—নিজের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, তাঁকে ভোগ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও বকম নির্দেশ দিয়ে যাননি। শিষ্য ও অনুগামীরা তাঁর সম্মানেই এসবের ব্যবস্থা করেছেন। সাধনার পথ সম্পর্কেও কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। জপ-তপ-ভজন ত্যাগ কবে যিনি কেবল মূর্তিপূজা ও ভোগদানের মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হবেন। কিন্তু ঐ সব করে কোন ব্যক্তি মূর্তিপূজা ইত্যাদি করলে ক্ষতি নেই।

একদিকে বিবেকানন্দ নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে অহৈতুকী প্রেম, শৃঙ্খলা পরায়ণতা, অন্যদিকে ভালোবাসা-সারল্য-ভ্রাতৃত্ব-উদারতা-মৈত্রীর সুকোমল বন্ধন রামকৃষ্ণ মিশনকে তার বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জনে পুরো এক শতাব্দী ধরে একই সঙ্গে ভাবময় ও প্রাণময় করে রেখেছে।

॥ ২ ॥

প্রতীক :

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ্নটি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা থেকেই বাস্তবরূপ পেয়েছে। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থ পড়ে আমরা জানতে পারি যে, বিবেকানন্দ বিখ্যাত শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক বা শীলমোহরের তাৎপর্য নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত

সলিলরাশি কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তিব পরিচায়ক। আর চিত্র মধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম-ভক্তি ও জ্ঞান যোগের সহিত সম্মিলিত হইলে পরমাত্মার সুদর্শন লাভ হয়। চিত্রের ইহাই অর্থ।'

আমরা এবার বিস্তৃত ভাবে এই প্রতীক বা শীলমোহর সম্পর্কে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাত উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবো। প্রথমেই বলা হয়েছে, চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি কর্মের প্রকাশক। এখানে কর্ম অর্থে কার্য সমূহকে বোঝানো হয়েছে। নদীতে যেমন অগণিত জলরাশি প্রবাহকারে অবিরত ধাবিত হচ্ছে—এই মুহূর্তে যে জলরাশি দেখা গেল পরমুহূর্তে তা আর থাকে না, নতুন জলরাশি এসে সেই স্থান পূর্ণ করে। তেমনি আমাদের জীবনেও কর্ম সংখ্যা একটি নয়। অগণিত কর্ম আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অবিরত সংগঠিত হচ্ছে। আবার তরঙ্গ ও সলিলের যেমন গতি আছে, কর্মেরও সেই রূপ গতি আছে। সল্ ধাতু থেকে 'সলিল' শব্দটি এসেছে। এই সল্ ধাতুর অর্থ গতিকে বোঝায়। পাণিনি সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। এ গতিরও আব একটি অর্থ প্রাপ্তি। সলিল এবং তার তবঙ্গ সম্পর্কে এই প্রাপ্তি প্রসংগটি প্রযোজ্য। তরঙ্গের প্রাপ্তি হল জল, আর জলের প্রাপ্তি হল স্থল। এই জলরাশির প্রবাহের মধ্যে কর্মের প্রসংগটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা যে কর্ম করি তা শুভ বা অশুভ হোক, তার একটি নির্দিষ্ট প্রাপ্তি আছে। যা আমাদের ভোগও করতে হয়। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের প্রসারিত অভিমত আমরা পাই 'সন্ন্যাসীর গীতি'তে। 'কৃত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে, বলে লোকে হেতু কার্য প্রসরিবে, শুভ কর্মে—শুভ মন্দে-মন্দ ফল,/এ নিয়ম রোধে নয় কারো বল।' গীতাতে আমরা পাই এ বিষয়ে গহীন তত্ত্ব। এখানে গতি কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তরঙ্গ যেমন ছোট বড় উঁচু নীচু হয়ে থাকে, কর্মও তেমনি অল্পকাল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি এরই ফলে আসে। জলরাশি যেমন জলকে বেষ্টন করে অর্থাৎ বন্ধন করে শুভা-শুভ ফলের মাধ্যমে। তরঙ্গ শব্দটি 'তৃ' ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ পার হওয়া—তরঙ্গ যেমন ভাসমান বস্তুকে তীরে পাঠিয়ে দেয়, তেমনি কর্ম জীবকে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়ে শুদ্ধির দিকে নিয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হলে মুক্ত করে দেয়।

দ্বিতীয়ত—আসে কমলগুলির কথা। কমলগুলি হল ভক্তির প্রকাশক। 'কমলগুলি' অর্থাৎ কমলের সমষ্টি। এর দ্বারা ভক্তি সমূহ উপলব্ধি করা যায়। কমলের যেমন বর্ণগত ও দলগত পার্থক্য আছে ভক্তিরও সেরকম প্রকার ভেদ আছে। কমলের বর্ণগত পার্থক্য হল লাল-নীল পার্থক্য ইত্যাদি। তেমনি ভক্তির ক্ষেত্রে নিষ্কাম (অহৈতুকী) পরা (মুখ্য), অপরা (গৌনী) প্রভৃতি। উভয়ের সঙ্গে কমলের একটি সম্পর্ক আছে। কমল জলেই ফোটে, ভক্তিরও চরম প্রকাশ অশ্রুসিক্ততা বা চোখের জলের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা সেই পরম ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করি এই ভাবে,—

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'[১২]

এখানে চরণের সঙ্গে কমল ও ভক্তির সংমিশ্রণে চরণকমল বা পাদপদ্মের বিষয়টি এসে যায়। দেববেদীর চরণে বা পদেই কমল বা পদ্ম যেমন নিবেদিত হয়, তেমনি নিবেদিত বা সমর্পিত হয় ভক্তিও। ব্যাকরণের দিক থেকে চরণ অর্থাৎ পদ ধাতুর অর্থ পাণিনির মতে 'পদগতৌ' বলে গতি বোঝায় এবং গতি যেখানে আছে সেখানে প্রাপ্তিও বোঝায়। কমলের গতি চরণে প্রাপ্তি ও সেই চরণ দেব-দেবীর, ভক্তিরও গতি দেব-দেবীর চরণে এবং তা প্রাপ্তিও। 'পদ' ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে 'পাদ' হয়, 'অচ্' যোগে 'পদ' হয় এবং 'পদ' ধাতুর সঙ্গে 'সন্' যোগে 'পদ্ম' হয়। অর্থাৎ উভয়েরই ধাতুগত অর্থ এক। বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরতি স্তোত্রে উল্লেখিত হয়েছে—'ত্যাগীশ্বর হে নর বর দেহ পদে অনুরাগ।' আবার 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতেও পাই 'সশক্তিকই নমি তব পদে'। এই নমস্কার-নত অনুরাগ ভক্তিরই পরম প্রকাশ।

তৃতীয়ত—আসে উদীয়মান সূর্যের কথা। সূর্য জ্ঞানের প্রকাশক। উদীয়মান ও সূর্য—এ দুটির প্রধান সাদৃশ্য হল—ক) স্বয়ং প্রকাশকত্ব খ) আবরণ নাশকত্ব। সূর্য স্বয়ং প্রকাশক। সূর্য যেমন অন্য সব কিছু প্রকাশ করে কিন্তু তাকে প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না, তেমনি জ্ঞান ও অন্য সব কিছু প্রকাশ করে, অজ্ঞানকে নাশ করে। জ্ঞানকে প্রকাশ করার জন্য অন্য কোন প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না। সূর্য যেমন তমঃরূপ আবরণ নাশ করে অর্থাৎ সূর্যোদয়ে যেমন সব অন্ধকার সরে গিয়ে সবকিছু আলোকিত হয়, জ্ঞানেও তেমনি অজ্ঞানরূপ আবরণ যা তমঃ'রই কার্য তা সর্বদা নাশ করে থাকে। তাতে কোন বস্তুর জ্ঞান

বা স্বরূপ প্রকাশ হয়। ব্যাকরণের দিক থেকে ধাতুগত অর্থে এ দুয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'সৃ' ধাতু থেকে 'সূর্য' হয় এবং 'জ্ঞা' থেকে 'জ্ঞান' হয়। 'সৃ' ধাতু গতি বোধক, সূর্যের যে গতি আছে আমরা তা সহজেই বুঝতে পারি। যার রশ্মিতে সারা জগৎ আলোকিত হয় এবং সৌর মণ্ডলের গ্রহগুলি তার আলো পায়। তেমনি 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ হল জানা এবং এই জানার সঙ্গে গতিও যুক্ত হয়ে আছে। রাত্রির অন্ধকার নাশ যেমন সূর্য ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি আমাদের অজ্ঞানতাও জ্ঞান ছাড়া দূর হতে পারে না। সূর্যকে যেমন কোন কিছু আবৃত করতে পারে না, তেমনি জ্ঞানকেও কোন ভাবে আবৃত করা সম্ভব নয়। গীতায় আমরা পাই—'ভক্ত্যা মামভি জানাতি যাবন্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ' অর্থাৎ কর্ম থেকে ভক্তির উদ্ভব হয়। আর ভক্তির মধ্য দিয়ে আসে জ্ঞান। 'ভক্ত্যা মামভি জানাতি'—গীতোক্ত এই প্রমাণের পাশাপাশি ব্যাকরণ কৌমুদির সূত্র—'ভক্তি জ্ঞানায় কল্পতে', অর্থাৎ সেই ভক্তি থেকে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে।

চতুর্থত—চিত্রগত সর্প পরিবেষ্টনীটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। এই সর্প যোগ দুটির সাদৃশ্য হল গতি ও প্রাপ্তি, যার মূলে আছে কার্যকরী শক্তি। এই সর্পবেষ্টনীর ও কার্যকরী শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে স্বরূপত কোন ভেদ নেই। যেমন ব্রহ্ম ও শক্তিতে কোন ভেদ নেই। ব্যাকরণের দিক থেকে 'সৃপ্' ধাতু থেকে সর্প শব্দটি এসেছে। এই সৃপ্ ধাতুর অর্থ পাণিনির মতে 'সৃপ্ লৃগ তো' যাতে প্রাপ্তিও বোঝায়। আর 'যুজ' ধাতুর তিনটি অর্থ দিয়েছেন পাণিনি—

ক) যুজ সমার্ধে অর্থাৎ সমাহিত করণ খ) যুজ সংযমনে অর্থাৎ সংযমন গ) যুজির যোগে অর্থাৎ মিলন। এই ব্যাকরণগত অর্থ থেকে আমরা বলতে পারি সর্প ও যোগের মধ্যে সাদৃশ্য হল গতি ও প্রাপ্তি; যার মূলে আছে 'কার্যকরী' শক্তি। এ থেকে বোঝা যায় সর্পেরও গতি ও প্রাপ্তি আছে।

গতির দ্বারা সে খাদ্য সংগ্রহ করে। খাদ্য সংগ্রহের এবং খাওয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রাপ্তি ঘটে। সর্পের মতো জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তিতে যোগের ক্ষেত্রেও আছে ক্রম পরম্পরায় গতি এবং পরিণতিতে প্রাপ্তি। গতির মূলে থাকে কার্যকরী শক্তি তা আমরা আগেই বলেছি। সর্পের মতো এই জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তিতে গতি ও প্রাপ্তি আছে। এই কুণ্ডলিনীর সঙ্গে সর্পের সাদৃশ্য দেখা যায়। সাধারণত এই কুণ্ডলিনী জীবের শাস্ত্রোক্ত মূলধার চক্রে প্রসুপ্ত সর্পের মতো কুণ্ডলী বদ্ধ হয়ে প্রসুপ্তা থাকেন।

এজন্য এ কে বলা হয় সর্পাকারা কুণ্ডলিনী। তিনি আবার শাস্ত্রোক্ত উপায়ে সাধন দ্বারা জাগ্রত হন তখনই এঁর সুষুম্না পথে গতি আরম্ভ হয় এবং ক্রমশ সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাগত, বিশুদ্ধা, আজ্ঞা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত চক্র অতিক্রম করে সহস্র দল পদ্মে পরম শিবের সঙ্গে সম্মিলিতা হন। এই তাঁর চরম গতি ও চরম প্রাপ্তি এবং তখনই জীবের পরম শিবত্ব লাভ বা আত্মোস্বরূপোলব্ধি হয়।

পঞ্চমত—চিত্র মধ্যস্থ হংস প্রতীকটির অর্থ পরমাত্মা। ব্যাকবণ মতে হংস কথাটি 'হন্' ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ ক) গতি খ) হিংসা করা। গৃহপালিত হংস এই গতির সঙ্গে যুক্ত। খাদ্য সংগ্রহের জন্য হংসকে অন্যান্য ছোট জীবের প্রতি হিংসা কবতে এবং তাকে নাশ করতে হয়। আবার যারা মাংস প্রিয় তারা হংসকে হিংসা বা নাশ করে। কাজেই হিংসার বিষয়টি উভয় দিক থেকে সত্য। 'আত্মন্' শব্দটি থেকে এসেছে 'আত্মা' আবার এই 'আত্মা'র মূলে আছে 'অত্' ধাতু—যার অর্থ 'সত্য গমন'। অর্থাৎ 'সতত্ গমন' যার সহজ অর্থ সর্বব্যাপী। আত্মা বা পরমাত্মা যে সর্বব্যাপী তা আমরা জানি। হংসের মতো আত্মারও গতি ও প্রাপ্তি আছে। এই গতির সঙ্গে প্রাপ্তিও যে বোঝায় তা পাণিনি সমর্থিতও বটে। যেমন 'ঋ' ধাতুর অর্থ গতি ও প্রাপণ বা প্রাপ্তি বোঝায়। আবার এই আত্মাই পরমাত্মার স্বরূপ। কাজেই অজ্ঞান নাশক; কেননা জ্ঞান সর্বদা অজ্ঞানকে হিংসা করে বা নাশ করে। কাজেই ঐ হংস বা পরমাত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। যা এই ব্যাকরণগত অর্থ দ্বারা সমর্থিত। আবার গতির ও হিংসার বিষয় জড়িত বলে শাস্ত্রমতে শ্বাস-প্রশ্বাসকেও হংস বলা হয়েছে। এদের গতিতো আছেই। হিংসা বা নাশের ব্যাপারেও আছে একবারের শ্বাস-প্রশ্বাসের পরে নতুন করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। এই শ্বাস-প্রশ্বাস নষ্ট হলে আমাদের দেহের নাশ ঘটে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হলেও জীব ভেদে বহু আত্মা কল্পিত হতে পারে, কিন্তু স্বরূপত তিনিও পরমহংস বা পরমাত্মা বা হংসরাজ। শাস্ত্রে আছে 'ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি', পরমহংস, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম একই। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে হিংসা বা নাশের বিষয়টি কল্পিত হতে পারে।

ষষ্ঠত—কর্ম ভক্তি-জ্ঞান যোগের সঙ্গে সম্মিলিত হলে পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়। পূর্বে উল্লেখিত সর্প-যোগ আলোচনাতেই আলোচিত হয়েছে যে যোগের দ্বারা গতি ও কার্যকরী শক্তি বোঝায়। কাজেই কর্ম-ভক্তি ও জ্ঞান যদি এই যোগের সঙ্গে যুক্ত না হয় তবে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা

থাকে না এবং সম্পূর্ণভাবে চিত্তশুদ্ধি না হলে কখনো পরমাত্মা সন্দর্শন লাভ সম্ভব নয়।

গীতোক্ত, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'—এই যোগ বলে গ্রহণ করা যায়, তাহলে বিষয়টি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। গীতাব যোগ শব্দটির অর্থ কৌশল বা শাস্ত্রোক্ত প্রকৃষ্ট উপায়। যে উপায় অবলম্বনে কার্য করলে ক্রমশ চিত্ত শুদ্ধি হয়ে পরমার্থ লাভ হয়। এই যোগ কথাটি ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের (রাজযোগের) সঙ্গেও প্রযোজ্য হতে পাবে। তাই বিবেকানন্দের ভাবনায় গীতোক্ত কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, বাজযোগ—এর দ্বারা একত্রিত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় এবং সেটিই তো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ্নটিতে এই গূঢ় তত্ত্বকে সরলীকরণেব মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ আমাদেব সামনে তা উপস্থিত করেছেন।

॥ ৩ ॥

উদ্দেশ্য-কার্যাবলী :

অবতার বরিষ্ঠ রামকৃষ্ণ পবমহংসদেবের হুগলি জেলাব কামারপুকুরে আর্বিভাব-এব মধ্য দিয়ে অঙ্কুরিত রামকৃষ্ণ আন্দোলনেব বীজ প্রসাবিত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরবাটী ছুঁয়ে কাশীপুব উদ্যানবাটীতে। পঞ্চাশ বছর পার্থিব শরীরে এই ধূলিধূসরিত মর্তধামে অতিবাহিত কবে ধর্ম সমন্বয়ের উদগাতা শ্রীরামকৃষ্ণ শিবজ্ঞানে জীবসেবাব যে কাজ নিজেব হাতে শুরু করেছিলেন তার দায় অর্পণ করে গিয়েছিলেন শ্রীমা সাবদাদেবী এবং প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর। রামকৃষ্ণ সংঘেব সংঘজননীরূপে শ্রীমা সারদাদেবীর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল, সেকথা আমরা আগে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণেব পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর বরাহনগরের ভগ্ন বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষাবা একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ। এখানেই নবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ১৫ জন সতীর্থ শাস্ত্র মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে শুরু হয়েছিল রামকৃষ্ণ আন্দোলনেব মহিমোজ্জ্বল যাত্রা। সে যাত্রা সংগঠিত ছিল না ঠিকই তবে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত দায় বা মহাব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৩-এর মে মাস পর্যন্ত এই দীর্ঘ, প্রায় সাত বছর বিবেকানন্দকে আমরা পেয়েছি পরিব্রাজকরূপে। প্রথম দিকে গুরুভাইরা তাঁর সঙ্গী হলেও ১৮৯০-এর জানুয়ারীর শেষদিকে

স্বামী বিবেকানন্দ একাকী যাত্রা শুরু করলেন মীরাট থেকে দিল্লী হয়ে। এই সময়টা তাঁর কেটেছিল অর্ধাশনে, কখনো অনশনে। নগ্ন পায়ে যে পদধূলি নিয়ে তিনি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পৌঁছেছেন এবং অত্যাচারিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, 'চলমান শ্মশান' অজ্ঞ মানুষদের প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই পদধূলি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন রাজাদের রাজপ্রাসাদে। সেখানে দেখেছেন চূড়ান্ত বৈভব-আভিজাত্য আর শোষণ অত্যাচারের নানা 'পাঞ্জা ছক্কা'। এই রাজ-রাজড়া এবং অভিজাত-বিত্তশালী মানুষেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মদত পুষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। সেদিন বিবেকানন্দ চূড়ান্ত বৈভব-আভিজাত্য লক্ষ্য করে বলে উঠেছেন—'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'[১৩] সেদিন বিবেকানন্দ অভিজাত-বিত্তশালী মানুষদের 'শূন্যে বিলীন' হওয়ার কথা বললেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন অজ্ঞ কাতর শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত 'চলমান শ্মশান'—ঐ সব মেহনতি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষদের 'উন্নত মস্তক ঊর্ধ্বে' তুলে উঠে দাঁড়াবার কথাও। সেদিন ভারতে বাস্তবের রক্ত তটে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী পরিব্রাজক বিবেকানন্দই প্রথম নিরঙ্কুশ অনুভবের সূত্রে পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করলেন। খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের মধ্য থেকে নতুন ভারতবর্ষ জন্ম নেবে, তারাই ভারতবর্ষ পরিচালনা করবে। একথা ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে আগে কেউ উচ্চারণ করেন নি। 'বার্ধক্যের বারাণসী যৌবনের উপবন' ভারতবর্ষ পায়ে পায়ে জরিপ করে বিবেকানন্দ জাতীয় সংহতির প্রোজ্জ্বল দীপ শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ব ভারতের দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ধর্মসিদ্ধি। সেই ধর্মসিদ্ধির ফলাফল পৌঁছে দিতে তিনি পৌঁছে গেছেন পশ্চিম ভারতের ঊষর ভূমিতে, আবার উত্তর ভারতের পাহাড়-পর্বত, বন্ধুর পথ অতিক্রম করে মানুষের মুক্তির গন্ধ বুকে নিয়ে বিবেকানন্দ পৌঁছে গেছেন দক্ষিণ ভারতের পথে পথে। আমরা যদি বিবেকানন্দের সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি নেড়ে চেড়ে দেখি তাহলে দেখব তা বিবেকানন্দের পদচিহ্নের পদাবলী হয়ে গেছে। দু' চোখ ভরে ভারতবর্ষকেই শুধু বিবেকানন্দ দেখেননি, অন্তর প্লাবী ভারতবর্ষের ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন হৃদয়ের তন্ত্রীতে আর ঐ 'চলমান শশ্মান' অজ্ঞ কাতর

দবিদ্রের জন্য তাঁব চোখ দিয়ে ঝবে পড়েছে রক্তাশ্রু। ঐ অজ্ঞ কাতব মানুষ-মানুষীদেব উত্তবণেব রাঙা পথটি দেখাবাব জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মহাব্রত দায় স্বরূপ অর্পণ করে গিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই উত্তর ভারতেব হাথরাস রেলস্টেশনের এ্যাসিষ্টান্ট স্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তকে (পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হয়েছিলেন স্বামী সদানন্দ) বলেছিলেন ঐ প্রব্রজ্যাকালে—'আমার জীবনে একটা মস্ত বড ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কি করে এটা উদ্যাপিত হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি। আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতিশয় ম্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতা বলে জগৎ জয় করতে হবে।'[১৪] প্রসঙ্গত আমরা বলতে পারি এমন স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং গুরুদেব অর্পিত মহাব্রত উদ্যাপনের জন্য আকুলতা বিবেকানন্দ ছাড়া অন্যান্য গুরু ভাইদের মধ্যে তেমন ছিল না। তাঁরা ধ্যান জপ সাধন ভজনে বেশি মগ্ন থাকতেন। তীর্থ পর্যটনেও বেরোতেন। কিন্তু শ্রীবামকৃষ্ণের বাণী যা জগৎকে নতুন পথের হদিশ দেবে তা প্রচার ও প্রসারেব দিকে গুরুভাইদের আগ্রহ তেমন ছিল না। যদি বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ অর্পিত মহাব্রত সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে আমরা পরিব্রাজক এবং পরিব্রাজক উত্তরকালের বিবেকানন্দকে পেতাম না। এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার রূপরেখাও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হত না। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬মে বিবেকানন্দ প্রমদাদাস মিত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতে স্থায়ী রামকৃষ্ণ সংঘ, বামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মহাব্রত পালনের কথা।

বিবেকানন্দ তাঁর এই মহাব্রত উদ্যাপনের পরিকল্পনা ভারত প্রব্রজ্যার কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোককে বলেছেন। বলেছেন কখনো রাজ-রাজড়া, শিষ্য-যুবকদের। আলোয়ারের যুব গোষ্ঠীকে বিবেকানন্দ বলেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের কথা, সংস্কৃতির কথা, মান্ডবী, ভুজ ও পোরবন্দরে বিবেকানন্দ নানা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন দেশে শিক্ষাবিস্তার, দারিদ্রমোচনের বিষয়ে।

ভারত প্রব্রজ্যার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত চিন্তা ভাবনা যে বিবেকানন্দের মনে গভীর ভাবে আলোড়িত হচ্ছিল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু উপায় তখন অজানা। যাঁরা স্বামীজীর চিন্তা ভাবনা শুনছিলেন তাঁদের

ছিল আন্তরিকতা, কিন্তু ছিল না কার্যকারিতা। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ তিনদিন তিনরাত—ভারত, আরব ও বঙ্গোপসাগরের মিলিত শিলাখণ্ডে ধ্যানে বসে আবিষ্কার করলেন মহাব্রত উদ্‌যাপনের পথ। সেই পথ ধর্মের পথ—ভারতের ঋষিদের অন্তশ্চেতনা জাত শাশ্বত বাণীর নিষিক্ত রূপ। তিনি উপলব্ধি করলেন ধর্ম ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের অনুভূতির বশেই আত্মজ্ঞান প্রত্যেকের মধ্যে জাগরিত হবার মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ, পুরোহিততন্ত্রের অবসান, শিক্ষাবিস্তার, নারীজাতির উত্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে এ সবের রূপায়ন। এর দায়িত্ব তুলে নিতে হবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দকে। অর্থ সংগ্রহের বিষয়টিও তাঁর চিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছিল। এর জন্য সন্ন্যাসীদের যেমন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কবতে হবে, তেমনি প্রয়োজনে সন্ন্যাসীদের বিদেশে গিয়ে ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী—বেদান্ত প্রচারের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। যদিও এই শেষের কাজটিকে সন্ন্যাসীর পক্ষে তিনি উপযুক্ত মনে করেননি। ১৮৯৪-এর ২৯ মার্চ পাশ্চাত্য থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন,—'ভারতের শাশ্বত সম্পদ পাশ্চাত্যে বিতরণ কবে অর্থ সংগ্রহ সন্ন্যাসীর অন্যায়।' এর মোকাবিলার জন্য তিনি সতর্ক ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদান প্রদানের বিষয়টি সহজ সরল ও সম্ভব হয়ে উঠবে। তাঁর সংকল্প ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ রূপে তিনি পাশ্চাত্যে যাবেন। সেখানে গিয়ে ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন। সকলের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন ও উত্তরণের লক্ষ্যে এবং পাশ্চাত্যের উন্নত বিজ্ঞান-কারিগরী শিক্ষার দ্বারা দূর করবেন ভারতের দারিদ্র্য। তাঁর শিকাগো-অভিযাত্রা (১৮৯৩) পৌঁছে দিল তাঁকে 'মহাব্রত' পালনের অভিমুখে। পাশ্চাত্য পরিক্রমায় তিনি বুঝেছিলেন 'মহাব্রত' পালনের জন্য চাই স্থায়ী একটি সংঘ। পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর অভীপ্সা বাস্তবিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অপরাহ্ণে সন্ন্যাসী ও গৃহী পার্ষদদের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে আমরা দুটি কথা পুনরায় উচ্চারণ করব।

সংঘের নামকরণের ক্ষেত্রে স্বামীজী সেদিন স্পষ্ট ভাবে জানালেন—'আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসার আশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের ১২ বৎসরে মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার

হয়েছে এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে।' এই সূত্রে সংঘের নাম হল রামকৃষ্ণ মিশন। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিনে শ্রীমা সারদাদেবীকে সংঘজননী রূপে প্রতিষ্ঠা করে বললেন—'আমাদের এই যে সংঘ হতে চলেছে তিনি তাব রক্ষা কর্ত্রী পালনকারিনী, তিনি আমাদের সংঘজননী।' শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই তিনি পরিচালিত এবং সাফল্য লাভের পর মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবেন। শিকাগো যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী সতীর্থ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দকে আবেগমথিত হৃদয়ে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

তারপরের ঘটনাতো ইতিহাস—দীর্ঘ উজ্জ্বল ইতিহাস। পাশ্চাত্য জয় করে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন ভারতবর্ষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ জানুয়ারী। স্বামীজীর বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রত্যাবর্তন যেমন ছিল ঐতিহাসিক তেমনি তাৎপর্যমণ্ডিত। বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত দেখা দিল তাঁকে ঘিবে বিরাট উদ্দীপনা। সেই উদ্দীপনা বিবেকানন্দের চিত্তে কাঙ্ক্ষিত মহাব্রত উদ্‌যাপনের উৎসাহাগ্নির উত্তাপ সংযুক্ত করল। উৎসাহ উদ্দীপনার রেশ কমে আসার পর খানিকটা স্থিতিশীল হয়ে কাজে নেমে পড়ার জন্য উদ্যোগী হলেন তিনি। সর্বাগ্রে তাঁর মনোভাবের কথা জানালেন শ্রীমা সারদাদেবীকে,—'মা, আমি তাঁরই (শ্রীবামকৃষ্ণের) বাণী প্রচার করতে চাই এবং সে জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি স্থায়ী সংঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যত দ্রুত আমি করে উঠতে চাই তা পেরে উঠছি না।'[১৫] শ্রীমা সারদাদেবী তখন নিজের স্নেহভাজন সন্তানকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'তাঁর জন্য তুমি কোন ভাবনা কোর না। তুমি যা করেছ আর যা করবে তা চিরকাল টিকে থাকবে। তোমার এই কাজের জন্য জগতের মানুষ তোমাকে লোকগুরু হিসেবে মানবে। তুমি নিশ্চিত জেনো, ঠাকুর তোমার আকাঙ্ক্ষা অচিরেই পূর্ণ করবেন।'[১৬]

১মে ১৮৯৭ আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। ৫ মে দ্বিতীয় সভায় উদ্দেশ্য ব্রত বা আদর্শ ও কার্যপ্রণালী গৃহীত হল।

উদ্দেশ্য ও ব্রত :

এ প্রসঙ্গে আগে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত আরো একবার বিষয়টির দিকে দৃষ্টি ফেরাব। সেদিনের সভায় নির্ধারিত হয়েছিল—

উদ্দেশ্য : মানুষের কল্যাণার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং কাজে ও তাঁর জীবনে প্রতিপালিত হয়েছে, তার প্রচার ও মানুষের

দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাতে সে সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করা এই মিশনের উদ্দেশ্য।

ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তর মাত্র জ্ঞানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করেছিলেন তার পরিচালনা এই মিশনের ব্রত।

কার্যপ্রণালী : মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোকশিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমজীবীকার উৎসাহবর্ধন। বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ জীবনে যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা জনসমাজে প্রবর্তন। এই কার্যপ্রণালী দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল (ক) ভারতবর্ষীয় কার্য ও (খ) বিদেশীয় কার্য।

ভারতবর্ষীয় কার্য: ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য ব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদের শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপন এবং যাতে তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে লোককে শিক্ষিত করতে পারেন তার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্য: ভারতের বাইরে দেশ সমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং সেসব দেশে স্থাপিত আশ্রমগুলির সঙ্গে ভারতীয় আশ্রমগুলির ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি বর্ধন। এবং নতুন নতুন আশ্রম সংস্থাপন।

মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ যেহেতু আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক তাই রাজনীতির সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবে না। এই আদর্শগুলির প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে বা যিনি বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণ কোন বিশেষ কার্য সাধনের জন্য এসেছিলেন, তিনি এই সংঘের সভ্য হতে পারবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে বিবেকানন্দ ভাব, আদর্শ ও জীবনধারায় এক নতুন দিক প্রবর্তন করলেন যা মিশনের উদ্দেশ্য, কার্যপ্রণালী থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। এই নিয়ে স্বামী যোগানন্দ প্রমুখ সতীর্থদের সংশয়-দ্বিধা ছিল। তাঁদের মনে হয়েছিল তপস্যা ও কর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। অদ্বৈত বেদান্ত ও নরনারায়ণ সেবা পরস্পর খাপছাড়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও সেবাব্রতে পরস্পর কোন মিল নেই। স্বামীজী তাঁদের প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন সন্ন্যাসীকে শুধু 'আত্মনো মোক্ষর্থং' অর্থাৎ নিজের মুক্তির সাধনে মগ্ন হলে চলবে না, 'জগৎদ্বিতায় চ' মন্ত্রে, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্মেও মন দিতে হবে। তাঁর গুরুভাইয়েরা পরিষ্কার বুঝলেন—বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন। অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি

দিক তাঁরা বুঝেছেন, অন্য দিকটি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হতে পারেন নি। তাঁদের ভুল ভাঙল, তাঁরা অবহিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সমগ্র জগতের জন্য, পৃথিবীর সকলের মুক্তির জন্য। পারস্পরিক শান্তি-মৈত্রী ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্থিব জীবনযাপনের জন্য। গুরুভাইদের সংশয় দূর হল, তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত স্বামীজী প্রদর্শিত পথে 'মহাব্রত' রূপায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এতদিনে রামকৃষ্ণ অর্পিত দায় পালিত হল। রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষ অতিক্রম করে বিবেকানন্দ প্রবর্তিত পথে সারা পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা-চেতনাবাহিত বাণী ও নির্দেশ প্রসারিত— বাস্তবায়িত করে চলেছে।

॥ ৪ ॥

গঠন-প্রণালী :

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য পরিচালনার জন্য প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দকে সভাপতি করে একটি কমিটি তৈবী হয়েছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ ছিলেন যথাক্রমে কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও উপ-সভাপতি। রামকৃষ্ণ-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ মিত্র হলেন এই কমিটির সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ শিষ্য ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ এবং শরৎচন্দ্র সরকার হলেন সহকারী সম্পাদক। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ট্রাস্ট ডীড তৈরী করে মঠ পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন তাঁর ১১ জন গুরুভাইকে। তাঁদের ট্রাস্টী বলা হয়। তাঁরাই মিশনের সব কাজ পরিচালনা করতেন। ক্রমশ মিশনের কার্য পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় আইন অনুসারে রামকৃষ্ণ মিশনকে রেজেস্ট্রিভুক্ত করা হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে এবং প্রথম পরিচালন সমিতি (Governing Body) গঠিত হয়। এতে সদস্য ছিলেন স্বামীজীর ১০জন গুরুভাই। এঁরা হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, এবং স্বামী অভেদানন্দ। পরবর্তী স্তরে এই পরিচালন সমিতিতে আরো ১০ জন যুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন বিবেকানন্দের শিষ্য। এঁরা হলেন— স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী অচলানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ, স্বামী মহিমানন্দ, এবং স্বামী শঙ্করানন্দ। অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সহাধ্যক্ষ—স্বামী অদ্বৈতানন্দ, সম্পাদক—স্বামী সারদানন্দ, কোষাধ্যক্ষ—স্বামী প্রেমানন্দ, এবং হিসাবরক্ষক—স্বামী শুদ্ধানন্দ।

বিবেকানন্দ নির্দেশিত গঠনপ্রণালী অনুযায়ী গণতান্ত্রিকভাবে ক্রম পরম্পরায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাস্টী বা অছি পরিষদ (যা কিনা সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন) ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪মে রেজিস্ট্রিভুক্ত উীড অনুযায়ী নির্বাচিত হয় ২০ বছর সন্ন্যাস জীবনযাপনকারী সন্ন্যাসীদের ভোটের মাধ্যমে। অছি পরিষদের নির্বাচনে ৬০ অনূর্ধ সন্ন্যাসীরাই শুধু দাঁড়াতে পারেন। অছি পরিষদে সদস্য সংখ্যা প্রধানত ১৫ থেকে ২০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই সন্ন্যাসী। এই প্রথা স্বামী বিবেকানন্দই প্রচলন করে গিয়েছিলেন। নিয়মাবলী প্রসঙ্গে আমরা সে কথা উল্লেখ করেছি। এই অছি পরিষদের সদস্যরাই আবার অধ্যক্ষ, সহাধ্যক্ষ (৩ জন), সাধারণ সম্পাদক, সহ সম্পাদক (৩ জন) ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে থাকেন। অছি পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সব কাজ বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার জন্য একটি সেন্ট্রাল গভর্নিং বডি বা কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতি আছে। আবার রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র পরিচালন সমিতি আছে। এই সকল পরিচালন সমিতি সন্ন্যাসী ও অনুরাগী — গৃহী, ভক্ত ও বিদগ্ধজনদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। আমরা ক্রমপরম্পরার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গৃহী ও সন্ন্যাসীদের যৌথ উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে বিবেকানন্দের চিন্তার বাস্তবায়নের সূত্রে।

॥ ৫ ॥

আদর্শ :

রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার সময়ে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনেব আদর্শ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। সেই আদর্শ হল 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্বিতায় চ' অর্থাৎ নিজের মুক্তি সাধনের সঙ্গে জগতের মুক্তিসাধন ও কল্যাণ।

এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি মুক্তি বা নিজের মুক্তিলাভ করা। সেখানে জগতের মঙ্গলের কথা ছিল অনুচ্চারিত। বিবেকানন্দ নিজের মুক্তির সঙ্গে জগতের কল্যাণ ও মুক্তির কথা যুক্ত করে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ রূপে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করলেন। এ শিক্ষা, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন। অদ্বৈত বেদান্তের ব্যবহারিক দিকটি প্রাত্যহিক

জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব। একই আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজমান। ঋষিরা তাই উচ্চারণ করেছেন,—'একম্ সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এই সত্যকে অনুভবের মধ্য দিয়ে, আত্মায় আত্মা সংযোগের মধ্য দিয়ে সার্বিক ভেদাভেদ ঘুচে যাবে এবং জীবনে জীবন যোগ করার প্রত্যয় জেগে উঠবে। অদ্বৈত বেদান্তের এই মূল সত্যটি রূপায়ণের জন্য সংসার থেকে পালিয়ে জঙ্গলে যাবার কোন প্রয়োজন নেই; সংসারের মধ্য থেকে অদ্বৈত জ্ঞানলাভ সম্ভব। মানুষ যা করছে করুক—শুধুমাত্র অন্তরে তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে, ঈশ্বরই মনের সংসার রূপে প্রকাশিত। জীবে জীবে তাঁর অধিষ্ঠান। তাই সংসারের সকল মানুষকে এমন কি জীবজন্তু সব কিছুকে শিবজ্ঞানে ভেবে সেবা করলে চিত্তশুদ্ধি হয়ে অচিরে নিজের মধ্যে চিদানন্দময় ঈশ্বরের ধারণা জেগে উঠবে। মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করে মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব হবে। 'পরা' ভক্তি লাভ হবে। মুক্তি হবে করায়ত্ত। রাজযোগী এভাবে সেবা করলে একই পথে পৌঁছবেন এবং নিষ্কাম কর্মযোগী মুক্তিলাভ করবেন। ভক্তির পথ দিয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হবে ভক্তিযোগী। বিবেকানন্দ অনুভব করলেন যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করলে চারটি যোগের—জ্ঞান-ভক্তি-যোগ ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটবে।

এই চারটি যোগের সমন্বয়ে প্রতিটি মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং তারই মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভের পথটি প্রশস্ত হবে। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে এই আদর্শ জগতের সামনে উপস্থাপিত করলেন। একে বলা হয় 'ব্যবহারিক বেদান্ত' বা 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' (Practical Vedanta) । বনের বেদান্তকে বিবেকানন্দ এইভাবে ঘরে ঘরে, সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন। এই মোহন আদর্শই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও জগতের সকলের মুক্তি লাভের এক নতুন সাধন পথ। এই আদর্শকেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের শিলমোহর (Monogram)-এ প্রতীক (emblem)-এ রূপায়িত করলেন। সে কথা আমরা আগে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি।

রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন একাদশ সংঘাধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ,—

স্বামীজীর পরিকল্পিত কর্মমার্গকে কিন্তু কর্মযোগের সমার্থক বলে গ্রহণ করা চলে না। কর্মযোগে ঈশ্বরার্থে ফলার্পণের নির্দেশ আছে। স্বামীজীর কার্যে পরিণত বেদান্তের মতে নিজের জন্য অজান্তে ঈশ্বরকে অর্পণের কথা ওঠে না। কারণ এখানে আদ্যন্ত প্রচেষ্টা ভগবানের জন্য—ফল

উৎপত্তির পূর্বে তা ভগবানের, মধ্যবস্থায়ও ভগবানের এবং সমাপ্তিতেও ভগবানের। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মূল কথা তাই, এখানে স্বার্থ চিন্তার অবকাশ নেই।... বিবেকানন্দের মতে যে কোন সৎ কর্মকেই ঈশ্বর আরাধনার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা চলে; কর্মমাত্রকে পূজায় পরিণত করা চলে।[১৭] তাই বোধ হয় বিবেকানন্দ বলতে পারেন 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার'। তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বর যদি মন্দিরে, চার্চে বা মসজিদে সাধককে দর্শন দিয়ে তৃপ্ত করেন, তাহলে তিনি চাষীর গোয়ালবাড়ি কিংবা শ্রমিকের দরোজায় বা মেহনতি মানুষের ঘরের ভিতর, অজ্ঞ-কাতর মানুষের অবস্থান ভূমিতে দেখা দেবেন না—এর সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। বিবেকানন্দ বাস্তব সাধক-জীবনের আলোকসম্পাতে দেখলেন কর্মে পরিণত বেদান্তের মধ্যে এমন ভাবে চতুর্মার্গের সমন্বয় ঘটেছে এবং পরার্থে কর্ম ব্যাপৃত থাকার সময়-কালে ভক্তি, জ্ঞান ও ধ্যানের উৎকর্ষে সাধিত হতে পারে জয়। কর্মে পরিণত বেদান্ত হবে শুধু পরম্পরাগত, এবং সাক্ষাৎ ভাবে তার মধ্য দিয়ে মুক্তি আসতে পারে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সাধনার দৃষ্টিতে কর্ম বিরহিত ভক্তি-বিচ্যুত জ্ঞান বা ধ্যান অথবা জ্ঞান সম্পর্ক শূন্য কর্ম বা ধ্যান ইত্যাদি নিছক কল্পনামাত্র। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ছিল তাঁর কর্মে পরিণত বেদান্তের যোগ। অপরের উপকাব, আর্ত মানুষের প্রাণ-পরহিতায় জীবন উৎসর্গ, অজ্ঞ-কাতর মানুষদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে সচেতন করে তোলা, নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া—এ সব কাজের মধ্য দিয়ে আসলে ঐ সকল মানুষের সঙ্গে রয়েছে আমার অবিচ্ছেদ্য সংযুক্তি, তারই প্রত্যয়দৃপ্ত অনুভব-উপলব্ধির প্রসার ঘটে। তাই তাদের উত্থানে আমার উত্থান, তাদের জাগরণে আমার জাগরণ, তাদের উন্নতিতে আমার উন্নতি, সর্বোপরি জগতের মুক্তি। এই অসাধারণ কর্মে পবিণত বেদান্তের নির্যাসটি শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত-বিবেকানন্দ বাহিত পথে শতবর্ষ ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও লক্ষ্য রূপে রূপায়িত-বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

॥ ৬ ॥

বিশেষত্ব :

রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষত্বগুলি, এর উদ্দেশ্য, আদর্শ, ব্রত, কার্যপ্রণালীর মধ্যে নিহিত আছে। এগুলি সব স্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে শুধু তাই নয়, সার্বিক ভাবে সাফল্য লাভ করেছে। তাই সমাজতাত্ত্বিকের

কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থান আলাদা। মিশনের বিশেষত্বগুলি সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়াবে,—

১) রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কাজের মধ্যে রয়েছে অধ্যাত্মচিন্তাব প্রকাশিত প্রসার। রামকৃষ্ণ মিশন প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক সংগঠন। সেই অধ্যাত্মচিন্তার বিষয়টি আমরা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করলাম।

২) কোনমতেই রামকৃষ্ণ মিশন কোন সমাজসেবী সংস্থা নয়।

৩) রামকৃষ্ণ মিশনের সকল সেবাকাজ সন্ন্যাসী ও গৃহীদের যুগ্মপ্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হয়।

৪) রামকৃষ্ণ মিশন স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সেবা করে।

৫) রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ জনসাধারণের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সরকারী অনুদানের পরিমাণ কম।

৬) শিক্ষার ব্যাপক এবং বহুমুখী প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মানুষকে যথার্থ সচেতন করে তোলা হয়, আসল মানুষের মধ্যেই যে অনন্ত শক্তি বিরাজমান দেবত্বের প্রকাশও তারই মধ্যে, সেটি শিক্ষা ও সচেতনতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হয়। মিশনের কাজের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতা-মানবিকতা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে। এটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত, অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এবং চরম মানবিকতার বিকাশে।

৭) রামকৃষ্ণ মিশন জনমুখী কাজে অগ্রবর্তী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান সমাজ সংস্কারের বিষয়ে নিজেকে যুক্ত করে না।

৮) পিছিয়ে পড়া বা নিম্নবর্গের, অন্ত্যজ গোত্রের, দীর্ঘ দিন অবহেলার অন্ধকারে অনেকটাই আত্মশক্তি-আত্মবিশ্বাসহীন মানুষদের আত্মশক্তিতে দাঁড়াতে শেখায়। তাদের সার্বিক উন্নতির মধ্য দিয়ে সমাজের উন্নতি সাধিত হয়।

৯) রামকৃষ্ণ মিশন কোন রাজনৈতিক দলেব সঙ্গে যুক্ত নয়।

১০) রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ, কোন পরিকল্পনার রূপায়ন ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না। পরিচালন সমিতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ক্রমে তা স্থিব হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি প্রধান কেন্দ্রের অছি পরিষদের এবং পরিচালন সামিতির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শাখা কেন্দ্রগুলির থাকে না। তার জন্য প্রধান——কেন্দ্রীয় সমিতি বাঁ অছি পরিষদের অনুমতি নিতে হয়।

১১) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান এবং শাখাকেন্দ্রের আর্থিক হিসেব-নিকেশ নিখুঁত ভাবে রক্ষিত হয় এবং নিয়মিত স্বীকৃত হিসেব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত হয়।

১২) রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসূচী রূপায়নে সম্ভাব্য হিসাব (Estimate) করা হয় এবং তারপর সেবা ও অন্যান্য কাজ আরম্ভ হয়। তারপর জনসাধারণের কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন জানানো হয়। অবশ্য অর্থ সংগ্রহের জন্য সময় সীমা নির্দিষ্ট থাকে।

১৩) রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সঙ্গতি না থাকলে বড় অঙ্কের অনুদান রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করে না।

১৪) রামকৃষ্ণ মিশন তার সেবাকাজের প্রচার কখনই তেমন ভাবে করে না। বরং অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রচারবিমুখ।

১৫) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা অনুমোদিত না হলেও তাদের চলার পথ নির্দিষ্ট করে দিতে রামকৃষ্ণ মিশন সাম্প্রতিক কালে ভাবপ্রচার পরিষদ গঠন করেছে। এর মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির একটা সমন্বয় ঘটে।

১৬) রামকৃষ্ণ মিশনের সাফল্যের চাবিকাঠি 'টিম স্পিরিট' বা দলগত উৎসাহ ও সংহতি। শ্রমের বা কাজের বিভাজনে (Division of Labor) নেতৃত্বের আজ্ঞাবহতা, সংঘের প্রতি আনুগত্য। পরিশ্রম স্বীকারে অঙ্গীকারবদ্ধতা ও সকলের সঙ্গে আলোচনা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে কাজে অংশগ্রহণ করানো।

১৭) রামকৃষ্ণ মিশনের সার্বিক এবং প্রধান লক্ষ্য কর্মই পূজা। সেবা এই কর্মেরই অন্তর্গত। সেবা কর্মের মধ্যে রয়েছে—

ক) দুস্থের সেবায় অনুপ্রাণিত ত্রাণকার্য।

খ) খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে উদ্ভুত ত্রাণকার্য।

গ) বন্যার কারণে উদ্ভুত ত্রাণকার্য।

ঘ) অগ্নি উদ্‌গীরণের জন্য উদ্ভুত ত্রাণকার্য।

ঙ) ভূমিকম্প-ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ত্রাণকার্য।

চ) স্থায়ী ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসাজনিত ত্রাণকার্য।

ছ) প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মহামারীজনিত পরিস্থিতিতে সেবাকার্য।

জ) পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপক শৈত্য প্রবাহের ফলে বিধ্বস্ত মানুষের মধ্যে সেবাকার্য।

ঝ) পুনর্বাসনের-পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে সেবাকার্যের পূর্ণাঙ্গ রূপটির উন্মোচন।

ঞ) এছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

॥ ৭ ॥

রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী, প্রতীক, কার্যাবলী, গঠন প্রণালী, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিশেষত্ব—এসবই স্বামী বিবেকানন্দ জীবিতকালে ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও গঠনপ্রণালী জনিত ট্রাস্ট ডীডটি তাঁর জীবনাবসানেব সাত বছব পর তৎকালীন সরকার দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং স্বীকৃতির সূত্রে বামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যপ্রণালী দুটি ধারায় বিভাজিত হয়। তার আগে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই ভাবাদর্শে একই গঠনপ্রণালীর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হত। বিভাজনের ফলে বড় মাপের কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি। আমবা যদি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান ভারতে ও বহির্ভারতের ১৪০টি কেন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করি তা হলে দেখব বিভাজন সত্ত্বেও মঠ ও মিশন প্রায় একই কাজ করে চলেছে। এ বিষয়ে আমরা আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শিবোনামাঙ্কিত প্রবন্ধগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বহুজনেব সুখের এবং হিতেব জন্য রামকৃষ্ণ মঠ—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। তাই মানুষকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তার সার্বিক উন্নয়ন উত্তরণ ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করেছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শকে প্রতিফলিত করে। সেই ভাবাদর্শেব রূপকার বিবেকানন্দ সাংগঠনিক রূপ ও বীতির কথা চিন্তা করেই নিয়মাবলী, কার্যাবলী, প্রতীক, উদ্দেশ্য, গঠনপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে যে অভিমত সুচারুরূপে জানিযে গেছেন তা আজও অনুসৃত হয়ে আসছে।

রামকৃষ্ণ মিশনেব বিশ্বজুড়ে স্বর্ণাভ অস্তিত্ব-অবস্থান এখানেই—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ থেকে তা বিচ্যুত হয় নি, আশাকরি আগামী দিনেও হবে না।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্কবণ, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা ২৮০, পৃঃ ৪৫০—৫৬
২. স্বামী বিবেকানন্দেব বাণী ও বচনা নবম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৪২—৪৩
৩. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা—২৮০, পৃঃ ৪৫০—৫৬
৪. বাণী ও বচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২—৪৩
৫. বচনা সংগ্রহ, সরলাবালা সবকাব, ১৯৮৯, পৃঃ ১৮৭—৮৮
৬. ঐ, পৃঃ ১৮৯

৭. ঐ, পৃঃ ১৯০
৮. ঐ, পৃঃ ১৯০—৯১
৮. Original Procedings of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 1897
১০. Ibid
১১. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২৮০, পৃঃ ৪৫০—৫৬
১২. রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৬৮, পৃঃ ১৫০
১৩. বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৩৯৮, পৃঃ ৬৪—৬৫
১৪. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪৫
১৫. মায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৮৫, পৃঃ ২১৫—১৬
১৬. ঐ, পৃঃ ২১৫—১৬
১৭. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৫—১৬, ১৩৭৩, পৃঃ ২২২

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা এবং সমকালীন সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া

কাশীপুরে মানবলীলা সংবরণের আগে 'অবিতার বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য অনুধাবন, শিবজ্ঞানে জীবসেবার অমোঘ নির্দেশের বাস্তবায়ন, ধর্মকে শুষ্ক আচার-আচরণের বেড়াজালে আবদ্ধ না রেখে সমাজের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সংযুক্তি, আন্তর্জাতিক চেতনা, বৌদ্ধ সংঘের 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'-এর কার্যাবলীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়, মানবকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণের অমেয় ভাব প্রচার ও প্রসার, আপন অভিজ্ঞতার অভিমুখে পৌঁছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের অভীপ্সায় স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই ১ মে ১৮৯৭ তারিখটি বিশ্ববন্দিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণ রূপে স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মানবলীলা সংবরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এগারোজন ত্যাগী শিষ্যদের নিজের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গেরুয়া বসন ও রুদ্রাক্ষের মালা তুলে দেন তখনই তো সূচনা হয়ে যায় একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ আন্দোলন আর সেই আন্দোলন পরিচালনা ও প্রসারে জন্ম হয় রামকৃষ্ণ সংঘের—যা পরবর্তীকালে দুটি ভাগে বিন্যস্ত, ক) রামকৃষ্ণ মঠ এবং খ) রামকৃষ্ণ মিশন।

আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের তারিখ দুটি ক্ষেত্রেই ইতিহাসের কাল-পঞ্জীর নিরিখে চিহ্নিত। রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯ অক্টোবর ১৮৮৬, বরাহনগরে, পরবর্তীকালে তা স্থানান্তরিত হয় আলমবাজারে, অবশেষে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি ছুঁয়ে বর্তমান বেলুড় মঠে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার তারিখ আগেই উল্লেখিত। বাগবাজারে বলরাম বসুর বসত বাড়ির হলঘরে আনুষ্ঠানিক সূচনা হলেও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ চলতে থাকে আলমবাজার মঠ থেকে

এবং পরবর্তী কালে বেলুড মঠেই স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় স্বামী বিবেকানন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে।

॥ ২ ॥

আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত কালপর্বেই শুরু হয়ে যায় প্রথম সেবা যজ্ঞের কাজ। এই কাজের কাণ্ডারী স্বামী অখণ্ডানন্দ। স্বামী অখণ্ডানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' কাজটির যা একদিনেই বা কোন যাদু-কাঠির স্পর্শে জাগরিত হয় নি। স্থির লক্ষ্য, অবিচল নিষ্ঠা, মোহন আদর্শে জীবনায়ন তাঁকে ধীরে ধীরে তৈরী করে তুলেছিল—ভিতরে ও বাইরে দু-দিক থেকেই। মুর্শিদাবাদের মহুলাতে (বর্তমানে ভাবতা ও সারগাছির মধ্যবর্তী স্থানে) অখণ্ডানন্দজীর সেবাকার্য শুরু করার আগের দিনগুলির সঙ্গে একবার আমরা দৃষ্টি বিনিময় করে নিতে পারি।

হিমালয় বিশেষজ্ঞ অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পবিব্রাজক বিবেকানন্দেব দেখা হয়েছিল কচ্ছ-মাণ্ডবীতে। আমেরিকায় যাওয়ার আগে বিবেকানন্দের সঙ্গে অখণ্ডানন্দের এই দেখাই ছিল শেষ দেখা। ১৮৯৫-এ অখণ্ডানন্দ আলমবাজার মঠে ফিরে এসেছিলেন নানা তীর্থস্থান পর্যটনেব পর। তাপের থেকেই প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা তাঁর নেতা বিবেকানন্দের আগমনের প্রত্যাশায়, উপল চিত্তে। এরই পাশাপাশি তাঁর অন্তর কলকাতার আশেপাশের দুঃখী, অজ্ঞ, কাতর, অন্ত্যজ-ব্রাত্য মানুষ-মানুষীর জন্য জাজ্বল্যমান। অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিকথা থেকে এ প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা উল্লেখ করতে পারি,—'তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন ...গঙ্গাস্নান করিয়া মঠে ফিরিবার পথে আলমবাজারের চৌমাথায় এক বুড়িকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। তখন দক্ষিণেশ্বরে, এঁড়েদহ অঞ্চলে ওলাউঠা-প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই বুড়িরও ওলাউঠা হয়। সে যে কোথা হইতে আসিয়া এখানে রাস্তায় পড়িয়াছিল, তাহা কেহই বলিত পারিল না। তারপর একখানা পরিষ্কার বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বুড়িকে পরাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ একখানা গরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে বরাহনগর থানায় দিয়া আসিলাম। থানাব লোক ক্যাম্বেল হাসপাতালে পাঠাইবার পর আমি মঠে ফিরিলাম।'[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খড়দহে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাড়ি পদব্রজে আগমনে বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ আতিথ্য গ্রহণকালে, মহাভারত কথকঠাকুর শিরোমণি মশায়ের কলেরায় আক্রান্ত হওয়া ও নির্দ্বিধায় তাঁর সেবায় মেতে ওঠা (যদিও হালিশহর বাসী এই কথকঠাকুর শেষ পযন্ত বাঁচেন নি) কিংবা হুগলি

জেলার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দেওয়ায় রোগাক্রান্ত মানুষজনের জন্য মর্মবেদনা—অখণ্ডানন্দের অন্তরের ছবিটি আমাদের সামনে স্পষ্টতর করে তোলে। এই নিঃস্বার্থ সেবার পরোক্ষ প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন জামনগরের বিখ্যাত বৈদ্য ঝন্ডুভট্ বিঠ্ঠলজীর কাছ থেকে। আর প্রত্যক্ষ প্রেরণা—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে।

আলমবাজার মঠ থেকে চন্দননগরে, কুকুরে কামড়ানো বিবেকানন্দ শিষ্য সদানন্দের প্রতিষেধক সংগ্রহ করে জনৈক ব্রহ্মচারীর মারফৎ মঠে পাঠিয়ে দিয়ে অখণ্ডানন্দ চললেন পায়ে হেঁটে নবদ্বীপ ধাম—শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি দর্শনে। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলি দেখবার জন্য যখন এগিয়ে চলেছেন, তখন তিনি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষজনের মাঝে পৌঁছে তাদের দ্বারা পরিবৃত হলেন। কিন্তু পিছু হটলেন না। মাত্র চার আনা পয়সা সম্বল করে শুরু হল ত্রাণ—আর্ত মানুষজনের ত্রাণ। নিঃসহায়, কর্পদকহীন, নিরাশ্রয় অখণ্ডানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসি মুখে দেখা দিয়ে অভয় বাণী শুনিয়েছিলেন,—'তুই এখানে থাক্। দেখ না কি হয়।' এই দেখাই রূপ নিল প্রথম সংগঠিত সেবাযজ্ঞের। স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা অনায়াসেই আমরা তুলে ধরতে পারি এ প্রসঙ্গে,—'খুব সকালে গঙ্গায় হাত মুখ ধুইয়া বাজারের দিকে আসিতে পথে দেখিলাম অতিশয় ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিতা প্রায় চোদ্দ বছরের একটি মুসলমান মেয়ে হাপুস নয়নে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। তাহার কাঁকালে একটি মাটির কলসী। তলাটি খসিয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল,—"বাড়িতে জল তুলিবার দ্বিতীয় পাত্র নাই। মা আমাকে মারবে সেই ভয়ে আমি কাঁদছি।" আমি তাহাকে লইয়া গিয়া দুই পয়সায় একটি মাটির কলসী কিনিয়া দিলাম এবং দুই পয়সার চিড়ে-মুড়কিও দেওয়া হইল। সঙ্গে আমার মাত্র সিকি অবশিষ্ট ছিল। আমার তিন আনা ফেরৎ লইতে না লইতেই সমুখবর্তী মরাদীঘি গ্রামের প্রায় দশ বারোজন ছোট বড় ছেলেমেয়ে দোকানে আসিয়া আমার কাছে সকাতরে ভিক্ষা চাহিয়া বলিল যে, তাহারাও আকালের জন্য খাইতে পায় না। আমি তখনই সেই দোকানীকে তিন আনার চিড়ে-মুড়কি প্রত্যেককে ভাগ করিয়া দিতে বলিলাম। তাহার পর আমি কপর্দকহীন সন্ন্যাসী।'[২]

অখণ্ডানন্দের মুর্শিদাবাদ যাত্রা কেবল তাঁর জীবনে নয়—রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় পদযাত্রা। শতবর্ষ পরে পিছনের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি—এক প্রেমিক মহাবীর পৃথিবীর দুঃখবেদনার

সঙ্গে শুধু ভালোবাসা আর সেবার অস্ত্রে সংগ্রাম করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন, পরাভূত হয়ে লুটিয়ে পড়ছেন, কিন্তু আবার উত্থিত হচ্ছেন করুণ সংগীতে—কান্না কান্না কান্নার সংগীত—পৃথিবীতে এত কান্না!

সেই কান্না তার বেদনার মাঝে নিরবচ্ছিন্ন সেবার মধ্য দিয়ে তিনি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষজনের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন। সে কথা আজ ইতিহাস। তার পুনরাবৃত্তি করবো না। শুধু উল্লেখ করবো। অখণ্ডানন্দ যখন সম্যক পরিস্থিতির কথা জানিয়ে আলমবাজার মঠে কিংবা মাদ্রাজে বামকৃষ্ণানন্দকে একের পর এক চিঠি পাঠাচ্ছেন তখন রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ থেকে এবং প্রেমানন্দ আলমবাজার থেকে যে কথাগুলি তাঁকে প্রত্যুত্তবে লিখছেন তা হল,—'তুমি কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী; হাজার, হাজার লোকেব অন্নসংস্থান করা তোমার অসাধ্য। অতএব তোমার মঠে ফিরে যাওয়া উচিত।' অগ্নিময় উৎসাহে শীতল জলের স্পর্শ। বিচলিত হলেন না অখণ্ডানন্দ। হবেনই বা কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ তো তিনি পেয়ে গেছেন। তাই সেবাযজ্ঞের কাজ পল্লবিত করে তুলতে অখণ্ডানন্দ যখন প্রস্তুত হচ্ছেন আত্মশক্তি আর গুরুদেবের আশীর্বাদকে ভর করে তখন এই প্রস্তুতিতে বারুদের সংযোগ ঘটালেন স্বামীজী—স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর নেতা, যাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। আলমোড়া থেকে স্বামীজী সব জানতে পেরে লিখলেন,—'ওয়া গুরুজীকি ফতে!! কাজ করে যাও। যত টাকা লাগে আমি দেব।' চিঠি লিখেই স্বামীজী খুশি হলেন না। আলমবাজার মঠ ও মিশনের দায়িত্বে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁকে সবরকমের সাহায্য পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর নির্দেশ পেয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি অর্থ, ওষুধ, বস্ত্র সংগ্রহ করে (মহাবোধি সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক চারুচন্দ্র বসু ১৫০ টাকা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্মৃতিচারণার সূত্রে জানিয়েছেন,—'প্রায় দুইমাস কাল মহাবোধি সোসাইটির দুর্ভিক্ষ-তহবিল হইতে যাহা পাওয়া যাইত, তাহাতেই কাজ চলিয়াছিল।' অর্থাৎ চারুচন্দ্র বসু ঐ ১৫০ টাকা ছাড়া দু'মাস মহাবোধি সোসাইটির তরফে অর্থ সাহায্য করেছিলেন) স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন (পরবর্তীকালে স্বামী সুরেশ্বরানন্দ)-এর মাধ্যমে অখণ্ডানন্দকে পাঠালেন। ত্রাণ-সামগ্রী, অর্থ এবং একজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আসায় ১৮৯৭-এর ১৫মে থেকে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠিত সেবাযজ্ঞ শুরু হল মুর্শিদাবাদের মাটিতে।

এই সেবাযজ্ঞ দীর্ঘদিন চলেছিল। অখণ্ডানন্দ সেবাকাজের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বা ত্রাণ সামগ্রী পাননি কিন্তু পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁর নেতার অপরিমেয় অনুপ্রাণনা। সমসাময়িক কালে লেখা অখণ্ডানন্দকে স্বামীজীর চিঠিগুলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা তা টের পাব। আমরা চিঠির নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করছি,—

১. এইরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। ... সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন, আশীর্বাদ জানিবে। কর্ম কর্ম কর্ম—হাম অ্যাওর কুছ নাহি মাঙ্গতে হে—কর্ম কর্ম—even unto death, দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। ... ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়—অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্। ...It is the heart, the heart that conquers, not the brain। ... এইতো আরম্ভ। এইরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না! ... লোকে দেখুক, আমাদেব প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কিনা! ... ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তাবের চেষ্টা করো। ... আমি শীঘ্রই Plain-এ নাবছি। বীব আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়েমানুষেব মতো বসে থাকা কি আমাব সাজে।

(১৫ জুন ১৮৯৭)

২. চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও 'ফের লেগে যা' আরম্ভ করেছি। শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than must out মবে গেলেও হাড়ে হাডে ভেল্কি খেলবে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসরেব ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—এর কম হবে না। তাল ঠুকে লেগে যাও—ওয়া, গুরুকী ফতে। টাকা-ফাকা সব আপনা আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাইনা। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে? (৩০ জুলাই ১৮৯৭)

৩. সঃ প্রত্যক্ষ এবং সর্বেষাং প্রেমরূপঃ—তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি-পাতা এখন কিছুদিন শান্তিলাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া-প্রেমের পুজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধ, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি। সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ অভীঃ। (১০ অক্টোবর ১৮৯৭)[৩]

সংশ্লিষ্ট তিনটি চিঠিই গুরুত্বপূর্ণ, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য প্রাথমিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে স্বামীজীর মনোভঙ্গির প্রতিফলনে। চিঠি তো চিঠি নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য কার্যাবলী, উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিবেকানন্দের লালিত দীর্ঘ অভীপ্সার ('ঠাকুর দিন দেন তো একদিন তা বাস্তবায়িত করব') সূত্রে প্রজ্ঞাদৃপ্ত ইস্তেহার। যে কাজের শুরু মুর্শিদাবাদের মাটিতে—গোটা ভারতবর্ষে এবং ক্রমে তামাম বিশ্বে তা প্রসারিত করে দেবার যে স্বপ্ন স্বামীজী দেখেছিলেন আজ তার সিংহভাগই বাস্তবায়িত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'পাদস্পর্শে' মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ঘটবে আর তারই মধ্য দিয়ে মানুষ অন্তরের দেবতাকে আবিষ্কার করবে নিজেরই মধ্যে। স্বামীজীর এই ঘোষণা এক নতুন ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছে যেমন, তেমনই শ্যাওলাদামে আচ্ছাদিত আত্মসংবিৎকে করেছে উন্মোচিত। স্বামীজীর চেতনার আকাশ জুড়ে ছিল মানুষ, মানুষ আর মানুষ। তাঁর প্রথম কথাটি মানুষ, মাঝের কথাটি মানুষ, শেষের কথাটিও মানুষ। 'মানুষ' সম্পর্কে তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণাকে দু'ভাবে বিন্যস্ত করেছেন.—১) নিজে যথার্থ খাঁটি মানুষ হও ২) মানুষ হয়ে অজ্ঞ, নিপীড়িত, কাতর, বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের উদ্ধারের জন্য, অন্ধকার থেকে আলোকস্নাত পথে এগিয়ে দেবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর। স্বামীজী সেই নিঃস্বার্থপর, খাঁটি মানুষের কথা উল্লেখ করলেন—যাঁরা একই সঙ্গে 'মায়ের জন্য' (দেশের জন্য) বলি প্রদত্ত। এই মানুষ স্বামীজী চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন আন্তরিক ভাবেই। পরবর্তীকালের ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয়, স্বামীজীর এই অভীপ্সা পূর্ণ হয়েছে। টাকা (অর্থ) নিয়ে তিনি কোনোদিনই মাথা ঘামান নি। কেননা তিনি জানতেন, মানুষই টাকা সৃষ্টি করে, টাকা মানুষ সৃষ্টি করে না। আর এও জানতেন, ভালো কাজে টাকার কোনোদিন অভাব হয় না। স্বামীজীর এই অগ্র চিন্তা আজ আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। এসব কথা প্রথম ও দ্বিতীয় চিঠির প্রেক্ষিতে। তৃতীয় চিঠিতে তিনি দুটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যা আজকের দিনেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক—১) কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো ছেড়ে মানুষ—জীবন্ত মানুষ (নররূপী নারায়ণ)-এর পুজোর উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন তিনি—'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' আদর্শ সামনে রেখে। ২) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসঙ্গটি জোরালো ভাবে তুলে ধরছেন। ভয়কে জয় করার মন্ত্রতো এই সঙ্গে আছেই।

এইভাবে স্বামীজী সেদিন অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের চলার পথের শুরুর দিনগুলিতে অখণ্ডানন্দকে অশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিলেন যেমন, তেমনি

আবার ছিল সঙ্গে প্রযোজনীয় নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ। কেবল জাগিয়ে তুলে কাজ করিয়ে নেওয়া নয়, সেই সঙ্গে কাজ যাতে ঠিক পথে হয়, তা দেখাও নেতা রূপে বিবেকানন্দেব দায়িত্ব। বিবেকানন্দ যতই হৃদয়ের কথা বলুন, একই সঙ্গে তিনি, সার্বিক চিন্তার নায়কও। তাঁর নিজের হাতে গড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ রূপচ্ছবিটি কেমন হবে, বন্ধুর পথ অতিক্রমণের উপায়, নিটোল ভাবমূর্তি, এব. উদ্দেশ্য-লক্ষ্য পূরণের জন্য সজাগ দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টিও তাঁকে বারবার ভাবতে হয়েছে। তাই প্রথম থেকেই অখণ্ডানন্দকে সতর্ক করে জানাতে লাগলেন, সাময়িক প্রেমাবেগে কিছু দান-খয়রাত করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়—স্থায়ী কাজ চাই, স্থায়ী কেন্দ্র মারফৎ। জানালেন, আমাদের উদ্দেশ্য—সুখী ভিখারী সৃষ্টি করা নয়, শিক্ষিত মানুষ তৈরী করা। সেবাকাজ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার ঠিক একমাস পরে ১৫ জুনের চিঠিতে, পূর্বোল্লেখিত উদ্দীপক কথাগুলির পরে স্বামীজী লিখেছিলেন,—'ঐ রকমে বিস্তাব করো, আর তাদের তুমি inspect করে বেড়াও। ক্রমে দেখবে যে, ঐ কার্যটা permanent হবে—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও ধর্মপ্রচার আপনা-আপনিই হবে।'

স্বামী বিবেকানন্দ আসলে অখণ্ডানন্দকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কর্মের আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক রূপে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এই প্রথম কর্মের আন্দোলন বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষে একটা নজির সৃষ্টি করুক, যাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবকের দল এই আন্দোলনে মেতে ওঠে—তাও চেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে।

স্বামীজীর এই আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয় নি। তার প্রমাণ,—১) যুবকেরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে কর্মের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বামীজী জীবিত থাকাকালেই আরো তিনটি বড সেবাকাজে তাঁরা অংশ নিয়ে নতুন এক নজির গড়েছিল। ২) সারা ভারতবর্ষে এমন কি বহির্ভারতেও সমকালে তীব্র সদর্থক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ৩) এই প্রতিক্রিয়ার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিল শিক্ষিত, অকপট, ত্যাগী যুবকের দল,—তারই ফলশ্রুতি শতবর্ষে স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসারণ, দেশে—দেশান্তরে।

॥ ৩ ॥

আমরা এবার সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়ার ছবিটি তুলে ধরবো। অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের মাঝে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ত্রাণকার্যের বিবরণ প্রশংসার. সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল 'মহাবোধি জার্নাল'

ও 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় একাধিকবার। তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা মহানগরী থেকে প্রকাশিত দুটি পত্রিকাই সারা ভারতে ছিল বিশেষ জনপ্রিয়। ১৮৯৭-এর জুলাই ও আগষ্ট মাসে 'মহাবোধি জার্নালে' মুর্শিদাবাদের সেবাকাজের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭-এর ৬ এবং ১৯ জুন। 'মহাবোধি জার্নালে' প্রকাশিত সংবাদের সারমর্ম হল—স্বামী বিবেকানন্দ নিয়োজিত স্বামী অখণ্ডানন্দ একজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী সহ মুর্শিদাবাদ জেলার নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ সেবাকাজ করছেন পরমোৎসাহে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। মহাবোধি সোসাইটি প্রদত্ত সাহায্য তাঁদের কর্মপ্রসারে বিশেষ সাহায্য করেছে। 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত সংবাদটির ভাষাও ছিল একই রকম। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় বাংলা ভাষায় এই সেবাকাজের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সমকালীন বাংলাদেশে একটা সাড়া জেগেছিল।

অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর নির্দেশে এবং ব্রহ্মানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় সেবাকাজ শুরু করার পর মাদ্রাজে অবস্থানকালীন রামকৃষ্ণানন্দের পূর্ববর্তী মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং তিনি অখণ্ডানন্দ প্রেরিত, দুর্ভিক্ষের করুণ বিবরণ সম্বলিত, বিপর্যস্ত মানবতার আর্তি প্রতিফলিত চিঠিগুলির কয়েকটি ইংরেজিতে তর্জমা করে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। সেইসঙ্গে মাদ্রাজবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদনও নিজের নামে জানিয়েছিলেন। মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা মারফৎই মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ-এর সংবাদ সর্বভারতের গোচরে আসে। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৮৯৭-এর ৫ জুন-এর সংখ্যায় রামকৃষ্ণানন্দ এক দীর্ঘ পত্রে পাঠকদের অখণ্ডানন্দের দুর্ভিক্ষসেবা সম্বন্ধে অবহিত করে সাহায্যের আবেদন জানান। রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর আবেদনে অখণ্ডানন্দের কয়েকটি চিঠির অংশ-বিশেষ ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ৫ জুনের সংখ্যায় রামকৃষ্ণানন্দের আবেদনের সঙ্গে অখণ্ডানন্দের চিঠির নির্বাচিত যে অংশ প্রকাশিত হয়েছিল, তা হল,—'এখানকার (মুর্শিদাবাদের) মানুষ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কতসংখ্যক মরে গেছে এবং কতসংখ্যক মরবার পথে, তার সীমাসংখ্যা করা অসম্ভব।' আরেকটি চিঠি থেকে,—'আশপাশের সবকটি গ্রামেরই একই অবস্থা। ক্ষুধার্ত মানুষগুলির মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা যখন ভাবি তখন ভয়ে তাদের কাছে যাই না—তাদের তো হাতে তুলে দেবার মতো কিছু নেই, আমরা শুধুই দেখব তাদের অপরিসীম কষ্ট।'

১৯ জুন ১৮৯৭-এ 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় রামকৃষ্ণানন্দ দীর্ঘ আবেদন প্রকাশ করেন। এই আবেদনের সঙ্গে অখণ্ডানন্দের চিঠির অংশবিশেষ শুধু নয়, স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন (পরবর্তীকালে স্বামী সুরেশ্বরানন্দ)-এর চিঠির অংশবিশেষও প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামকৃষ্ণানন্দ মুর্শিদাবাদ সেবাকাজের ঋত্বিক অখণ্ডানন্দের জীবন সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন। এটিই ছিল অখণ্ডানন্দের প্রথম জীবনী। রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর এই রচনায় অখণ্ডানন্দের দুটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে ২৯ মে'র চিঠিতে ছিল সেবাকাজের কিছু বিবরণ এবং ১৭ মে'র চিঠিতে দুর্ভিক্ষ-দুঃখের কথাচিত্র। শেষোক্ত চিঠিতে অখণ্ডানন্দ জানিয়েছিলেন, —'প্রতিদিন অনাহারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা চাল বিতরণ করছি, এই সংবাদে চারদিক থেকে দলে-দলে কঙ্কালসার মুমূর্ষুরা এসে জুটছে। কিন্তু আমাদের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলে যারা কেবল মৃত্যুদশায় হাজির, তাদেরই পুরো চাল দিতে পারি। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ কে আছে, তা আমরা আগে সন্ধান করেছিলাম, কিন্তু গতকাল থেকে সে-কাজ বাদ দিতে হয়েছে, সর্বদিক থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে, তাদের দেবার মতো সঞ্চয় আমাদের নেই।'

স্বামী নিত্যানন্দের ১৬ মে'র চিঠিটি কারুণ্য নিষিক্ত মর্মস্পর্শী দলিল,—'সার্বিক দৃশ্য এতই মর্মান্তিক এবং হৃদয়বিদারক তা কিছুতেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দলে দলে ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা নরনারী এসে তাদের যন্ত্রণার কথা বলে যাচ্ছে, যা শুনে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। স্ত্রী-পুত্রকে ফেলে স্বামী পালিয়ে গেছে, কিংবা গলায় দাড়ি দিয়েছে; নিরূপায় পুরুষ—সে তার স্ত্রী-পুত্রের পেটের জ্বালা আর দেখতে পারছিল না। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এসে গেছে মহামারী। অন্নের সঙ্গে মানুষের সম্ভ্রমও গেছে—তারা প্রায় উলঙ্গ হয়ে রয়েছে বস্ত্রাভাবে।'

ব্রহ্মচারী সুরেনের ২ জুনের চিঠিতে একই বিবরণ—'কিভাবে মানুষ ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে, পারছে না। সরকার সাহায্য-কেন্দ্র খুলেছে, কিন্তু যেখানে যথার্থ প্রয়োজন, সেখানে সাহায্য পৌঁছচ্ছে না। মুসলমান মহিলারা জেনানায় থাকেন; সেখানে থেকে তাঁরা অনাহারে শুকিয়ে মরে যাবেন তবু নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে যৎসামান্য সাহায্য নিতে আসবেন না, যে-লোকগুলি মোটেই ভদ্র নয়, আমরা এই ধরণের মানুষকেই বেশি সাহায্য করছি—সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসহায়, বৃদ্ধ অথর্বদের।' ব্রহ্মচারী সুরেনের এই চিঠির একটি অংশ জুড়ে ছিল অখণ্ডানন্দের সেবার

মানসিকতা, অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেবাকাজে অংশ নেওয়া এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মূর্ত রূপের নিটোল মুগ্ধতাবিষ্ট বর্ণনা,—'এখানে সকলেই স্বামী অখণ্ডানন্দের অদম্য উৎসাহ ও সর্বমানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা দেখে বিস্মিত—একেবারে মোহিত। ইনি কখনো সারারাত রোগীর শয্যাপার্শ্বে কাটান, কখনো বা গ্রামে গ্রামে সন্ধান করে ফেরেন—কোথায় রয়েছে অসহায় মানুষেরা, কাদের সাহায্য প্রয়োজন? দরিদ্রের জন্য প্রাণে-প্রাণে অনুভব করা কাকে বলে, তা যদি কেউ জানতে চান, তিনি অখণ্ডানন্দের কাজ দেখে নিতে পারেন। দরিদ্রকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়, তা যেন সকলে তাঁর কাছ থেকে শিখে নেয়।'

এই সব চিঠির অংশবিশেষ ইংরেজিতে তর্জমা করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় সারা ভারতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিশেষত মাদ্রাজবাসীরা অকৃপণভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাজবাসী আর. গোপাল আইয়ার সেদিন মুর্শিদাবাদে সেবাকাজের জন্য ১০০০ টাকা দান করেছিলেন। সেকালে এটা কম কথা নয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকাজের সংবাদ ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর তা পৌঁছেছিল প্রধানত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার সূত্রে। মিস্ মার্গারেট নোবেল (পরবর্তীকালে যিনি সিস্টার নিবেদিতায় রূপান্তরিত) তখনো ভারতে আসেন নি। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসে ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার স্থাপিত হয় এবং সাহায্যের জন্য আবেদন প্রকাশিত হয় 'ডেইলি ক্রনিকল' পত্রিকায়। আবেদনের সারমর্মটি ছিল—১৮৯৩-এ শিকাগো বক্তৃতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং ১৮৯৫ ও ১৮৯৬-এ ইংলণ্ডের নানা স্থানে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন নিয়ে যিনি বক্তৃতা করে বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন—যা একটি অ-রাজনৈতিক, অ-সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, তার উদ্যোগে বাংলাদেশের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষজনিত সেবাকাজ চলছে, সরকারী সাহায্য অপ্রতুল, এজন্য সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করুন। এই আবেদনের শেষে মার্গারেট নোবেল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁকে ব্যক্তিগত চিঠিতে যা লিখেছিলেন তার খানিকটা তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই উদ্ধৃত অংশটি হল,—'এই সেবা-কাজ একটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এই আন্দোলন একটি বিষয়ে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে—উচ্চবর্ণের অনেক তরুণ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যশ্রেণীর কলেরা

রোগীর সেবা করছেন, সোৎসাহে। বুদ্ধদেবের সময়ের পরে এমন ঘটনা বোধহয় ভারতে ঘটেনি।'[৪] (আবেদনটি 'ডেইলি ক্রনিকল' পত্রিকায় 'An Ideal Relief Fund'—এই শিরোনামে ১৮৯৭-এর ৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল)।

মার্গারেট নোবেল ইংলণ্ডের উইম্বলডন থেকে লেখা 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে ছিল, ইংলণ্ডের নানা মহলে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের বিবরণ এবং ইংলণ্ডের মানুষজনের উদ্দেশে প্রজ্ঞাপিত আবেদন। এই আবেদন কতটা সাড়া জাগিয়েছিল, উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পেয়ে যাই ঐ 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাতেই।[৫]

মুর্শিদাবাদের সেবাকাজ চলাকালীন বাংলাদেশের দিনাজপুরে, বিহারের দেওঘরে, রাজস্থানের কিষেণগড়েও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ঐ সব স্থানগুলিতে সেবাকাজের দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং বিবেকানন্দ শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ। এই সব সেবাকাজের খবর সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকা ১৮৯৭-এর ১৩ নভেম্বর সংখ্যায় লিখল যে,—সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন চমৎকার কাজ করেছে। মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে তারা জানিয়েছিল যে, বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ জেলার সদর) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—কালেক্টর মিস্টার লেভিঞ্জ অখণ্ডানন্দ কৃত সেবাকাজের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন এবং তিনি অখণ্ডানন্দকে একটি অনাথাশ্রম স্থাপনে অনুরোধ পর্যন্ত করেছেন। 'ট্রিবিউন' সন্তোষ প্রকাশ করে আরো লিখেছিল যে, এই বোধহয় প্রথম সরকারী কর্মচারীরা সেবাব বিষয়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হাত মেলালেন (এই কাজটা সেকালের ভারতবর্ষে ছিল কল্পনাতীত)। রাজস্থানের (তৎকালীন রাজপুতনা) কিষেণগড়ের সেবাকাজের দুটি বিবরণ প্রকাশ করেছিল 'ট্রিবিউন' ১৯০০-এর ২৬ ও ২৯ মে। দ্বিতীয় বিবরণটি দীর্ঘতর, যার মধ্যে কল্যাণানন্দ কর্তৃক অনাথাশ্রম স্থাপনের কথা আছে। সেই সঙ্গে আছে ফেমিন কমিশনার মেজর ডানলপ স্মিথের ঐ অনাথাশ্রম পরিদর্শন এবং প্রশংসার সংবাদ।

'মাদ্রাজ মেল' ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৭, 'ফেমিন রিলিফ ইন বেঙ্গল' শীর্ষক এক নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেই নিবন্ধে অখণ্ডানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দের দুর্ভিক্ষ সেবার বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ ছিল। এই দু'জন সন্ন্যাসী কিভাবে গ্রামে গ্রামে ঐ কাজে ঘুরেছেন, কিভাবে নিজেদের

শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মতোই যৎসামান্য আহারে দিন কাটিয়েছেন, সেবার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের কোন পার্থক্য করেন নি এবং এমন কর্মনৈপুণ্য দেখিয়েছেন যে জেলার সর্বোচ্চ রাজপুরুষ পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্বাসে এঁদের উপর কর্মদায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন ও সানন্দে উন্মোচন করে দিয়েছেন সরকারী সাহায্যের ভাণ্ডার—এই সকল 'বিস্ময়কর' সংবাদ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেছিল।

॥ ৪ ॥

রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ প্লেগ-সেবা। ভয়াবহ বিভীষিকাময় অবস্থায় কলকাতার আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীর দলে দলে পালিয়ে যাওয়ার খবর বাংলার বাইরের পত্রিকাগুলিতে বিশদ ভাবে প্রকাশিত হল। মহারাষ্ট্রের পুনার 'মরাঠা' পত্রিকা ১৮৯৮-এর ৮ মে লিখল,—

'কয়েকদিন ধরে কলকাতায় ভয়ানক বিভীষিকাময় অবস্থা চলেছে। বহু বছর কলকাতায় এ-জিনিস দেখা যায় নি। আট লক্ষ লোকের ঐ বিরাট জনসমুদ্র যেন সহসা ভয়াবহভাবে সংক্ষুব্ধ, আলোড়িত হয়ে উঠেছে। শহরের বাইরে পালাবার জন্য প্রচণ্ড ব্যস্ততা—সাধারণ যানবাহন দ্বারা ঐ বিপুল জনসংঘকে পাচার করা সম্ভব নয়। ট্রেনে, স্টীমারে, পথে—শুধু দেখা যায়, বিপুল প্রবাহিত জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের মধ্যে দু'লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে গেছে। কিছু ধনী পর্দানসীনা মহিলা পর্দাবন্ধন ফেলে দিয়ে পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে ছুটেছেন—এই মারাত্মক শহর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। অবস্থা দেখে মনে হয় এ বিরাট এক সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিচিত্র রূপ।'

৪ মে'র, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হল,—

'আতঙ্কের রূপ অদৃষ্টপূর্ব। আর কখনো কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা এইরকম প্রবলভাবে আন্দোলিত হয় নি। যেসব মুখ "সূর্যও দেখেনি", তাঁরাও শহরের পথের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছেন বা ট্রামে চড়ে পালাচ্ছেন। পদব্রজে পলায়নের কারণ—অন্য কোন যানবাহন পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতি ঘন্টায় দশ টাকা গাড়ি ভাড়া। তাও গাড়ির সংখ্যা সীমাবদ্ধ। হাওড়া স্টেশনের দিকে যে জনস্রোত ধাবিত হচ্ছিল, হাওড়া ব্রিজে তাদের ধরেনি। সেই ভিড় ঠেলেই মহিলারা ছুটেছেন। নৌকাওয়ালারা এক পয়সার বদলে পাঁচ টাকা দাবি করেছে। চারিদিকে কেবল দেখা যায়—সবাই পালাচ্ছে, শুধু পালাচ্ছে জীবনের ভয়ে।'

প্লেগ মানেই ভয়, সেই ভয় মৃত্যুর। সে মৃত্যু ভয়ংকর। হাজারে-হাজারে। তাই স্বামীজী উদ্বিগ্ন, অস্থির। মুর্শিদাবাদ-প্রত্যাগত অখণ্ডানন্দকে নিয়ে স্বামীজী গিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ। প্লেগের সংবাদ সেখানে পৌঁছনোর পর স্বামীজীর প্রতিক্রিয়ার ছবিটি তুলে ধরেছেন প্রত্যক্ষদর্শী অখণ্ডানন্দ—

'স্বামীজী অমন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি, একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেন না। চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হল, কিন্তু তাঁরা কোন রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না। একটা বালিশের উপর মাথা গুঁজে সারাদিন বসে রইলেন। তারপর শুনলাম, কলকাতায় প্লেগে নাকি তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে শুনে অবধি এই অবস্থা।'[৬]

স্বামীজী কলকাতায় ফিরে এলেন। ফিরেই মঠে (মঠ তখন নীলাম্বর-বাবুর বাগান বাড়িতে) সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তদের এক যৌথ সভা ডাকলেন। সভায় সমবেত সকলেব উদ্দেশে বললেন যে,—'দেখ আমরা ভগবানের পবিত্র নামে এখানে মিলিত হয়েছি। মরণভয় তুচ্ছ করে এইসব প্লেগরোগীদের সেবা আমাদের করতে হবে। এদের সেবা করতে, ঔষধ দিতে, চিকিৎসা করতে আমাদের নূতন মঠের জমিও যদি বিক্রি করে দিতে হয়, আমাদের যদি জীবন বিসর্জনও দিতে হয়, আমরা প্রস্তুত।'[৭]

কলকাতায় তখন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনরকম আস্থা নেই। প্লেগের কালে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা নেই। এই পরিস্থিতিতে সভায় স্থির হল, রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে প্রচারপত্র বিলি করে জনগণকে তাদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। প্রচারপত্র প্রথমে বাংলায় রচিত হল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তার হিন্দি অনুবাদ করলেন। বাংলা ও হিন্দিতে তা হাজারে হাজারে ছেপে কলকাতার জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হল। সেই প্রচারপত্রে লেখা ছিল,—

'কলিকাতা-নিবাসী ভাই সকল, আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী। এই দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারী ভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও প্রার্থনা।

'যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া শহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সে রোগে যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে হাজির হয়, তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধনীজ্ঞান করিব, কারণ তোমরা

সকলে ভগবানের মূর্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনার কোনো প্রভেদ নাই। যে (লোক) অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানসত্তায় অন্যথা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

ধনী লোক পালায় পালাক, আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি। ...হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয়, তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থসাহায্যও সম্ভবপর।'[১৮]

এই প্রচারপত্রটি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের অপরিমেয় এক দলিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে, স্ত্রীলোকের বিশেষ ব্যবস্থার চিকিৎসার কথাও প্রচারপত্রে উল্লেখিত হয়েছিল। বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে সেবা কাজের প্রস্তুতি এবং অর্থের প্রয়োজনে বেলুড় মঠের 'নূতন জমি' (বর্তমানে যেখানে মঠ অবস্থিত) পর্যন্ত স্বামীজী বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় প্লেগ নিবারণে স্বামীজী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অবস্থান কোথায় ছিল। নিঃসন্দেহে সে অবস্থান ছিল ঐতিহাসিক, তা আমরা সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতেই লক্ষ্য করবো।

১৮৯৮-এ প্লেগ রোগ মারাত্মক আকার নেয়নি শেষ পর্যন্ত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারপত্র বিলিতে সাধারণ মানুষ সজাগ হয়েছিল। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে ঘিঞ্জি, বস্তি অঞ্চলে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও কর্মীবৃন্দ কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। সরকারী ব্যবস্থায় কয়েকটি হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। এইসব কারণেই মারাত্মক রোগটিকে বশে আনা গিয়েছিল। কিন্তু আসল ট্রাজেডি ছিল অপেক্ষমান। ১৮৯৯-এব মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্লেগ রোগ কলকাতা মহানগরীকে জাপটে ধরল। মানুষ এবার আর পালাবার সুযোগ পেল না। স্বভাবতই মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। নিবেদিতা আর্তনাদ করে ইংলণ্ডের বিবেকানন্দ অনুরাগীদের কাছে চিঠিতে লিখলেন (২৩ মার্চ ১৮৯৯),—'কী ভয়ংকর! চারদিকে মানুষ মরছে অথচ কিছু করবার নেই!' স্বামীজী চোখের সামনে দেখলেন তাঁর কলকাতার ভাই-বোনেদের সর্বনাশ। স্থির করলেন, এর বিরুদ্ধে যেভাবেই হোক লড়াই করতে হবে। আলোচনা করলেন নিবেদিতার সঙ্গে, আলোচনা করলেন রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং অনুরাগী তরুণ কর্মীদের সঙ্গে। সকলেই 'সহাস্যে মৃত্যুবরণ' করতে প্রস্তুত।

১৮৯৯ এর ৩১ মার্চ, গুড ফ্রাইডের দিন রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কাজ শুরু হল। জনসাধারণের মনোবল বাড়াতে এবং কর্মীদের উৎসাহ দিতে স্বামীজী নিজে দরিদ্র পল্লীতে এসে বাস করতে লাগলেন। সমস্ত সেবাকার্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন নিবেদিতা। তিনি গঠিত প্লেগ নিবারণী সেবা সমিতির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা—একই সঙ্গে। স্বামী সদানন্দ কার্যপরিচালক। তাঁর সহকারীরা হলেন—স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ এবং স্বামী আত্মানন্দ।[১]

স্বল্পপরিসরে সেই দিনগুলিতে আমরা দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিতে পারি। প্লেগ রোগাক্রান্ত পিতৃ-মাতৃহারা শিশুকে কোলে নিয়ে বাস্তব দুঃসহ পরিবেশে নিবেদিতা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে রইলেন। মাতৃজ্ঞানে মৃত্যুপথযাত্রী শিশুটিও তাঁকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। এই নতুন মায়ের কোলেই সে মরেছিল অবশেষে। স্বামীজী এই কাজের সাহসিকতার তারিফ করেও এই আত্মঘাতী রোমান্স থেকে সরিয়ে নিয়ে নিবেদিতাকে বস্তি পরিষ্কারের কঠিনতর কাজে নিয়োগ করেছিলেন। নিবেদিতা বস্তিবাসীদের মর্মান্তিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে সংবাদপত্রে চিঠি—নিরন্তর চিঠি লিখতে লাগলেন। সাহায্যের আবেদন জানালেন, সেই সঙ্গে বস্তিতে বস্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে কি ধরণের কাজ চলেছে, তার বিবরণও দিলেন। তাতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহলে সাড়া পড়ে গেল, অল্পবিস্তর সাহায্য তাঁরা পেলেন এবং তাঁদের কাজ প্রত্যক্ষ দেখবার পর সরকারী হেলথ্ অফিসার ডাঃ নীল্ড কুক, সরকারী প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান মিস্টার ব্রাইট এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, যা সেকালে কোন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পাবার কল্পনাও করতে পারত না।

এই কাজে স্বামীজী আরো বেশি সংখ্যক যুবকদের সাহায্য চেয়েছিলেন। এজন্য ১৮৯৯-এর ২২ এপ্রিল বিডন স্ট্রীটের 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভাটি রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন নিবেদিতা। জ্বলন্ত ভাষায় কলকাতার ছাত্র-যুবকদের পৌরুষকে তিনি আহ্বান করেছিলেন—দরিদ্র অসহায় বস্তিবাসী ভাই-বোনেদের চরম সংকটের দিনে সাহায্য করবার জন্য। নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতায় এই সেবা প্রয়াসকে গণ আন্দোলনের রূপ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছোট্ট বক্তৃতায় সকলকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই সভার খবরটি কলকাতার সংবাদপত্রগুলি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ না করায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সংবাদপত্রগুলি ধিক্কার জানিয়েছিল। এই সভার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বেশ কিছু ছাত্র-যুবক স্বেচ্ছাসেবক রূপে নিজেদের নাম লিখিয়েছিল। তাদের নিয়ে নিবেদিতা ও সদানন্দ বস্তি পরিষ্কারের কাজ করেছিলেন।[১০]

মার্চ মাসের শেষে ছড়িয়ে পড়া এই প্লেগ রোগের প্রকোপ জুন মাসের শেষে স্তিমিত হয়ে এল। এরপর পরই নিবেদিতা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান কিছুটা পারিবারিক প্রয়োজনে এবং বেশির ভাগটা রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। স্বামীজীও প্রথমে আমেরিকা ও তারপর ইউরোপে গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বারের জন্য। শরৎ, হেমন্ত অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দী বিদায় নিল। বিংশ শতাব্দী বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনা নিয়ে হাজির হল। শীত, বসন্ত অতিক্রান্ত হবার পর পরই সেই 'কালভৈরব' রূপে হাজির হল গ্রীষ্ম। আবার কলকাতার বুকে ফিরে এল প্লেগ। শুধু ফিরেই এল না, এল আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপে। স্বামীজী ও নিবেদিতার অবর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ থেমে রইল না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উদ্যোগে সদানন্দের নেতৃত্বে এবং নিরলস-প্রত্যয়দৃপ্ত-সুকঠোর পরিশ্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ অব্যাহত রইল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের এই প্লেগ-মহামারীর সেবাকাজে সদানন্দ অতুলনীয় বীরত্ব ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নাম তখন সকলের মুখে মুখে ফিরছিল। রামকৃষ্ণ মিশন তখন বিরাট কোন প্রতিষ্ঠান নয়, পুঁজি সামান্যই, তবু অসামান্য কাজ হয়েছিল তার মাধ্যমে, যাতে বিবেকানন্দের উক্তির সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছিল—মানুষই কাজ করে, টাকা নয়। শহরের দরিদ্রতম অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের অতুলনীয় সেবাকাজের বিষয়ে ২৯ এপ্রিল ১৯০০-এর 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা জানিয়েছিল,—

> 'The Ramakrishna Mission ...Plague volunteers ...are to be met with in Calcutta in the direct streets and filthiest bustees, helping to clear plague ...spots, encouraging the people, consoling them in their affliction and teaching them to live clean lives. And this is done without the expenditure of much money.'

এই খবর জানতে পেরে ভারতবাসী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞের উত্তাপ নিশ্চয়ই কিছুটা টের পেয়েছিল। ১৯০০-এর ১ সেপ্টেম্বরের 'ব্রহ্মবাদিন্'

পত্রিকা পড়ে ভারতবাসী আরো জানতে পেরেছিল যে, সদানন্দের দল প্লেগ রোগাক্রান্ত কলকাতা মহানগরীর ৬ জন মেথর, ৩ জন ধাঙড় সহ মোট ১৩ জন মজুরকে নিয়ে মাত্র ৫ সপ্তাহের মধ্যে নর্দমা সাফ ও জীবানু-প্রতিষেধক সহ ১৩০০ বস্তি বাড়ি, ৪০টি পাকা বাড়ি পরিষ্কার করেছিলেন এবং মোট ১৬০টি বাড়ির আবর্জনা সরিয়েছিলেন। শহরের জঘন্যতম বস্তি অঞ্চলেও তাঁরা এই কাজ করেছিলেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

১৯০০-এর প্লেগের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের নায়ক সদানন্দ। অখণ্ডানন্দের মতো সন্ন্যাসী আর্ত মানুষের সেবায় আগে থেকেই ছিলেন তৎপর এবং অভিজ্ঞ। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ভারত প্রব্রজ্যার সময় হরিদ্বারের কাছে 'হাথরাশ' রেল স্টেশনের তরুণ এ্যাসিসটেন্ট স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ও ভাবাদর্শের সামনে নতজানু হয়ে গ্রহণ করেছিলেন শিষ্যত্ব। তারপর সন্ন্যাস। তিনিই ছিলেন স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী-শিষ্য। শরৎচন্দ্র গুপ্ত থেকে স্বামী সদানন্দে পৌঁছতে বেশি সময় যেমন লাগেনি, তেমনি লাগেনি গুরুদেবের কর্মচঞ্চল 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মানসিকতাটি বুঝতে। তাই বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্য হতে পেরেছিলেন তিনি। সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় অনবদ্য কথাচিত্র এঁকেছেন সদানন্দ সম্পর্কে। রোমাঁ রোলাঁ এই 'পুষ্পটি'কে তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীর পাত্রে স্থাপন না করে পারেন নি। নিবেদিতা 'দি মাস্টাব অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে সদানন্দের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এবং 'পত্রাবলী'র সিংহভাগ জুড়েই সদানন্দের কথায় পরিপূর্ণ। সদানন্দের দেহত্যাগের পর 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে সুন্দর লেখা বেরিয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতিতর্পণ করেছেন 'স্মৃতিকথা'য়। বিবেকানন্দের জীবনীগুলিতে সদানন্দের উপস্থিতি স্বভাবতই বর্ণোজ্জ্বল।

স্বামী সদানন্দ আর্ত মানুষের সেবায় কতটা তৎপর ও আন্তরিক ছিলেন আমরা দুটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারি। এক কুষ্ঠরোগীর পাশে তিনি শুয়ে কাটিয়েছিলেন একটা গোটা রাত। সেই কুষ্ঠরোগীকে 'নারায়ণ' জ্ঞানে সেবা করলেন পরদিন প্রভাতে। তার ক্ষত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলেন, সকালে শুশ্রূষা করলেন, পুজো করলেন তাঁকে নারায়ণ জ্ঞানে। নিবেদিতা জানিয়েছেন, এই নারায়ণ জ্ঞান তাঁর এমন তুরীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঐ কুষ্ঠরোগীর ক্ষতস্থান তিনি মুখ দিয়ে চুষেছিলেন। আর একবার, তিনি এক বসন্তরোগীর সেবা করেছিলেন, দারুণ মারীতে সেই রোগীটির শরীর আগুনের মত জ্বলছিল, যন্ত্রণাকাতর মানুষটিকে সদানন্দ ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের বুকে জড়িয়ে রাখলেন,

যেহেতু তাঁর মনে হয়েছিল, ওর জ্বালা জুড়োবার পক্ষে তাঁর বুকের চেয়ে সুশীতল ঠাঁই আব কোথাও নেই।

কলকাতার প্লেগে তাঁর অবিস্মরণীয় ছবিটির কথা তুলে না ধরলে এ আলোচনা থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। সিস্টার ক্রিস্টিনের কথাচিত্রই তুলে ধরব এ প্রসঙ্গে,—

> 'কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে ঝাড়ুদারবাহিনী গঠন করে বাগবাজারে বস্তি পরিষ্কারের কাজে তিনিই প্রথম এগিয়ে গিয়েছিলেন। ভিক্ষা করা টাকায় একাজ তিনি করেছিলেন। ঝাড়ুদার বাহিনীর ছোকরা অচ্ছুতদের তিনি কি ভালই না বাসতেন। তাদেরই একজন হয়ে তিনি কাজ করতেন—ঝাড়ুদেওয়ার কাজ পর্যন্ত। তাঁরা বস্তির নরককুণ্ড পরিষ্কার কবে জনস্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনেছিলেন—সে কাজ করেছিলেন অদম্য উৎসাহে। অস্পৃশ্য ছেলেগুলির মধ্যে তিনি নিজের সত্তাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই সেবাকাজে সদানন্দ তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন—নষ্ট করেছিলেন নিজের অসাধারণ স্বাস্থ্যকে।'[১১]

রামকৃষ্ণ মিশন প্লেগ বোগাক্রান্ত কলকাত্রয় তিনবার যে সেবাকাজ করেছিল সারা ভাবতে তার প্রতিক্রিয়ার ছবিটি বর্ণবিভায় উজ্জ্বল। সেই ছবিটি এবার আমরা তমগ্নোভাবে প্রত্যক্ষ করব। 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় ১৮৯৯-এর ১ মে'র সংখ্যায় নিবেদিতার লেখা কলকাতার প্লেগ সংক্রান্ত দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। 'স্টেটস্‌ম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় সমকালেই তারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। এই সূত্রে তামাম ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যের মানুষ কলকাতার প্লেগ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। অর্থ সাহায্যও এসেছিল।

বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও লেখক মালাবারি, বিবেকানন্দের উদ্যোগে এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবা প্রসঙ্গে সাধুবাদ জানিয়ে 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর' পত্রিকার ৩০ এপ্রিল ১৮৯৯-এর সংখ্যায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেই নিবন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দ ইচ্ছা করলে দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন, একথা আমরা আগে বলেছি, এখন আমাদের সে আশা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা দেখছি। প্লেগ-সেবা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নানা বিষয়ে বিবেকানন্দের সমালোচক 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার' পত্রিকাও এই প্লেগ-সেবা কাজের বিষয়ে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের

প্রশংসা ভিন্ন আব কিছু করার কথা ভাবতে পারেনি। ১৮৯৮-এর ৯ অক্টোবর তারিখে 'রিনানসিয়েশন এণ্ড সার্ভিস' নামে যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে যে কথাগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ পুরনো রীতির আধ্যাত্মিক সুখের জন্য দয়া বৃত্তির অনুশীলনের কথা না বলে বৃহত্তর মানবসেবার কথা বলেছেন। পূর্বোক্ত প্রকার ত্যাগ স্বার্থপরতাব নামান্তর, আর বিবেকানন্দের ত্যাগ জনগণের উন্নয়নের জন্য। স্বামীজী 'জাতীয় কর্মশক্তি'র বৃদ্ধি চান। সম্পাদকীয় নিবন্ধের ভাষা উদ্ধৃত করে বলতে পারি,—'এক হিন্দু সন্ন্যাসী এইভাবে পুরাতন ভাবধারাকে নতুন যুগের উপযোগী চেতনায় মণ্ডিত করে প্রকাশ করবেন এটাকে আমরা অভিনন্দনের যোগ্য মনে করি। সকল মানুষ হয়ত তাঁর এই প্রচেষ্টায় খুশি হবে না, ...কিন্তু স্বামীজীর এই ভাবধারা ভাবী ভারতের উর্ধ্বতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।'

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ ভারতীয় সমাজে কী ধরণের নিঃশব্দ বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল তা এই কাগজে প্রকাশিত ১১ আগস্ট ১৯০১ তারিখের একটি চিঠির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমবা বুঝতে পারি। চিঠিটিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের ক্ষেত্রে ভারত নবযুগের পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজ সংস্কারের যথার্থ তাৎপর্য বিষয়ে সে অবহিত হচ্ছে; বেহিসেবী সংস্কার—কল্পনার উচ্ছ্বাস কমে গিয়ে সংস্কার কর্মের গুণ ও পরিমাণ বাড়ছে। সাক্ষাৎ ফল নয়, স্থায়ী ফলই শ্রেষ্ঠ, তা সংস্কারকেরা অনুভব করছেন—এবং তা ঘটছে স্বামী বিবেকানন্দেব প্রচারের ফলে।

সমসাময়িক কালে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের পত্রিকাগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্লেগ-সেবার প্রশংসাজনিত সংবাদই শুধু প্রকাশিত হয় নি, স্বতন্ত্র নিবন্ধ বা সম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। বাল গঙ্গাধর তিলকের 'মরাঠা' পত্রিকায় একাধিকবার এই প্লেগ-সেবার সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় সেই সব প্রকাশিত সংবাদে। 'মরাঠা' পত্রিকায় ১৯০১-এর ২২ ডিসেম্বর এই বিষয়ে দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই নিবন্ধ দুটি থেকে নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি।

> ১. আধুনিক জীবনের পরিবর্তিত অবস্থায় রামকৃষ্ণ মিশন মানবতার সেবাকাজ গ্রহণ করে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আত্মত্যাগ

এবং আত্মবিলোপের আদর্শ গ্রহণকারী সন্ন্যাসীগণ এতাবৎকাল কর্মব্যস্ত সংসার থেকে দূরে, নিঃসঙ্গ প্রত্যাহারের জীবনযাপন করেছেন। কিন্তু তার তুলনায় দুঃস্থ মানবভ্রাতাদের দুর্দশা দূরীকরণের জন্য আত্মদানের জীবনকে বরণ করা বহু গুণের কাম্য এবং ধন্য। রামকৃষ্ণ মিশন এই আদর্শকে বাস্তবে অনুসরণ করেছে; প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁদের কাজ গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক না করে পারবে না।

২. রামকৃষ্ণ মিশন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্লেগেব সময়ে শহর পরিষ্কারের নিরতিশয় নীরস কাজও করেছে। শহরেব দরিদ্রতম যেসব মানুষ ঘরবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী স্থান পরিষ্কার করা এবং জীবানুশূন্য করার ব্যয় বহন করতে অসমর্থ, মিশনের স্বেচ্ছাসেবকেরা কেবল তাদের মধ্যেই কাজ করেছে। ...ভরসা করি, এইসব বাস্তব কর্মে নিযুক্ত বৈদান্তিকদের প্রশংসনীয় কার্যাবলী ...আমাদের দেশের এই অঞ্চলের ধর্মব্রতীদের মধ্যে শুভতর প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটাবে, যার ফলে তাঁরা সংগঠিতভাবে সহযোগিতামূলক কর্মে নিরত হবেন।

৩০ এপ্রিল ১৮৯৯-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'মরাঠা' রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ সেবার কাজকে (ঐ সময় কাজ চলছিল) পরমাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল। তার কারণও ছিল একাধিক। প্রথমত—এর দ্বারা বাঙালী যে কেবল বাক্‌সর্বস্ব নয় (যে ধারণা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বহুল প্রচলিত) তা প্রমাণিত হল। দ্বিতীয়ত—যে বিবেকানন্দকে ধর্মনায়ক বলে তিলক-গোষ্ঠী স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁর অধিকন্তু কর্মী রূপটিকে এঁরা দর্শন করতে পারলেন। তৃতীয়ত—বাস্তববাদী দৃঢ়চিত্ত মরাঠি মনের প্রতিনিধি 'মরাঠা', বিস্ময় ও ধিক্কারের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল—বিবেকানন্দের প্লেগ সেবার এতবড় সংবাদকে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি উপযুক্ত স্থান দেয় নি। এ সম্পর্কে তাদের মন্তব্যগুলি তীরের মত এসে বিদ্ধ করেছিল বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলিকে। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মাদ্রাজের 'হিন্দু' বা 'মাদ্রাজ মেল', 'মাদ্রাজ টাইমস্' কিংবা লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার কাছে অলক্ষিত থাকে নি। 'হিন্দু' পত্রিকায় ১৭ এপ্রিল ১৮৯৯-এ 'নোটস ফ্রম ক্যালকাটা'র মধ্যে নিবেদিতার নেতৃত্বে প্লেগ-সেবাকাজ আরম্ভের বিবরণ ছিল। বস্তিবাসী অসহায় প্লেগরোগাক্রান্তদের সাহায্যের বিষয়ে কলকাতা পুরসভাকে উদাসীন দেখে নিবেদিতা এগিয়ে এসে ভারতীয় ও ইউরোপীয়

সমাজের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজ সাড়া দিয়েছে কিন্তু গোঁড়া ইউরোপীয়রা তাঁদের সমাজত্যাগী, হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত, নিবেদিতার আবেদনে সাড়া দেবেন, এমন ভরসা ঐ সংবাদদাতা করতে পারেন নি।

১৮৯৯-এর মাঝামাঝি নিবেদিতা ভারত থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাবার পরও রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবার কাজ থেমে থাকেনি। ঐ সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বামী সদানন্দ। ২৬ এপ্রিল ১৯০০-এর 'মাদ্রাজ মেল' পত্রিকায় ঐ সম্পর্কিত 'Voluntary Sanitary Work in Calcutta' এবং ২৯ জুন-এর সংখ্যায় 'The Ramakrishna Mission Sanitary Crusade' শীর্ষক সংবাদে এই পর্বের প্লেগ সেবার প্রভূত প্রশংসা করা হয়। দ্বিতীয় সংবাদে আরো বলা হয়, রামকৃষ্ণ মিশন 'বিনা আড়ম্বরে কিন্তু কার্যকরী ভাবে' কলকাতার দরিদ্রতম মানুষদের মধ্যে প্লেগ-সেবার কাজ করে যাচ্ছে। অতি দরিদ্র বস্তিগুলি যেভাবে তারা পরিষ্কার ও জীবাণুশূন্য করছে, অশিক্ষিত জনগণের সামনে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের আদর্শ স্থাপন করছে, ভবিষ্যতে তার ফললাভ হবেই। বোম্বাই-এর 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই সময়ে—'The Plague in India, Bengali Roused to Activity' শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার প্লেগ-সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি বিবেকানন্দের প্লেগ-সেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার যথাযোগ্য মূল্য স্বীকার না করায় 'মরাঠা' বা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংবাদপত্রগুলির বিস্ময় স্বাভাবিক। কারণ পুণা তখনও ইতিহাসের সর্ববৃহৎ প্লেগ-মহামারীর মধ্যে অবস্থিত এবং পুনার লোকহিতব্রতীরা ঐ মহামারীর সঙ্গে আপ্রাণ যুঝবার চেষ্টা করছেন। অপরদিকে বাঙালী বুদ্ধিমানেরা ভাবছিলেন, বক্তৃতা করে, বা কীর্তন করে, প্লেগ তাড়ানো সম্ভবপর। না পারলে পলায়নই শ্রেয়। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের কথা ও কাজ বাড়তি উৎপাত। তাই শিক্ষিত বাঙালীরা বিবেকানন্দ চরিত্রের ঐ বাস্তববাদী অংশটিকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার মত মানসিক অবস্থায় ছিলেন না। এছাড়া আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দের থিয়োজফিস্টবিরোধী বক্তৃতায় বাংলাদেশের সব সংবাদপত্রের দরোজা তাঁর জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবা কাজের সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়নি বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের সর্বভারতীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ, প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি মহারাষ্ট্রের 'নেটিভ ওপিনিয়ান' পত্রিকার ১২ জুলাই ১৯০০ সংখ্যায়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে গুরুত্ব সহকারে লেখা হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য চিন্তা আমাদের সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সঙ্গে এঁরা বেদান্তের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারী ও তাদের ভাবানুবর্তী ভারতীয় সংস্কারক মহলে প্রচলিত একটি সমালোচনাকে দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করতে সচেষ্ট হন — বেদান্ত নাকি স্বার্থপরতা শেখায় তা যে কত মিথ্যা, বেদান্ত যে 'প্রতিবেশীদের ভালবাসার' খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব অপেক্ষা ভাবাদর্শে এতটুকুও দুর্বল নয়, তা এই পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত ভিত্তিক সেবাকর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়ে দিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের লোককল্যাণকর নানা সেবাকাজ সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের 'উন্নত মস্তক ঊর্ধ্বে তুলে' থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয় নি। তাই আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দের জীবনাবসানের পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত নানা পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের প্রশংসায় মেতে উঠল। ১৯০২-এর ১০ জুলাই 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা লিখল — 'স্বামীজীর অনুগামীরা সেবাকাজের সময়ে কলাকৌশলের ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তাঁরা দরিদ্র পল্লীতে দীন আবাসে থেকে ব্যাধি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সর্বদাই তেজোময় বাণীতে এবং প্রাণশক্তিতে তৎসহ বাস্তব দৃষ্টান্তে চারিপাশের সকলকে সামাজিক বেদনা দূর করার কাজে উজ্জীবিত করেছেন। ...স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার সীমাহীন প্লেগ যন্ত্রণা দেখে অশ্রুবিসর্জন করতেন। তাঁর অনুগামীরাও অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন কিন্তু তা ছিল রক্তাশ্রু, অলস অশ্রু নয়। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা স্মরণ করি — তাঁরা নোংরাতম বস্তিতে প্রবেশ করেছেন, সেখানে নৈতিক ও বাস্তবিক ক্লেদের শেষ নেই। সেখানে গিয়ে তাঁরা প্লেগ আক্রান্তদের সেবা করেছেন। এবং সকলের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁদের এই লোককল্যাণকর কার্য এই শহরের ইতিহাসে স্থায়ী কীর্তিরূপে গণ্য হবে।'

কলকাতার গীতা সোসাইটি এই বিষয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার ভাষাও ছিল এমনই। সেই প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০২-এর জুলাই সংখ্যায়। সেকালের সুপরিচিত যশোরের 'ব্রহ্মচারিন্' পত্রিকার একটি প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ উদ্ধৃত হয়েছিল 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০২-এর জুলাই সংখ্যায়। তাতে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ

হিন্দু, যিনি 'নরকুলের নবেন্দ্র' সেই স্বামী বিবেকানন্দের বিবিধ গুণের মধ্যে বলা হয়েছিল, বিবেকানন্দের মত ভারতকে আর কেউ ভালোবাসেন নি। তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের অর্থ নয় সমাজ থেকে পলায়ন, তা আত্মবলিদান, সমাজকে সেবা করার জন্য। কলকাতার সংবাদপত্রের সঙ্গে সেদিন সুর মিলিয়েছিল 'স্যোশাল রিফরমার' পত্রিকাও। ১৯০২-এর ১৩ই জুলাইয়ের সংখ্যায় তারা প্রকাশ করেছিল,—

> 'The philanthropic work of the Ramakrishna Mission, which he (Vivekananda) founded and controlled till his death, makes it out as a unique organisation on the history of Modern India that alone is enough to raise him high among those who have laboured to infuse life into the Indian people.'

॥ ৫ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ সন্ন্যাসীর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ কবেছেন, —'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই আদর্শ ভুলে যায় বৃথা তাদের জীবন। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী কান্না থামাতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, মৃতহীনার প্রাণে শান্তি দিতে, অজ্ঞ জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে, সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।'[১২] বিবেকানন্দ উল্লেখিত যথার্থ সন্ন্যাসীর পরিচয় পাই স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সদানন্দের মধ্যে। এই দুটি নামের পর আরো দুজন সন্ন্যাসীর নাম একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। এঁরা হলেন স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। বিবেকানন্দ শিষ্য কল্যাণানন্দকে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিক্রমা করে মঠে ফিরে এসে কাছে ডেকে বললেন,—'দ্যাখ কল্যাণ, হৃষীকেশ হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস, ওদের দেখবার কেউ নেই। তুই গিয়ে ওদের সেবায় লেগে যা।' কল্যাণানন্দ নির্দ্বিধায় গুরুবাক্য শিরোধার্য করে নিলেন এবং এই সূত্রেই হরিদ্বারের কন্‌খলে প্রতিষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। বর্তমানে যেখানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম অবস্থিত তারই কাছাকাছি নির্বাণি আখড়ার দুটি ঘর তিন টাকায় ভাড়া নিয়ে সেবাশ্রমের সূত্রপাত হয়। ঐ দুটি ঘরের মধ্যে সাধুদের জন্য শয্যা-চিকিৎসালয়, কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের থাকার ব্যবস্থা ছিল। নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন সকালে একটি

ওষুধের বাক্স এবং পথ্যাদির জন্য কিছু জিনিসের একটি পুঁটলী কাঁধে নিয়ে কন্‌খল থেকে প্রায় ১৮ মাইল পায়ে হেঁটে হৃষীকেশে যেতেন সাধুদের সেবা করতে। কল্যাণানন্দ প্রধানত কন্‌খলে সাধুদের সেবাশুশ্রূষা করতেন তাই বলে সেবাশ্রমের দ্বার কারোর জন্য রুদ্ধ ছিল না বরং তিনি বিশেষভাবে দীন দুঃখী অস্পৃশ্য চণ্ডাল-চামারদের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করে আসতেন। সেবার সময় চণ্ডাল যে ব্রাহ্মণের ভাই এই বোধের ব্যত্যয় কখনো ঘটেনি। ১৯০৫-এ তিনি জনশিক্ষার জন্য একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৯১৩'য় দরিদ্র শ্রমজীবী ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন।

কল্যাণানন্দ প্রতিষ্ঠিত কন্‌খলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আজ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শুধু রূপান্তরিত হয় নি, সকল স্তরের মানুষের সেবা ও চিকিৎসার জন্য গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক একটি হাসপাতালও।

কন্‌খলে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বামীজীর যে অভীপ্সা কাজ করেছিল তা হল পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী বহুবার অসুস্থ হয়েছেন, বলতে গেলে একেবারে মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর সকল গুরুভাইদেরও একই অবস্থা। চোখের সামনে তাঁরা কত সাধুকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখেছেন। তাই মাধুকরী যাঁদের জীবনের অবলম্বন, তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী নিশ্চয়ানন্দের হাত ধরে কন্‌খলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম চলতি শতাব্দীর শুরুতে যে যাত্রা শুরু করেছিল সে যাত্রা শুধু অব্যাহতই থাকে নি তা হয়েছে পল্লবিত। এই বামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য 'প্রবুদ্ধভারত' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী বিমলানন্দ ১৯০১-এর আগষ্ট মাসে সারা ভারতের নানা পত্র-পত্রিকায়—'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৬ আগস্ট ১৯০১), 'বেঙ্গলী' (১৪ আগস্ট ১৯০১), 'হিন্দু' (১৬ আগস্ট ১৯০১), 'মরাঠা' (৮ সেপ্টেবর ১৯০১), 'লাইট অব ট্রুথ' (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১) প্রভৃতিতে আবেদন প্রকাশ করেছিলেন। সাধুরা তাঁদের নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন জীবনে রোগের ক্ষেত্রে কী অসহ্য যন্ত্রণা পান, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও মুখে এক ফোঁটা জল পৌঁছায় না, দিনের পর দিন অনাহারে পড়ে থাকলেও একটুকরো রুটি জোটে না—তাঁদের সেবার জন্য মর্মস্পর্শী ভাষায় বিমলানন্দের আবেদন নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই অর্থ-সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। সেই অর্থেই কন্‌খল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অগ্রগতি হয়েছে এবং তা যথার্থভাবেই একটি সেবা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

॥ ৬ ॥

শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্যই কন্‌খলে সেবাশ্রম নয়, বিশিষ্ট হিন্দু তীর্থস্থান বারাণসীতে প্রত্যহ আগত পুণ্যার্থী—নরনারীদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। কাশী সেন্ট্রাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর্থাব রিচার্ডসন এই সেবাশ্রম গড়ে ওঠার কাহিনীটি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেবাশ্রম প্রথমে গড়ে তুলেছিলেন বিবেকানন্দ অনুরাগী কয়েকজন ভক্ত, ব্রহ্মচারী ও শিষ্যবৃন্দ। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন যিনি তাঁর নাম চারুচন্দ্র দাস (পরবর্তীকালে স্বামী শুভানন্দ)। বিবেকানন্দ অনুরাগী যামিনী মজুমদারের ভূমিকাও ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২-এ এই সেবাশ্রমে পদার্পণ করেছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশেই এই আশ্রমের প্রাথমিক নাম 'দরিদ্রদুঃখ প্রতিকার সমিতি'র পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ হয়েছিল সেবাশ্রম। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর ১৯০২-এর ২৩ নভেম্বর এই সেবাশ্রম পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিবেকানন্দের নেতৃত্বে এবং আন্তরিক উদ্যোগে সেবাধর্ম প্রথাবদ্ধ ভারতীয় মানসিকতায় যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল তার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। কাশী সেবাশ্রমের সূত্রে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়ার ছবিটি আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি। অবিমুক্ত বারাণসী বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রস্থল। এখানেই শংকরাচার্য জীবব্রহ্মের অভেদত্ব সর্বপ্রথমে ঘোষণা করেছিলেন। এখানেই লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রত্যহ অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের অর্চনা করলেও বিশ্বনাথের সাক্ষাৎমূর্তিস্বরূপ জীবন ধারণ করেও যে অনাথ-অনাথা, অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রাস্তায় পড়ে রয়েছে তাদের সেবা করার জন্য স্বামী শুভানন্দের পরিচালনায় কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম তৎপরতার সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি আশ্চর্যজনক প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 'আশ্চর্যজনক' এই বিশেষণটির কারণ—চলমান, আর্ত, পীড়িত শিবরূপী জীবের সেবার জন্যে ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। তাই এই প্রতিষ্ঠানটি দেখবার জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিদেশেরও কিছু সেরা মানুষ এখানে এসেছেন এবং মুক্তকণ্ঠে এই প্রতিষ্ঠানের অনন্যতার কথা স্বীকার করেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবুল কাশেম, স্যার মির্জা ইসমাইল, স্যার কৃষ্ণস্বামী আয়ার,

স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, জি. এস. সাকরেদে, এন. সি. কেলকার, লালা লাজপত রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ। লাহোরের 'দি ইন্দ্র এন্ড দি অর্জুন' পত্রিকার সম্পাদক ধর্মপাল এই সেবাশ্রম ঘুরে গিয়ে লিখেছেন,—'এ পর্যন্ত যত জনসেবা প্রতিষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছি তাদের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান নিঃস্বার্থ সেবার ক্ষেত্রে অনন্য।' 'মাদ্রাজ প্র্যাকটিক্যাল লাইফ' পত্রিকার সম্পাদকের ধারণায়—'হিন্দুধর্মের মূল লক্ষণ যে ত্যাগ তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমে ঘটেছে।'

বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকেরা যে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কাজে ভাবাবেগ বোধ করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। ১৯১০-এ 'হিতবাদী' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন—'ঐশ্বরিক ভাবের প্রেরণা ভিন্ন এ ধরণের ত্যাগের কাজ করা সম্ভব নয় ...এ ঈশ্বরেরই কাজ।' 'হিতবাদী' পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক দেশব্রতী সখারাম গণেশ দেউস্কর হৃদয় উজাড় করে লিখেছিলেন, —'অনাথ আতুর ও পীড়িত সাধু-সন্ন্যাসীদিগের চিকিৎসা, পথ্য, আশ্রয়দান ও নানা প্রকার সহায়তা বিষয়ে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সেবক-মহাশয়ের কার্যে শতমুখে প্রশংসা করিয়াও তৃপ্তি লাভ করা যায় না।' 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষের ভাষায়,—'মানবসেবা মানবের মহানতম কাজ। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সেই ঐশ্বরিক কাজ হাতে নিয়েছে। এই দিব্যকার্য একদল আত্মত্যাগী ভদ্রমহোদয়গণ গ্রহণ করেছেন, যাঁরা নিজেদের সকল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এই আত্মোৎসর্গ করেছেন।'

কলকাতার রক্ষণশীল পত্রিকা 'বঙ্গবাসী'—স্বামী বিবেকানন্দকে একনাগাড়ে আক্রমণ করাই ছিল যার পরম কর্তব্য—তারই সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ১৯১১'র ২৮ অক্টোবর সেবাশ্রমের দশম বার্ষিক সভায় যোগ দিয়ে বলেছিলেন,—'আমার শরীর যদিও খারাপ তবু কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাবশে আমি সভায় যোগদান করা কর্তব্য ভেবেছি।... যদি মানবসমাজে সর্বাধিক মঙ্গল করা মহিমার লক্ষ্য হয় তাহলে পরলোকগত রামকৃষ্ণ পরমহংস নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী আর সেকথা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্মীর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত।' পরবর্তী সভায় তাঁর মন্তব্যটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ,—'তীর্থযাত্রী যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের প্রথম কর্তব্য শিব ও অন্নপূর্ণা পূজা করা। কিন্তু যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের কোন সেবা করতে পারেন না, অন্তত দর্শন করে যেতে পারেন না, তাঁরা

আর একটি কর্তব্যহানির দোষে দুষ্ট হবেন এবং তাঁদের সেই শৈথিল্য অনুতাপেব কারণ হওয়া উচিত।' রক্ষণশীল বিশিষ্ট হিন্দু এবং মুসলমান মানুষজন এই প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে নির্মিত ভেদবুদ্ধিহীন মানবপ্রেমের পীঠস্থান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ যেমন আছেন তেমনই ছিলেন আকবরকত্ মহম্মদ ইব্রাহিম, সামসুর হোসেন, এ.জি. লিয়ো প্রমুখ। কলকাতার সিটি কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যক্ষ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য উমেশচন্দ্র দত্ত স্বচক্ষে এখানকার সেবাকাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেবা ও সমাজ কর্মে অভিজ্ঞ সংস্থা পুণার 'সারভেন্টস অব ইণ্ডিয়া'র দুই সদস্য, এ.ডি.ঠক্কর ও এস.সি. ভাজে বাস্তববোধযুক্ত কঠোরশ্রমের সঙ্গে ঈশ্বরসেবার ভাবকে এখানে যেভাবে সমবেত করা হয়েছে এ বিষয়ে চমৎকার মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। শুধু এদেশের মানুষই নয়, সাগরপারের মানুষ যাঁরা এদেশ শাসনের কাজের সঙ্গে যুক্ত সেই সব নানান পদাধিকারীরাও এই প্রতিষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভাইসরয় পত্নী লেডি ডোবিন খোলাখুলি জানিয়েছিলেন—'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিসের দ্বারা যে অপূর্ব কাজ হচ্ছে তা দেখে আমি গভীরতর আনন্দ পেয়েছি। আত্মপীড়িত মানুষের দুঃখমোচনের জন্য আত্মত্যাগী কর্মীগণ যে কাজ করছেন তা আমাদের সমাজের সকলের কাছে দৃষ্টান্তের বিষয়।'

স্বাধীনতার আগে সেবাশ্রমে সারা পৃথিবী এসে মিলিত হত। এসেছিলেন ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ পুরোহিত, মিশর বা পারস্যের নাগরিক, চীনের কবি, হল্যাণ্ডের শিল্পী, আমেরিকার বুদ্ধিজীবী, জাপানের কলাশিল্পবেত্তা, ইংল্যাণ্ডের অভিজাত পুরুষ, স্কটল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক, জার্মানীর দার্শনিক। জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক, লেখক ও পর্যটক কাউন্ট কাইজারলিঙ লক্ষ করেছিলেন,—'মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যাঁরা পুণ্যভূমি বারাণসীতে আসেন তাঁরা অধিকাংশই সেবা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত নন। সেবাশ্রমের কর্মীরাই আতুর, অসমর্থদের সন্ধান করে তুলে নিয়ে আসেন। কোন হাসপাতালে এমন উৎফুল্ল আবহাওয়া আমি দেখিনি, মুক্তির বাসনায় রোগীদের যাতনা স্নিগ্ধতা এনে দেয়। মানুষের প্রতি সেবাশ্রমের সেবকদের বিপুল ভালবাসা অপূর্ব, তাঁরা সত্যই ঈশ্বর উদ্দীপিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যথার্থ অনুগামী। ভালবাসায় পূর্ণ তাঁরা অথচ সহজবুদ্ধিসম্পন্ন, মোটেই ধর্মান্ধ বা অযথা জেদী নন—মানব-বন্ধুর যা হওয়া উচিত তাঁরা ঠিক তাই।' [১৩]

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আদর্শ ও কার্যের মূল্যবান পর্যালোচনা করেছিলেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ যদুনাথ সরকার। তিনি এই সেবাশ্রমের অনন্যত্বের স্বরূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন এইভাবে—'আমাদের দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি মানুষের স্মৃতি বহন করছে এই প্রতিষ্ঠান। তাঁদের একজন রামকৃষ্ণ আর একজন স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ সকলকে বলেছিলেন, তোমরা চলে যাও মূলগত ধর্মের একেবারে উৎসে। সেখান থেকে জীবন্ত বিশ্বাসের বারি আহরণ কর—সেই বিশ্বাসকে পবিত্র জীবন ও পবিত্র চিন্তার মধ্যে দিয়ে নিজের মধ্যে ব্যক্ত কর—আচারের দাসত্ব কর না। ...বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্ম মৃত বা অবরুদ্ধ ধর্ম নয়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন তা জীবন্ত ও বিস্তারশীল—মানবসমাজেব জন্য তাঁর একটা বাণী আছে।' গোপালকৃষ্ণ গোখেল সেবাশ্রম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছিলেন এইভাবে—'এই যে সেবাকাজ দেখলাম—এই সেই মানুষটির স্মৃতির প্রতি সত্যই সুযোগ্য নমস্কার। যাঁর হৃদয় সর্বদাই দরিদ্র ও যাতনার্থদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।' লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক প্রায় একই ভাষায় উচ্চারণ করেছেন—'সেবাশ্রমের কাজ দেখে আমি তৃপ্ত। স্বর্গত স্বামী বিবেকানন্দ থেকে এই ভাবের সূত্রপাত। দরিদ্র দুঃখীদের ক্লেশমোচনের চেয়ে মহত্তর কাজের কথা আমি জানি না, ধ্যানাদি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিকাশের পক্ষে এই সেবাকর্ম অধিকতর সহায়ক।' সরোজনী নাইডু সহর্ষে লিখেছিলেন,—'দ্বিতীয়বার এই রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রটি আমি দেখলাম। সমাজ সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এই যৌথ বিকাশ দেখে আমি উল্লসিত। জাতীয় ধারার ক্রমবিবর্তন করে কর্ম ও ভক্তির যে নিপুণ ঐক্য সম্ভব—এ হল তাই।'

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সম্পর্কে থিয়োজফিকাল সোসাইটির প্রধান নেত্রী অ্যানী বেসান্ত এবং সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জর্জ আরুণডেনের মন্তব্য আমাদের সচকিত করে তোলে। অ্যানী বেসান্ত জীর্ণ কুটীর থেকে সেবাশ্রমের সামগ্রিক অগ্রগতির মূলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নিরলস পরিশ্রমের কথা স্মরণ করেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানকে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ বলে চিহ্নিত করেছেন। আর আরুণডেনের ভাষায় এই রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হল সেই প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের যথার্থ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের একাল ও আগামীকালের উজ্জ্বল সংযোজক।

এই কাশী সেবাশ্রমেব উন্নতিব জন্য নিবেদিতার ত্যাগ ও নিরলস কর্মের কথা কখনই ভোলা যাবে না। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম শ্রীমা সাবদাদেবীর পদার্পণে ধন্য।[১৪]

॥ ৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণেব কাছ থেকে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র তত্ত্ব লাভ করে, তাঁব সঙ্গে নিজের বহু বছরের ভারত ও বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা যুক্ত করে বিবেকানন্দ যে সঙ্ঘ গঠন কবেছিলেন, নিবেদিতার মতে তা,— 'ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সংগঠিত হল, যাঁরা নতুন ধরণের সামাজিক কর্তব্যেব রূপধাবণ ও তাঁর প্রয়োগকে দৃঢভাবে গ্রহণ করেছিল।'[১৫] আসলে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন আত্মমুক্তির সাধনা বজায় রেখে রামকৃষ্ণ সংঘ যেন সমষ্টিমুক্তির তত্ত্বকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে। 'আত্মোন মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই ধ্রুব মন্ত্রকে আশ্রয় করে রামকৃষ্ণ মিশনেব সন্ন্যাসীরা সেবাকাজে মেতে উঠেছিলেন। আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতা হাত ধরাধরি কবে এগিয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের ভিত্তিভূমি এবং অভীপ্সা ছিল এটি। তাই রোমা রোলাঁকে বলতে হয়েছে—'বিবেকানন্দ যে ধর্মসঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সামাজিক মানবিকতাবাদী এবং অধ্যাত্মবাদের সর্বজনীনতার দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ ধর্মেই আধুনিক জীবনের অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের বিরোধিতা করা হয়, যুক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসকে তুলে ধবা হয়, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সংঘ তা করেনি—তা বিজ্ঞানকে সর্বাগ্রে স্থাপন করেছে, আধ্যাত্মিক ও প্রগতির সঙ্গে সহযোগিতায় সে আগ্রহী। কলাশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের প্রসারে সে উৎসাহী। তার আসল উদ্দেশ্য জনগণের মঙ্গলবিধান। ...রামকৃষ্ণের বিরাট হৃদয় বিবেকানন্দের প্রেমের মধ্যে মানবিকতাকে করেছিল আলিঙ্গন।'[১৬]

অস্পৃশ্যতার প্রকোপ যেখানে সবচেয়ে বেশি সেই দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে গেছে ফলিত বেদান্তের সূত্রে। স্বামী নির্মলানন্দ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার পৌষ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত পালঘাটের 'পতিত উদ্ধার সমিতি' রচনায় অস্পৃশ্যদের সমাজে সর্বনিম্নপর্যায়ভুক্ত মালাবারের 'পঞ্চমা'দের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও শিক্ষা প্রসারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিভাবে

মিশন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অন্ত্যজ পঞ্চমাদের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষাই শুধু নয়, বিনামূল্যে স্লেট পেন্সিল বই, এমনকি পোশাকাদিও দেওয়া হচ্ছিল—নলিনীমোহন রায়চৌধুরী তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সগৌরবে জানিয়েছেন, এই শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেছেন ব্রাহ্মণেরাই। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের আর এক সিদ্ধি সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়ার সূত্রে জানা যাচ্ছে। মানবিকতার এ এক বড় আলিঙ্গন।

এই মানবিকতার আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ ভারতীয় অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। সেই পরিবর্তনের রূপরেখাটি সার্বিকভাবে বিচার, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করেছেন ভারতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক জি.এস. ঘুরী। তিনি তাঁর মূল্যায়নের শেষে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন—'রামকৃষ্ণের প্রেরণাপুষ্ট বিবেকানন্দ হলেন আধুনিককালের সর্বাধিক মৌলিক অদ্বিতীয় সন্ন্যাসী। ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসীদের আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা ও জীবনচর্যায় বিবেকানন্দ সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এনেছেন। বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ বহুলাংশে দূর হয়েছে এবং তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসেবার কার্যে অগ্রবর্তী হচ্ছেন। এর মূলেও বিবেকানন্দ। হিন্দুধর্মের সীমাকে বিস্তৃত করে বিবেকানন্দ তাকে সর্বজনীন ধর্মে পরিণত করেছেন এবং সন্ন্যাসীদের জীবনে এনেছেন বিরাট পরিবর্তন।'[১৭]

এই পরিবর্তনের ছোঁয়া আমরা বিবেকানন্দ-সমসাময়িক কালে প্রত্যক্ষ করেছি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সেবাকাজে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার আগে এ দুটি প্রতিষ্ঠান সেবাকাজ শুরু করলেও বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন সেবার ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে একটি নতুন চেতনাকে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। সেই চেতনা মানবিক চেতনা। পরাধীন ভারতবর্ষের এই মানবিক চেতনার সম্প্রসারণে একদিকে দানা বেঁধে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম, অন্যদিকে বহু তরুণের, বহু যুবকের ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতে এবং বহির্ভারতে।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, স্বামী গম্ভীবানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৪—৫৫
২. ঐ, পৃঃ ৫৪—৫৫
৩. পত্রাংশগুলি স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪ থেকে উদ্ধৃত
৪. ঐ, পত্রসংখ্যা ৩৬১, পৃঃ ৫৬৫
৫. The Vedanta Missionary Work, Brahmavadin, Nov. 1, 1897.
৬. স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ', প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৭০
৭. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৩৮৩ পৃঃ ১০৩
৮. পরিশিষ্ট অংশে মূল প্রচারপত্রটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে
৯. The life of Swami Vivekananda, Vol-II, 1915, P.360
১০. ইণ্ডিয়ান নেশন, ১ মে ১৮৮৯
১১. Reminiscences of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, 1994, P.94
১২. স্বামী শিষ্য সংবাদ, শবচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ১৪০০, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ৭১
১৩. Count Herman Keyserling; The Travel Diary of a Philoshopher, 1914, P.218-304
১৪. কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমতগুলি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের 'ভিজিটবস্ ওপিনিয়ন' রেজিস্টাব থেকে সংগৃহীত
১৫. Letters of Sister Nivedita, Vol-1, P.110
১৬. স্বামী বিবেকানন্দ, রোমা রোলাঁ, ১৩৯৯, পৃঃ ৮৭
১৭. Indian Sadhus, G. S. Ghurye, Bombay, 1964, P.235

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রামকৃষ্ণ মিশন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত,—ক) সশস্ত্র বিপ্লব—চরমপন্থা, খ) অহিংস গণ আন্দোলন—গান্ধীজীর নেতৃত্বে, গ) সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখ সমর। এছাড়া আঞ্চলিক স্তরে যে সকল আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা এসে মিলেছিল প্রধান ঐ তিনটি ধারায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান তিনটি ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন সংঘটিত রূপ নিয়েছিল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি ঘটেছে। কিন্তু ক্রমাগত স্বর্ণবিভায় বিকশিত হচ্ছিল সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন—যা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরিপূর্ণ ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রসারিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের অক্লান্ত প্রয়াসে এবং সতীর্থ ত্যাগী ও গৃহী পার্ষদদের অপরিমেয় সাহচর্যে। এই রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক সূচনাকাল থেকেই তার নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। আসলে তিনিইতো সংঘজননী। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় রামকৃষ্ণ সংঘের 'হাইকোর্ট'। ১৮৮৬ থেকে ১৯২০—দীর্ঘ এই ৩৪টি বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীমা সারদাদেবী নেতৃত্ব না দিলে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পল্লবিত বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটত না। শ্রীমা নানা প্রতিকূলতা, সংকট, প্রতিবন্ধকতার আবহ থেকে রামকৃষ্ণ সংঘকে যেমন মুক্ত করেছেন তেমনি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপন শক্তির প্রচ্ছায়ায় আগলে রেখেছেন তাকে। তিনি স-শরীরে বেঁচে থাকাকালীন যে সকল সংকট ঘনীভূত হয়েছে তার অন্যতম হল—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় অগ্নি সংযোগ এবং তার ক্রম প্রসারিত দ্যুতিতে ভীত রাজশক্তির রোষে পড়েছে রামকৃষ্ণ

মিশন। সে বিষয়ে আমবা বিস্তৃত আলোচনার আগে পূর্ব প্রেক্ষাপটটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিতে চাই।

তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) পর থেকেই ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেই পরাধীনতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে মোগল শক্তির আগমনে ও শাসন ক্ষমতা দখলে এবং অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 'বনিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন পবাধীন থাকার ফলে ভারতবাসীর আত্মশক্তির ক্ষেত্রে আদর্শায়িত জীবনবোধে দেখা দিয়েছিল অবক্ষয়। শৈথিল্যের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজনের জীবনে নেমে এসেছিল হাজারো স্খলন-পতন। ধর্মাচরণে নানাবিধ অত্যাচার-অবিচারের মাঝে, সামাজিক বিশৃঙ্খলায় সাধারণ মানুষ হয়ে পড়েছিল নতজানু। পার্থিব সম্পদ লুণ্ঠনের পাশাপাশি ভারতীয় শাশ্বত জীবনধারায় নেমে এল কালনেমির অভিশাপ। সংগত কারণেই সাধারণ মানুষ হয়ে পড়েছিল দিশেহারা, আর শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা আত্মগত সংকটের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছিল। এই সময় রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন কলকাতায়, লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে প্রজা-শোষণের অর্থে বিত্তশালী স্বল্প সংখ্যক মানুষজনের সাহচর্যে যে নবজাগরণ আনার চেষ্টা করেছিলেন তা বাস্তবিক ক্ষেত্রে ছিল আংশিক—অপূর্ণ। সেই আংশিক ও অপূর্ণ নবজাগরণের সূত্র ধরে কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হলেও তা সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের চিত্রটি সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ যা কিনা মহাবিদ্রোহ ও ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত—তারপর থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী-শিক্ষিত মানুষেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বন্ধুর পরিবর্তে শত্রু হিসেবে চিনতে শিখলেন। এর আগে এঁরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসনক্ষমতা দখলে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং পরিবর্তনের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁবেদারে পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৫৭-র পর তাঁদের মোহভঙ্গ হল। তাই আমরা দেখলাম, গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে, ভাবের ঊর্মিমুখর স্রোতে ভেসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হল। ১৮৬৭-তে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা, ন্যাশনাল পেপারের প্রকাশ, ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এরই ফলশ্রুতি। এই

সময়ে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকেরা ঐ ভাববাদী মানসিকতা নিয়ে রচনা করলেন নাটক, কাব্য-কবিতা এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তারপরে এল উপন্যাস। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে সোল্লাসে ঘোষণা করলেন—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ কে বাঁচিতে চায়'। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লিখলেন,—'মিলি সবে ভারত সন্তান'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—'চল্‌রে চল্‌ সব ভারত সন্তান'। অতুলপ্রসাদ সেন সরাসরি লিখলেন—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। এই ভাববাদী মানসিকতা থেকে একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বাস্তবের মাটির সঙ্গে সংযোগ ঘটানো, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে দেওয়া, অন্যদিকে প্রকৃত অর্থে নবজাগরণের পরিপূর্ণ রূপটি আমাদের সামনে মেলে ধরলেন প্রথম যিনি, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভাববাদের আঙিনা থেকে সরে এসে ক্রমে তিনিই প্রথম পায়ে পায়ে সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করলেন। চিনলেন, বুঝলেন, জানলেন প্রকৃত ভারতবর্ষের ছবিটি—অতীত ও বর্তমানের ব্যবধানের দীর্ঘ রেখাটি। তাই তো বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার ধূলিধূসরিত প্রব্রজ্যার দিনগুলি সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের পদচিহ্নের পদাবলী হয়ে রয়েছে। এই সূত্রেই তাঁর পাশ্চাত্যে গমন। দীর্ঘ চার বছর পাশ্চাত্যে অবস্থান। শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হয়ে প্রতীচ্যের প্রমিথিয়ুস বিবেকানন্দ সামগ্রিকভাবে নিদ্রিত ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। ভারতের মর্মবাণী পৌঁছে দিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন পাশ্চাত্যের আকাশে-বাতাসে, সর্বোপরি মানুষের মনে-প্রাণে। ১৮৯৭-এ তাঁর ভারত-প্রত্যাবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগরণের মন্ত্রটি পূর্ণ হয়েছিল, শুদ্ধ হয়েছিল। তাই এই নবজাগরণের পূর্ণতায় বিবেকানন্দের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অরবিন্দ বলেন,—'পশ্চিমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে স্বদেশের সনাতন ধ্যান ধারণার বহু উপাদানের পুনর্মূল্যায়ন ও বর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এই উদ্যোগ। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছিল ভারতবর্ষের চিন্ময় লোকের তীব্র প্রতিক্রিয়া। কখনো প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যান, কখনো বা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর নতুনভাবে গুরুত্ব আরোপ ও নবতর ব্যঞ্জনার সংযোজন শুরু হয়েছিল। শুধুমাত্র ভারতীয় বলে পুরনো সংস্কৃতির সমস্ত কিছুকে সমর্থন ও জাতীয় জীবনে সেগুলির সাঙ্গীকরণই হয়ে উঠেছিল এই পর্যায়ের চিন্তানায়কদের প্রধান কাজ। এর পরে আরম্ভ হয় আত্মীকরণের এক যুগ্ম প্রক্রিয়া। সনাতন ধ্যান-ধারণাগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে যে

পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন—ঐতিহ্যবাদী ও তার সমালোচক—উভয়পন্থী মানুষের তুষ্টিবিধানের একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যাবর্তনের একটা পূর্ণতর রূপ, একটা সমন্বয়ধর্মী পুনর্ব্যাখ্যার নীতিগ্রহণ করে।· তা প্রাচীন সংস্কৃতির বাহ্য আঙ্গিক কোন কোন সময়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেও জীর্ণতাকে বর্জন করেছিল। নতুন যা কিছু প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে খাপ খায় বা তাকে বৃহত্তর বিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় তাকেও গ্রহণ করেছিল। বিগত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন এবং পুনর্বিন্যাসের ধারা সংরক্ষণেব এই উদ্যোগের প্রাণপুরুষ ছিলেন বিবেকানন্দ।'[১] জীবনের প্রথম পর্বে মিল, বেন্থাম ও কোঁতের মধ্যে মানবব্যাধির নির্ণয় ও নিদান, মানবসমাজের সমস্যা এবং সমাধান ব্যাকুলভাবে খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞানালোক তিনি নির্বিচারে বরণ করতে চাননি ; আবার ভারতের জীর্ণ সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতার প্রতি তাঁর বিরাগও গোপন থাকেনি। এজন্যই তাঁকে দার্শনিক-অনুসৃত মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে দেখা গিয়েছিল।

আধ্যাত্মিক জগতে বিবেকানন্দের ভূমিকা শিল্পের রাজ্যে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে তুলনীয়। বিবেকানন্দকে প্রায়ই বলতে শোনা গেছে, একসময় নিদ্রাবেশে তাঁর সামনে ভেসে উঠত দুটি জীবনাদর্শ—একটি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, অপরটি সর্বরিক্ত সন্ন্যাসী। প্রাচীন ভারতবর্ষের পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানপ্রসূত সকল পার্থিব জীবনের টানাপোড়েনে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল বিবেকানন্দেব মনোজগৎ। বহুদিন এমনি করেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছিলেন মাইকেল এঞ্জেলো। গ্রীক-ল্যাটিন-ধ্রুপদী রীতির, নিও-প্লেটোনিক আদর্শবাদ এবং রেনেঁসাস পর্বে বাস্তববাদের দ্বন্দ্বে তিনি দোলায়িত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতায় জমজমাট, আকাশের মত নিঃসীম, সমুদ্রের মত অতলান্ত, হীরকখণ্ডের মত সুকঠিন এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জীবন প্রবাহের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ তাঁর নবীন দৃষ্টিতে অতীত ও বর্তমানকে মেলাতে পেরেছেন। জাতির জাগরণের তাবৎ মন্ত্রগুলি তিনি পাঠ করতে পেরেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপর এক মহৎ ব্রত পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সে দায়িত্ব বিচার, বিবেক ও উক্তির সাহায্যে পরের মধ্যে নারায়ণকে জাগ্রত করা। এই জাগরণের মধ্যে দিয়েই বিবেকানন্দ পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেবেন—এটাই ছিল তাঁর কাম্য। সেই কামনা ব্যর্থ হয়নি।

তুষারমৌলি হিমালয় থেকে সমুদ্র-চুম্বিত কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পথের ধূলার মধ্যে তাঁর অথিষ্ট শিবকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন অগণিত নিরন্ন ক্লিষ্ট জীবের মাঝে। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে পৌঁছে তিনি বেদান্তকে নতুন করে উপস্থাপিত করলেন, প্রচার করলেন রামকৃষ্ণ কথামৃত, শোনালেন সকলেই অমৃতের অধিকারী, ধর্ম অসীম, অনন্ত তার ভাব ও পথ, বহুত্ববোধে মায়ার জন্ম— তার থেকে আসে দুঃখ-ভয়-মৃত্যু; আর এক-রমতা বা সমতাই ঈশ্বর, তিনি অন্তরে-বাইরে বিরাজমান।

বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছিলেন বিবেকানন্দ। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবন যোগ করার প্রত্যয়ে ঈপ্সিত অভীপ্সাই হয়েছিল প্রসারিত। তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করার জন্য যে বিপুল কর্মশক্তি দরকার একমাত্র ভালোবাসা তার উৎস হতে পারে। অন্তহীন সর্বপ্লাবী এই ভালোলাগাই সহস্র ধারায় রূপান্তরিত হবে মানবসেবায়, বিশ্বাস রূপ নেবে কর্মে। আর এই দুয়ে মিলে গড়ে তুলবে আগামী দিনের মানুষের চরিত্র। শক্তি, পৌরুষ, ক্ষাত্র-বীর্য, ব্রহ্মতেজ—এই উপাদানগুলি হবে মানুষের অজেয় সম্পদ। তাই বেদান্তের বিশুষ্ক অনুশীলন নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাকে যুগের উপযোগী করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করবেন, আর তাতে জেগে উঠবে মানুষের আত্মশক্তি। বিবেকানন্দ সেটাই চেয়েছিলেন। কর্মযোগের সোপান ধরে প্রথমে আত্মশুদ্ধি, ধ্যান-ভজনের সোপান ধরে পরে আত্মপোলব্ধি। সন্ন্যাসী সংসারকে চতুর্বিধ জ্ঞান দেবেন—অন্ন, শিক্ষা, আরোগ্য, ধর্ম। বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিশেষত চরমপন্থী-সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা নিজেদের জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ জুন, 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন,—'পৃথিবীকে নিজের দুটি হাতে ধরে তাকে রূপান্তরিত করার জন্য যাঁর আবির্ভাব সেই পরমপুরুষই বিবেকানন্দের বিজয়ের পথ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আর তা সমস্ত বিশ্বের কাছে এই সত্যটা পরিস্ফুট করে দেয় যে ভারতবর্ষ পুনর্জাগ্রত হয়েছে।' এই নবজাগরণ শুধু টিকে থাকার জন্য নয়, তা বিশ্ববিজয়ের মত একটা মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য। চরমপন্থীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের উচ্চারিত অতুলনীয় মন্ত্রে "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।" তাঁর 'গভীর' আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৃত ল্যাজারেসের মত তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মনে হয়েছিল মিথ্যে মায়ার মত বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলাও সকলের

পবিত্র কর্তব্য। তাঁর প্রেরণা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে শিখিয়েছিল, কেননা তাঁর ভাষায়, "আমি মৃত্যুঞ্জয়ী, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বহু ঊর্ধ্বে আমি, আমিই সে।"

এই মন্ত্রই হল ভারতীয় শাশ্বত জীবনধারার পবিত্র মন্ত্র। জীবনকে জয় করার, আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্যে উত্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই মন্ত্রই ছিল চরম এবং পরম। বিবেকানন্দই প্রথম 'জগদ্ধিতায়' একটি বাস্তব পরিকল্পনা রচনায় সফল হয়েছিলেন। দরিদ্রনারায়ণ সেবার মহৎ আদর্শকে ঘিরেই সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ, জাতি এবং শ্রেণীর অনায়াস মিলন ছিল সম্ভবপর। এর মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, জাত-পাতের দ্বন্দ্বের বিমোচন সম্ভব। গীতার সেই শাশ্বত মন্ত্র 'উদ্ধারেৎ আত্মনাত্মনম্' কখনো বিস্মৃত হননি বিবেকানন্দ। পরহিত সাধনা আত্ম উদ্ধারের পথই প্রশস্ত করে। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, অসুস্থকে সেবা, এবং অজ্ঞকে জ্ঞানদানের মধ্যে দিয়ে মানুষের সহজাত স্বার্থপরতার অবসান ঘটে। কর্ম তখন হয়ে ওঠে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য। ডারউইন কথিত নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়, এমন নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষের বিবর্তন হয়। তবে অনাহারক্লিষ্টের জন্য অন্নের সংস্থান, কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির সেবার চেয়ে শিক্ষাদান যে বড়—সে বিষয়ে বিবেকানন্দের সন্দেহ ছিল না। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সর্ববিধ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষাকে তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশের সহায়ক হিসেবে দেখতেন। আর সব শিক্ষার মূলে আছে ধর্ম। কিন্তু সে কি প্রথাগত হিন্দুধর্ম? বিবেকানন্দ বলতেন হিন্দুধর্মের মত অন্য কোন ধর্ম মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে পারেনি। আবার দীনহীনের উপর নির্যাতন নিপীড়নের ব্যাপারে এই ধর্মের জুড়ি মেলে না। এই অবিশ্বাস্য স্ববিরোধিতার একমাত্র কারণ এই ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অন্যায় প্রয়োগ। হিন্দুধর্মের মধ্যে আচার-সর্বস্ব ভণ্ডরাই অসহায়ের উপর অত্যাচার অবিচার এবং ব্যভিচারের অসংখ্য সুযোগ উদ্ভাবন করেছে। এ বিষয়ে এঁরা ওল্ড টেস্টামেন্টের ফ্যারিসী ও স্যাডিয়ুসীদের ছাড়িয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলে এই কলুষ দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি চাইতেন তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা যেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিক্রমণ করে দীন ও দরিদ্রের কুটিরেই এই ধর্মের বাণী প্রচার করেন। পতিত চণ্ডালের হৃদয়েও এই মহৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন যে ব্রাহ্মণের মত তাদেরও আছে ধর্মানুশীলনের অধিকার, বিচার বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জনের

স্বাধীনতা, কেননা সকলের মধ্যেই বিরাজ করছেন সেই পরম ব্রহ্ম। এ ভাবে জাতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে পশ্চিমী সভ্যতার সম্মুখীন হতে গেলে বিকৃতি ও অন্ধ অনুকরণ অনিবার্য। তাই তো তিনি বলেন—'এই পরানুবাদ পরানুকরণ পরমুখাপেক্ষা দাসসুলভ দুর্বলতা এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে'? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?'

ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি আসবে, স্বাধীনতা আসবে বলে বিবেকানন্দ তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক মুক্তি তো মানব-অস্তিত্বের উপরের স্তরটিকে শুধু স্পর্শ করতে পারে, তা মানুষের সার্বিক মুক্তির পথটিকে প্রশস্ত করতে পারে না। বিবেকানন্দ চান আধ্যাত্মিকতার বলে সার্বিক মুক্তি। পশ্চিমী জগতের দেশগুলিতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর যে আদর্শ মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, এদেশের মানুষেরা তাকে অনুকরণ করাকে এক ধরণের উন্মত্ততা বলে তিনি মনে করতেন। কেননা ভারতবর্ষে যে বাজনৈতিক অবস্থা পত্তনের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, ঐ সব দেশে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহু আগে। এ বিষয়ে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে বহু আগে। এবং শেষ পর্যন্ত তা অপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। একের পর এক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে সেখানে। ইউরোপ নিজেই আজ দিশেহারা। স্বামী শিবানন্দকে লেখা বিবেকানন্দের একটি চিঠিতে এই সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে—'তোমাদের পার্লামেন্ট, সিনেট, তোমাদের নির্বাচন, ভোটাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠতা—সব কিছুর সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। কিন্তু বন্ধু, সর্বত্রই এদের ইতিবৃত্ত পরিণাম একই। সবদেশে পরাক্রান্ত মানুষই নিজের ইচ্ছা অনুসারে সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। বাকী সবাই ভেড়ার পালের মত নিষ্ক্রিয় নির্বিকার।' কোথাও কোথাও অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু মানবসভ্যতার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে, যদি না তা ধর্মের উপর, মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করতে পারে। একমাত্র ধর্মই পারে সমস্ত কিছুর মূলে গিয়ে পৌঁছতে। মানুষ যদি ধর্মে সুস্থিত থাকে তবে অন্য সব কিছুই যথাযথ থাকবে। পার্লামেন্টের কোন বিধান দিয়ে তো ধর্মানুভূতি জাগানো যায় না। এর জন্য রাজনীতির চেয়ে ধর্ম উপলব্ধি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পার্থিব কোন সুখ সম্পদই আত্মার শূন্যতা দূর করতে পারে না। আত্মাকে মলিন রেখে সমস্ত পৃথিবী জয় করলেও সেই জয় হবে ক্ষীণায়ু। সেজন্য আধ্যাত্মিকতার বিকাশের প্রতি

উদাসীন সভ্যতার ভিত্তি হয় চোরাবালির মত। কিন্তু অদ্বৈতবাদ মানুষের আত্মশক্তি একবার উদ্বোধিত করে দিলে তার পক্ষে সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন সহজ হয়ে যায়। তখন যে অসীম শক্তির জন্ম হয় তার আঘাতে শ্রেণী বৈষম্য, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, এমনকি সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে যায়। যে আধ্যাত্মিকতা ভারতীয়ত্বের পরম অভিজ্ঞান—তার বিনিময়ে নয়, তাকে কেন্দ্র হিসেবে রেখে প্রতীচ্যের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মানবহিতৈষণা পরিচালিত হওয়া কাম্য। রাজনীতি মানুষের মধ্যে প্রকৃত মিলন বা ঐক্যবন্ধন রচনা করতে পারে না, তা শুধু সাময়িকভাবে কিছু মানুষকে পাশাপাশি করে দেয়। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে তা এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জড়বাদের জন্ম দেবে বলে বিবেকানন্দ সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

বিশিষ্ট বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি আধ্যাত্মিক উদ্যোগ বলেই মনে করতেন। প্রত্যেক মানুষেব অন্তস্থলে তার অস্তিত্ব বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে ঈশ্বরের উপস্থিতি। আর ঈশ্বর যেহেতু অনন্তরূপে প্রকাশিত, স্বাধীনতা তারই এক প্রকাশ। বেদান্তের বিশেষ বাণীর ব্যাখ্যা এভাবেই করেছিলেন চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল। আর অরবিন্দের বিচারে স্বরাজের প্রকৃত তাৎপর্য ছিল—আধুনিক পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জাতীয় গৌরবের সত্যযুগের পুনরুজ্জীবন, বিশ্বমানবের গুরু রূপে তার পূর্ব ভূমিকা পুনর্গ্রহণ। 'ভবানী মন্দির' শিরোনামের রচনাটিতে অরবিন্দ যে ভবানীর ধ্যান করেছেন সেখানে তিনি ভক্তবৃন্দকে এমন একটি মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন যা হবে সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য। আর তার জন্যই ভারতের স্বরাজ লাভ অত্যন্ত জরুরী। একটি বিষয়াসক্ত, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু জাতির পার্থিব ও রাজনৈতিক সিদ্ধির ক্রীড়নক হিসেবে নয়, বিশ্বের আত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই তার স্বাধীন অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক; তার সমস্ত উদ্যোগ, সমস্ত সংগ্রামই ছিল জগদ্ধিতায়। এই প্রেরণাই জন্ম দেবে একটি নবীন জাতির, তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে একটি যুগকে, সমস্ত পৃথিবীকে দীক্ষা দেবে ভারত ধর্মের মহামন্ত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'সন্তান দল'-এর ভাবনা, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সংশ্লিষ্ট ভাবধারায় অগ্নিময় বিভা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

॥ ২ ॥

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপেই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচিতি। সে ধর্ম 'আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'। প্রচলিত ধর্মের বাইবে বেদান্ত ধর্মের প্রসারেই রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে। সার্বিক মানুষের কল্যাণ, আত্মশক্তির জাগরণ এবং মুক্তি—সূচনাকাল থেকে এই ব্রতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা ব্রতী। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংযোগ থাকবে না—এটা বিবেকানন্দই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন প্রথমেই—লিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে। আজও তা অনুসৃত হচ্ছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থী দুই বিশিষ্ট বিপ্লবী—অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্রের মানসিকতা যা পূর্বে উল্লিখিত, তা থেকে আমরা বুঝতে পারছি—বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সত্যতা। আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত না হলে সার্বিক ভাবে মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব নয়; আর সেই সংযোগ থেকেই গণজাগরণ ও তা থেকে গণআন্দোলন এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে। রবীন্দ্রনাথও এই উপলব্ধির স্তবে পৌঁছেছিলেন। 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলি তারই পরিচয়বাহী। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখ্য—বিবেকানন্দও প্রথম অবস্থায় পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বৈপ্লবিক পথে পা বাড়াতে চেয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই তথ্য সিস্টার ক্রিস্টিনকে জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিমত, স্বামীজী নাকি বলেছিলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বৈপ্লবিক পথে তিনি বৈদেশিক শাসনকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই কারণে তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং বন্দুক নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ দেখলেন যে দেশ, দেশের সাধারণ মানুষ প্রস্তুত নয়—তাই তিনি মানুষ-জাতি গঠনের কাজে হাত দিলেন।[২] বিবেকানন্দ অনুজ বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথের অভিমত যদি সত্য হয়ে থাকে, আমরা বলব, বিবেকানন্দ সর্বার্থে এবং সর্বাগ্রে গণজাগরণ চেয়েছিলেন এবং তাকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষুধাতুর-অজ্ঞ জনগণকে আগে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার সুযোগ দিয়ে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা একশো বছর ধরে সেই কাজ করে চলেছেন। জনগণই যদি না সচেতন হয়, না জাগে—তবে কাদের নিয়ে, কাদের জন্য আন্দোলন? এই চিন্তা পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের সচেতন করেছিল—অবশ্যই করেছিল তাই আমরা দেখবো বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল—এই তিন প্রধান বিপ্লবী দলের অনুগামীরা

চবম পথযাত্রী হয়ে, সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল হয়ে অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন এবং বিপ্লবী মত ও পথ পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত 'বিরাট'-এব উপাসনায় মেতে উঠে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস জীবনকে অবলম্বন করেছেন। ভিন্ন পথে জনসেবা-দেশসেবার মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দের অভিজ্ঞান—যা আগে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি, তা যে কতটা বাস্তবমথিত ও সুদূবপ্রসাবী ছিল সেটা আমরা বুঝতে পারি। অব্যবহিত পরবর্তীকালে অববিন্দ, বিপিনচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারা সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিবে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে নবীন যুবকদের স্বাধীনতা স্পৃহা লক্ষ্য কবে জাতি-দেশ গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার আহ্বান জানালেন,—'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরিয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসব ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত...।'[৩] জনসাধারণের সেবা কবে তাদেরকে 'মানুষ' কবে তুলতে পারলেই দেশমাতৃকার মুক্তি আসবে। স্বামীজী মানুষ চেয়েছিলেন—মানুষ, খাঁটি অকপট মানুষ, দ্রঢিষ্ঠ, বলিষ্ঠ— যারা অবিচলিত শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত—যদি এমন একশো আত্মবিশ্বাসী, আদর্শনিষ্ঠ যুবক মেলে তবে ভারতের মুক্তি হবেই। ভাবীকালের দেশপ্রেমিকের কাছে তিনি রাখলেন স্বদেশপ্রেমের এক নতুন আদর্শ। পশ্চিমের আমদানী করা দেশপ্রেম নয়, হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা দেশপ্রেমিক নয়, বড়মাপের হৃদয়, প্রত্যয় দৃপ্ত দৃঢ়তা এবং অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে দেশপ্রেমিক হওয়ার উপব বিবেকানন্দ গুরুত্ব দিলেন। বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ বাণী, ত্যাগ ও বিশ্বাসের আদর্শ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট ক্ষীয়মান মুমূর্ষু জাতির প্রাণে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও অত্যুগ্র আশার সঞ্চার করে ভারতে এক নবযুগের সূত্রপাত করল। বিবেকানন্দ জীবিতাবস্থাতে প্রত্যক্ষ করলেন লেভিয়াথানের নিদ্রাভঙ্গ,—'সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। ...নিদ্রিত শব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত মস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে...

কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। ... কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙিতেছে।"[৪]

জাতি সত্যি সেদিন জেগেছিল। বিবেকানন্দেব প্রেরণায় ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন পথে ধাবিত হতে লাগল। লক্ষ লক্ষ যুবক জাতীয়তাব যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে সে সময় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তার কর্মধারা প্রসারিত হচ্ছিল দেশে-দেশান্তরে বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিল সেকালেও। ইতিহাস সেই কথা বলে। স্বভাবতই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, সহিংস ও অহিংস — সকলেই বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা-ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন আর বিপরীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির রোষবহ্নি ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি।

বিবেকানন্দের জীবনাবসানের (১৯০২) পরেই ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের কারণে, বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল বাংলাদেশে। বিপ্লববাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠল। নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আবির্ভাব ঘটল গান্ধীজী ও বালগঙ্গাধর তিলকের। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে মানসিকতা, প্রস্তুতি ও জাতীয় চেতনার প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সেই মহত্তর জিনিসটি যুগিয়েছেন বিবেকানন্দ। জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিপ্লবীদের আস্তানা খানা তল্লাস করতে গিয়ে পুলিশ বিবেকানন্দের গ্রন্থ — আগ্নেয় রচনাসমূহ পেত। সিডিসন কমিটির রিপোর্ট (১৯১৮), উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জেমস্ ক্যাম্বেল কার সম্পাদিত 'Political Troubles in India: 1907–17' এবং বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে বিপ্লবীদের উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের সূত্রে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তীব্র রাজরোষের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট জেলা থেকে প্রদেশ হয়ে রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে গেল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ অধ্যক্ষ থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের উপর পুলিশের নজরদারীও ছিল প্রবল। এ প্রসঙ্গে কলকাতাস্থ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশ প্রধান চার্লস টেগার্টের রিপোর্ট, বেঙ্গল এডমিনিসট্রেশন রিপোর্ট — ১৯১৫ (যার ভিত্তিতে লর্ড কারমাইকেলের দরবারী ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনকে তীব্রভাবে

আক্রমণ), বাংলা সরকারের লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী সি. টিনড্যাল, বাংলার চীফ সেক্রেটারী এইচ. এল. স্টিফেনসন এবং কাউন্সিলের সদস্য পি. সি. লায়ন-এর রিপোর্ট ১৯১৭ — এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বাংলাদেশের যুবকেরা বিবেকানন্দের বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সহিংস-অহিংস — দুই আন্দোলনেই। বিবেকানন্দকে স-শরীরে তারা দেখতে পায় নি বটে তবে তাঁর রচনাবলীর এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারায়, গৈরিক বসনের দ্যুতিতে অগ্নিময় বিবেকানন্দকে তারা মনের মণিকোঠায় দেখতে পেয়েছিল। তা না হলে অমন দুঃসাহসিক কর্মে অনায়াসে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব হত না; সম্ভব হত না জীবনের জয়গান গেয়ে হাসতে হাসতে বীরোচিত গর্বে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করা। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখতে পারেন দ্বিধাহীন চিত্তে,—'আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি — দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়। তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে সেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।'[৫]

রবীন্দ্রনাথের অভিমতের মধ্য দিয়ে মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী যুবকদের প্রতি বিবেকানন্দের অমেয় প্রভাব কতখানি স্বতোচ্ছল ছিল তা বোঝা যায়। বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র ঘোষের স্বীকারোক্তিতে বিবেকানন্দ-বহ্নিশিখার যে উত্তাপ অনুভব করা গেছে — রবীন্দ্রনাথের অভিমত তারই যথার্থ স্বীকৃতি। ১৯০১-এর মার্চ মাসে তরুণ হেমচন্দ্র (পরবর্তীকালে বিপ্লবী মহানায়ক) বিবেকানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন যে নির্দেশ তা হল,—'সর্বপ্রথম চরিত্রবান হও। ভারতমাতার সেবা যদি করিতে চাও তাহা হইলে বীর্যবান হও, দেশমাতৃকার দুর্গতি দূর করিবার জন্য প্রচণ্ড শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হও। সাহস অবলম্বন করিয়া স্ব-স্ব কর্ম করিয়া যাও। জয় তোমাদের অনিবার্য।'[৬] মৃত্যুর একটি বছর আগে

বিবেকানন্দের এই নির্দেশ তো নির্দেশ নয়, অন্তরেব অন্তস্থলে রক্ষিত অগ্নিবীণার ঝংকার। ঝংকার কান পাতলেই শোনা যায় না; আপন অন্তরে যদি বারুদ থাকে তবে সে শুনতে পায়। যেমন শুনেছিলেন নিবেদিতা,—'যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভাবতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে... এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রামাণ্য প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ।'[৭]

এই যন্ত্রণা, অগ্নিদাহের উত্তাপ ব্যক্তিজীবনে প্রবাহিত করে দিয়ে বিপ্লবী তরুণ দল মেতেছিল মাতনযজ্ঞে। আত্মাহুতি সে যজ্ঞে স্বাভাবিকতার প্রসাবণ। সেই তরুণ বিপ্লবীরা বিবেকানন্দের পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে বিবেকানন্দেব রক্তিম মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে সংঘজননীর অপরিমেয় আশীর্বাদ পাথেয় করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। একথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এবার তারই ফলিত রূপটি আমরা স্বল্প পরিসরে দেখব।

রামকৃষ্ণ মিশনের নেত্রী শ্রীমা সারদাদেবীব কাছে বিবেকানন্দের মতই স্বাধীনতা ছিল আত্মার সংগীত। নিবেদিতার কথায় যিনি ভারতীয় নাবীর পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নতুন আদর্শের অগ্রদূত, সেই শ্রীমার দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জয়রামবাটীর মাটি তাঁর কাছে চিরপবিত্র। জয়রামবাটীর পবিত্রভূমিকে প্রণাম করে তাই তিনি বলেন,—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'[৮]

শ্রীমার গোটা জীবনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনচেতা তাঁর মানসিকতাটি। জগজ্জননী হয়েও ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত সহমর্মিতার রূপরেখাটি তাই আমরা দেখতে পাই এভাবেই—বিপ্লবী তরুণ দল কি উদ্বোধনে, কি জয়রামবাটীতে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে গেলে কোনো দিন তাঁর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় নি। পুলিশ গোপনে খবর পেয়ে 'স্বদেশীদের' সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানাতেন—'কে স্বদেশী, কে বিদেশী জানিনে। যারা আমার কাছে আসে তারা সকলেই আমার সন্তান।'[৯] শ্রীমা ইংরেজ-শাসনকে কখনই সুনজরে দেখেন নি। তাঁর মতে ভারতের দুঃখ-দুর্দশার, অভাব-অনটনের মূলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১৪—১৮)

সাবা দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়েছিল। খাদ্যাভাব, বিশেষত বস্ত্রাভাবে মানুষ-মানুষীর পিঠ ঠেকেছিল দেওয়ালে। শ্রীমা বস্ত্রাভাবে নারীদের অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের কথা জেনে নিজে চরকায় সুতো কাটার অভীপ্সার কথা জানিয়েছেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে তাঁত ও চরকার মাধ্যমে বস্ত্র বয়নের কাজে শ্রীমা আশ্রমকর্মীদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। বিলাতী দ্রব্য-বস্ত্র বর্জন ও তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা তীব্র হওয়ায় মা সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে তাঁত ও চরকার মাধ্যমে বস্ত্র বয়নের পরামর্শ দিলেন।[১০] এতে সাড়া জাগলো। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁরই নির্দেশে বস্ত্র বিতরণের কাজে নেমেছিলেন বিভিন্ন স্থানে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সম্পর্কে শ্রীমার টুকরো টুকরো কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—ক) 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো!'[১১] খ) 'আগে ওদের ধ্বংস হবে—নিজেদের বাজ্য নিজেদের হবে'।[১২] স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রামকে শ্রীমা 'ঠাকুরেরই কাজ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লবী সুরেন করের আত্মহত্যার কথা শুনে মা বলে উঠেছিলেন—'ঠাকুর কতদিন আর অনাচার সইবো।'[১৩]

মুক্তি সংগ্রামে ক্লান্ত-হতাশাময় জীবনে শান্তিলাভের আশায় বিপ্লবী যুবকেরা ছুটে আসতেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কাছে শান্তিলাভের আশায়। জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'স্বরাজ' পত্রিকায় এই প্রসঙ্গটি অন্য ভাবে, ভিন্ন ভাষায় তুলে ধরেছেন।[১৪]

অনুশীলন সমিতির তরুণ বিপ্লবীরা শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ নিয়েই শুধু ফিরতেন না, তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনেও নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। বিশেষত ঠাকুর-স্বামীজীর আবির্ভাব তিথি উৎসবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ কবতেন। শেষ পর্যন্ত এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শ্রীমার অনুমোদনে এবং শ্রীমার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন ও পরবর্তীকালে বিশিষ্ট সন্ন্যাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এঁরা হলেন দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) রাধিকা গোস্বামী (স্বামী সুন্দরানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ—ভরত মহারাজ)। পরবর্তী কালে নিতাই দাস (স্বামী বলদেবানন্দ) প্রমুখ আরো অনেক বিপ্লবী যুবক রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

বিপ্লবী জীবন থেকে সন্ন্যাসী জীবনে উত্তরণ দেশ তথা সর্ব মানবের সেবায় আত্মনিয়োগের পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল। এঁদের মধ্যে দুই

বিপ্লবী—দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেন ১৯০৯-এর মানিকতলা বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই বিপ্লবীকে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের অনুমতি দেওয়া যে কতটা বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শ্রীমা সারদাদেবী সেদিন সেটা বিপজ্জনক জেনেও ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এটা লোকজননী-দেশজননী-সংঘজননীর পক্ষেই সম্ভব। রাজরোষবৃদ্ধির কবলে পড়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন এই সূত্রেই। পরে সংঘজননীর তৎপরতায় তা থেকে আপাত মুক্ত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন। অন্যান্য দলের বিপ্লবীরা এবং অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগ্রামীরা শ্রীমার চরণস্পর্শে ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। জেলে যাওয়ার আগে ও পরে তাঁরা শ্রীমার চরণ স্পর্শ করতে আসতেন দলে দলে। একথা জানিয়েছেন নিবেদিতা।[১৫] বিবেকানন্দ জননী—রামকৃষ্ণ সংঘের সংঘজননীর চরণ স্পর্শের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের প্রেরণা আরো বেশি করে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সঞ্চারিত করে দিতে চাইতেন তাঁরা। বাঘাযতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বুড়ি বালামের তীরে দু'জন সতীর্থের সাথে বিশাল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে মাউজার পিস্তল নিয়ে অসম লড়াই করতে যাওয়াব আগে শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রণাম করে গিয়েছিলেন। বাঘাযতীন শ্রীমার কাছে ছিলেন 'আগুনে ছেলে'। ননীবালাদেবীর কথা সর্বজনবিদিত। অনুশীলন সমিতির দীনেশ দাশগুপ্ত (স্বামী নিখিলানন্দ), যুগান্তর দলের ব্রহ্মচারী গৌরহরি মায়ের দীক্ষা ও মিশনে যোগ দেবার অনুমতি পেয়েছিলেন। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের সুরেশ চৌধুরীকে পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরদারীর মধ্যেই মা দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং কোয়ালপাড়া আশ্রমে রাত্রিবাসও করতে দিয়েছিলেন অকুতোভয় চিত্তে।

১৯১৬-তে শত শত যুবক যখন কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ হয়ে আছে, দেশ যখন যুদ্ধকালীন নানা স্বৈরাচারী আইনের নিগড়ে আবদ্ধ—ঠিক সেই সময়ে বাংলার গভর্ণর জেনারেল লর্ড কারমাইকেল 'বেঙ্গল এডমিনিসট্রেশন রিপোর্টের' ভিত্তিতে ১১ ডিসেম্বর দরবারী ভাষণে বিপ্লবী আন্দোলন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বিষোদ্গার করলেন। এই বিষোদ্গারে রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। অনেকেই সেদিন প্রাক্তন বিপ্লবী যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁদের মিশন থেকে বিতাড়িত করার পরামর্শ দিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ শ্রীমাকে সব কথা জানালে, মা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—'ওমা! এসব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে

তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের-দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।'[১৬] স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের কথামতো লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করে বিস্তৃত ভাবে লিখে সব জানানোর পর গভর্ণর জেনারেল শেষ পর্যন্ত ২৬ মার্চ ১৯১৭ তারিখে একটি চিঠি লিখে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।[১৭] সংঘজননীর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে রামকৃষ্ণ মিশন রাজরোষে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে সন্দেহের তীরটি রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে তাক করা থাকেই। টিনড্যাল, স্টিফেনসন ও লায়নের নোট; কার, সিডিসন ও রাউলাট রিপোর্ট তারই ইঙ্গিত বহন করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনাকালে নানা নথিপত্র ঘেঁটে জানিয়েছেন যে ব্রিটিশ সরকার 'ভারতরক্ষা আইন'-এ রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি।

॥ ৩ ॥

গান্ধীজী ১৯০১-এ বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। শ্রান্ত-ক্লান্ত গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয় নি। কারণ স্বামীজী তখন অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসাধীন। গান্ধীজীর সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয়েছিল কলকাতায়। তবে সেই সাক্ষাৎকার ও পারস্পরিক আলোচনা সুখকর হয় নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা গান্ধীজী অহিংসার মাধ্যমে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর আর নিবেদিতা সহিংস বিপ্লবীবাদের 'উপদেষ্টা'। গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হলে কি হত— সে প্রশ্নের উত্তর কালের গর্ভে বিলীন।

বিবেকানন্দের পর জননায়ক রূপে যিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি হলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ৫৯তম আবির্ভাব তিথির দিন কস্তুরবা, মতিলাল নেহরু ও মহম্মদ আলি সহ বেলুড় মঠে এসেছিলেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁদের স্বামীজীর ঘরে নিয়ে গেলে গান্ধীজী নানা জিজ্ঞাসার সদুত্তর পেয়ে প্রণতি জানালেন স্বামীজীকে। স্বামীজীর বাড়ির বাইরে গঙ্গার ধারের মাঠে গান্ধীজীকে দেখবার ও তাঁর ভাষণ শোনবার জন্যে বহু মানুষ সমবেত। গান্ধীজী স্বামীজীর বাড়ির দোতলার

বারান্দা থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন, —'আজ আমি এখানে এসেছি স্বামী বিবেকানন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাতে। আমি গভীর নিমগ্নতার সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়েছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার দেশাত্ববোধ ও দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর রচনাবলী পড়ে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের এই পুণ্যদিনে আমি আপনাদের কাছে কোন বক্তৃতা করব না। স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন ফরমান জারি করব না। শুধু যুবকদের উদ্দেশে বলব আপনারা এই পবিত্রভূমি থেকে এক টুকরো মাটি নিয়ে যান আর আপনাদের অন্তরে যে বারুদ রয়েছে তার সঙ্গে এই মাটির সংযোগ ঘটান, তাতে যে হাজার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেবে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।'[১৮]

গান্ধীজীর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় যে তাঁর নেতৃত্বাধীন অহিংস পথবাহী নানা আন্দোলন বিবেকানন্দের প্রভাবে প্রভাবিত। তাঁর উত্তরসূরী জওহরলাল নেহরুও বিবেকানন্দের ঋণ স্বীকার করেছেন দেশপ্রেম জাগরণের ক্ষেত্রে। জওহরলাল নেহরু জানাচ্ছেন, —'অতীতের মধ্যে প্রোথিত তাঁর মূল, ভারতের ঐতিহ্যের গর্বে পূর্ণ তিনি—তথাপি জীবন সমস্যার সমাধানে আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন—বিবেকানন্দ অতীত ভারত ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতুস্বরূপ। ...হতচেতন হতোদ্যম হিন্দুমনের কাছে সঞ্জীবনী সুরার মতো তাঁর আবির্ভাব। তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মনোভাব তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাদের যুক্ত করেছিলেন অতীতের প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে। তাঁর কাছে আমরা সকলেই ঋণী।'[১৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গান্ধীজী শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠে আসেননি, গিয়েছেন ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরের নানা শাখা কেন্দ্রেও। ১৯২৭-এর ১৩ নভেম্বর কলম্বো কেন্দ্রে গিয়ে অভিভূত হয়েছেন। সেখানে তিনি মন্তব্য করেছেন, —'বিবেকানন্দের নাম যাদুমন্ত্রস্বরূপ। ভারতবর্ষের জীবনে তিনি অনপনেয় প্রভাব রেখে গেছেন।'[২০] ১৯২৯-এর ১৪ মার্চ রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ব্যাপক কর্মযজ্ঞের প্রশংসা করেন। বিবেকানন্দ যে তাঁর আচার্যের নির্দেশ বাস্তবায়িত করে ভারতবর্ষ তথা সার্বিক মানুষের কল্যাণের পথটি প্রশস্ত করেছেন সেকথাও উল্লেখ করেন। আমরা জানতে পারি, ১৯২৯-এর ২৪ এপ্রিল গান্ধীজী পোত্তনুরুতে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরী'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

করেছেন। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম দর্শন করেছেন।[২১] গান্ধীজী কন্যাকুমারীতে গিয়ে আত্মার শান্তির ও চিত্তের আনন্দ অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণ আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব অপরিসীম এবং তা প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে,—ক) জাতিভেদজাত অস্পৃশ্যতা বর্জনে ও খ) দারিদ্র্য দূরীকরণে। এই দুটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের যন্ত্রণাময় চিন্তার উত্তরাধিকার গান্ধীজী নিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সামাজিক অংশ এই দুই সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত ছিল। তাঁর হরিজন আন্দোলন ও চরকাতত্ত্ব এই জন্যই। এই প্রসঙ্গে নারী জাগরণের বিষয়ে গান্ধীজীর প্রয়াস বিবেকানন্দের চিন্তারই দ্যোতনা। গান্ধীবাদী আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষতা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয়েরই নামান্তর।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, সৈয়দ ফজল আলি প্রমুখ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে পি. মিত্র, সতীশ বসু, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মতিলাল রায় সশ্রদ্ধ চিত্তে বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান এবং শাখা কেন্দ্রে যাতায়াতের মাধ্যমে আরো বেশি বলিষ্ঠতর অভী মন্ত্রে রঞ্জিত হতে পেরেছেন।

ভারতে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও প্রসারে বিবেকানন্দের বৈদান্তিক চিন্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। একথা একালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। জাতীয়তাবোধ—সে তো দেশ ও দেশের মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই বিবেকানন্দ প্রাথমিক ভাবে জোর দিয়েছিলেন দেশের পিছিয়ে পড়া অজ্ঞ, মূর্খ, কাতর, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের উন্নতি বিধানে এবং শিক্ষা-সচেতনতার মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ যা জাতীয়তাবোধেরই নামান্তর—তার জাগরণে, এবিষয়ে আমরা আগে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিমত তারই সম্পূরক,—

1. Vivekananda's writings on nationalism have made a more powerful Impact than those of other writers because they have a broader base and also because they stem from a philosophy that might be called perennial. Although he was a Hindu monk, preaching a certain form of Vedanta, it

is no catholic that men of all faiths , including atheists and agnostics, may draw inspiration from his writings, which preach Spirituality but do not recognize any heaven beyond the earth, and he never loses sight of the temporal forces—racial, economic and political—which sustain our quest for the beyond.[২২]

2. Son of Solicitor, Vivekananda himself belonged to the upper stratum of society, and he spoke to many educated audiences both at home and abroad. But his eyes were fixed on the dumb, labouring millions of India on whom the future of the nation lay. It is the eradication of their poverty and illiteracy which was his first concern. No dogmas, said he, would satisfy the cravings of hunger; rather our leaders should first try to give a piece of better bread and a piece of better rag to the sunken millions. The upper classes are mummies, because their vitality has been sapped by centuries of parasitism and exploitation. The masses are like the sleeping Leviathan. The Laviathan will wake up one day; that is to say. The advent of the shudras will supersede the domination of Priestly Brahimins, warlike Kshatriyas and prosperous Vaishyas. This would mean a better distribution of material wealth, which might involve a lowering of the standard of culture. But if we place Swamiji's exhortation about the awakening of the masses in the context of his philosophy as a whole, we cannot miss his emphasis on the antidote to this probable deterioration in culture. The masses should be raised from their abysmal poverty, but they should also be educated spiritually. That is the mission of India as a nation, and there she would find the panacea that has eluded Western materialism.[২৩]

॥ ৪ ॥

সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ দেশনায়কের পদে বরণ করলেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, নেতাজী হলেন স্বামীজীর মানসপুত্র। সুভাষচন্দ্র প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন যে বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। মুখোমুখি দেখা না হলেও বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনাকে সুভাষচন্দ্র প্রগাঢ়ভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। প্রথম যৌবনে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর যে

সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল 'গোগ্রাসে' বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা 'গিলবার' মধ্য দিয়ে তা অটুট ছিল 'মহানিষ্ক্রমণ' পর্যন্ত। কটক থেকে কলকাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কেমব্রিজ, ওটেন নিগ্রহ থেকে আই.সি.এস. হয়েও পদত্যাগ, মানবসেবা থেকে কলকাতার মেয়র, কংগ্রেস পরিত্যাগ, অসুস্থ অন্তরীণ অবস্থা থেকে অন্তর্ধান, আই.এন.এ. গঠন থেকে মহানিষ্ক্রমণ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্বেই বিবেকানন্দের প্রভাব সুচিহ্নিত। এমন প্রবল আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস—যা বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরসূরীর পক্ষেই সম্ভব, তার উপর ভর দিয়ে একাকী গোমো থেকে পেশোয়ার হয়ে আফগানিস্থান; সেখান থেকে ইয়োরোপ ঘুরে ডুবো জাহাজে জাপানে—তারপর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে, নারীশক্তিকে সম্মান জানিয়ে 'দিল্লী চলো'র আহ্বান— এ সবই সুভাষচন্দ্র নামক একটি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দের অমোঘ প্রভাবের ফলেই।

সুভাষচন্দ্র যৌবনে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্ভব হয়নি। বিধির বাঁধন তিনি কাটতে পারেন নি তাই আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষা করেছেন। সিঙ্গাপুরে পৌঁছে রাতে—গভীর রাতে সামরিক বস্ত্র খুলে পট্টবস্ত্র পরিধান করে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্রে যেতেন। গভীর ধ্যানে ডুব দিতেন। সেই ধ্যান অন্তরদেবতা-জীবনদেবতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধ্যান। রেঙ্গুনে পৌঁছেও একই দৃশ্য। পতন যখন সম্মুখে, শত্রুকবলিত রেঙ্গুন ত্যাগ করার আগের দিন—আজীবনের স্বপ্ন ও আদর্শের গোটা আলেখ্য যখন ভেঙে পড়ছে ঝুরঝুর করে—কখনও বা সশব্দে—সামনে শুধুই অন্ধকার—সেই সংকটের চরমতম মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র শুচি, শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিহিত যোগী হয়ে পৌঁছলেন রামকৃষ্ণ মিশনে—জীবনদেবতার সেবায়তনে। তন্ময়, তদ্গত চিত্তে সুভাষচন্দ্র মন্দিরে রামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দের সামনে মুখোমুখি বসে কি খুঁজে ফিরছিলেন? ভবিষ্যতের ঠিকানা? পেয়েছিলেন অমরত্বের ঠিকানা, ব্যর্থতার মাঝে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠার, সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ঠিকানা। তাই তাঁর ব্যর্থতা-পরাজয় উজ্জ্বল অলংকারে আবৃত। শতবর্ষপূর্তির মহোচ্ছ্বাসই তো সে কথাই স্মরণ করায়। সুভাষচন্দ্রের অন্তিম পরিণতি আজও অজানা, তবে তিনি মানুষ-মানুষীর মর্মের নিভৃত বেদিতে প্রতিষ্ঠিত।

সুভাষচন্দ্রের সৈনিক জীবনের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমরা বিবেকানন্দের অমোঘ প্রভাবের প্রভাকে নিরীক্ষণ করব। বিবেকানন্দ জানতেন ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সহজে দেবে না, তা জোর করে আদায় করে

নিতে হবে এবং তার জন্য রক্তপাত অনিবার্য। তাই বিবেকানন্দ বীর্যবত্তার সঙ্গে বললেন,—'ছবিখানা নিঁখুত করবার জন্য হলই বা একটু রক্তপাত।'[২৪] বিবেকানন্দের মত সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস-প্রতীতি ছিল, 'রক্তের বিনিময়ে অর্জিত না হলে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য জাতি বুঝতে পারবে না। তাই সহযাত্রী সৈনিকদের উদ্দেশে তিনি বললেন,—'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' এ প্রত্যয় তাঁর জীবনদেবতা বিবেকানন্দের কাছ থেকেই পাওয়া। দেশের পরাধীনতার যন্ত্রণা শরীরিনী হয়ে উঠেছিল গুরু ও শিষ্যের কাছে একইরকম ভাবে। তাই তার উৎসার বড় বেদনার। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর সৈন্যদের রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় দিলেন তখন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল,—'রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো—জাগো! আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। অস্ত্র হাতে তুলে নাও। তোমাদের সম্মুখে যে পথ, সে পথ আমাদের পূর্ববর্তী মহাপুরুষেরা রচনা করে গিয়েছেন। ঐ পথ দিয়ে আমরা অগ্রসর হব। শত্রু সৈন্যের সারিবদ্ধ ব্যূহ ভেদ করে আমরা আমাদের পথ করে নেব। আর যদি ঈশ্বর চান, আমরা শহীদের মৃত্যুবরণ করবো। এবং অন্তিম নিদ্রায় চুম্বন করে যাব ঐ পথকে যা আমাদের সেনাদলকে দিল্লী পৌঁছে দেবে। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!'[২৫]

সুভাষচন্দ্রের এই কথাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। প্রসঙ্গত বিবেকানন্দের দুটি উক্তি আমরা তুলে ধরব।

১. 'পেছনে চেয়ো না। অতিপ্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে যাও।'[২৬]
২. 'তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। ...অগ্রসর হও... পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইওনা, এগিয়ে যাও সম্মুখে। এরূপে আমরা অগ্রসর হইব। একজন পড়িবে, আর একজন তার স্থান দখল করিবে।'[২৭]

বিপ্লবী মহানায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের কথা উদ্ধৃত করে আমরা ইতি টানব। মৃত্যুর আগে হেমচন্দ্র ঘোষ 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিমগ্ন চিত্তে জানিয়েছিলেন,—'রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ—এই ত্রয়ী এক মহাবিপ্লবের প্রতীক। সারা পৃথিবীর চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক বিরাট রেভ্যুলিউশন এনে দিয়েছেন এঁরা। এঁদের বিপ্লবে চাঞ্চল্য নেই, গতির চমক নেই। দু-একটা শতাব্দী হয়তো চলে

যাবে, এর বহিঃপ্রকাশ মানুষের চোখে ধরা পড়তে। কিন্তু এই বিপ্লবকে, যাকে "রামকৃষ্ণ বিপ্লব" বলে আমি অভিহিত করতে চাই, তা থেমে নেই। সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলছে—মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হল বিপ্লবের প্রকৃতি। আগামীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করে দিয়েছে।'[২৮] এই বিপ্লবের কর্মধারাই হল রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা আর 'রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ' এবং আরো আরো অনেককে নিয়েই তো রামকৃষ্ণ মিশন—যার প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক জীবনায়নের সর্বত্র প্রকাশিত।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব—অমলেশ ত্রিপাঠী, ১৯৯১, পৃ: ৩১-৩২
২. Patriot Prophet, Bhupendranath Datta, Forward P. viii-ix
৩. বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ. ১৯৮-১৯৯
৪. ঐ, পৃ: ৩৮
৫. ৯ এপ্রিল ১৯২৮-এ ডাঃ সরসীলাল সবকাবকে লেখা চিঠি
৬. 'বাখাল বেনু' পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৮৬
৭. বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, মোহিতলাল মজুমদাব, ১৩৭০, পৃ: ৯০
৮. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ১৩৮৫, পৃ: ৩৬৮
৯. শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, স্বামী সাবদেশানন্দ, ১ম সংস্করণ, পৃ: ১৬৬
১০. শ্রীশ্রী সাবদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩৮৪, পৃ: ২৮৪-৮৫।
১১. শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, প্রথম সংস্করণ, পৃ: ১৬৬
১২. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যেব সাক্ষাৎকার, ৬ ফেব্রুয়াবী ১৯৮০
১৩. Prabuddha Bharata, Vol-IX, 1954, P. 458-80
১৪. সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীবামকৃষ্ণ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৭৫, পৃ: ১৭
১৫. Letter of Sister Nivedita, Edited by Shankari Prasad Basu, First Edition, Vol-II, P. 990-1000
১৬. 'উদ্বোধন', বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃ: ২০৩
১৭. স্বামী সারদানন্দ, ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র, ১৯৩৬, পৃ: ২৮৯-৩০৩

১৮. History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Swami Gambhirananda, 1983, P. 223

১৯. Discovery of India, First Edition, P.269

২০. Gandhigi's work, Vol. 35, First Edition, P. 233-34, & P. 136

২১. Ibid, vol. 40. P. 144

২২. Subodh Chandra Sengupta, Swami Vivekananda and Indian Nationalism, 1984, P. 61

২৩. Ibid, P. 72–73

২৪. The Master as I saw him, Sister Nivedita, First Edition, P. 136

২৫. The Spring Tiger, Hugh Toye, 1959, P.103

২৬. বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৮৩, পৃ. ৩৫৯

২৭. ঐ, পৃ: ৩৬৭

২৮. 'রাখাল বেনু', চৈত্র-মাঘ সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ: ২৯৪-৯৫

ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে যে বক্তৃতাগুলি করলেন তার অনেকটাই জুড়ে ছিল যুবকদের উদ্দেশে পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে তৎপর হয়ে ওঠার দীপ্র আহ্বান। প্রসঙ্গত আমরা সংশ্লিষ্ট বক্তৃতাগুলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি অংশ তুলে ধরতে পারি—

১. ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এখন ঘুমোবার সময় নয়। আমাদের কার্যকলাপের উপর ভারতের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করছেন। তিনি কিছু কাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। ওঠো, তাঁকে জাগাও—তাঁর নতুন জাগরণে, নতুন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করে ভক্তি ভাবে তাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।[১]

২. আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্যা দেবতা হোন। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয়েক বছর ভুললে ক্ষতি নেই। অন্যান্য দেবতারা এখন ঘুমোচ্ছেন।[২]

৩. মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হয়ে যাবে...বীর্যবান সম্পূর্ণ অকপট তেজস্বী যুবক আবশ্যক। এমন একশো যুবক হলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অন্য কিছু অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক... বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি অসীম... আত্মবিশ্বাসী হও, আমাদের এখন প্রয়োজন শক্তিসঞ্চয়। এখন তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের এখন আবশ্যক লোহার মতো পেশী ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ়

স্নায়ু। আমরা অনেক দিন ধরে কেঁদেছি। এখন আর কাঁদার প্রয়োজন নেই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও।[৩]

৪. তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে? কোটি কোটি লোক শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে? তোমরা প্রাণে প্রাণে কি বুঝছ অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগন আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কি এই সকল ভেবে অস্থির হয়েছ? এই ভাবনাই তোমাদের নিদ্রা কি পরিত্যাগ করেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে? তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে কি এই ভাবনা মিশে গিয়েছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে? দেশের দুর্দশা কি তোমাদের ধ্যানের বিষয় হয়েছে?[৪]

৫. সাহস অবলম্বন কর, ভয় পেয়ো না। আত্মবিশ্বাসী হও, অগ্নিময় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠ। কেবল আমাদের শাস্ত্রে ভগবানকে লক্ষ্য করে অভী—এই বিশেষণ প্রদত্ত হয়েছে। আমাদের সকলকে অভী, নির্ভীক হতে হবে। তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধি লাভ করবো। ওঠ, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করছেন।[৫]

এর আগে আমেরিকা থেকে ১৮৯৩'র ১০ আগস্ট আলাসিঙ্গা প্রমুখ যুবকদের উদ্দেশে যন্ত্রণার উপলখণ্ডগুলি কুড়িয়ে যা লিখলেন তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল স্বাধীনতার আহ্বান,—

'এস মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ মোহগর্ত থেকে বেরিয়ে এসে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্যে—উন্নত হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেওনা—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেওনা। সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা বস্তুত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন।'

বিবেকানন্দের ওই অগ্নিবর্ষী আহ্বান পরাধীন ভারতবাসী বিশেষত যুবকদের মনে বয়ে নিয়ে এলো মুক্তির নির্যাস।

এই আহ্বানগুলির পেছনে ছিল দীর্ঘ ভারত প্রব্রজ্যায় লব্ধ পরাধীন ভারতবর্ষের রক্তারুণ ছবিটি আর পাশ্চাত্য পরিভ্রমণে আমেরিকা-ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলির সার্বিক চিত্রটি। একদিকে ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের নুইয়ে পড়া, অন্যদিকে আমেরিকা-ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলির উন্নতি বিবেকানন্দের রক্তে তুফান তুলেছিল। তাই তিনি ভারতে ফিরে এসে যুবকদের সংগঠিত ভাবে দেশোদ্ধারের আহ্বান জানালেন একদিকে, অন্যদিকে অজ্ঞ-নিপীড়িত-কাতর-অসহায় ভারতবাসীর মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিতে 'আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি নিজে, রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী তৈরী করলেন। এই নিয়মাবলীর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ও কার্যাবলী। ধর্ম-আধ্যাত্মিক ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপেই রামকৃষ্ণ মিশনের আত্মপ্রকাশ এবং নিরন্তর সেই লক্ষ্যে পথ চলা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ থাকবে না এটা প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল। ত্যাগ ও মানবসেবাকে প্রাধান্য দিয়ে জগৎবাসীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সচেতনতায় আত্মমুক্তির অভীপ্সা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যুবকদের যোগ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল বিশেষ ভাবে।

রামকৃষ্ণ মিশন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছিল; কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির রোষে পড়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখই যথেষ্ট। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারি শুরু হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। বিষয়টি সকলের দৃষ্টিগোচর হতে সময় লাগে। ১৮৯৮'র ২২ মে তারিখে নিবেদিতা তাঁর এক বান্ধবীকে চিঠিতে এ প্রসঙ্গে লেখেন,—

> 'আজ সকালে সন্ন্যাসীদের একজন সতর্কবাণী শুনেছেন— পুলিশ গোয়েন্দা মারফৎ স্বামীজীর উপর নজর রাখছে। ব্যাপারটা সাধারণ ভাবে অবশ্য আমরা জানতাম, কিন্তু আজকের সংবাদটি একেবারে গায়ে আঁচ লাগার মতো। ...সরকার নিশ্চয় ক্ষেপে গেছে, অন্তত স্বামীজীকে যদি সে কোনভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করে তাহলে তাই প্রমাণিত হবে। সরকারের ঐ কাজ মশালে আগুন ধরিয়ে দেবে, যা সারা দেশে আগুন ছড়াবে।'

ব্রিটিশ সরকার তা অবশ্য করেন নি বিবেকানন্দের অসামান্য অপরিমেয় জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে। তবে বিবেকানন্দের প্রতি বেলুড় মঠে গোয়েন্দা পুলিশ নিযুক্ত করে ব্রিটিশ সরকার বিবেকানন্দের অগ্নিবাণীতে উদ্বোধিত যুবকদের বুকের মধ্যে স্তূপীকৃত বারুদে অগ্নি সংযোগের কাজটি ত্বরান্বিত করেছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে। পরবর্তীকালে মিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য যখন সরকারী কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন, তখন মিশনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতাগুলি আর একবার যাচাই করে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় মিশন কর্তৃপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মিশনের সদস্য রূপে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিবেকানন্দের আহ্বানে একদল যুবক সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সেই যুবকদের অনেকে দেশ ও মানবসেবার কাজকে অগ্রাধিকার দিতে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন। তাই রাজনীতির সঙ্গে কার সম্পর্ক আছে আর কার নেই—এসব জানা এবং অনুসন্ধান করা মিশন কর্তৃপক্ষের সম্ভব ছিল না। তাই মিশন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে হলে এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে, কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন গোপন সংগঠনের সঙ্গে তাঁর কোন রকম যোগাযোগ নেই। ঘোষণা পত্রের ইংরেজি বয়ানটি ছিল এই রকম,—

'I also declare that I have no connection whatever with any political or any secret body.'[৬] এই প্রথা চালু হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।

রামকৃষ্ণ মিশনের রাজরোষের শিকার হয়ে ওঠার প্রধান কারণ — ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠা। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসব কিংবা বাংলাদেশে কালী মন্দিরে গীতা হাতে নিয়ে বিপ্লবীদের দেশমাতৃকার নামে শপথ গ্রহণ — এ সবই এদেশে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের পরিচয় বহন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলতেন সেই সকল উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'The Extremist Challenge' গ্রন্থে লিখেছেন,—'This is the story on an idea at once religious and political'.[৭] ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে — রাজনীতিতে ধর্মের এই

অপবিসীম প্রভাব সরকারের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই এই দেশের সন্ন্যাসী সমাজের কোন কোন অংশের উপর তাঁবা ববাবরই গোপনে চোখ রাখতেন। এই গোপন প্রহরা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনও রেহাই পায়ই নি। না পাওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান ও বাণীর দ্বারা পবিচালিত হয়েছিল ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা আন্দোলন — বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধারায়।

॥ ২ ॥

ধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা আমরা প্রথম লক্ষ্য কবি ষাটেব দশকে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'ব (১৮৬০) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এই সভাব বাঙালী তথা ভাবতীয় (বিশেষত হিন্দু) জনসাধাবণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি কবতে সাহায্য করেছিল। ১৮৬৭তে নবগোপাল মিত্র আয়োজিত হিন্দু মেলাও বহুলাংশে ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবার চেষ্টা করেছিল।

এই সময়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিব মোহিনী-মায়া ছিন্ন কবে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেব ঋত্বিকেরা পৌরাণিক কাহিনীকে অথবা ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীকে আঁকড়ে ধরে পরাধীনতাব মাঝে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করতে তীব্র ভাবে উৎসাহী হয়ে পড়লেন। পৌবাণিক যুগের কাহিনী ধর্মীয় বাতাববণে, নব মূল্যায়নে রচিত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হবার পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন চরমপন্থী-উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে আদর্শ পুরুষ। বালগঙ্গাধর তিলক বচনা করলেন মারাঠী ভাষায় — 'গীতাবহস্য', অরবিন্দ তৎপব হলেন গীতাব দীর্ঘ ভূমিকা লিখতে এবং লালা লাজপৎ রায়কে দেখা গেল উর্দু ভাষায় শ্রীকৃষ্ণেব জীবনী প্রণয়নে। এই সময়েই ভাগবত ধর্মেব মূল বিষয়বস্তু — ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা লিখতে শুরু করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম রূপে সুখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারিত 'নব বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে' প্রভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে 'ভারত-আত্মা' রূপে ববণ কবতেও দ্বিধা কবেননি। এমন কি ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখে ফেললেন — 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব'।

আবাব নিকট ইতিহাসের শবণাপন্ন হতেও দেখা যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত বিরচিত 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়ার দু' দশকের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতিচারণের অস্ফুট গুঞ্জন পরিণত হয় দেশব্যাপী

শিবাজী উৎসব পালনের সমারোহে। বলা বাহুল্য, এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। এই নব মূল্যায়ন পূর্ণতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় (১৯০৪)।

সমসাময়িক কালে ধর্মকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন নানা স্তরে দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির অন্তর্লীন আধ্যাত্মিকতার পুনরুদ্ধার এবং তার দ্বারা নবজাগ্রত ভারতবর্ষের জীবন সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করাতেই তাঁরা উৎসাহী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান ও সংশ্লিষ্ট বাণী ও রচনা এবং 'গীতা' বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শতাব্দীর ক্লান্ত অবসানে বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন বুদ্ধিজীবীদের প্রবল আকর্ষণ করে। যুগের প্রয়োজনে তিনি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের একটা সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঈশ্বরে সাকারত্ব আরোপের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি। তবে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব উপলব্ধির আগে তাঁর অবয়বী রূপ কল্পনা সাধনার পথ সহজতর করে দেয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। আবার, অবতারবাদের মধ্যে ঈশ্বরের নরদেহ ধারণের চেয়ে মানুষের দিব্যত্ব অর্জনের ইঙ্গিতই তিনি দেখিয়েছিলেন। এই সমগ্র জীবলোকের আদর্শ হিসেবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রিত করেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করে তিনি দেখালেন যে শুধু ফরাসী নয়, হিন্দু চিন্তাধারার প্রচ্ছায়ায় মানব সমাজের অন্তহীন প্রগতির সম্ভাবনাও রয়েছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আহরিত অস্ত্রগুলি এদেশের ইংরেজ ঘেঁষা, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞেয়বাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিয়েছিল। আবার হিন্দু ধর্মতত্ত্বের যুক্তিসিদ্ধ, সর্বজনগ্রাহ্য এবং মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিচার নীরব করে দিয়েছিল মৌলবাদীদের। বেন্থাম প্রচারিত 'বহুজন হিতের' আদর্শ থেকে হিন্দু সাধনার লক্ষ্য (পরভূতহিত) যে মহত্তর এবং ব্যাপকতর তা সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল সকলের কাছে, তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু অতীত মূল্যবোধে আবিষ্ট হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি বিরূপ হননি। মুক্তি অর্জনে সহায়ক বলে প্রতিটি ভারতবাসীরই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন, আবার পশ্চিমের বস্তুসর্বস্বতার সংযত সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর প্রাসঙ্গিক অভিমতটি আমরা তুলে ধরব,—'প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ দৃঢ় সেতু-মুখের

স্থপতি যার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ প্রতীচ্যের প্রবল শক্তির প্রাণকেন্দ্র আমেরিকায় অভিযান চালিয়েছিলেন। আর এদেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতে দিশেহারা বিদেশী শাসনের ভারে নিষ্পিষ্ট, অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভ্রান্ত লক্ষ লক্ষ "ক্লৈবগ্রস্ত অর্জুন" তাঁর বাণীতে উদ্বোধিত হয়েছিল।[৮] বিবেকানন্দের বাণী নরমপন্থীদের (কংগ্রেস) নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে চরমপন্থী সশস্ত্র বিপ্লবীদের অনুসৃতব্য পথ আলোকিত করে দিয়েছিল। তাই স্বাভাবিক কারণে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন সশস্ত্র তরুণ বিপ্লবীদের অগ্রদূত — তাঁরা নরমপন্থীদের সকরুণ আবেদন-নিবেদন-বিবৃতিদানের কর্মসূচীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাব ও নিষ্ফলা বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাঁদের কাছে প্রহসন হয়ে উঠেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে আবার আমরা দৃষ্টি ফেরাব। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়ে তরুণ বিপ্লবীরা সমকালে এই শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, জাতিব ভবিষ্যৎ কোন মতেই ঐ 'অ-জাতীয় কংগ্রেস' অথবা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-এর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থে কমলাকান্তের মুখ দিয়ে তিনি অক্ষম উপরোধের হীন-সারমেয়-নীতি ছেড়ে দিয়ে চরমপন্থীদের বৃষ-তুল্য বিক্রম প্রকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সামনে দেশমাতৃকার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে মায়ের দ্বিসপ্ত কোটিভূজে ধৃত ছিল — ভিক্ষা-ভাণ্ড নয়, খর তরবার। এঁদের হৃদয়ে বঙ্গজননীর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, তাঁর অসামান্য মহিমার প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন, তিনিই তাঁদের দীক্ষিত করেছিলেন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রভাবও ছিল অপরিসীম। 'আনন্দমঠে'র — 'মা যা হইয়াছেন' — সেই কৃষ্ণবর্ণা, করালবদনা নগ্নিকা কালীমূর্তি বিপ্লবী অরবিন্দের কাছে বহু শতাব্দীর শোষণ নিপীড়নের প্রতীক বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। আর সন্তানদলের সন্তানদের উদ্দেশে সত্যানন্দের উদাত্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে তিনি আসুবিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের রণোন্মাদনা জাগার ডাকই শুনেছিলেন। অসুর বিনাশিনী, যশ, জ্ঞান, শক্তি, সৌভাগ্য ও সাফল্যের প্রতীক দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছিল অরবিন্দের স্বপ্নের দেশমাতার মূর্তি। তা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলিত জাতীয়তাবাদ নয়, তা আইরিশ ও রুশ পপ্যুলিস্ট আদর্শে গড়া পৌরাণিক হিন্দুর অসহিষ্ণু, একমুখী, চবম জাতি-বৈর-প্রণোদিত দেশপ্রেম। অরবিন্দ তৈরী করতে চেয়েছিলেন 'মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত' নতুন 'সন্তান দল'। ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা এই সূত্রেই। দেশপ্রেম তাঁর কাছে ধর্মেরই

বিকল্প হয়ে উঠেছিল। তবুও আমরা দেখতে পাই যে বঙ্কিমের 'ভারত কলঙ্ক' এবং 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধ দুটি অনেকাংশে অরবিন্দ সহ সতীর্থ বিপ্লবীদের উদ্বোধিত করেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষত চরমপন্থী বিপ্লবীদের উপর ধর্মীয় প্রভাব নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আমাদের দয়ানন্দ সরস্বতীর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। রামমোহনের সকল কর্ম-প্রেরণার উৎস ছিল উপনিষদ, যদিও যুক্তিবাদকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি; গীতাকে চিন্ময় জগতের পথপ্রদর্শক বলে মনে করলেও বঙ্কিমচন্দ্র আত্মশুদ্ধির সহায়করূপে সনাতন ঐতিহ্যকে অবহেলা করতে রাজী ছিলেন না। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকে অধ্যাত্ম জীবনের মুখ্য প্রেরণা রূপে গ্রহণ করলেও দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয় সাধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবে বক্ষোপলব্ধির একটা সহজ উপায় নির্ধারণ করেছিলেন বিবেকানন্দ তাকেই প্রয়োগ করেছিলেন; কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মচিন্তাবিদ্ দয়ানন্দ সরস্বতীর কাছে—'ঈশ্বরোক্ত' ও 'নিত্য' বেদই ছিল সকল কর্মের প্রেরণা। অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র এবং বেদোত্তর যুগের বিশিষ্ট ধর্মাত্মাদের উল্লেখ তাঁর রচনা ও চিন্তাধারায় পাওয়া গেলেও একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই ছিল তাঁর কাছে প্রকৃত জ্ঞানের, এমনকি বিজ্ঞানের আধার। দয়ানন্দ মুক্তির যে পথ নির্দেশ করেছেন তাতে আধ্যাত্মিকতার থেকে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। পরহিত সাধন, সুবিচার, সুনির্দিষ্ট সংযমী জীবন যাপন ইত্যাদি ধর্মানুশীলনের অঙ্গ এবং একই সঙ্গে তা আত্মশক্তি বৃদ্ধিব সহায়ক ও ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতিষেধক। বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, পোশাক-আশাক সম্পর্কিত নীতি জাতিভেদ প্রথাকে ঘিরে যে সমস্ত অযৌক্তিক এবং অমানবিক সংস্কার হিন্দু সমাজে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সে সমস্ত কিছুকে দয়ানন্দ ঘৃণা করতেন। তবে জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করলেও তিনি বর্ণবিদ্বেষী ছিলেন না; কেন না এই প্রথাটি বেদ-সমর্থিত, এবং তারই মধ্যে বৈদিক যুগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়েছিল। স্ত্রী জাতি সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকদের সঙ্গে দয়ানন্দের বিশেষ মতপার্থক্য ছিল না। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রেও তাঁর মতবাদের উপর বেদের প্রভাবই ছিল একক। এজন্য তিনি খ্রীষ্টান আচরণ বা যুক্তিবাদের দ্বারস্থ হননি। দেশের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা চিন্তা করেই দয়ানন্দ নিরামিষ আহারেরই পক্ষপাতী ছিলেন, জ্ঞানার্জন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে বিদেশে

যাওয়া-আসাতেও তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তবে জীবনের একটা সময় পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্রহ্মচর্যপালনকে তিনি আবশ্যিক বলে মনে করতেন এবং সমমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেওছিলেন তপোবন-সুলভ পরিবেশে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের উপর। পুরোহিত-তন্ত্র, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তাঁর কাছে কখনও স্বীকৃতি পায়নি। বেদে যার সমর্থন নেই এমন আচার-অনুষ্ঠানকে আজীবন তিনি নিন্দা করেছেন। বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, আক্রমণোদ্যত আর্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে তাঁকে বিবেকানন্দের অগ্রদূত বিবেচনা করা অযৌক্তিক হবে না। অন্তত অরবিন্দ তাই মনে করতেন।

দয়ানন্দের ব্যক্তিগত চরিত্র, তাঁর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রতি অরবিন্দের বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন,—'ব্রোঞ্জের উপর খোদাই কাজের মতোই সমকালীন মানুষের মন ও সমাজের উপর তাঁর গভীর প্রভাব অঙ্কিত হয়েছিল। ঈশ্বরের কর্মশালায় নিযুক্ত অক্লান্ত, অমিতশক্তির এই মানুষটির কথা মনে পড়লে আমার চোখের সামনে অজস্র সংগ্রাম, কর্ম-সাফল্য ও শ্রমার্জিত জয়ের ছবি ভেসে আসে।'[৯] গ্রীক ধ্রুপদী ভাবধারায় মগ্ন ঈশ্বরের রাজ্যের এই সৈনিকের মধ্যেই হোমারের নায়কের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন অরবিন্দ। আর ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সুপ্রাচীন আর্য সংস্কৃতির বহু মূল্যবান বৈশিষ্ট্য যে তাঁর জন্যই সংযোজিত হয়েছিল — সে কথাও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন অরবিন্দ। অব্যবস্থিতচিত্ততা ও সুবিধাবাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থেকে দয়ানন্দ কখনো আপোষহীন সংগ্রামের ভান করেননি। ভারতীয় মানসিকতাকে অস্পষ্টতা ও উদ্দেশ্যহীনতার ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন দয়ানন্দ। বহু শতাব্দী ধরে বেদ ভারতীয় জীবনের একটা গ্রানিট পাথরে-গড়া ভিত্তি হয়ে আছে; দয়ানন্দের ব্যক্তিত্ব যেন তারই উপর শিরা-উপশিরা। মনে হয় অতীতকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন তার উৎস-মুখের নির্মলতায়, তার বোধনের পুণ্যলগ্নে। তাই দয়ানন্দ যে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনা করেছিলেন তা একই সঙ্গে চিরন্তন এবং রূপান্তরক্ষম। বেদের যে মন্ত্রটি তিনি তাঁর কালের মানুষের কাছে মহামূল্যবান একটি উত্তরাধিকার রূপে রেখে গেছেন তাতে ধ্বনিত হয়েছে এই প্রার্থনা,—'সত্য পরিব্যাপ্ত হোক সমস্ত আত্মার মধ্যে, দৃষ্টি হোক সত্যের অঞ্জন-লিপ্ত, সত্যই হোক সকল বাসনার উৎস, সত্য বিকিরিত হোক সকল কর্মের মধ্যে'।[১০] এদেশের বহুবিচিত্র সংস্কৃতি, বিভিন্ন আদর্শ এবং বহুবিধ উদ্দেশ্যের সংঘাতের মধ্যেও অরবিন্দের অক্লান্ত আকুল অন্বেষণ ছিল বিশুদ্ধ শক্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টি, অভ্রান্ত কর্মকুশলতা এবং ভয়হীন ঐকান্তিকতার

জন্য আর এ সমস্ত কিছুর সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন দয়ানন্দের মধ্যে। তাঁর কল্পনায় দয়ানন্দের মধ্যে চরমপন্থীদের আদর্শ প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ, আর এই কারণেই এই ভাবমূর্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য হয়ে উঠেছে।

বিচারপতি জেনকিন্স (Sir Lawrence Jenkins) আলিপুর বোমার মামলার বিচারকালে মন্তব্য করেছিলেন যে এই ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত আসামীরা প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও ধর্মভাবাপন্ন মানুষ।[১১] জেনকিন্সের কথায় বিপ্লবীদের ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের প্রতি আস্থা ও মনোভাবের বিষয়টি প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী উগ্র মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের উগ্র সমর্থক বালগঙ্গাধর তিলক মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় সমাজে একটি মাত্র মনোভাব যা সাধারণ ভাবে সকলের মধ্যে উপস্থিত তা ধর্মকেন্দ্রিক মনোভাব। আর এই ধর্ম হিন্দুধর্মকেই আশ্রয় করেই এগিয়ে গিয়েছে। মুসলমান বা খ্রীষ্টান দ্বারা অংশত অধ্যুষিত হলেও আমাদের দেশের গরিষ্ঠ জনসাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং এই ধর্মের ভিত্তিতে এদেশে ঐক্য তথা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে।[১২]

বস্তুত ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের উন্মেষে ধর্ম যে বিপুল পরিমাণে প্রেরণা জুগিয়েছিল তা ব্রিটিশরাও এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৩]

এ প্রসঙ্গে মানিকতলা বোমা মামলায় বিচারালয়ে নির্দোষ প্রতিপন্ন হবার পর অরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়া ভাষণে যা বলেছিলেন তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়—'একদা বিশেষ প্রত্যয় সহকারে আমি একথা বলেছিলাম যে, এই আন্দোলন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এ হল একটি ধর্ম, ধর্মমত বা বিশ্বাস। আজ সেই একই কথা আমি আর এক ভাবে বলতে চাই। জাতীয়তাবাদ যে একটি ধর্ম, ধর্মমত বা বিশ্বাস; সে কথার পুনরুক্তি না করে আমি বরং এখন বলতে চাই যে, এ হল সেই সনাতন ধর্ম যা আমাদের চোখে জাতীয়তাবাদের সামিল।'[১৪]

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্রিটিশ শাসকের নজর এড়িয়ে যায়নি। তাই এ কালে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনকেও তারা দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। রাজশক্তির দৃষ্টিকোণে বিচার করলে কর্তৃপক্ষের এই সন্দেহ স্বাভাবিক কারণে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হতে পারে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের এই মর্মে নির্দেশ ছিল যে ইংরেজ আমলের

গোড়া থেকে সর্বত্র এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীদলের আবির্ভাব হয়েছে। এই সকল সন্ন্যাসীরা যে বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশবিরোধী কর্মে যুক্ত ছিলেন সে বিষয়ে পুলিশ একাধিক রিপোর্টে পেশ করে।[১৫] সন্ন্যাসীকুল সম্পর্কে সন্দেহের এই সার্বিক পরিবেশের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনও অবাঞ্ছিত এক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল।

॥ ৩ ॥

ইতিহাসের নিরিখে সমসাময়িক কালের সঙ্গে আমরা দৃষ্টি বিনিময় করলে দেখতে পাব বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিবেকানন্দের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ যুবকেরা সহিংস-অহিংস দু' পথেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বকালে সংশ্লিষ্ট উগ্র জাতীয়তাবাদী যুবকেরা বিবেকানন্দের অবর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ এবং সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শাখাকেন্দ্রে প্রায়শ যাতায়াত করত। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, বিপ্লবী যুবকেরা দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত মন্ত্রে অভিসিক্ত হয়ে ব্যাপকতর ভাবে তাদের কাজ শুরু করে দেবার পর থেকে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের খোঁজ খবর শুরু করে দেয়।

বস্তুত, রামকৃষ্ণ মিশনের বহির্ভারতীয় কেন্দ্রগুলিও পুলিশের সর্তক নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। এই সব কেন্দ্রে সন্ন্যাসীগণ ও ভক্তবৃন্দ কোথায় কি করছেন, কিভাবে প্রচার চালাচ্ছেন, কিংবা ত্রাণকার্যের সুযোগ নিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক ভাবে সন্দেহজনক অন্য কোন কাজকর্ম শুরু করেছেন কিনা সে সব ব্যাপার খুব মনোযোগ দিয়ে নজর রাখা হত। এমন কি রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্রে, আশ্রমগুলিতে প্রধানত কোন শ্রেণীর মানুষ যাতায়াত করত সে সময় খোঁজ খবর নেওয়া হত। পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে মিশন ও শহরতলীর আশ্রমগুলি সম্পর্কে নানা অভিযোগ এনেছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে পুলিশ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের সব অভিযোগগুলি কেবল একান্তভাবে গোপন রিপোর্টের মধ্যে প্রকাশ করা হত। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এফ. সি ড্যালি (F.C. Dally), হাচিনসন (Hutchinson), চার্লস টেগার্ট (C.A. Tegart) বা বিচারপতি রাউলাট (S.A.T. Rowllet)

প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে যে সব মন্তব্য পেশ করেন সেগুলি উচ্চ মহলের স্বল্প সংখ্যক মানুষেরাই জানতে পারেন।

কালানুক্রমিক বিচারে পুলিশের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর জেনারেল এফ.সি. ড্যালির ১৯১১'র ৭ অগাস্ট-এর রিপোর্ট, তার আগে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন থানায় লিপিবদ্ধ রিপোর্ট, ১৯১৪তে চার্লস অগস্টাস টেগার্টের দীর্ঘ রিপোর্ট (যা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সম্পূর্ণ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে), ১৯১৬'র ১১ ডিসেম্বর লর্ড কারমাইকেলের দরবাবী ভাষণ — যার মূল ভিত্তি ছিল টেগার্টের রিপোর্ট। ১৯১৭'র ১ জানুয়ারী লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়েট সেক্রেটারি সি. টিন্ডেলের গোপন নোট, ঐ বছরের ২ ফেব্রুয়ারী অনারেবল মেম্বার পি. সি. লায়নের কাছে বাংলাদেশের চিফ্‌ সেক্রেটারী এইচ. এল. স্টিফেনসন কর্তৃক প্রেরিত নোট — আর এরই সূত্রে ৪ ফেব্রুয়ারীতে লর্ড কারমাইকেলের কাছে প্রেরিত নোট। এগুলিই রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 'রাজরোষ'। শেষোক্ত দুটি নোট লর্ড কারমাইকেলের রামকৃষ্ণ মিশনকে সরাসরি অভিযুক্ত করার প্রেক্ষিতে স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক লিখিত প্রতিবাদ পত্রের সূত্রে প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপনের বিস্তৃত প্রয়াস। এই প্রয়াস ১৯১৭তেই থেমে থাকেনি। ১৯১৮-তে সিডিসন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচারপতি রাউলাট বাংলাদেশের বিপ্লবীদের উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে এই উল্লেখ আরো বেশি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর লর্ড কারমাইকেলের দরবারী বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনা হয় — যদিও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মিশনের নামটি উচ্চারিত হয়েছিল। আসলে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজশক্তির যতই অভিযোগ থাকুক না কেন বাংলাদেশ তথা গোটা ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দুটি দশকের মধ্যেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তি মিশনের বিরুদ্ধে আদালতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ না করে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে ভরসা পেতেন না। তাই মিশনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গোপনে দৃষ্টি রাখলেও তাঁরা প্রকাশ্যভাবে মিশনের সেবাকার্যের প্রশংসা করে যেতেন। লর্ড কারমাইকেলের উল্লিখিত দরবারী বক্তৃতাতে মিশনের সেবাকার্যের উল্লেখ ছিল।

এসব যে ব্যাজস্তুতি তা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ নিজেরাও বুঝতেন। তাই তাঁদের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসকেরা মুখে যাই বলুক

না কেন অন্তরে মিশনের সম্পর্কে তাদের সন্দেহ-মানসিকতা শিকড় গেড়েছে। তাই সরকারী কর্তৃপক্ষের মন থেকে সন্দেহ মোচনে তাঁবা নিজেরাও কম সচেষ্ট ছিলেন না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি পুলিশের সন্দেহ সবচেয়ে বাড়তে থাকে। কিন্তু তার অনেক আগেই রাজনীতি সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশনের অভিমত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর স্বয়ং বিবেকানন্দ যে নিয়ম নীতিগুলি লিপিবদ্ধ কবেছিলেন সেখানে রাজনীতির সঙ্গে মিশনের সংযোগহীনতা উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টীবোর্ড বা অছি পবিষদ গঠনের পর এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যাঁরা মিশন নিদের্শিত সন্ন্যাস ও ত্যাগব্রতের আদর্শ নিয়েছিলেন তাঁদের সতর্ক করা হয়েছিল সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও জীবন গঠনে—

'We find people seeking to utilise the monastic spirit as a mean to some material collective end, ...the Swami pointed out that from the earliest ages renunciation has formed. The central ideal, the pivot, on which the India Scheme of life has been made to revolve and that no material or political end can ever supply the organising motive of in the collective life of India.'[১৬]

অর্থাৎ মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা ইউরোপীয় অনুকরণে রচনা করা যাবে না। আমাদের দেশে বামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগের আদর্শেই গোষ্ঠী-জীবন গড়ে তুলতে হবে। কোন বকম জাগতিক—অর্থাৎ সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা একেবারেই নিরর্থক।

একমাত্র ধর্মের প্রেরণাই নিখিল ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকেব মধ্যে মহান ঐক্যেব যোগসূত্র রচনা করতে পারে। ত্যাগব্রতের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দেশের প্রতিটি নাগরিক ও যুবকদের কাছে মিশন কর্তৃপক্ষ তাই প্রার্থিত উচ্চাশা, ভোগ এবং প্রলোভন অথবা রাজনীতির সংকীর্ণ মাদকতা উপেক্ষা করে দেশের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান—

'To such youngmen shielded by true renunciation from all the seductions of worldly ambition and enjoyment and the alterments of a narrow, exotic political idea for their

country, the Ramakrishna Mission sends forth its appeal, for the harvest indeed it full and we watch day to day, for the coming of the reappers.'[১৭]

রাজনীতিকে পরিহার করে চলার জন্য এর থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ অঙ্গীকারবোধ হয়তো সম্ভব ছিল না। তবুও রাজরোষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশন মুক্তি পায়নি।

॥ ৪ ॥

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রামকৃষ্ণের নামে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আশ্রমগুলির সঙ্গে বিপ্লবীবাদীদের গোপন যোগাযোগ জানাজানি হয়ে গিয়ে মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ পুলিশের চাপে পড়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, এই তথাকথিত আশ্রমগুলির সঙ্গে মিশনের কোন সম্পর্ক নেই। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন তরফ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে— বিবেকানন্দ স্বয়ং রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দেওয়া পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতেন। ব্রিটিশ কুশাসনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ মতামত প্রকাশ করে নিজেকে বিতর্কে জড়াতে চাননি। কেন না তার ফলে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কর্মটি ব্যাহত হত।[১৮] এ প্রসঙ্গে আমরা বলব বিবেকানন্দ যে কথাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যুর আগে প্রকাশ করেছেন কিংবা ভারত প্রত্যাবর্তনের পরে পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য অগ্নিময় আহ্বান জানিয়েছেন যা আগের প্রবন্ধে ও এই প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে তারই প্রভাবে বিপ্লবী যুবকেরা সশস্ত্র ভাবে এবং হিংস্র পথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর গান্ধীজী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রগাঢ় ভাবে ভারতবর্ষকে ভালোবাসার সূত্রে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁর সামগ্রিক কর্মের বিস্তার ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি— বিবেকানন্দের ভূমিকা একই সঙ্গে Active এবং Passive। তাই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তরুণ বিপ্লবীদের আকর্ষণ যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের নিরীক্ষণ।

আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাগুলি সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারে অংশ নেয়নি ঠিকই কিন্তু

এদের কেন্দ্র করে ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব, ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি গড়ে ওঠে। ব্রিটিশরাজ তাদের ভালো চোখে দেখত না। রামকৃষ্ণ মিশন এবং বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ এইসব সংস্থার বরাবরই ছিল। অন্তত এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা একই সময়ে বিপ্লবীসংস্থা এবং একযোগে বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে পোর্টল্যাণ্ডের জনৈক এ্যাটর্নি—গালওয়ানি (G.W. Galwoni) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতা পুলিশের হাতে যামিনী মজুমদার নামে একজন গ্রেপ্তার হবার পর স্বীকার করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসত। পুলিশের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রমাণ সহ যাচাই করার সুযোগ ঘটেনি। আমেরিকায় বেদান্ত সোসাইটি তথা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যে রাজদ্রোহমূলক যোগাযোগ ছিল এ বিষয়ে পুলিশ ববাবর সন্দেহ করে এসেছে। বিবেকানন্দের ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৮-এ জেল থেকে মুক্তি পাবার পর কিছুকাল বেলুড় মঠে আত্মগোপন করেন। তারপর আমেরিকায় পাড়ি দেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকার জন্য তিনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছে বিশেষ আদরের মানুষ ছিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদক স্বামী বোধানন্দের প্রতি পুলিশের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, বোধানন্দ বেদান্ত সোসাইটির আড়ালে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে প্রচণ্ড সহায়তা কবে আসছিলেন। আমেরিকার অন্যান্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বামী অভেদানন্দ সহানুভূতিশীল ছিলেন বিপ্লবীদের ওপর। আমেরিকায় অবস্থান কালে অভেদানন্দ যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি পরবর্তীকালে 'India and her people' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পুলিশের ভাষায় এগুলি অধিকাংশ ছিল রাজদ্বেষে পূর্ণ এবং সেই কারণে বোম্বাই সরকার এই বইটি নিষিদ্ধ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী অভেদানন্দ যেদিন কলকাতায় আসেন সেদিন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান হয়। এ উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে যে জনসভা হয়েছিল সেখানে রাজরোষের আশঙ্কায় কোন সরকারী কর্মচারী যোগদান করেননি। তা সত্ত্বেও টাকীর স্বনামধন্য যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, 'বসুমতী' পত্রিকার জলধব সেন, 'ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা'র সম্পাদক নরেন্দ্র সেন উপস্থিত থেকে স্বামী অভেদানন্দকে স্বাগত জানান। ঐ উপলক্ষ্যে ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার টাউন হলে আর একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ সভায় কাথিয়াবাড় নিবাসী এবং সদ্য দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রত্যাগত গান্ধীজীব প্রতিনিধি মদনজিৎ নামে জনৈক স্বাধীনতা

সংগ্রামী উপস্থিত ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের ভাই নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী একই ভাবে আমেরিকায় গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলন তুঙ্গে তুলতে প্রয়াসী হন। পরে নরেশচন্দ্র এবং তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রমোহন বসু বিপ্লব আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে দূর প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন। এঁরা আমেরিকার হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ছিলেন। কৃষ্ণ বর্মা এবং বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল প্যারিসের ম্যাডাম কামার সঙ্গে এঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে স্বামী সারদানন্দ প্রকাশ্যে রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সংস্রবশূন্য হয়ে থাকা যে সব সময় সম্ভব নয়, তাও তিনি বুঝতেন। তাই তিনি এক সময় স্বক্ষোভ মন্তব্য করেন যে, বিরাট ক্ষমতা ও প্রভাব নিয়ে সরকার যেখানে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ছেন সেখানে সহায়সম্বলহীন রামকৃষ্ণ মিশনের গুটি কয়েক সন্ন্যাসীদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কথা বলার মাধ্যমে স্বামী সারদানন্দ সরকারের রোষবহ্নি থেকে রামকৃষ্ণ মিশনকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দু'জন বিপ্লবীকে মিশন কর্তৃপক্ষ আশ্রয় দেন। পরবর্তীকালে এঁরা রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

ব্রিটিশ রাজরোষ সরাসরি রামকৃষ্ণ মিশনের উপর নেমে আসার কারণগুলি আমরা সূত্রাকারে সাজাতে পারি—

ক) রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিটিশ সরকারের প্রধান সন্দেহভাজন ছিলেন। তাঁর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, তাঁর রচনাবলী পাঠ করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেজন্যই বিবেকানন্দ এবং তাঁর রচনাবলী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপক রাজরোষের কবলে পড়েছে। যদিও তখন বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন না, থাকলে হয়তো ইতিহাসের মোড়টা ঘুরে যেত। আমরা জানি গত শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়েছিল—নিবেদিতার চিঠিতে তা জানতে পারি। বিবেকানন্দের চিঠি সেন্সর করা হত। আমেরিকায় ব্রিটিশ শাসনবিরোধী তাঁর উক্তির জন্য তাঁকে 'কংগ্রেসওয়ালা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বাধাদানে কাশ্মীরে মঠ স্থাপনের জন্য তিনি জমি পাননি। তাঁর সম্পর্কে যে গোপন রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল তা আজও সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে

আসার আগেই লণ্ডনে অবস্থান কাল থেকেই ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর উপর নজর রাখতে শুরু করে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সেই নজরদারী শুধু দীর্ঘই হয়নি, সামগ্রিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর সরকারের রোষবহ্নি নেমে এসেছে।[১৯]

খ) নিবেদিতা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের দ্বিতীয় সন্দেহভাজন। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে আমরা জানতে পারি বৈপ্লবিক চুরির অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টাও সরকার চালিয়েছিল। লর্ড মিন্টোর পত্নী লেডি মিন্টো নিবেদিতার কার্যকলাপ ও তাঁর বৈপ্লবিক মানসিকতাব হদিশ নিতে নিবেদিতার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের চর কর্নেলিয়া সোরাপজি (তৎকালীন সমাজের নামী মহিলা) লেডি মিন্টোর সঙ্গে গিয়ে বেলুড় মঠে নানা অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং রামকৃষ্ণ পার্ষদদের কাছ থেকে নানা তথ্য জানতে চেয়েছেন। আমরা জানি নিবেদিতার পিছনে স্থায়ীভাবে গোয়েন্দা ঘুরত। তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবীদেব সঙ্গে গভীব সংযোগ থাকায় পুলিশ নানা ভাবে নিবেদিতাকে হেনস্থা করার চেষ্টা কবেছে। তাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে বিদেশ যেতেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল সক্রিয়। নিবেদিতা তখন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন কিন্তু সরকারী মহল সেটাকে সত্যকার ছেদ বলে মনে করেনি। কেননা নিবেদিতা নিয়মিত বেলুড় মঠে এবং বাগবাজারে শ্রীমা সারদা দেবীর কাছে যাতায়াত করতেন। মায়াবতী আশ্রমে গিয়ে গ্রীষ্ম ও শরতে অবস্থান করতেন। তাঁর লেখা নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এইসব কারণে একদিকে নিবেদিতা যেমন রাজরোষের শিকার হয়েছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনও বাদ পড়েনি।[২০]

গ) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ভারতে এসে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন নানা স্থানে। তিনি ব্যাপক জনসম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অবশ্যই ছিল ব্যাপকভাবে উদ্দীপনা সঞ্চারী। তিনি আমেরিকার ব্রুকলিন ইনস্টিটিউটে ছ'টি বক্তৃতায় তীব্রভাবে ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা করেছিলেন। যা 'India and her people' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এই বইটি ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে যাতে না পৌঁছয় তার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বইটি নিষিদ্ধ করার কথাও ভেবেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ তা ব্রিটিশ সরকার

ভালোভাবেই জানত। স্বয়ং লর্ড কার্জনের রোষবহ্নিতে পড়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।[১১]

ঘ) তৎকালীন বিপ্লবীদের অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা 'যুগান্তরের' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই, নিবেদিতা যে তাঁর জামিনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ধরেই নিয়েছিল ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ মিশন দ্বারা সমর্থিত। এ বিষয়ে চার্লস টেগার্টের রিপোর্টে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

ঙ) আলিপুর মামলা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেবব্রত বসু এবং শচীন সেনকে রামকৃষ্ণ মিশন শুধু থাকতেই দেয়নি, শ্রীমা সারদাদেবীর নির্দেশে এবং স্বামী সারদানন্দের উদ্যোগে তাঁরা সন্ন্যাসীও হয়েছিলেন। এই বিষয়টিকে ব্রিটিশ সরকার এবং তার গোয়েন্দাবাহিনী সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। বরং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তাদেব রোষবহ্নি দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল এই সূত্রে।

চ) কেবল সশস্ত্র বিপ্লবী পুরুষেরাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত নারীরাও শ্রীমা সারদাদেবীর আশ্রয় পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশানে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা বন্দিনী ননীবালা দেবীর কথা অবশ্যই আমরা স্মরণ করব। তিনি বিপ্লবী যুবকদের গোপন অস্ত্রের সন্ধান রাখতেন। এবং বিপ্লবীরা তাঁর কাছ থেকে নানা সাহায্য পেত। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার থেকে কাশীতে তাঁকে আনা হয়। অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও গোপন সূত্র না জানতে পারায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেন। তৎকালীন কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট মিঃ গোল্ডী তাঁকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যদি তিনি আহারাদি করেন তবে তাঁর যে কোন ইচ্ছা পূরণ করবেন। তার উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, যদি তাঁকে বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে রেখে আসা হয় তবে তিনি খাবেন। এই মর্মে পুলিশ তাঁকে একটি দরখাস্ত লিখে দিতে বলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত লিখেও দেন। কিন্তু মিঃ গোল্ডী সে দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলে দেন। তখন আহত সিংহীর ন্যায় ননীবালা গোল্ডীর গালে চড় মারেন। দ্বিতীয় চড় মারার আগে গোয়েন্দা পুলিশের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা হাত ধরে নিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ননীবালা দেবীর সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর শুধু সংযোগ ছিল না, ছিল প্রায় সমস্ত সশস্ত্র বিপ্লবীদের। বিপ্লবীরা বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে এসে চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে বিপ্লবের কাজে নামতেন এবং উদ্বুদ্ধ হতেন। বাঘাযতীনের

কথা তো আমরা বিশেষভাবে জানি। যে সমস্ত বিপ্লবীরা মায়ের কাছে দীক্ষা পেয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন — দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ), রাধিকামোহন অধিকারী (স্বামী সুন্দরানন্দ), বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী তপানন্দ), ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য (স্বামী প্রেমেশানন্দ), দীনেশ দাশগুপ্ত (স্বামী নিখিলানন্দ), অতুলচন্দ্র গুপ্ত (স্বামী অভয়ানন্দ)। এছাড়া সন্ন্যাস নেননি যে সব বিপ্লবীরা কিন্তু দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন — রামচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, বিজয়কুমাব নাগ, দীনেশ মুস্তাফি, সুরেন কর, গৌরহবি ভট্টাচার্য, কর্ণাটকুমার চৌধুরী প্রমুখ।

ছ) বিপ্লবীদেব মধ্যে বিবেকানন্দের গ্রন্থের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে জানা ছিল। শুধু তাই নয়, 'উদ্বোধন' পত্রিকা এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় বিবেকানন্দের এমন সব চিঠি ও বক্তৃতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীব সন্দেহের বিষয় হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন রাজরোষ উপেক্ষা করে তা প্রকাশ কবেছিল।

জ) সরকার আরো লক্ষ্য করেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন উৎসবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সমবেত উপস্থিতি। রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকাতেও তাদের উপস্থিতির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ঝ) বিপ্লবীদের পত্র পত্রিকায় বিবেকানন্দেব প্রেরণাব কথা প্রায়ই উল্লেখ থাকত। সরকার সে বিষযে সজাগ ছিল। বিভিন্ন পুলিশ রিপোর্টে তার বিস্তৃত বিববণ আছে।

ঞ) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে ঐ নাম নিয়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গডে উঠেছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের আডালে থেকে বিপ্লবীরা কাজ চালিয়ে যেত। রামকৃষ্ণ মিশনের অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের গভীর যোগ আছে বলে ধারণাব বশবর্তী হয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন পুলিশ রিপোর্টে এ বিষয়ে বিষাক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানত এই সব কারণে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রিটিশ রাজরোষ বহ্নির কবলে পডেছিলেন।

এছাড়া খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক এবং ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষক পত্র-পত্রিকাগুলির প্রত্যক্ষ মদত তো ছিলই।

স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশি কয়েকজন শিষ্য ও শিষ্যা, অনুরাগী ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং বসবাস করেছিলেন। এঁরা হলেন মিস্ মাগারেট নোবেল

(পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা), মিস্ ক্রিস্টিন, সেভিয়ার দম্পতি, মিঃ গুডউইন, মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিসেস ওলিবুল প্রমুখ। এঁরা সকলেই ভারতের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শ্রীমতী সেভিয়ার মিশন পরিচালিত আলমোড়ার মায়াবতী আশ্রমে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করেন। ভারতবর্ষের উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং শোনা যায় তিনি স্বয়ং পুনায় হাজির হয়ে বালগঙ্গাধর তিলকের পত্নীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ভগ্নী ক্রিস্টিন নিবেদিতার সহযোগী হিসেবে এ দেশের বহু গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। সকলের উপর নিবেদিতা বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের একজন প্রধান প্রেরণা-উৎসাহদাত্রী রূপে এ দেশে অনেকদিন ধরেই সুপরিচিত হয়ে আছেন। নিবেদিতার লেখা 'Kali the Mother', শ্রীঅরবিন্দ বিরচিত 'ভবানী মন্দির' থেকে কোন অংশে কম বিদ্রোহাত্মক ছিল না। এ কথা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করে গেছেন। তিনি বরোদার গাইকোয়াড় এবং রাজপুতনার রাজন্যবর্গের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁদের ভারতবর্ষের বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান। রাজদ্রোহের অপরাধে ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিবেদিতাই তাঁর জামিন হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখিত। এ ছাড়া লাঠি খেলা, অসি চালনা প্রভৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করে তিনি শহরে ও গ্রামের সর্বত্র প্রকাশ্যে বিপ্লববাদী কর্মে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ধর্মসভায় বক্তৃতা করার সূত্রে ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করেন। রাজনীতির সঙ্গে এই রকম প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত ১৯০৮-এ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণ-সভায় যে সব স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন তার থেকেই অনুমান করা যায় যে তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এই সভায় বিপিনচন্দ্র পাল, প্রভাস দে প্রমুখ সুপরিচিত নেতারা যোগদান করেন এবং তাঁরা সকলেই এ দেশের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেন। 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকার স্তম্ভে র‍্যাটিক্লিফ নিবেদিতাকে এ দেশের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রূপে বর্ণনা করেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে অনুরূপভাবে নিবেদিতার প্রতি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ কবা হয। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দেব প্রতীচ্যেব শিষ্য-শিষ্যা, অনুবাগীদেব নিযে ব্রিটিশ সবকাব বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। তাই মিশনেব নানা কেন্দ্রে ও সংশ্লিষ্টজনেব উপব জাবি ছিল ব্যাপক নজবদাবী।

॥ ৫ ॥

ভাবতবর্ষেব বাইবে যেমন বেদান্ত সোসাইটি এবং অন্যান্য বিদেশি শিষ্যবর্গেব মাধ্যমে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে টিকিযে বাখাব চেষ্টা কবা হযেছিল, ভাবতেব অভ্যন্তবে তেমনি মিশনেব বিভিন্ন আশ্রমগুলি কখনো কখনো ব্রিটিশবিবোধী বাজনীতিব গোপন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হযেছিল। বামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হওযাব প্রথম যুগে মিশন কর্তৃক অনুমোদিত এই ধবণেব আশ্রমেব সংখ্যা ছিল এগাবো এবং যে এলাকায এগুলি গডে উঠেছিল সেগুলি হল, এলাহাবাদেব মুঠিগঞ্জ, বেনাবস সিটিব লক্ষব, (বেনাবসে আবো একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হযেছিল), বৃন্দাবনেব বংশীঘাট, সাহাবানপুবেব কন্‌খল, পূর্ব বাংলাব ববিশাল, পশ্চিম বাংলায মুর্শিদাবাদেব সাবগাছি, মাদ্রাজেব মাইলাপুব, কর্নাটকেব বাঙ্গালোব সিটি (গোল টেম্পল বোড), উত্তবপ্রদেশে আলমোডাব মাযাবতী এবং সব শেষে কলকাতাব গোপাল নিযোগী লেনেব উদ্বোধন কার্যালয। এই আশ্রমগুলিব মধ্যে বেশ কযেকটিতে বিপ্লবীবা ঘন ঘন যাতাযাত কবতেন। মানিকতলা বোমা মামলাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপেন ব্যানার্জী, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল এবং ইন্দ্র নন্দী মাযাবতী আশ্রমে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত কবেন। এখানে থাকাব সমযেই তাঁবা 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাব সম্পাদক সুপবিচিত বামচন্দ্র প্রভুব সংস্পর্শে আসেন। ইন্দ্র নন্দী সন্ত্রাসবাদী দলেব একজন সক্রিয কর্মী ছিলেন। স্বামীজী গ্রামবাংলাব অধিবাসীদেব মধ্যে গ্লোব, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদিব সাহায্যে শিক্ষা প্রচাবেব উপদেশ দিযেছিলেন। ইন্দ্র নন্দীও স্বামীজী নির্দেশিত পন্থায মফঃস্বল অঞ্চলেব দূববর্তী এলাকাগুলিতে সাধাবণ মানুষেব মধ্যে শিক্ষা ও বিপ্লবী প্রচাবকর্ম চালিযেছিলেন। প্রচাব কাজে মফঃস্বলে থাকাব সময ইন্দ্র নন্দী প্রাযই মিশনেব কোনো আশ্রমে গিযে হাজিব হতেন। বাংলাদেশেব বহু অঞ্চলেই তখন বামকৃষ্ণেব নামে বিভিন্ন আশ্রম গজিযে উঠেছিল। এই সব ভুঁইফোড আশ্রমগুলি মিশনেব অনুমোদিত সংস্থা না হলেও, এলাকাব সবল অধিবাসীবা কিন্তু এগুলিকে মিশন পবিচালিত আশ্রম বলেই জানত এবং সঙ্গত কাবণেই এই আশ্রমগুলিব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেবা খুব সহজেই গ্রামবাসীদের উপব

প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। এই অনুমোদিত আশ্রমগুলির সঙ্গে নিষিদ্ধ রাজনীতির যোগাযোগ পুলিশ মহলকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সময় পূর্ব বাংলার প্রায় সব কটি জেলাতেই এই ধরণের তথাকথিত রামকৃষ্ণ মিশন গজিয়ে ওঠে। পুলিশের সন্দেহ যে, ঢাকার নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতিই এই সব ভুঁইফোড় এবং অননুমোদিত আশ্রমগুলি গড়ে তোলায় সাহায্য করে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই অসংখ্য আশ্রম গড়ে ওঠে। এই সব আশ্রমে রাজনৈতিক কর্মীরা আত্মগোপন করে থাকতেন। বিপ্লবী পুলিন দাসের বিচারে দ্বীপান্তর হওয়ার পর ঢাকার সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম প্রধান নেতা মাখন সেন এই আশ্রমগুলির সংগঠন ও ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সবিশেষ জড়িত ছিলেন। এই কেন্দ্রগুলির রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা কালক্রমে এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বেলুড়ের কেন্দ্রীয় মিশনের যে কোনো সংশ্রব নেই, এই মর্মে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এই সব আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে বা পরেও মিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের যোগাযোগ কোন অবস্থাতেই একেবারে ক্ষীণ হয়ে যায়নি। এটা সম্ভবও ছিল না। কেননা মুখে যাই বলুন না কেন, মিশনের প্রাণপুরুষ স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও বিপ্লববাদী কর্মধারার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, স্বামীজী নাকি কোনো এক সময় এ কথা স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষের তখন যে অবস্থা তাতে এ দেশের পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হল বোমার (What needs today is bomb)। অনুমান করা যেতে পারে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা কিংবা এ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরাও বিবেকানন্দের মনের গোপন কথাটি টের পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা প্রকাশ্যে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেও, গোপনে বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্য করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রম থেকে যে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হত তার কোনো কোনো সংখ্যাতে আপত্তিকর অনেক কিছুই ছাপা হতো। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর সংখ্যার 'প্রবুদ্ধ ভারতে' শ্রীঅরবিন্দ, দেবপ্রসাদ মুখার্জী এবং অন্যান্য পরিচিত বিপ্লবী কর্মীদের লিখিত বহু আপত্তিজনক বইয়ের বিজ্ঞাপন বের করা হয়েছিল। এই সমস্ত কর্মীদের সকলেই রাজদ্রোহের

অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। দেবপ্রসাদকে তো সুদূর বোম্বাই অঞ্চলের পুলিশও খুঁজে ফিরছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ থাকাকালীন স্বরাজের আদর্শ প্রচারে সন্ন্যাসীগণ বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন বলে পুলিশের সন্দেহ। বিপ্লবীদের সঙ্গে এই সময় বেলুড় মঠের যে একটা কিছু সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল এ ব্যাপারেও পুলিশের তরফে নিশ্চিত দাবী করা হয়। পুলিশের ধারণা স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং 'যুগান্তর' প্রচারপত্র বিলি করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন ট্রিপ্লিকেনে ছিলেন, সেই সময়েই মাদ্রাজে এই সব প্রচার-পুস্তিকাগুলি বিলি করা হয। অবশ্য মাদ্রাজ পুলিশ এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের অভিমত মেনে নিতে অস্বীকার কবে। তাদের ধারণা যে, তুতিকোরিণের সন্ত্রাসবাদী উকিল এস. সোমসুন্দবম্ ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যেই এগুলি মাদ্রাজে নিয়ে এসেছিলেন। মাদ্রাজের ঘটনাটিকে গুরুত্ব না দিলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংযোগ বরাববই অটুট ছিল। কলকাতার চোরবাগানের নলিনীকান্ত দে, ব্রহ্মানন্দের সহচর হিসেবে একদা পুরী গিয়েছিলেন এবং এঁরই সাহায্যে সেই সময় ননীগোপাল সেনগুপ্তের দলকে গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বিপ্লবী কর্মধারার প্রতি ব্রহ্মানন্দ এতই সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছিলেন যে সেই সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতির বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও তাঁর কাছে বিপ্লবের নানা ব্যাপারে উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হাজির হয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সন্ন্যাসী পূর্বে উল্লিখিত মাখন সেনের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই জ্ঞানেন্দ্রর মাধ্যমেই আবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে সম্ভবত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকেই বিশেষ উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র মিশনের অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রায়শই দেশবন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এর ফলে দেশবন্ধুর মাধ্যমে মিশন কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ সে আমলের ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির পরিমণ্ডলের আবর্তে জড়িয়ে পড়েন। মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ অবশ্য এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে অন্তত প্রকাশ্যে যথাসম্ভব দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এ ভাবে সব কিছু এড়িয়ে যেতে পারেননি। তিনি তাঁর কয়েকজন অনুগামী সহ অসহযোগ আন্দোলনের কাজে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত, তাঁরই দেখাদেখি মফঃস্বলের একাধিক

জেলা আশ্রমগুলিও অসহযোগ প্রচার কর্মে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছিল। টেগার্টের রিপোর্ট জোরের সঙ্গে সে কথাই বলে।

মিশনের অনুমোদনহীন মফঃস্বলের বিভিন্ন আশ্রমগুলির বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু জেলাগুলিতে মিশনের অনুমোদিত আশ্রমগুলিও বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে একেবারে উদাসীন ছিল না। এই আশ্রমগুলি স্থাপন করার ব্যাপারে যাঁরা সবচেয়ে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন স্বয়ং বিপ্লবী কর্মী। উদাহরণ স্বরূপ বাঁকুড়া জেলার সুপরিচিত উকিল এবং বিবেকানন্দের একান্ত অনুগামী ভক্ত চন্দ্রকান্ত সেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও 'বয়কট' প্রচারের কাজে যোগদান করে তিনি ১৯০৭—০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সবিশেষ খ্যাতি এবং রাজরোষ বহ্নির কবলে পড়েছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে তিনিই আবার অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরের বছর ফরিদপুরে যে সেবাশ্রম স্থাপিত হয়, সেই কাজে পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ঐ একই বছরে আগরতলাতেও একটি মিশন স্থাপিত হয়। পার্বত্য ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদী দলই এই শাখা আশ্রমটি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। এই কেন্দ্রে আত্মগোপনকারী অনেক রাজনৈতিক কর্মী মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুলিশের ইন্সপেক্টর নৃপেন ঘোষকে হত্যার ব্যাপারে জড়িত প্রিয়নাথ ব্যানার্জী এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ নামক দুই ব্যক্তি মিশনের এই আশ্রমে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। এই সব শাখা আশ্রমগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীরা একই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। পুলিশের রিপোর্ট অনুয়ায়ী বেলুড় মঠের সঙ্গেই বিপ্লবীদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একরকম সুনিশ্চিত ছিলেন যে সংসারত্যাগী বিপ্লবী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী সমাজের একাংশ বেলুড়ে রীতিমত ট্রেনিং এবং রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ ও সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতেন। বাস্তবিক পক্ষে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার ব্যাপারেও মিশন সহায়তা করে এসেছে। প্রখ্যাত বিপ্লববাদী কর্মী হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর স্মৃতিকথায় নানা ব্যাপারে মিশনের সতত সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিলেই রামকৃষ্ণ

মিশনের সাহায্য নেওয়া হত, কেননা মিশনের সন্ন্যাসীরা ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে খুব সহজেই রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন।[২১] বস্তুত স্বাদেশিকতাকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করে ধর্ম-অভিলাষী জনসাধারণকে অতি সহজেই স্বদেশের রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত করা যেত।

সাধারণত রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করার জন্য যে-সব উৎসবের আয়োজন কবা হতো সেই উপলক্ষ্যে বহু বিপ্লবী কর্মী মিশনের কাজে যোগদান কবতেন। কোনো কোনো সময় আবার মিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় যে ত্রাণ কার্য চালান হতো, সেখানেও এই সব রাজনৈতিক কর্মীরা জমায়েত হতেন। পুলিশের রিপোর্টে এই ধরণের একাধিক সমাবেশ ও অনুষ্ঠানেব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই তারিখে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেব বিভিন্ন সভাপতি সহ মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের ছবি প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে প্রায় ১৫,০০০ যুবক যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে আলিপুব বোমা মামলায় সংশ্লিষ্ট দেবব্রত বসু (পরবর্তীকালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন সেন (পরবর্তীকালে স্বামী চিন্ময়ানন্দ) ও কুঞ্জলাল সাহা বিশেষ উৎসাহ সহকারে অনুষ্ঠানেব কাজে সাহায্য করেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলাব সারদা চক্রবর্তী এবং অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য নগেন রায়চৌধুরীও এই উৎসবে উপস্থিত থেকে সমবেত জনতার মধ্যে শ্রমজীবী সমবায় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচারপত্র বিতবণ করেন। পরের বছর ঐ একই উৎসবে বহু বিপ্লবী কর্মী সমবেত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বহু অনুগামীসহ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং এমন কি স্বদেশেব কাজে যোগদান করার জন্য শ্রোতাদের প্রকাশ্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের রামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী উৎসবে সুপরিচিত বিপ্লবী কর্মী মাখন সেন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করেন। তিনি ছাড়াও যশোরের কিরণ মুখার্জী, সুরেশ সমাজপতি এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় সংশ্লিষ্ট মানিক গুহমুস্তাফি ও হেমচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দ জন্মবার্ষিকী উৎসবেও বিপ্লবী কর্মীরা মিশনের অনুষ্ঠানে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই উপলক্ষ্যে যে উৎসব হয় সেখানে বহু বিপ্লববাদী কর্মী অতিথি আপ্যায়ন এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবায় স্বেচ্ছাসেবীর

কাজ করেন। ঐ অনুষ্ঠানে ভারতের রাজনীতিতে আগ্রহী বহু বিদেশি অভ্যাগতও উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস আলেকজাণ্ডার (Francis Alexander) নামে জনৈক ভদ্রলোকসহ বহু আমেরিকান ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। স্বামীজীর ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পরের বছর যে উৎসবের আয়োজন করা হয় সেখানেও রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অনেকের সমাবেশ ঘটেছিল। ভেঙে যাওয়া অনুশীলন সমিতির বহু পরিচিত সদস্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের কাজে যুক্ত ছিলেন। সরাসরি প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পুলিশ সংবাদ পেয়েছিল যে উৎসবের শেষে ওখানে একটি গোপন রাজনৈতিক সভারও আয়োজন করা হয়েছিল।

উপরোক্ত উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়াও বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীরা মিশন আয়োজিত বিভিন্ন ত্রাণ কার্যেও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানে মিশনের বন্যাত্রাণ কার্যে অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর মত সর্বজনবিদিত বিপ্লবী অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অমরেন্দ্র দুর্গত এলাকাগুলিতে মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। অমরেন্দ্র যে মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে রীতিমত পরিচিত ছিলেন একথা অনেকেই জানতেন এবং বেলুড়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসব ও সমাবেশে তাঁকে অনেকবারই বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী রূপে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। ত্রাণকার্য পরিচালনা করার জন্য মিশনের একটি নিজস্ব সংগঠন ছিল। এই সংগঠনে ঢাকার বিপ্লবী পুলিন দাসের বিশিষ্ট সহযোগী প্রিয়নাথ দাস এবং কলকাতার সন্ত্রাসবাদী কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত অমৃত হাজরা সহ অন্যান্য বহু যুবক ও যুগান্তর দলের বসন্ত নামক জনৈক কর্মী প্রমুখ বিপ্লবীরাও যুক্ত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত মাত্র চারজনেরই নাম প্রকাশ করেন। কিন্তু এঁদের সম্পর্কেও বিশদভাবে কিছু জানাতে তিনি অস্বীকার কবেন।

পুলিশ, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যে সব স্বনামখ্যাত রাজনৈতিক কর্মীদের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ ছিল তাঁদের নামের একটি তালিকা রচনা করে। এই তালিকায় আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত রাজদ্রোহী দেবব্রত বসুর নাম পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি মিশনের কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পরে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পূর্বে উল্লিখিত শচীন সেন এবং কুঞ্জলাল সাহাও মিশনের বেলুড় ও মাইলাপুর (মাদ্রাজ) কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভবভূষণ মিত্র বেলুড়

মঠের কর্তৃপক্ষের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। এই মামলার অনুসন্ধানকালে প্রকাশ পায় যে বেলুড় মঠের সঙ্গে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতির কিছু গোপন সংস্রব বহুদিন থেকেই রয়ে গিয়েছিল। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে ১১৭, আমহার্স্ট স্ট্রীটে যে পুলিশী তল্লাশী চালানো হয়েছিল তার ফলে জনৈক কুলচন্দ্র সিংহবায়ের একটি ডায়েরি আবিষ্কৃত হয়। এই ডায়েরিতে যে গোপন সংকেতলিপি পাওয়া যায় সেটির পাঠোদ্ধার করে জানা গিয়েছিল যে অনুশীলন সমিতিব সদস্য প্রায় জনা ত্রিশেক ছাত্র বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এঁরা বিবেকান্দের কোনো এক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠের অনুষ্ঠানে প্রায় কর্মকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সাংকেতিক চিঠিখানি পাঠ করে আবো জানা যায় যে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বেলুড় মঠকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির শিক্ষাপ্রসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত চন্দননগরের ফণিভূষণ ঘোষকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মে তাবিখে বেলুড় মঠে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। হাওড়ার যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীও রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সদস্য ছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্ণ দাসের সমিতির সঙ্গে যুক্ত ঢাকাব উমাচরণ সরকার এবং গোপালপুর ও কমলপুর ডাকাতির ব্যাপারে সন্দেহভাজন রসিকচন্দ্র সরকার ও জনৈক আশুতোষ দেব নামক বিপ্লবী কর্মী, সন্ন্যাসী রূপে বেলুড় মঠে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু এঁরা তা হতে পারেননি। ‘সারথি কেন্দ্র’, ‘যুবক মণ্ডলী’র যোগেন ঠাকুরও বেলুড় মঠের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি পরে ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক মঠ থেকে বিতাড়িত হন। ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত তারাপদ বসুও কিছু দিনের জন্য বেলুড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। ঢাকার নগেন্দ্রনাথ সরকার এবং হাওড়ার ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর অনুগামী বীরেন সুর নামক জনৈক আর্য সমাজের সদস্য যথাক্রমে বেলুড় ও বেনারসের মিশন কেন্দ্রে কিছুকাল দিনযাপন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজাবাজার বোমা মামলার সুবাদে পুলিশ মহলে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম বারে বারে উল্লেখিত হয়। মিশনের মায়াবতী আশ্রমে আবেক্ষাধীন একদা ঢাকা নিবাসী অতুল গুহ (পরবর্তীকালে স্বামী অভয়ানন্দ), প্রফুল্ল চক্রবর্তী নামক অপর এক ব্যক্তিকে একটি চিঠি লেখেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির নাম, রাজাবাজার মামলায় অভিযুক্ত অমৃত হাজরার নিকট প্রাপ্ত একটি সংকেতলিপিতে উল্লেখিত হয়েছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপব বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যিনি পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে সর্বদা যোগসূত্র বজায় রেখে চলতেন, সেই স্বনামধন্য নেতা মিশনের কন্‌খল-হরিদ্বার শাখার একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এই মিশনের কিছু পুস্তিকা ও কয়েকজন সভ্যের ফটোগ্রাফ, চন্দননগরের একটি বাড়িতে খানাতল্লাসী করার সময় পুলিশ উদ্ধার করে। এই মামলার অপর এক আসামী রঘুবীর শর্মার বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ চারজন সন্দেহজনক বাঙালীর নাম খুঁজে পায়। এঁদের কাছে কিছু ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারপুস্তিকা বিলি করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। এই দলের মধ্যে কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্র অবনীন্দ্রনাথ ঘোষ মিশনের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি দুর্গাপুজোর সময় মিশনের বেনারস আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর কন্‌খল আশ্রমে বসবাস করেন। ঐ দলের অপর তিনজন ব্যক্তি হলেন হাওড়ার নীতিচন্দ্র রায়, সুশীলকুমার মিত্র এবং অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী। নীতিচন্দ্র বেলুড়, বেনারস এবং কন্‌খলের মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাক্তন বিচারপতি সারদা মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র সুশীল অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং বেলুড় মঠে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন। অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর সঙ্গে মিশনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এঁরা ছাড়াও রঘুবীর শর্মার বাড়ি তল্লাসী করার সময় আরো একজনের নাম জানা যায়। তিনি হলেন হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং বেলুড় মঠের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতা না রাখলেও তিনি প্রায়শই মিশনের দেরাদুন আশ্রমে উপস্থিত থাকতেন। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন আশ্রম তল্লাসী করে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়। এঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারতের আশ্রমগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বলদেব রায় প্রথমে বেনারস এবং পরে কন্‌খলের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সতীশ দাশগুপ্তও বেনারসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বসন্ত বিশ্বাসই সর্বাপেক্ষা পরিচিত ছিলেন। দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। মিশনের বেনারস আশ্রমে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়। সব শেষে নেপালী বাবা নামে একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি নিজে মিশনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, সেখানকার অনেক সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। ঢাকা নিবাসী বিখ্যাত বিপ্লবী ও মল্লযোদ্ধা শ্যামাকান্ত ব্যানার্জী নেপালী বাবার বিশেষ অনুরাগী

ছিলেন। তিনি পবে সংসার ত্যাগ করে সোহহং স্বামী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

যে সকল উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁদেব কয়েকজনের নামের একটি তালিকা তৈরী করেছিল গোয়েন্দা পুলিশ। এঁরা হলেন—

যুগান্তর দলের :

রাসবিহারী বসু, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রনাথ নন্দী, কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রকুমার সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ)- এবং ভবভূষণ মিত্র।

অনুশীলন সমিতির :

মাখনলাল সেন, তুলসীচবণ দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জী, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দাস, প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ)।

এ ছাডা সদ্য ইউবোপ প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দেব অনুজ যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীব নামও উপরোক্ত তালিকায় লিখিত ছিল।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই হোক না কেন ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দেব মতাদর্শ এবং সামগ্রিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন অপবিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিডিশন কমিটির রিপোর্টের ২৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদে পবাধীন ভারতবর্ষেব রাজনীতির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্মেব প্রেরণায় শ্রীঅরবিন্দ কি ভাবে হিন্দুধর্ম ও স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হযেছিলেন সে কথা তিনি নিজেই ১৯০৩-এ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় ব্যাখ্যা করে গেছেন। হিন্দুর 'শক্তি' সাধনাই রাজনৈতিক বন্ধন মোচনের একমাত্র পথ, এবং কোনো এক সময় পর্যন্ত; শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে, এই শক্তি সাধনার পথেই জাপান পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

বস্তুতপক্ষে, বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। লর্ড কারমাইকেলের দরবারী ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ তারই সাক্ষ্য বহন করে। পরিশেষে

সার্বিক পর্যালোচনার সূত্রে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে — রাজনীতিকে ধর্মের পর্যায়ে উত্তরণ ঘটিয়ে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ, স্বদেশ-সেবা ও ধর্মের মধ্যে এক অসাধারণ সমন্বয় সাধন করেছিল রামকৃষ্ণ মিশন। এই কারণেই সম্ভবত মিশন বিপ্লববাদী কর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকার ব্যাপারে কোনোরকম মানসিক দ্বিধার সম্মুখীন হয়নি। দ্বিধা যেটুকু ছিল তার পিছনে হয়তো কেবলমাত্র বাস্তব কারণই ছিল, তা না হলে রাজনীতির সঙ্গে মিশনের এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখনই সম্ভব হতো না।

রামকৃষ্ণ মিশন যেমন একদিক দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে উৎসাহ দান করেছিল, তেমনি অপরদিকে মিশনের প্রভাবেই এই আন্দোলন কিছু পরিমাণে ভাঁটার পথেও এগিয়ে গিয়েছিল। স্বদেশ এবং ধর্মের মধ্যে যোগসূত্র ঘটিয়ে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতাদর্শ এককালের বহু অগ্নিহোত্রী বিপ্লবীকে ধর্মের পথে টেনে নিয়ে আসে এবং রামকৃষ্ণ মিশন এইসব রাজনীতিভ্রষ্ট বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। বিশিষ্ট বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেছেন। রাজনীতির পতন-অভ্যুদয় পথের সংঘর্ষে অনেকেই শেষ জীবনে ক্লান্ত ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হেমচন্দ্রের মতে, বিপ্লবী জীবনের সেই সব দুঃখ ও হতাশা যখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল, অনেকে কেবলমাত্র তখনই আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে সংসার তথা রাজনীতির জগৎ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম ছিল রাজনৈতিক দায়িত্ব এড়ানোর ও রাজরোষ থেকে মুক্ত হবার একমাত্র প্রকৃষ্ট আশ্রয়স্থল এবং রাজনীতির সংকটময় পথ থেকে পিছলে আসার জন্য ধর্মই একমাত্র সম্মানজনক উপায় হিসেবে পবিগণিত ছিল।[২২] এককালের বহু প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় রাজনীতিক এইভাবে অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী নিরালম্ব নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সূর্যকুমার সেন (স্বামী নির্বাণানন্দ), রাধিকামোহন অধিকারী (স্বামী সুন্দরানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) এবং নরেন সেন (নরেন মহারাজ)-এর মত একদল প্রাক্তন বিপ্লবী রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভিন্ন ধারায় দেশ-মানবসেবার কাজে অংশ নেন।[২৩] রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ব্রিটিশ রাজরোষ যে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ছিল না সার্বিক আলোচনা থেকে তা বোঝা যায়। স্বাধীনোত্তর কালে বহু বিপ্লবী প্রকাশ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের কথা জানিয়েছেন।

আসলে বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বোধিত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। এই যোগের প্রধান কারণ তিনটি: ক) শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর অধ্যাত্ম সাধনার স্পর্শে জাগরিত হওয়া ও শুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হওয়া। খ) জীবনদেবতা বিবেকানন্দকে প্রণতি জানানোর মধ্য দিয়ে অপরিমেয় শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠা। গ) বিবেকানন্দ সে সময়ে দুর্জয় দুর্মর দুঃসাহসিক যে কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন তা আমাদের চমকিত করে,—'কেবল গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক—পড়ুক গুলি আমার বুকে... শুধু বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?'[২৪] এসব কিছুই বিপ্লবী যুবকদের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাতেব জন্য সর্বদা তাড়িত করেছে—পরিণতিতে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গানকে কবেছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। 'জগতে যখন জন্মেছিস তখন একটা দাগ রেখে যা'—এই দাগ রাখতেই হাজারো যুবকের আত্মবলিদান। তাই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন রাজরোষের শিকার হয়েছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে নানা নথিপত্র ঘেঁটে একটি তথ্য উদ্ধার করেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে ভারতরক্ষা আইনের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা কার্যকর করা যায়নি ভারতীয় জনজীবনে-গণমানসে রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাবগ্রাহী কর্মপ্রবাহ ও জনপ্রিয়তার সূত্রে এবং আমেরিকাবাসী ক্ষুব্ধ হবে ভেবে।[২৫] তবে সাদা পোশাকের পুলিশ বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন নানা শাখা কেন্দ্রের উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সজাগ রেখেছিল সর্বক্ষণ।[২৬]

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য ও বিপ্লবীদের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল। স্বভাবতই রাজরোষের আগ্নেয় উত্তাপ তাই স্পর্শ করেছে বারে বারে রামকৃষ্ণ মিশনকে—সেকালে ও উত্তরকালে।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৯৬, সুলভ সংস্করণ, পৃ: ২৭

২. ঐ, পৃ: ৩৫

৩. ঐ পৃ: ৮৭–৮৮

৪. ঐ পৃ: ৮৯

৫. ঐ পৃ: ১৬৬
৬. History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Swami Gambhirananda, 1983, P. 175
৭. The Extremist Challenge, 1967, P.15
৮. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, অমলেশ ত্রিপাঠী, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ২৭
৯. ঐ, পৃ: ৪৭
১০. Dayananda the Man and his works, Sri Aurovinda, Vaidic Mission, 1916, P.915
১১. Militant Nationalist in India, Biman Behari Majumdar, 1966, P.116
১২. Tilak & Gokhle, A Stanley Wolpert, 1962, P.201-202
১৩. Indian Nationalism and Hindu Social Reform, H. Charles Heilsath, 1964, P.131-146
১৪. Uttarpara Speech, (4th edition), Aurobinda Ghosh, 1943, P.20
১৫. State Committee for Compilation of History of Freedom Movement in India: Bengal Region, paper No. 49, Bundle No. 15 Political activities of the Sadhus upto 1909.
১৬. History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 1983, P.178
১৭. Ebid, P.179
১৮. Militant Nationalism in India, Biman Behari Majumder, P-57
১৯. Intelegence Report—Prepared for the Government of India, foreign Department in 1896; L/Pad S/19/Tem. No. 168
২০. India, 9 Feb 1906
২১. বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, হেমচন্দ্র কানুনগো, ১৯২৮, পৃ: ১৪
২২. ঐ, পৃ: ১৭
২৩. বাংলায় বিপ্লববাদ, (প্রথম সংস্করণ) নলিনীকিশোর গুহ এই গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।
২৪. লণ্ডনে বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ: ১৯০–১৯১.
২৫. বাখাল বেণু পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৬, পৃ: ২৯৮
২৬. এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে Dr. Ramesh Chandra Majumder রচিত 'History of the Freedom movement of India' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ১৯৬৩, পৃঃ ১৬৫–৬৬তে।

ভারতীয় জনজীবনে রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আকাশ জুড়ে ছিল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য — ভারতবর্ষের অজ্ঞ-কাতর-শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের পথটি চিনে নেবার প্রয়াসে, স্বমহিমায় ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করবার অভীপ্সায় স্বামী বিবেকানন্দ অশ্রুপাত করেছেন অসংখ্য বার। পায়ে পায়ে ভারতবর্ষের মাটি তিনি জরিপ করেছিলেন ভারত প্রব্রজ্যার কালে। লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে একদিকে 'চলমান শ্মশান', ঐ পিছিয়ে পড়া অজ্ঞ-কাতর, শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করা, অন্যদিকে শাশ্বত ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ স্খলিতভাবে যে জীবন যাপন করছে তার প্রতিকারের জন্য বিশেষভাবে ভাবিত হওয়া। গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে এই দুয়ের সংযুক্তিতে, 'মহাব্রত' পালনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু কিভাবে সেই 'মহাব্রত' পালন করবেন তা ভেবে উঠতে পারছিলেন না। তাই চিন্তার রাজ্যে ডুব দিয়েছেন, নিরন্তর পথ চলেছেন এবং বিভিন্ন মানুষজনের কাছ থেকে পথের হদিশ খুঁজে পেতে চেয়েছেন। গুরুভাইদের চিঠি লিখে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। পরিশেষে দক্ষিণ ভারতের যুবকদের রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে সংগঠিত করেছেন এবং কন্যাকুমারিকায় শিলাখণ্ডে বসে তিন দিন তিন রাত অনশনে ধ্যানস্থ অবস্থায় অতিবাহিতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের উত্তরণের পথটি অন্বেষণ করেছেন। কারণ ভারতবর্ষ ছিল তাঁর 'যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী'। তিনি ভারত-প্রব্রজ্যার কালেই যে পদধূলি নিয়ে রাজার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছেন, দেখেছেন চূড়ান্ত বৈভব, বিলাসিতা আর বিপুল ঐশ্বর্য, বুঝেছেন — এ সবই সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচারের সূত্রে সংগৃহীত অর্থে অর্জিত। আবার সেই পদধূলি নিয়ে, তিনি পৌঁছেছেন দরিদ্রের পর্ণকুটিরে। দেখেছেন 'চলমান শ্মশান'

কাতর নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের। আর তাই ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে সোচ্চারে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঐ রাজা-রাজড়া, অভিজাত-বিত্তবান মানুষদের উদ্দেশে, 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও', একই সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন,—'নূতন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'[১] বিবেকানন্দই প্রথম ভারতবাসী যিনি সোচ্চারে ঐ পিছিয়ে পড়া, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের নেতৃত্বে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের কথা ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁর মুখ থেকে সোচ্চারে ঘোষিত হল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখনিতে সাম্যবাদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দই প্রথম সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের নিটোল রূপটি ভারতবর্ষের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের জন্য এত কান্না বিবেকানন্দের মতো আর কেউ কাঁদেননি, ভারতবর্ষের জন্য এত ভাবনা বিবেকানন্দের মত আর কেউ ভাবেননি। বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে ভারতবর্ষ নামটি একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাইতো শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন,—'বিবেকানন্দ ভারত আত্মার প্রতীক', আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জেনেভায় ফরাসী নোবেল লরিয়েট রোমা রোলাঁর[২] দেখা হবার পর, রোমা রোলাঁ যখন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে চেয়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানিয়েছেন 'Study Vivekananda', অর্থাৎ বিবেকানন্দকে পড়ুন, বিবেকানন্দকে চিনুন, বিবেকানন্দকে জানুন তাহলেই ভারতবর্ষকে বুঝতে, চিনতে ও জানতে পারবেন।

বিবেকানন্দ একদিকে ভারতবর্ষের শাশ্বত ধর্ম-দর্শন সঞ্জাত চিন্তারাজি পাশ্চাত্যের মানুষজনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষের অজ্ঞ-কাতর-নিপীড়িত মানুষদের উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। দীর্ঘ প্রায় চার বছর আমেরিকা এবং ইউরোপ পরিক্রমা করে তিনি ভারতবর্ষের শাশ্বত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের সত্য রূপটি তুলে ধরেছেন। আর এদেশের মানুষের উন্নতির কথা প্রতি মুহূর্তে ভেবেছেন। সেই ভাবনার সূত্রে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিকে ভারতবর্ষের মানুষদের স্বনির্ভর উন্নতির জন্য এগিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শিল্পপতি

জামশেদজী টাটাকে শিল্প প্রতিষ্ঠাব জন্য পবামর্শ দিয়েছেন। আবাব পাশ্চাত্য থেকে সতীর্থদেব এবং ভক্ত-অনুবাগীদের চিঠি লিখে অজ্ঞ-কাতব-নিপীড়িত মানুষদেব উন্নতি কল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়াবী[৩] পাশ্চাত্য জয় করে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখে বিবেকানন্দ দক্ষিণ ভারতের যুবকদের পবাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সংগঠিত হয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেবার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে, 'পবহিতায় জীবনপাত' অর্থাৎ ঐ অজ্ঞ-কাতব মানুষদেব উন্নতির জন্য সার্বিকভাবে সচেষ্ট হবার নির্দেশ দিযেছেন। কলম্বো থেকে আলমোড়া এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উষ্ণ সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন পেয়েছেন। আর সম্বর্ধনা ও অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ পঁচিশটি বক্তৃতা করেছেন—সেখানে উঠে এসেছে চারটি প্রধান নির্দেশ—ক) পবাধীন ভারতবর্ষকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত কবা। খ) শিবজ্ঞানে জীবসেবার মানসিকতা নিযে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ঐ অজ্ঞ-কাতর মানুষদের সেবায় আত্মনিয়োগ কবা এবং তাদের সমাজেব মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত কবা। গ) বেদান্ত কেন্দ্রিক ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যবাহী ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ঘ) 'মান' ও 'হুঁশ' নিয়ে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠা, চবিত্র গঠন করা ও আদর্শ জীবন উপহার দেওয়া।

এই চাবটি কাজেব বাস্তবায়নের জন্য তিনি গুরুত্ব আবোপ করেছিলেন শিক্ষার উপর; কেননা, তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, 'আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা-শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া হল শিক্ষা'। মানুষ যে অমৃতের সন্তান—এই উপলব্ধি আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে বৈদিক ঋষিবা উচ্চারণ কবেছিলেন, তা শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে অনন্ত শক্তি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিরাজ করছেন দেবতা। তাই প্রত্যেক মানুষ-মানুষী অমৃতের অধিকারী। এই চরম সত্যটিকে জানবাব জন্য প্রয়োজন সার্বিক শিক্ষা। সেই শিক্ষার মধ্য দিয়েই আসবে আত্মসচেতনতা, আর সচেতনার মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মতত্ত্ব, আত্মশক্তি ও আত্মজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবে এবং হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী। মানবিকতার প্রত্যয়ে জীবনে জীবন যোগ করার অভীপ্সাটি তীব্রভাবে জাগরিত হবে। আর তা থেকেই পৃথিবী হবে শোষণ-দূষণ মুক্ত। সকল মানুষই শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবে, আত্মার সঙ্গে আত্মার সংযুক্তিতে

পরমাত্মার হদিশ মিলবে। তাই 'জীবে জীবে তাঁর অধিষ্ঠান'—এই অনুভবের সূত্রে হিংসা, রিরংসা, আগ্রাসী মনোভাব, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, লোভ-লালসা দূরীভূত হবে। মানুষ যথার্থ অর্থে দেবতা হয়ে উঠবে।

পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসবার পর স্বামী বিবেকানন্দ অভিনন্দন, সম্বর্ধনা ও বক্তৃতাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর গুরুদেব অর্পিত 'মহাব্রত' পালনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন আর 'আনুষ্ঠানিক' ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ব্রত-উদ্দেশ্য-কার্যাবলী এর আগে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি—

ক) বিবেকানন্দ শাশ্বত ধর্ম-দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে আদর্শ জীবন ও চরিত্র গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

খ) বহির্ভারতের মানুষের কাছে ভারতবর্ষের এই শাশ্বত বাণী পৌঁছে দেবার জন্য উদ্যোগী হবার কথা বলেছেন।

গ) শিবজ্ঞানে জীবসেবাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, জীবিকানির্বাহ, স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে জীবনের মান উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘ) অনগ্রসর মানুষদের জীবনের তমোনিশা দূর করে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের সামনে এগিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতীয় জনজীবনে বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শে রামকৃষ্ণ মিশন বিগত একশ বছরে শিক্ষা-প্রসারে যে ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছে এবং সাফল্য অর্জন করেছে সে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনায় ব্রতী হব। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে আমরা প্রধানত জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে, দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে বিশেষত গ্রামীণ মানুষজনের মধ্যে আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তুলতে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে, প্রতিকূল পরিবেশে অর্থাৎ বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্গত মানুষদের পাশে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ, উপজাতি-আদিবাসী এবং অনগ্রসর মানুষদের উন্নতির জন্য নানা প্রয়াস, সর্বোপরি সকল স্তরের মানুষ-মানুষীদের শারীরিক দিক থেকে সুস্থ-সবল থাকার জন্য ব্যাপক প্রয়াস অর্থাৎ অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমরা আলোচনায় মেতে উঠব।

॥২॥

স্বাস্থ্য-পরিষেবা :

বিবেকানন্দ যুবকদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'গীতা পাঠের থেকে ফুটবল খেলা অনেক বেশী জরুরী।' এর মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ যে কথাটি আসলে বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকলে তবেই অন্যান্য সদর্থক কর্ম এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হয়ে আত্মজ্ঞানলাভ সম্ভব। আর এই শারীরিক সুস্থতা আসতে পারে ফুটবল খেলার মত ব্যাপক শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে। সুস্থ শরীর একান্ত ভাবেই কাম্য। কিন্তু বিভিন্ন বয়সের অর্থাৎ শিশু থেকে বৃদ্ধ সকল বয়সের মানুষ-মানুষী কোন না কোন অসুখের শিকার হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন তাদের সীমায়িত সাধ্যের মধ্যে শারীরিক দিক থেকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস চালান। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়গুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর রোগমুক্ত হন। সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরে যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এটা হয়ে থাকে তা বলা যাবে না। সততা, নিঃস্বার্থ-সেবার পরিপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে এই হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলি পরিচালিত হলেও মানুষের জীবনের ছেদ যেখানে চিহ্নিত হয়ে আছে সেখানেই তার জীবনাবসান ঘটে। সে ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, চিকিৎসকবৃন্দ, সেবিকা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে সংযুক্ত অন্যান্য সকলের পক্ষে অন্তরদেবতার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মানুষের জীবনের দীপটি নিভে গেলেও গীতোক্ত বাণী অনুযায়ী এই পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয় বটে, কিন্তু অন্তর্স্থিত আত্মা—তার তো কোন মৃত্যু নেই, লয় নেই, ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই, সে আত্মা তো পরমাত্মারই অংশ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতাবস্থাতেই বারাণসী অর্থাৎ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'Ramakrishna Mission Home of Service'—কেন্দ্রটি ১৯০২-এ রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী শুভানন্দ এবং তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিবেকানন্দ-অনুরাগী যুবকবৃন্দ।

প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে একটি ধারণা বদ্ধমূল যে, কাশীতে মৃত্যু হলে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করতে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীমা সারদাদেবী এই ধারণাটিকে সত্যের প্রখর প্রভায় পৌঁছে দিয়েছেন।

তাই আমরা দেখতে পাই, একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীরা কাশীতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করতে যান, পুণ্যসলিলা গঙ্গায় অবগাহন করেন—সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান, কাশীবাসের মধ্য দিয়েই যেন তাঁদের প্রাণত্যাগ হয়। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা উপন্যাস ও গল্পের পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা দেখবো অধিকাংশ নরনারী শেষ বয়সে কাশীবাসী হয়েছে মহামুক্তির অভীপ্সা নিয়ে। সাহিত্য তো বাস্তবেরই দর্পণ। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাই 'বার্ধক্যে বারাণসী'—এই প্রবাদটি সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। আমরা দেখতে পাই, সারা ভারতবর্ষ থেকে পুণ্যার্থীরা পুণ্যতীর্থ কাশীতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করতে আসেন। তবে সকলেই যে প্রাণত্যাগ বা মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাশীতে আসেন—তা নয়।

এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি, আগত পুণ্যার্থীদের এবং বার্ধক্যে কাশীতে বসবাসকারী মানুষ-মানুষীদের চিকিৎসার জন্যে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল একটি ঘটনা। তাইতো এই কেন্দ্রটিতে ভারতবর্ষ এবং বহির্ভারতের বহু মনীষীরা এসেছেন এবং শিব সন্দর্শনে আসা সচল শিবদের অসুস্থ হওয়ার পর তাদের শিবজ্ঞানে সেবা করার অনন্য প্রয়াসটি লক্ষ্য করে অভিভূত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম হাসপাতাল এটি। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ২৩০টি শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে ১০০টি শয্যা সংরক্ষিত দুঃস্থ মানুষদের জন্য। তাদের এখানে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করার জন্য কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। হাসপাতালের নিজস্ব অপারেশন থিয়েটার আছে। প্রতি আর্থিক বছরে প্রায় ৭,০০০-এর বেশি মানুষ-মানুষী এই হাসপাতালে নানা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। চক্ষু অপারেশনের জন্য আছে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই হাসপাতালেই আছে একটি বিশাল বহির্বিভাগ। বহির্বিভাগে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দু' ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই বহির্বিভাগে সাধারণ রোগীদের জন্য চোখ, দাঁত, নাক-কান-গলার চিকিৎসা, এক্সরে, ইলেকট্রোথেরাপি এবং কার্ডিওলজির ব্যবস্থা আছে। বহির্বিভাগে বছরে গড়ে ৭৭,০০০-এরও বেশি মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান স্বল্পমূল্যে কখনওবা বিনামূল্যে। হাসপাতালে নিজস্ব প্যাথোলজি ল্যাবেরেটরি আছে, আছে সার্জিক্যাল ইউনিট। আর আছে হৃদরোগ নির্ণয়ের জন্য ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফের ব্যবস্থা। শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি

১৯৯৫-এর এপ্রিল থেকে ১৯৯৬-এর মার্চ মাস পর্যন্ত আর্থিক বছরে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির সুযোগ পেয়েছেন ৬৭,৮৪৪ জন, এক্সরে করার সুযোগ পেয়েছেন ১০,৬৩১ জন, সারজিক্যাল ইউনিটে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ২,৭০১ জন এবং ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফ করার সুযোগ পেয়েছেন ১,৫৬৬ জন। বিশাল জায়গা নিয়ে এই হাসপাতাল অবস্থিত। আগত পুণ্যার্থী, বার্ধক্যে উপনীত মানুষ-মানুষী এবং স্থানীয় জনসাধারণ এই হাসপাতাল থেকে অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে বিখ্যাত জার্মান পর্যটক দার্শনিক ও লেখক কাউন্ট কাইজারলিঙের অভিমতটির দিকে আমরা দৃষ্টি দিতে পারি আরো একবার—'মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যাঁরা পুণ্যভূমি বারাণসীতে আসেন তাঁরা অধিকাংশ সেবা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত নন—সেবাশ্রমের কর্মীরা আতুর অসমর্থদের সন্ধান করে তুলে নিয়ে আসেন। কোন হাসপাতালে এমন উৎফুল্ল সেবক-সেবিকাদের বিপুল ভালোবাসা অপূর্ব। তাঁরা সত্য সত্যই উদ্দীপিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুগামী পরিচালকমণ্ডলী। ভালোবাসায় পূর্ণ এবং সহজ বুদ্ধি সম্পন্ন—মোটেই ধর্মান্ধ বা অযথা জেদী নন—মানব বন্ধুর যা হওয়া উচিত তাঁরা ঠিক তাই'।[৪]

অবিমুক্ত বারাণসী বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রস্থল। এখানেই শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্বরূপ প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। আর আজ এখানেই লক্ষ লক্ষ নরনারী অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের পূজার্চনা করে বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ মূর্তি স্বরূপ জীবগণ যে অনাথ-অনাথা, অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রূপ ধারণ করেছে, তাদেরই সেবায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর দরিদ্র দুঃখ প্রতিকার সমিতি নামে যে সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে সেই সংস্থাই ১৯০২-এ রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র রূপে 'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব্ সার্ভিসে' রূপান্তরিত হয়। এই কেন্দ্রটিতে আছে দুটি বার্ধক্য নিবাস—একটি মহিলাদের এবং অপরটি পুরুষদের জন্য। ৩৬ জন মহিলা এবং ৩৫ জন পুরুষ এই বার্ধক্য নিবাসে থাকার সুযোগ পান। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত-সন্ন্যাসীদের জন্যও আছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাধু-নিবাস। সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী অবসরকালীন জীবনযাপন করেন। সর্বোপরি, আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল মানুষ-মানুষীদের প্রতিবছর গড়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য বাবদ হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর দুঃস্থ মানুষদের নববস্ত্র পরিধানের সুযোগ করে দেয় এই কেন্দ্রটি, তার জন্য ব্যয় হয় বছরে প্রায় পনেরো হাজার টাকা। রামকৃষ্ণ মিশনের এই

কেন্দ্রটি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার এক সময়ের সম্পাদক বিহারীলাল সরকার ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করে যে কথাটি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, তা আমরা বারবার উচ্চারণ করতে পারি,—'তীর্থযাত্রী যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের প্রথম কর্তব্য শিব ও অন্নপূর্ণা পূজা করা। কিন্তু যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের কোন সেবা করতে পারেন না অন্তত এটিকে দর্শন করে যেতে পারেন না, তাঁরা আর একটি কর্তব্যহানি দোষে দুষ্ট হবেন এবং তাঁদের সেই শৈথিল্য অনুতাপের কারণ হওয়া উচিত।'

এরপরেই হাসপাতাল কেন্দ্রিক রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্রটির কথা আমাদের উল্লেখ করতে হবে, তা হল, হরিদ্বারের কন্‌খল-এ অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। তখন স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আগের বছরটিতে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য থেকে ঘুরে আসার পর স্বামীজী কল্যাণানন্দকে ডেকে এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তিনি হিমালয় পরিভ্রমণের সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে, হিমালয় পর্বতের পাদদেশে এবং হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত তীর্থস্থান আছে সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেন। কিন্তু তাঁদের আহারের যেমন কোন ব্যবস্থা নেই, তেমনি নেই রোগাক্রান্ত হলে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা। তাই বিবেকানন্দ প্রধানত পরিভ্রমণরত সাধু-সন্ন্যাসীদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দকে। বিবেকানন্দ মনে করতেন, সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। সংসারী জীবনকে ভালবাসে, কিন্তু সন্ন্যাসী ভালবাসবে মৃত্যুকে। সন্ন্যাসীর অঙ্গের গৈরিক বসন তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুশয্যা। সেই কথা স্মরণ করিয়ে কল্যাণানন্দকে ডেকে বিবেকানন্দ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,—হৃষিকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলে অসুস্থ সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য স্থায়ীভাবে সেবাকাজে উদ্যোগী হতে। কল্যাণানন্দ গুরুবাক্যকে শিরোধার্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার জন্য। বিবেকানন্দ ভারত প্রব্রজ্যার কালে বিশেষত হিমালয় পরিভ্রমণের সময় বারবার মৃত্যুর মুখে পড়েছিলেন, অসুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ললাট লিখনে, গুরুর আশীর্বাদে আবার সুস্থও হয়েছেন। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় পথেঘাটে অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীদের মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তি তিনি বার বার শুনেছেন। তাই ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের চিরতীর্থ হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের প্রবেশপথ

হরিদ্বার-হৃষিকেশে পাঠিয়েছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দকে। স্বামী কল্যাণানন্দ বর্তমান কন্‌খল্‌ রামকৃষ্ণ মিশনের কাছেই নির্বাণি আখড়ার দুটি ঘর তিন টাকায় ভাড়া নিয়ে সেবাশ্রমের কাজ শুরু করেছিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সহযোগী হিসাবে ছিলেন। তিনি হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশে প্রতিদিন হেঁটে গিয়ে অসুস্থ সাধু-সন্ন্যাসীদের চিকিৎসা করতেন। তাঁর সঙ্গে থাকত চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম সহ একটি ব্যাগ। সেদিনের সেই দুটি ঘরে যে সেবাযজ্ঞের সূত্রপাত হয়েছিল তাই আজ বিশাল মহীরুহে পরিণত। আর নিশ্চয়ানন্দ পায়ে হেঁটে যে কঠিন তপশ্চর্যায় ব্রতী হয়েছিলেন আজ তা ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, আধুনিক জীবনের সম্প্রসারণে। এই হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে আছে ১২২টি শয্যা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বছরে গড়ে প্রায় ৩,৫০০ জন পুণ্যার্থী, সাধু-সন্ন্যাসী ও স্থানীয় মানুষ অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পান। এর মধ্যে শল্য চিকিৎসার রোগীর সংখ্যা গড়ে এক হাজার। শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৯৫—১৯৯৬ আর্থিক বছরে ৩,৬৪৫ জন অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া শল্য চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন ১,০১১ জন। বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১,৮৯,১৮৫ জন। এর মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৩৮,৭৪৭ জন। শল্য চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ২২,১২০ জন। এক্সরের সুযোগ পেয়েছেন ৮,৯৯০ জন, আলট্রা সোনোগ্রাফির সুযোগ পেয়েছেন ১,১২২ জন। এছাড়া ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১৯,৯৩৮ জন। এর মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৬,৭২৮ জন। এই কেন্দ্রে নিসর্গ প্রকৃতির শ্যামলিমায় আচ্ছাদিত মঠের একটি শাখা সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারই অন্তর্গত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি সুদৃশ্য মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিদিন পুজো ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। তীর্থযাত্রীদের থাকবার জন্য আছে একটি অতিথি নিবাসও। বৃদ্ধ অবসর প্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য আছে বিশেষ ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের আর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বৃন্দাবন। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত মথুরা জেলার বৃন্দাবনে আছে হাসপাতাল কেন্দ্রিক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটির অধীনস্থ হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে ১২১টি শয্যা আছে। সেখানে মেডিসিন, সার্জিক্যাল, চক্ষু, ই.এন.টি., ডেন্টাল, ফিজিওথেরাপী, গাইনিকলজি, অর্থপেডিক, রেডিওলজি এবং প্যাথোলজি বিভাগ আছে। বিগত আর্থিক

বছরে সার্জিক্যাল বা শল্য বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগে ৯,০৬৪ জন ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছেন এবং সার্জিক্যাল বিভাগে ২,৬০১ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। বহির্বিভাগে আছে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র। এই দুটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিগত আর্থিক বছরে ৪,৫৫,৬৯১ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৯৩,২৩৪ জন। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১২,০০৪ জন, হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসার জন্য এই কেন্দ্রে আছে নিজস্ব একটি গোশালা এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট খামার। এছাড়া দুঃস্থ মানুষদের সেবার জন্য বিভিন্ন সময়ে খাদ্য ও বস্ত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে প্রধানত হাসপাতালকেন্দ্রিক এই কেন্দ্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে কাশী ও হরিদ্বারের মতো আগত পুণ্যার্থী, সাধু-সন্ন্যাসী এবং আঞ্চলিক অধিবাসীরা আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। এটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রে আছে বিবেকানন্দ পলিক্লিনিক। সেখানে আছে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ। গত আর্থিক বছরে ৭,০৫৬ জন অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। বহির্বিভাগের চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৬৩,৮৯৮ জন। এর মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৭০,০২৪ জন। এখানে সর্বসমেত ২২টি বিভাগ আছে। সেগুলি হল মেডিসিন, সার্জারী, ই.এন.টি., ডিসেন্ট্রি, অফথালমোলজি, প্যাথলজি, রেডিওলজি. ফিজিক্যাল মেডিসিন, গাইনিকলজি, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইত্যাদি। এছাড়া আছে একই সঙ্গে হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুযোগ। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বিগত আর্থিক বছরে ১,৩০,৯৮৯ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ১৮,৮৪৬ জন। লক্ষ্ণৌ একটি ঐতিহাসিক শহর। এই শহরে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। রামকৃষ্ণ মিশন তার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রেখে নিরলসভাবে যে কাজ করে চলেছে তার অন্যতম নজির এই কেন্দ্রটি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা মহানগরীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সর্ববৃহৎ হাসপাতালটি অবস্থিত। এই কেন্দ্রটির নাম 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান'। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে প্রসূতি বিভাগ এবং শিশু বিভাগই ছিল প্রধান। পরবর্তীকালে অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম

বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল রূপে এর প্রসার ঘটে। প্রথম অবস্থার এই কেন্দ্রটির নাম ছিল 'শিশুমঙ্গল'। বর্তমানে কলকাতার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল রূপে এটি চিহ্নিত। এই হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জিক্যাল, পেড্রিয়াট্রিক, ডার্মাটোলজি, রেডিওলজি, গাইনিকলজি, চক্ষু, ইন.এন.টি., অর্থপেডিক, ডেন্টাল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইত্যাদি নানা বিভাগ আছে। অন্তর্বিভাগে আছে ৫৫০টি শয্যা, আর আছে ৪টি প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক, দশটি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, একটি ডায়ালেসিস ইউনিট, একটি স্ক্যানিং ইউনিট, ছ'টি এক্সরে ইউনিট, একটি ডিপ এক্সরে থেরাপি ইউনিট, একটি ফিজিওথেরাপি ইউনিট, একটি ইলেকট্রিক লন্ড্রি প্ল্যান্ট, একটি স্যালাইন প্রোডাকসন ইউনিট ইত্যাদি। গত আর্থিক বছরে ১৬,৫১২ জন অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ৫০৪ জন চিকিৎসারত অবস্থায় অন্তর্বিভাগে ভর্তি ছিলেন। ৩,৯৭৬ টি বড় মাপের অপারেশন এবং ৩,১১১টি ছোট মাপের অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে গত আর্থিক বছরে। বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ২,৬৮,৬৬৭ জন। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে কলকাতা সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকায় ৪২,৮১২ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরের হাসপাতাল কেন্দ্রিক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই হাসপাতালে প্রধানত উপজাতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ১৬০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে আছে তিনটি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার। এই হাসপাতালে জেনারেল মেডিসিন, সার্জিক্যাল, পেড্রিয়াট্রিক, ফিজিওথেরাপি, গাইনিকলজি, ই.এন.টি., ডেন্টাল, আলট্রা সোনোগ্রাফি, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযুক্তিকরণ বিভাগ ইত্যাদি আছে। গত আর্থিক বছরে অন্তর্বিভাগে ৬,২২১ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। বহির্বিভাগে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রে ১,৪৮,৫৯০ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন; তার মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৫২,৭৮৯ জন।

বিহারের রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশন টিউবারকিউলিসেস স্যানিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২টি শয্যা নিয়ে। বর্তমানে সেই শয্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮০টি। যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা এখানে আছে। খোলামেলা পরিবেশে বিস্তৃত পরিসরের ভূখণ্ডে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। এখানকার জল-হাওয়া রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। গত আর্থিক

বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা জানতে পারছি অন্তর্বিভাগে ৫১৫ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন, তার মধ্যে ৩৮৩ জন নতুন রোগী। যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসা ও নিরাময় বিশেষ সময় সাপেক্ষ, সেই সূত্রে নিরাময়ের পর ৩৬৭ জন মুক্তি পেয়েছেন। এই রোগীদের মধ্যে ১৪৮ জন বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন এবং ২০২ জন স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসা বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষও বটে। বহির্বিভাগের ২১,১০৫ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৫৯৯ জন। এখানে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। সেখানে ৫,৭৭১ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ২,০৯৫ জন। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১১,৪৪০ জন। এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য সেবা কাজ হল, গত আর্থিক বছরে আদিবাসী জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে ৫,৩১১টি নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের শিল্পনগরী কানপুরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। বেলুড় মঠের অনুমোদন পায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে বহির্বিভাগীয় এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। প্রতি বছর গড়ে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ এই চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার নারায়ণপুরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত উপজাতি মানুষদের কল্যাণার্থে। প্রধানত তাদেরই চিকিৎসার জন্য এখানে অন্তর্বিভাগে ৩০টি শয্যাবিশিষ্ট 'বিবেকানন্দ আরোগ্য ধাম'-নামে একটি হাসপাতাল আছে। গড়ে বছরে প্রায় ২,০০০ মানুষ-মানুষী এই অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পান এবং বহির্বিভাগে প্রতিবছর ১৬ হাজারেরও বেশি মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। আর ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে সুযোগ পান গড়ে প্রায় সাড়ে ন' হাজার মানুষ।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি ও স্বল্পমূল্যে চিকিৎসালয়গুলি ভারতবর্ষের আর যে যে কেন্দ্রে বর্তমান তা হল — রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম কেন্দ্র তামিলনাড়ুর মাদুরাই, চেঙ্গেলপাট্টু, কোয়েম্বাটুর, সালেম, নাট্টারামপল্লী, বিহারের পাটনা, রাঁচি, দেওঘর, জামশেদপুর, মোরাবাদি, জামতাড়ায়, পশ্চিমবঙ্গের বেলুড়, নরেন্দ্রপুর, সারগাছি, মনসাদ্বীপ, রহড়া, শিকড়া কুলীনগ্রাম, মালদা, মেদিনীপুর, তমলুক, বাঁকুড়া, কাঁথি, গড়বেতা, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, আঁটপুর, বারাসাত, সরিষা, টাকী, বড়িশা, চণ্ডীপুর, ইছাপুর, বরাহনগর এবং জলপাইগুড়িতে; আসামের

শিলচর, গৌহাটিতে, অন্ধ্রপ্রদেশেব বিশাখাপত্তনম, হায়দ্রাবাদ, রাজমহেন্দ্রীতে, চণ্ডীগড়ে, বাজস্থানেব খেতড়ি, জয়পুরে; গুজরাটের রাজকোট, লিমডিতে; ওড়িশাব ভুবনেশ্বর, পুবীতে (মঠ ও মিশন)। নতুন দিল্লীতে, মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে, মেঘালয়ের শিলং-এ, ত্রিপুবার বিবেকনগরে, অরুণাচল প্রদেশের নবোত্তমনগব, আলং-এ, উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ, শ্যামলাতালে দুটি কেন্দ্রে, দেরাদুনের কিষাণপুরে, কর্ণাটকের পোন্নামপেট, মহারাষ্ট্রের মুম্বই, পুনে, নাগপুবে; কেরালার তিরুবন্তপুরম্, কোঝিকোড় ও কালাডিতে।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ে হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি দুটি বিভাগেই দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গত আর্থিক বছরে এখানে চিকিৎসাব সুযোগ পেয়েছেন ৪,৮০,৭৯১ জন। এখানে দাঁত, চোখ, কান, নাক, চর্ম, রেডিওলজি, প্যাথোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি এবং আকুপাংচারের মাধ্যমে চিকিৎসাব ব্যবস্থা আছে। ববাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে তিন হাজাব বোগী চিকিৎসার সুযোগ পান। মনসাদ্বীপে অবস্থিত দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালযে বছবে গড়ে প্রায় ৭০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া মাঝে দুবার স্বাস্থ্য শিবিব অনুষ্ঠিত হয় সাগব দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে কলকাতা বোটাবী ক্লাবের সহযোগিতায়। বিগত আর্থিক বছরে এই স্বাস্থ্য শিবিরের সহযোগিতায় চিকিৎসার সুযোগ পায় ৯৯৯ জন। নরেন্দ্রপুরে স্বল্পমূল্যে এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়েব মাধ্যমে গত আর্থিক বছবের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৯৩,৮০৭ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। রহড়ায় দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ে গত আর্থিক বছবে চিকিৎসাব সুযোগ পেয়েছেন ১৩,৮৮৬ জন, সারগাছিতে দাতব্য হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ে বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে ন' হাজার মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। সরিষায় রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতার বামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে এবং নিজস্ব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ে গড়ে বছরে প্রায় ১,৫০০ মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান। জলপাইগুড়িতে স্বল্পমূল্যে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ে বছরে গড়ে প্রায় ৮,০০০ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। শিকড়া-কুলীনগ্রামে স্বল্পমূল্যে এলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ পান বছরে প্রায় ২০০ মানুষ। মালদা কেন্দ্রে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে চিকিৎসায় উপকৃত ৪,৭২০ জন মানুষ-মানুষী। মেদিনীপুরে দাতব্য এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গড়ে প্রায় ২৩,০০০ মানুষ বিনামূল্যে বছরে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

তমলুকে গত আর্থিক বছরে ২৮,৯৮৮ জন হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি দুটি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। বাঁকুড়ায় দুটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পান বছরে গড়ে ২৩,০০০ মানুষ, কাঁথিতে হোমিওপ্যাথি বিভাগের মাধ্যমে বছরে সুযোগ পান ২,৪০০ জন, গড়বেতায় গত আর্থিক বছরে ১৮,৪৮০ জন দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া এখানে গত আর্থিক বছরে ২৫ জন রোগীর চক্ষু অপারেশন হয়েছে এবং বিনামূল্যে তাদের চশমা দেওয়া হয়েছে। জয়রামবাটিতে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে জয়রামবাটি ও উপশাখা কেন্দ্র কোয়ালপাড়ায় বছরে গড়ে ৫৯,৫৭৯ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। কামারপুকুরে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১০,৫০০ মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান। আঁটপুরে দাতব্য এলোপ্যাথি সহ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ে গত আর্থিক বছরে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১১,২১০ জন আর ৬৬ জন রোগী বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশনের সুযোগ পেয়েছেন এবং চশমাও পেয়েছেন বিনামূল্যে। প্রতিবছরই এখানে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বড়িশা দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে ৩,০০০ মানুষ-মানুষী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। চণ্ডীপুরে গড়ে এই সংখ্যা প্রায় ২,৩৫০ জন। ময়াল-ইছাপুরে গত আর্থিক বছরে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৫,৯১৮ জন। এছাড়া এলোপ্যাথি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৭৫৯ জন।

বিহারের জামশেদপুরে সপ্তাহে একবার দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বিনামূল্যে দুঃস্থ ১,০০০ জন মানুষ বছরে চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া দুটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে সিংভূম জেলার দূর-দূরান্তের মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান বছরে ৮,০০০ জন। পাটনায় দাতব্য হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি—দুটি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে প্রায় ১৮,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া আছে একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়। অর মাধ্যমে বছরে গড়ে প্রায় ৭,৫০০ মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান। রাঁচির মোরাবাদিতে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৩,০০০ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। জামতাড়ায় দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে ১১,১৫৪ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

তামিলনাড়ুর চেঙ্গেলপট্টুতে অবস্থিত এলোপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রে গত আর্থিক বছরে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৮৫,৫২৪ জন। কোয়েম্বাটুরে একটি গ্রামীণ এলোপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। সেখানে গত আর্থিক বছরে ৩,৫২০ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। সালেমের দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ে (দন্ত চিকিৎসা বিভাগ সহ) বছরে প্রায় ৫,৫০০ জন মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে- থাকেন। মাদুরাই থেকে চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত বছরে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৩,৫২৭ জন। নাট্টারামপল্লীতে দাতব্য এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলে ১৩,১৮৯ জন গ্রামবাসী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্বল্পমূল্যে ৬১৮ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া দুটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে দূর-দূরান্তরের গ্রামের মানুষেরা এলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন গত আর্থিক বছরে—৮৭,৪৬১ জন। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত বিবেকানন্দ হেলথ্ সেন্টারে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুটি বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বছরে গড়ে ৪২,০০০ মানুষ এই দুটি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। রাজমাহেন্দ্রীতে দাতব্য এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি সংযুক্ত দুটি চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৭৬,৯৮০ জন। এছাড়া একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে ১,১৭,৩৪০ জন উপজাতি শ্রেণীর মানুষ গত আর্থিক বছরে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া ৪টি স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজাতি প্রধান এলাকায়। সেখানে ৮১৪ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। চণ্ডীগড়ে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গড়ে ২,৩০০ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

আসামের গৌহাটি কেন্দ্রে আছে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিভাগ। এই বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা পরীক্ষার এবং সঠিক রোগ নির্ণয়ের সুযোগ পেয়েছেন ৮,৭৩৮ জন গত আর্থিক বছরে। আর ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১৬,৫০০ জন মানুষ স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। শিলচর কেন্দ্রে ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে ৪২,১২৩ জন স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

শিলং কেন্দ্রে দাতব্য এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি সংযুক্ত চিকিৎসালয়ে প্যাথোলজি, এক্সরে ও অপথালমোলজি বিভাগ সহ বছরে গড়ে প্রায় ১৭,৫০০ জন মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া ভ্রাম্যমান

চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে শিলং সংলগ্ন ৫২টি গ্রামের ৩৬,৬৭৩ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন গত আর্থিক বছরে।

ত্রিপুরায় অবস্থিত বিবেকনগর কেন্দ্রে প্রতি রবিবার চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন হয়। এর মধ্যে গত আর্থিক বছরে ৩,৪৪৬ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এই কেন্দ্রের অধীন আগরতলাস্থিত উপকেন্দ্রে দাতব্য এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি সংযুক্ত চিকিৎসালয়ে গত আর্থিক বছরে ১৮,৯৬৭ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

অরুণাচল প্রদেশের নরোত্তমনগর কেন্দ্রে এলোপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বছরে গড়ে ৪,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। আর ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে ২,৩৪৪ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। আলং-এর উপজাতি প্রধান এলাকায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে ২৪,৮১৩ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অবস্থিত কেন্দ্রে একটি দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। এর মাধ্যমে বছরে গড়ে প্রায় ১০,০০০ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র আছে যার মাধ্যমে গ্রামের প্রায় ১,৫০০ জন মানুষ বছরে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। পুরীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রে একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় আছে, যার মাধ্যমে বছরে প্রায় গড়ে ৬,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্যশিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্যশিবিরে গত আর্থিক বছরে ৮৭৩ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। পুরীতে অবস্থিত আর একটি কেন্দ্রের মাধ্যমে সমুদ্রতীরবর্তী মৎস্যজীবী মানুষদের উপনিবেশে দাঁত ও সাধারণ চিকিৎসার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গত আর্থিক বছরে ৩,৫৭৫ জন এই শিবিরের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

নতুন দিল্লী কেন্দ্রে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বছরে প্রায় ৪,৪৫০ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া আছে করোলবাগে বিনাব্যয়ে যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই চিকিৎসালয়ে বছরে ৪,০০০ যক্ষ্মা রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয় স্বাস্থ্যজনিত সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বিভাগ। এই বিভাগের সঙ্গে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীর বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা যুক্ত। গত আর্থিক বছরে ৫১,২৫০ জন রোগী এই বিভাগের মাধ্যমে সঠিক রোগ নির্ণয়ের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন।

উত্তবপ্রদেশেব এলাহাবাদে একটি দাতব্য এলোপ্যাথি ও তৎসংযুক্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয আছে। সেখানে বিনামূল্যে প্যাথোলজি ও ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম চিকিৎসাব ব্যবস্থা আছে। এই চিকিৎসালয়েব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেবা অবৈতনিকভাবে বোগীদেব চিকিৎসা কবে থাকেন। বছবে গড়ে ২৭,০০০ জন মানুষ এই কেন্দ্রে চিকিৎসাব সুযোগ পান। শ্যামলাতাল কেন্দ্রেব অন্তর্বিভাগে ১৫টি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। আব আছে বহির্বিভাগ। এই দুটি বিভাগেব মাধ্যমে বিনামূল্যে গডে প্রায ৬,৫০০ জন মানুষ চিকিৎসাব সুযোগ পান। দেবাদুনে কিষাণপুবেব এলোপ্যাথি সংযুক্ত হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালযে বছযে গডে প্রায ৩,০০০ হাজাব মানুষ চিকিৎসাব সুযোগ পান।

গুজবাটে লিমডিতে একটি দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয আছে। এখানে গত আর্থিক বছবে ২৬,৫৬৮ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেয়েছেন। এছাডা তিনটি স্বাস্থ্য শিবিব-এব আযোজন কবা হযেছে। ১,৯৪৬ জন বোগী সেখানে চিকিৎসাব সুযোগ পেযেছেন। বাজকোটে দাতব্য আযুর্বেদিক সংযুক্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালযে বছবে গডে ৪,৫০০ জন মানুষ চিকিৎসাব সুযোগ পান।

মধ্যপ্রদেশেব বায়পুবে একটি দাতব্য এলোপ্যাথি সংযুক্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। এখানে এক্সবে, ডেন্টাল, চক্ষু, ই.এন.টি., অর্থপেডিক, গাইনিকলজি, পেড্রিযাটিকস, ফিজিযোলজি ও প্যাথোলজিক্যাল ল্যাববেটবী আছে। বছবে প্রায় ২২,৫০০ মানুষ চিকিৎসাব সুযোগ পান।

বাজস্থানেব জযপুবে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয আছে। এখানে স্বল্পমূল্যে গত আর্থিক বছবে ৫,৫০০ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেযেছেন। খেতডিতে অবস্থিত কেন্দ্রটিতে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালযে গত আর্থিক বছবে ৩২৭ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেযেছিল।

কর্ণাটকেব পোনামপেটে এলোপ্যাথি চিকিৎসালযে গত আর্থিক বছবে ৮,০৫৬ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেযেছেন। এছাডা শিশুদেব জন্য আয়োজিত শিবিবে ২৫৩ জন শিশু চিকিৎসাব সুযোগ পেয়েছে।

মহাবাষ্ট্রেব বাজধানী মুম্বই কেন্দ্রেব অন্তর্বিভাগে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। এছাডা বহির্বিভাগে আছে এলোপ্যাথি সংযুক্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয। অন্তর্বিভাগে গডে শল্য চিকিৎসা সহ অন্যান্য চিকিৎসাব সুযোগ পেয়ে থাকেন ৬,০০০-এব বেশি মানুষ আব বহির্বিভাগে পান ৮৭,৪৫৫ জন মানুষ। পুনেতে অবস্থিত কেন্দ্রে দাতব্য হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসালয়ে গড়ে বছরে ৪,৫০০ জন বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। নাগপুর কেন্দ্রের অধীনে ইন্দোরে দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষজনের অবস্থানভূমি অর্থাৎ বস্তি অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। যেখানে বছরে গড়ে ১৩,৫০০ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাডা একটি ভ্রাম্যমান এলোপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, সেখানে বছরে গড়ে ৭,০০০ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান।

কেরলের রাজধানী তিরুবন্তীপুরম্ কেন্দ্রের অন্তর্বিভাগে ২৭৫টি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। এর মধ্যে ১০৬টি শয্যায় বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই হাসপাতালে পেড্রিয়াটিক, সার্জিক্যাল, ই.এন.টি., ডিসেন্ট্রি, অপথ্যালমোলজি, মেটারনিটি, সাইকিয়াট্রি এবং ডার্মাটিলজি বিভাগ আছে। অন্তর্বিভাগে গত আর্থিক বছরে ১,২১২ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন আর বহির্বিভাগে পেয়েছেন ১,৫১,০৯৫ জন। এছাড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে তিরুবন্তীপুবম্ জেলার পাঁচটি গ্রামে এবং নেট্রায়মে একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে—এই কেন্দ্রের মাধ্যমে তা পরিচালিত হয়। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ও আছে এই কেন্দ্রে। গত আর্থিক বছবে গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্রে ৩৬,৪৩১ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। কালাডিতে একটি দাতব্য আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় আছে। সেখানে গড়ে ৩০০ জন মানুষ চিকিৎসাব সুযোগ পেয়ে থাকেন।

মেঘালয়ের আলং-এ ভ্রাম্যমান চিকিৎসায় গত আর্থিক বছরে ২৪,৮৩০ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বেলঘরিয়ায় আছে দুটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়, গত আর্থিক বছরে ২৭,৮৩৭ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থিত একটি এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি সংযুক্ত চিকিৎসালয়ে বছরে গড়ে ৬,৫০০ জন বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান।

জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে প্রতিদিন ৩২৭ জন কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা এবং সংশ্লিষ্ট রোগীদের স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ করা হয়। এছাড়া আদিত্যপুর অঞ্চলে অবস্থিত দাতব্য এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১,০০০ জন দরিদ্র মানুষ-মানুষী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। সিংভূম জেলার দূরবর্তী গ্রামে দুটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ৮,০০০ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি হোমিওপ্যাথি-এ্যালোপ্যাথি সংযুক্ত চিকিৎসালয়ে বছরে ১১,৫০০ জন মানুষ-মানুষী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। গত আর্থিক বছরে ২টি চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১৯৯ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ এবং রোগমুক্তির পর চশমা পেয়েছেন বিনামূল্যে।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে এ্যালোপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গড়ে ১৫,০০০ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে এই কেন্দ্রে। বিনামূল্যে তাঁরা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

নরোত্তমনগর পরিচালিত উপজাতিপ্রধান মানুষের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় আছে। সেখানে বছরে গড়ে ৪,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। ভ্রাম্যমান চিকিৎসার সুযোগ পান ২,০০০ জন মানুষ।

খেতড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে একটি প্রসূতিসদন এবং শিশু কল্যাণ বিভাগ আছে। গত আর্থিক বছরে এখানে ২৩৮ জন মা ও শিশু চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এখানে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ও আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে গোটা ভারতবর্ষে ছোট, বড়, যে সমস্ত হাসপাতাল-চিকিৎসালয় অবৈতনিকভাবে বা স্বল্প অর্থের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে চলেছেন এবং তার মাধ্যমে লক্ষাধিক মানুষ-মানুষী বছরে সু-চিকিৎসিত হচ্ছেন যেভাবে, তা স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আমরা মহাত্মা গান্ধীর সুচিন্তিত অভিমতটি অবশ্যই উল্লেখ করব—

'রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত সেবাশ্রম ও হাসপাতালগুলি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাঁরা ছোট বা বড় আকারের কাজ করে যাচ্ছেন না। তাঁরা হাসপাতাল খুলছেন, দরিদ্রের চিকিৎসা করছেন, ওষুধ দিচ্ছেন।... রামকৃষ্ণ নাম যখন আমার মনে পড়ে তখন বিবেকানন্দের কাজের কথা আমি বিস্মৃত হতে পারি না। বিবেকানন্দ তাঁর আচার্যকে পৃথিবীর মানুষের সামনে আপন প্রভায় তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এমন সেবাশ্রম হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। আশা করি যাঁদের হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, ত্যাগের প্রতি আছে চির আকাঙ্ক্ষা, এমন মানুষেরা এই রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করবেন। এবং ভারতবর্ষের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা কাজ করে যাবেন।'[৫]

॥ ৩ ॥

গ্রামীণ উন্নয়ন :

রামকৃষ্ণ মিশন গ্রামোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা তো জানি, দেশের সিংহভাগ মানুষ গ্রামেই বসবাস করে। তাই গ্রামীণ মানুষদের উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি এবং শহর বা শহরতলীতে অবস্থিত কেন্দ্রগুলিও গ্রামীণ জীবন উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করেছে বিভিন্ন ভাবে। পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টার, বেলুড়ে অবস্থিত সমাজ সেবক শিক্ষণমন্দির, রাঁচি মোরাবাদিতে অবস্থিত 'দিব্যায়ন' নামাঙ্কিত আবাসিক কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (যা কিনা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত) ইত্যাদি একদিকে গ্রামীণ মানুষের জীবনে অত্যাধুনিক কৃষি কাজের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে চলেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগীর পালন, গবাদিপশু পালন, মাশরুম চাষ ইত্যাদির উন্নতিতে নিয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এ প্রসঙ্গে একটি জরুরী কথা উল্লেখ্য — গ্রামীণ মানুষদের শিক্ষাব মাধ্যমে সচেতন করে তোলার জন্য জনশিক্ষা (Mass-Education) প্রকল্প, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা (Non-Formal Education) প্রচলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ (Literacy Programme) প্রকল্প, দর্শনজাত শিক্ষা (Visual Education), বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education) প্রকল্প, ইত্যাদি রূপায়িত করে চলেছে একই সঙ্গে।

শুধু কৃষিকাজের মধ্যেই গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে রামকৃষ্ণ মিশন নিজেকে সীমাবদ্ধ বাখে নি। সেই সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের জন্য আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে 'পল্লীমঙ্গল' প্রকল্প গড়ে বস্ত্রজাত শিল্প উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পল্লীমঙ্গল প্রকল্প ছোট জুটমিলের মাধ্যমে পাটজাত নানা সামগ্রী, তাঁতবস্ত্রেব নানা সামগ্রী, ধূপকাঠি ও গৃহসজ্জার নানা সামগ্রী উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী বহু মানুষ-মানুষী আর্থিক ভাবে সচ্ছল হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের অন্যান্য স্থানে একই লক্ষ্যে নানা প্রকল্পের রূপায়নের কাজ চলেছে। আসলে আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র মানুষদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার বিষয়টিকে বিবেকানন্দ বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাবা ভারতবর্ষে আরও নানা কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিয়ে চলেছে। এ জন্য বিনামূল্যে বিশেষ প্রশিক্ষণেব ব্যবস্থা আছে। গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই নানা কেন্দ্রেব মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা এবং কোন্ মাটিতে কোন্ শস্য ভালো ফলবে তার পবীক্ষা যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে তেমনি কৃষিকাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীবা নিরন্তর সচেতন ভাবে কাজ করে চলেছেন। ভারত সরকার বামকৃষ্ণ মিশনের কৃষি এবং গ্রাম উন্নয়নের কাজের তৎপরতা লক্ষ্য করে একদিকে বিশেষজ্ঞদের বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, অন্য দিকে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে কৃষিকাজের উন্নতিতে আর্থিক সহায়তা করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, যোজনা পর্ষদ বা প্ল্যানিং কমিশনে বামকৃষ্ণ মিশনের গ্রামীণ-কৃষি উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেব যুক্ত করা হয়েছে। তাই আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি, বামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে গ্রামীণ মানুষের মুখে সাধ্যাতীতভাবে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। বিবেকানন্দ গ্রামীণ মানুষের উন্নতির জন্য নানা নির্দেশ দিয়েছিলেন। শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্ণ মিশন তা অনেকটা বাস্তবাযিত করেছে, গ্রামীণ মানুষ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে, শিক্ষা ও সচেতনতার মধ্যে দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখতে চলেছে। এ প্রসঙ্গে আমবা বলতে পাবি, শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়—কলকাতা, মুম্বই, দিল্লী, চেন্নাই শহরের বস্তী অঞ্চলে বামকৃষ্ণ মিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে শিক্ষা, স্বনির্ভবতা ও বাসস্থানের উন্নয়নে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে উত্তব কলকাতব বামবাগান ও পূর্ব কলকাতার তিলজলায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চলেছে বিশাল কর্মযজ্ঞ।

॥ ৪ ॥

উপজাতি-আদিবাসী অনুন্নতজনদের উন্নয়ন :

রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল,—উপজাতি-আদিবাসী এবং গ্রামীণ সমাজে পিছিয়ে থাকা অনুন্নত মানুষজনেদের উন্নতি বিধান, উন্নতির জন্য প্রয়াসী হওয়া এবং নানা পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জীবনের মূল স্রোতে সামিল করা। তাই আমরা দেখতে পাই, রামকৃষ্ণ মিশন উত্তব-পূর্ব ভারতের চেরাপুঞ্জি, ইটানগর, আলং, নরোত্তমনগর, আমতলী প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রেব মাধ্যমে উপজাতি এবং আদিবাসী মানুষজনদের উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছে। আবার বিহারে জামতাড়া, জামশেদপুর, রাঁচি কেন্দ্রের মাধ্যমে আদিবাসী মানুষজনদের কল্যাণ সাধনে এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার নারায়ণপুর

ও রায়পুর কেন্দ্রের মাধ্যমে উপজাতি শ্রেণীর মানুষদের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়াসী হয়েছে এবং নানা প্রকল্প রূপায়িত করে চলেছে।

উপজাতি, আদিবাসী এবং অনুন্নতশ্রেণীর মানুষজনদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন চার ভাবে কাজ করে চলে—ক) উপজাতিপ্রধান পাহাড়ী এলাকায়, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীপ্রধান গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রগুলি তাদের কাজগুলি রূপায়িত করে চলেছে। খ) শহর ও শহরতলীর নানা শাখাকেন্দ্র গ্রামীণ অনুন্নত ও আদিবাসী ও উপজাতি মানুষদের মধ্যে সেবামূলক এবং তাদের উন্নতিতে নানা প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করে থাকে। গ) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলির বিদ্যালয়ে উপজাতি, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার মাধ্যমে যথার্থ ভাবে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন ও স্বনির্ভরশীল হয়ে থাকে। ঘ) সংশ্লিষ্ট বিশেষ কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে উপজাতি-আদিবাসী ও অনুন্নত মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের যে কাজগুলি হয়ে থাকে তা হল—ক) সাধারণ উন্নয়ন—পানীয় জলের ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, কম খরচে বাড়ি, মল-মূত্র পরিত্যাগের স্থান নির্মাণ। খ) কৃষি উন্নয়ন—বিনা খরচে কারো জমির মাটি পরীক্ষা, কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ শেখানো,. বন-সৃজন, ফলের গাছ লাগানো ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া। গ) স্বনির্ভরতা প্রকল্প—বাচ্চাদের জন্য বিদ্যালয়—সেখানে সবকিছু বিনাপয়সায় দেওয়া হয়, বিধিমুক্ত বা প্রথাবহির্ভূত ও নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও সেই সূত্রে স্বনির্ভর প্রকল্পে, চামড়া, কাঠের কাজ, বয়ন শিল্প, ধূপকাঠি তৈরীর কাজ শেখানো হয়। ঘ) সংস্কৃতি চর্চা—আঞ্চলিক, ধর্মীয়-নৈতিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেমন তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মান বৃদ্ধি করা হয় তেমন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রবহমানতাকে আরও উজ্জীবিত করে তোলা হয়। ঙ) স্বাস্থ্য-প্রকল্প—হাসপাতাল, ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়, বিনাপয়সায় ঔষধ বিতরণ, চক্ষু অপারেশন শিবির ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সেবাকাজ চালানো হয়। চ) ত্রাণ প্রকল্প—প্রতিকূল পরিবেশে অর্থাৎ খরা, বন্যা ইত্যাদিতে ঐ উপজাতি, আদিবাসী ও অনুন্নত মানুষদের মধ্যে নানা ভাবে সেবাকাজ সংগঠিত করা হয়। এই সেবাকাজের মধ্যে আছে প্রতিকূল পরিস্থিতি চলাকালীন রান্না করা, খাবার পৌঁছে দেওয়া, সাময়িক গণবণ্টনের ব্যবস্থা করা আর পরবর্তী স্তরে বসবাসের জন্য স্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরী করে দেওয়া ইত্যাদি। এখানে দুঃস্থদের নতুন সাধারণ

বস্ত্র, শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে কৃষিকাজ, অন্যান্য কুটিরজাত শিল্প উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সেই পর্বে অন্ন সংস্থানের জন্য নগদ অর্থ দেওয়া হয় কিংবা তণ্ডুলজাত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

বিগত আর্থিক বছরের নিরিখে আমরা উপজাতি-আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষজনদের শিক্ষা, চিকিৎসা, গ্রন্থাগার ইত্যাদির উন্নতির চিত্রটি তুলে ধরছি—ক) কলেজ-২, খ) শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র-২, গ) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়-১৭, ঘ) কৃষি শিক্ষালয়-২, ঙ) অন্ধবালক বিদ্যালয়-১, চ) গ্রাম উন্নয়ন শিক্ষণকেন্দ্র-৪, ছ) নার্সেস ট্রেনিং সেন্টার-২, জ) ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার-১৮, ঝ) প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র-২,৬১৮, ঞ) অন্যান্য শিক্ষালয়-৮৮, মোট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা-১,০৩,৬৭৯, ট) ছাত্রাবাস-৪৪, ঠ) হাসপাতাল-৬, ড) অন্তর্বিভাগে শয্যাসংখ্যা-৫২৮, ঢ) অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা-১৫,৬১০, ণ) বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা-২,৭৪,৪৬৬, ত) দাতব্য চিকিৎসালয়-৩৯, থ) দাতব্যরোগীর সংখ্যা-৭,৫০,২৩৪, দ), ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের সংখ্যা-২৫, ধ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসায় উপকৃত রোগীর সংখ্যা-৬,১৩,৩৬৮, ন) গ্রন্থাগার-৫৪, প) অডিওভিস্যুয়াল ইউনিট (দর্শনজাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার)-১১। সব মিলিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপজাতি, আদিবাসী, অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ-মানুষীর জীবনের মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কাজে গত আর্থিক বছরে ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি আশ্রমের অন্তর্গত সেলাতে যে উপজাতি কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল তা সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। চেরাপুঞ্জি মিশন খাসিয়া পাহাড়ে উপজাতি মানুষদের শিক্ষাদানে রত। বর্তমানে চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনে রয়েছে চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া ছাড়া আসাম, মণিপুর, মিজোরাম উপজাতির ছেলেমেয়েরাও পড়ে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৬৬৮ জন। এই কেন্দ্রে আছে একটি ছাত্রাবাস, এখানে উপজাতিরাই থাকার সুযোগ পায়। সব কাজ নিজেদের করতে হয়—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে নিজের হাতে তরকারি কাটা পর্যন্ত। এখানে কাজকর্ম-জীবনযাপনের সঙ্গে সুনাগরিক তৈরী হয়ে যায়। এই বিদ্যালয় দেশ-বিদেশে অনেক কৃতি মানুষ উপহার দিয়েছে। বহু শিক্ষক, চিকিৎসক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মী, রাজনৈতিক নেতা এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন এই বিদ্যালয়টি ছাড়াও ৪৬টি প্রাথমিক

ও এম.ই. স্কুল পরিচালনা করে, যার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪৪৩০ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা তিনশতাধিক। স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের জন্য রয়েছে ভোকেশনাল স্কুল, এখানে তাঁতের, দর্জির, টাইপ রাইটারের, প্রিন্টিং প্রেসের কাজ, উল বোনা শেখানো হয়। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যাতে ঘরে গিয়ে কিছু রোজগার করতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। এদের তৈরী জিনিসপত্র রামকৃষ্ণ মিশনের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে বিক্রয় করা হয়। অর্জিত লভ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীরাও কিছু পেয়ে থাকে। এখানকার পাঠাগারটি স্থানীয় মানুষদের একটি বড় অবলম্বন। খাসি ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যও এই আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। খাসি ভাষায় সঙ্গীতের বইও প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় উপজাতি মানুষদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে এলোপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, আর রয়েছে অডিওভিস্যুয়াল ইউনিট যার মাধ্যমে দর্শনজাত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক চলচ্চিত্র গ্রামে গ্রামে প্রদর্শিত হয়। এই কেন্দ্রটির উপজাতি সংগ্রহশালাটি দৃষ্টিনন্দন। এখানে দর্শনীয় বহু জিনিস আছে। দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র, কম্বল দেওয়া হয়, আর্থিক সাহায্য ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ত্রাণকাজ পরিচালিত হয়।

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের চিত্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত উপজাতি-আদিবাসী মানুষের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কিভাবে কাজ করে চলেছে তা প্রত্যক্ষ করলাম। উত্তর-পূর্ব ভারতে মেঘালয়ের শিলং, আসামের গৌহাটি, শিলচর, অরুণাচল প্রদেশেব আলং, ত্রিপুরার আমতলী ও ধলেশ্বরে বড় মাপের কাজ চলছে।

উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন উপজাতি আদিবাসী মানুষদের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছে উত্তরপ্রদেশের শ্যামলাতালে, বিহারের রাঁচি, জামশেদপুর, দেওঘর, জামতাড়ায়, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে, রাজমাহেন্দ্রীতে, ওড়িশার ভুবনেশ্বর, পুরীতে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, রহড়া, নরেন্দ্রপুর ও জয়রামবাটীতে, মুম্বই আর মহারাষ্ট্রে, কর্নাটকের মহীশূরে, কেরালার ত্রিচুর ও কালাডিতে, গুজরাটের রাজকোটে এবং মধ্যপ্রদেশের রায়পুর, নারায়ণপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে। মধ্যপ্রদেশের নারায়ণপুরে চলেছে বিশাল কর্মযজ্ঞ।

উপজাতি-আদিবাসী-অনুন্নত মানুষজনদের জীবনধারার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে তাদের সামিল করার কাজে রামকৃষ্ণ মিশন নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কাজ করে চলেছে। আমরা তো জানি অনুন্নত

শ্রেণীর মানুষদের সেবাব কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা / এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'[৬] রামকৃষ্ণ মিশন সেই আশা ও ভাষা জুগিয়ে চলেছে নিরন্তর। বিবেকানন্দ বলেছেন—'আমাদের নিম্নশ্রেণীর মানুষজনের জন্যে কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তোলা।'[৭] এই উপজাতি-আদিবাসী অনুন্নত কিছু মানুষের মুখে বেলুড মঠ প্রতিষ্ঠার সময় অন্ন তুলে দিয়ে তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার নজিব উজ্জ্বল প্রত্যয়ে স্থাপন করেছিলেন। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনেব প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ে উপজাতি যুব সম্মেলনে (Tribal Youth Conference) বামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র থেকে প্রায় ন'শো যুব প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এখানে বিভিন্ন যুবপ্রতিনিধিরা নানা অনুষ্ঠানে যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন তা উন্নতমানেব। প্রকৃত সুযোগ সুবিধা পেলে তাঁরাও যে ভাবতীয় জীবনধাবায় আপন উজ্জ্বলতায় সামিল হতে পাবেন এ তো তাবই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পবিশেষে স্মবণ করব বিবেকানন্দেব উদাত্ত আহ্বানটি। "...নূতন ভাবত বেরুক। বেরুক লাঙল ধবে, চাষাব কুটির ভেদ কবে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপডিব মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড-জঙ্গল পাহাড পর্বত থেকে।"[৮] এই অনুন্নত-আদিবাসী-উপজাতি খেটে খাওয়া মানুষদেব মধ্যে থেকে জন্ম নেবে নতুন ভাবত। রামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞ তাবই পবিচয়বাহী। আদিবাসী অনগ্রসব উপজাতি কল্যাণে রামকৃষ্ণ মিশন তাব সাধ্যের মধ্যে যে কাজ কবে চলেছে তা বিবেকানন্দের চিন্তারই পবিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

॥ ৫ ॥

ত্রাণ পরিষেবা :

শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজটি প্রথম বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১মে আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পবই মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা গ্রামে। এই গ্রামেরই অদূরে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনেব প্রথম কেন্দ্র। এ বিষয়ে আমরা আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। স্বামী অখণ্ডানন্দ একশো বছব আগে মাত্র চাব আনা পয়সা সম্বল কবে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রপীড়িত মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখিত

অঞ্চলে যে ত্রাণকাজ শুরু করেছিলেন সেই ত্রাণ কাজ নিরবচ্ছিন্ন ১০০ বছর ধরে পল্লবিতভাবে প্রসারিত হয়েছে ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতেও। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী শুভানন্দ, স্বামী সদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও কলকাতা মহানগরীতে যে ত্রাণকাজ শুরু করেছিলেন নির্ভীক চিত্তে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে—উত্তরকালে তারই প্রসারিত রূপটি আমরা বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছি।

সচল শিব অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষ-মানুষীরা যখনই প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয়েছেন অর্থাৎ খরা, বন্যা, কলেরা-প্লেগজনিত মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ড, ম্যালেরিয়া, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, সাধারণ খাদ্যাভাব, বসন্ত রোগ, ঝড়ের তাণ্ডব তখন, আবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে, দুর্গত মানুষদের মধ্যে, স্বাধীনতার সমসাময়িককালে দেশবিভাগ-জনিত শরণার্থী সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রাণকাজে রামকৃষ্ণ মিশন সবার আগে এগিয়ে গিয়েছে এবং এখনও আরো সুসংগঠিত ভাবে এগিয়ে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই ত্রাণকাজগুলি সংঘটিত হয়ে থাকে। বিগত একশো বছরের বিভিন্ন ত্রাণকাজের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পরিশিষ্ট অংশে।

বিগত আর্থিক বছরে যে ত্রাণকার্যগুলি সম্পন্ন হয়েছে তা হল, (ক) ঝড়ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত ত্রাণকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাপীঠ (বেলুড়) কেন্দ্রের মাধ্যমে, (খ) দুঃস্থ মানুষজনদের মধ্যে ত্রাণকার্য—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের (বেলুড়) মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে জয়রামবাটি ও রামহরিপুর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র দুটির মাধ্যমে। (গ) অগ্নিজনিত ত্রাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে কলকাতায়—রামকৃষ্ণ মিশন প্রধান কেন্দ্রের মাধ্যমে; ওড়িশায়—পুরীর কেন্দ্রের মাধ্যমে; অরুণাচলপ্রদেশে—আলং কেন্দ্রের মাধ্যমে। (ঘ) বন্যাজনিত ত্রাণকার্য পশ্চিমবঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র ও অন্যান্য কেন্দ্র—ইছাপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা, মেদিনীপুর, সারগাছি ও তমলুক কেন্দ্রের মাধ্যমে, মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের মাধ্যমে, দিল্লীতে নতুন দিল্লী কেন্দ্রের মাধ্যমে, আর বহির্ভারতে বাংলাদেশে ঢাকা ও দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে। (ঙ) স্বাস্থ্যজনিত ত্রাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়), রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা ও মনসাদ্বীপ কেন্দ্রের মাধ্যমে। (চ) শীতবস্ত্রপ্রদানজনিত ত্রাণকার্য

সম্পন্ন হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র, জলপাইগুড়ি, কামারপুকুর এবং শিকড়া কুলীনগ্রাম কেন্দ্রের মাধ্যমে। এই সমস্ত ত্রাণকার্যে নগদ ৩৮,৭৫,০০০ টাকা ছাড়াও খাদ্য, সাধারণ বস্ত্র, শীতবস্ত্র, জ্বালানী তেল, হেলোজেন ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন ঔষধপত্র বাবদ আরও কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরে উল্লেখযোগ্য একটি বড় কাজ হল মহারাষ্ট্রের লাটুরে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মানুষজনদের মধ্যে ২২২টি ভূমিকম্প নিরোধক স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া। এছাড়া সেখানে দুটি কমিউনিটি হল, দুটি স্কুলভবন, ছ'টি শিশু উদ্যান নির্মিত হয়েছে, পুনর্বাসনজনিত এই ত্রাণকার্যে বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। শুধু বাড়িঘর নির্মাণই নয়, প্রাত্যহিক জীবননির্বাহের জন্য যে সকল জিনিসপত্র প্রয়োজন তা এই ২২২টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশিষ্ট বাগ্মী ও শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই তিনি লিখেছিলেন—'রামকৃষ্ণ মিশন যে নানা বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া যে ভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে বাংলাদেশের এই প্রতিষ্ঠান (রামকৃষ্ণ মিশন), ভারতের সর্বত্রও কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়া আসিতেছেন। দিল্লীর কাছে কুরুক্ষেত্র শরণার্থী আশ্রয় শিবিরে, বহু লক্ষ আশ্রয় শরণার্থী অবস্থান করিতেছেন। সকলের পরামর্শে রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবা কার্যের জন্য আহ্বান করা হয়। তাঁরা প্রশংসার সহিত সেবাকার্য করিতেছেন।'[৯]

রামকৃষ্ণ মিশন স্বাস্থ্য, গ্রাম-কৃষি কাজের উন্নয়ন, উপজাতি-আদিবাসী ও অনুন্নত মানুষজনদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাদের জীবনের মানোন্নয়ন এবং ভারতবর্ষের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে তাদের সংযুক্তিকরণ, সর্বোপরি, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অংশ নিয়ে ভারতীয় জনজীবনে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করে চলেছে তা নজিরবিহীন। এই প্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চমৎকার অভিমত প্রকাশ করেছেন মাদ্রাজ (চেন্নাই)-এর স্টুডেন্টস্ হোমে পৌঁছে—'শহরের পর শহর প্রদেশের পর প্রদেশ আমি ঘুরেছি। ভ্রমণকালে আমি যে আশ্চর্যজনক জিনিস্ দেখেছি তা হল রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত, সুসংগঠিত, কর্মদক্ষ বৃহৎ আকারের সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ। অধিক প্রচার ছাড়াই তারা শান্ত ভাবে নিজের কাজ করে যায়, সেজন্যই বোধ হয় এই ঢক্কানিনাদ জগতে এই সকল বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে এক প্রকার শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে দেখে বিস্ময় লাগে। যখনই কোথাও

ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, মহামারী ইত্যাদি বিপর্যয় ঘটে সেখানে অনেক লোক চেঁচামেচি করে ছুটে যায় ও ত্রাণকাজ করে, কিন্তু আমি সর্বত্রই দেখেছি সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন।'[১০]

ভারতীয় জনজীবন ও রামকৃষ্ণ মিশন—একে অপরের পরিপূরক। ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার, যথার্থ শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ ও চরিত্র গঠন, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও বিভিন্ন কারিগরী প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কাজে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যে, উন্নত দেশগুলিতে তাঁরা পৌঁছে গেছেন এবং সেখানকার উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষের মর্যাদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই প্রবহমাণ শিক্ষার পাশাপাশি জনশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞ, কাতর নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষকে সচেতন করে তোলার কাজ করে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন। সেইসঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন, গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের নানা কাজে সামিল হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপকভাবে। আর গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই নীরোগ, সুস্বাস্থ্য ও রোগমুক্তির জন্য নানা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন। আমাদের আলোচিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসালয়গুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলিতে সর্বস্তরের মানুষ শুধু রোগমুক্তির জন্য যান না, রোগমুক্তির পাশাপাশি জীবসেবায় আন্দোলিত পরমপবিত্র ও লালিত্যময় স্পর্শ নিয়ে ফেরেন। এখানেই রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলির ভূমিকা মহিমোজ্জ্বল। সর্বোপরি, দুর্গত মানুষদের উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতীয় জনজীবনে যে নিরলস কর্মধারা প্রবাহিত করে দিয়েছে তা 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'। ভারতীয় জনজীবনে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সাধারণ মানুষকে জীবলোক থেকে শিবলোকে পৌঁছে দেবার জন্য কাজ করে চলেছেন নিরন্তর এবং ক্রমপরম্পরায়।

॥ ৬ ॥

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করে ভারতবর্ষের শেষ বড়লাট পত্নী লেডি মাউন্টব্যাটেন জানিয়েছেন—

'রামকৃষ্ণ মিশনের সকল বিভাগের কর্মীদের একনিষ্ঠতা, কর্মনিপুণতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, নিষ্কাম মানবপ্রেম দেখে আমি গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়েছি।'[১১]

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতবর্ষের ত্রাণ-সেবাকাজের এবং জনগণের উন্নতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের আত্মনিয়োগ দেখে মন্তব্য করেছিলেন—'অনেক বছর ধরে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত। এদেশে রামকৃষ্ণ মিশন যেসব সেবাকাজ করে চলেছে তা দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। দেশের যেখানে প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ দুর্বিপাক ঘটুক অবিলম্বে দেখা যাবে সেবার জন্য তাঁরা উপস্থিত। এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে আমার সংযোগ আমাকে কেবল অনুরাগী করেনি, বিরাট সমর্থক করে তুলেছে।'[১২]

আচার্য বিনোবা ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেছেন—

'রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য বিবেকানন্দের ফল স্বরূপ। আমি দেখেছি রামকৃষ্ণ সেবকেরা কত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন। আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি সংযোগে দুঃখীর সেবা করার যে উত্তম দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখেছেন, তার তুলনা হয় না। যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে তো তাঁরা ছুটে যাচ্ছেন। আর্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন।'[১৩]

রামকৃষ্ণ মিশন গত একশো বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'র কাজ পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে করে এসেছে এবং করে চলেছে। এই জীব সেবার কাজটি বাস্তবায়িত হয়েছে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নানা চিকিৎসার মাধ্যমে, পল্লীগ্রামের উন্নয়নে ও গ্রামীণ মানুষের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে দিয়ে, আদিবাসী অনগ্রসর উপজাতি শ্রেণীর মানুষের সার্বিক কল্যাণে এবং নানা বিপর্যয়ে ত্রাণজনিত সেবাকাজের মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই কর্ম হল ধর্ম। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বর্ষীয়ান নেতা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রামকৃষ্ণ মিশনের বিপুল সেবা-কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকৃত ছবিটি প্রতিফলিত হয়েছে,— 'রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মই যেখানে সেবা এবং সেই সেবার মধ্য দিয়ে অগণিত সাধারণ মানুষ সুস্থিত জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।'[১৪]

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ঐতিহাসিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের এই ত্রাণ সেবা কাজের উৎস ভূমিটি চিহ্নিত করে চমৎকার মন্তব্য করেছেন,—

'The fruitful movement of the dialectic of the Indian spirit towards the strees of university of the human person is embodied in the thought and vision of Swami Vivekananda,

the beloved diciple of Ramakrishna, one of the greatest saint of modern India and a living embodiment of the university and transcendence of Vedantic humanism. Vivekandnda get to modern India the conception of the destitute, suffering and sorrowing God (Arta and Daridra Narayan) in man conceived as essentially interpersonal and at the same time ultimately cosmic transcendent.'[১৫]

আমরা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে ভারতীয় জনজীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের পল্লবিত কর্মধারার রূপটি প্রত্যক্ষ করলাম।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৩৯৬, পৃঃ ৬৪—৬৫
২. রোমা রোলাঁ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ফরাসী ভাষায় 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাস লেখার জন্য
৩. স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে কলম্বোর মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী
৪. The Travel Diary of a Philosopher, Count Hermen Kayserling.
৫. রেঙ্গুন বামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত অভিমত, ১৪ মার্চ ১৯২৯
৬. চিত্রা কাব্য—'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯৮০, পৃঃ ৫৬৯
৭. বাণী ও রচনা—সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১০২
৮. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৩৯৬, পৃ. ৬৪—৬৫
৯. উদ্বোধন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
১০. মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমে ভাষণ, ৭ অক্টোবর, ১৯৩৬
১১. উদ্বোধন পত্রিকা, ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৪৪
১২. মহীশূর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৩ আগস্ট, ১৯৫৪
১৩. Prabuddha Bharata, May, 1963, P-172-173
১৪. মার্কসবাদীদের চোখে বিবেকানন্দ, তাপস বসু সম্পাদিত, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৯—৪০
১৫. The way of Humanism; East and West, Radha Kamal Mukherjee.

বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন

ভারত পরিক্রমার শেষে স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি আরবসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে তিন দিন তিন রাত অনশনে নিমগ্ন চিত্তে ধ্যান করলেন। সেই ধ্যান ছিল ভারতবর্ষের। কিভাবে ভারতবর্ষকে শাশ্বত চেতনা ও প্রজ্ঞার পথে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায়, কিভাবে 'চলমান শ্মশান' ঐ নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিত কাতর মানুষদের শিক্ষা ও সচেতনতায় আত্মশক্তির পথ বেয়ে দাঁড়ানোর পথটি উন্মোচিত করা যায়, নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যায়,—সেই চিন্তায় তিনি ধ্যানের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন। অব্যবহিত পরবর্তীকালেই তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন যে তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সাগরের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে হেঁটে যাচ্ছেন আর বিবেকানন্দকে তিনি অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যাবেন স্থির করেছেন। সেজন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে দক্ষিণ ভারতের তাঁর যুবক শিষ্যরা। আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের (১৮৯৩) কথা তাঁর কানে এসে পৌঁছেছে। সেই সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গীত উচ্চকিত করে তুলতে চান। কিন্তু তখন শ্রীমা সারদাদেবী সশরীরে বর্তমান। তাঁর অনুমতি ছাড়া তো যেতে পারেন না। তাই সব জানিয়ে মায়ের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন। মা সারদাদেবী চিঠি পেয়ে খানিকটা চঞ্চল হলেন। তাঁর নরেন সাগর পাড়ি দিয়ে পাশ্চাত্যে যাবে! সন্তানের জন্য মায়ের বুক কেঁপে উঠল। এখন থেকে একশো বছর আগে সাগর পাড়ি দেওয়া মানে সমাজের কাছে 'ম্লেচ্ছ' বনে যাওয়া। তাই 'কালাপানি' পাড়ি দিলে তাকে একঘরে করে রাখা হত। এসব জেনেও শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত পথে পাশ্চাত্যে যাবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে অনুমতি দিলেন। কেননা বিবেকানন্দ তো রামকৃষ্ণের

আজ্ঞাবহ হয়ে তাঁরই চিন্তাধারা, যা কিনা শাশ্বত ভারতবর্ষের সামগ্রিক চিন্তা চেতনার ঘনীভূত রূপ—তারই প্রচার ও প্রসারের জন্য পাশ্চাত্যে যাবেন। তাই শ্রীমা সাবদাদেবী সোৎসাহে অনুমতি দিলেন। স্বামী সারদানন্দকে বললেন, —'নরেনকে পাশ্চাত্যে যেতে লিখে দাও।'[১]

বিবেকানন্দের কাছে শ্রীমা সারদাদেবীব এই চিঠি তো শুধু চিঠি নয়, তা ছিল পাশপোর্ট অর্থাৎ ছাড়পত্র। সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে তিনি পাশ্চাত্যে পাডি দিলেন। সেই দিনটি হল ১৮৯৩-এর ৩১ মে। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন করে গেলেন পাশ্চাত্যে। দুবারে সব মিলিয়ে তিনি প্রায় পাঁচ বছর (জুলাই ১৮৯৩—ডিসেম্বর ১৮৯৬ এবং জুলাই ১৮৯৯—নভেম্বর ১৯০০) আমেবিকা ও ইউরোপে সর্বজনীন বেদান্ত ধর্মপ্রচার করলেন। বেদান্তের বাণীইতো শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ, শুধু তাই নয়, একদিকে বেদান্ত ও অন্যদিকে সর্বধর্মসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মেব চিবন্তন সত্যকে তুলে ধরেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,—'পাশ্চাত্যের প্রতি আমার একটা বাণী আছে, যেমন প্রাচ্যেব প্রতি বুদ্ধের একটা বাণী ছিল'—এ বাণী সেই রামকৃষ্ণের বাণী। বিবেকানন্দকে এই বাণী বহন করতে গিয়ে কত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে, অপমানিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছে, কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটতে হয়েছে, অনাহার-অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। তাঁর অদ্ভুত পোষাক দেখে লোকে ধাক্কা মেরেছে, ঢিল ছুঁড়েছে, এমন কি পাশ্চাত্যের ধর্মান্ধ মানুষেরা তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষ থেকে ধর্মের নানা বার্তাবাহক পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের জন্য যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে কিন্তু আমাদের অবশ্যই জোরের সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে—এ পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে এবং তিনিই ছিলেন যথার্থ পথিকৃৎ। তিনি গোঁড়া-ধর্মান্ধ খ্রীষ্টানদের দেশে ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য যেভাবে রক্তাক্ত হয়েছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে রক্তাক্ষরেই লেখা আছে। সেদিনের সেই অভিযাত্রার সূত্র ধরে পরবর্তীকালে উত্তরসূরীরা তাঁর পথ বেয়ে তামাম পৃথিবীতে বামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে সচেষ্ট হয়েছেন। বিবেকানন্দ যে কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন হাঁটতে-হাঁটতে, রক্তাক্ত হয়ে কাঁটাগুলি তুলে ফেলেছিলেন, সেই পথই ক্রমে, পরবর্তীকালে

কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে অন্যান্য ভাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী ববার্ট ইঙ্গারসোল সেইসময় বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—

'পঞ্চাশ বছব আগে এদেশে ধর্মপ্রচাব করিতে আসিলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হইত বা পুড়াইয়া মারা হইত। এমনকি আরো কিছু পরে আসিলেও আপনাকে ঢিল মারিয়া সংশ্লিষ্ট স্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত।'[২]

রবার্ট ইঙ্গারসোলের কথা যে অসত্য নয় তা আমরা বুঝতে পারি ঐ পাশ্চাত্যের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে। ফ্রান্সের জোয়ান অফ আর্ক, জিওর্দানো ব্রুনো, কিংবা ইতালিতে ভানিনি প্রমুখ যাঁরা খ্রীষ্টানধর্মের মধ্যে বড় হয়ে উঠে প্রথাগত, প্রাতিষ্ঠানিক পৌবোহিত্যের আধিপত্যেব বিরুদ্ধে, ধর্ম সম্পর্কে মৌলিক কিছু সত্যকথা আপন উপলব্ধির নিবিখে সমাজে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁদেব আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এমনকি গ্যালিলিওব আবিষ্কারকে পর্যন্ত ভুল প্রমাণেব চেষ্টা চালানো হযেছিল। অর্থাৎ আমরা যে সত্য চিত্রটি তুলে ধরতে চাইছি তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেই ধর্মান্ধতাব মধ্যযুগীয় বর্বরতার রূপটি।

আধুনিক কালে নানা দিকে প্রগতিব পাল তুলে দিলেও পাশ্চাত্যে ধর্মান্ধতা কিন্তু থেকেই গেছে এবং তা মূলত খ্রীষ্টানধর্মকেই কেন্দ্র করে। অন্যান্য ধর্মেব মধ্যে এই ধর্মান্ধতা যে ছিল না, তা নয়। তাই আমরা দেখতে পাই শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ১০টি ধর্মপ্রধানরা উপস্থিত হয়ে নিজেদের ধর্মের মহিমা কীর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র বিবেকানন্দই সেদিন সকল ধর্মেব গৌরব ঘোষণা করে কুসংস্কাব, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার বিষাক্ত আবহাওয়া সবিয়ে সতেজ, সজীব, সর্বজনীন ধর্মীয় ভাব বিস্তারের উদাব মত ও পথের সন্ধান দিয়ে স্নিগ্ধ বাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে একজন ইহুদী পণ্ডিত স্বামী নিখিলানন্দকে বলেছিলেন —'After hearing Swami Vivekananda's speech in the perliament of religion in the 1893, I realise that my religion was also true.'[৩] স্বামী বিবেকানন্দের মুখ দিয়ে পৃথিবীর মানুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের নতুন বার্তা শুধু শুনলো না, প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। একদিকে যেমন ধর্মের কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে এসে হৃদয়ের উন্মোচনে উদার হয়ে উঠলো অন্য দিকে তেমনি পৃথিবীর সকল মানুষ যে অমৃতের সন্তান এবং সকলের মধ্যেই যে সেই পরমব্রহ্ম

বিরাজমান এই সত্যটি পৃথিবীর মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলো। তাই প্রয়োজন হলো বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে প্রচারিত ও প্রসারিত করবার জন্য ব্যাপক উদ্যোগের। পাশ্চাত্যে ভারতের মর্মবাণী তথা রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের যুগান্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানিয়েছেন—

'বিবেকানন্দ দুমুখো ছুরি। এই ছুরির কোনো মুখই ভোঁতা নয়। এই ছুরি বিলকুল তেতো, বিষাক্ত। বিবেকানন্দ জবর বিষ, জবর যম—কোনো কোনো লোকের পক্ষে, কোনো কোনো দলের পক্ষে, কোনো কোনো চিন্তাপ্রণালীর পক্ষে, কোনো কোনো কার্যপ্রণালীর পক্ষে। বিবেকানন্দের ব্যবসা দুনিয়াকে লড়াই-এ ডাকা, আহম্মকদের বেঅকুবিগুলাকে কুচি কুচি করিয়া কাটা, আর কাপুরুষদের মেজাজ ও হাত-পাকে গুঁড়া করিয়া ফেলা।...

'...পশ্চিমাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলেন "আরে ভাই মার্কিন, আরে ভাই ইয়াংকি, বাপের বেটা হোস্ তো একে একে লড়ে যা। দেখা যাউক কত কার মুরোদ, কার মগজে কতখানি ঘি, কার চরিত্রে কতখানি মনুষ্যত্ব।" ...পশ্চিমা নরনারী শুনিল আর ভাবিল "তাই তো, এ যে বিপ্লব, দুনিয়ার যুগান্তর।"'[৪]

পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে বিবেকানন্দের দান এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়াশিংটনের স্মিথ সোবিয়ান ইন্‌স্টিটিউশানে একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। আমেরিকার চিন্তা, ভাবধারা ও প্রগতির ক্ষেত্রে যে সকল বিদেশীরা স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে ৩১ জনের জীবন ও কার্যাবলী এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। আনন্দের বিষয় সেই প্রদর্শনীতে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের তথা রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের গুরুত্বকে। সেই গুরুত্ব বিবেকানন্দ সেদিন নিজের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুভব করেছিলেন বলেই পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকা ও সেখান থেকে ইউরোপে। প্রাচ্যের প্রমিথিউস বিবেকানন্দ মানুষের উত্তরণের রাঙা পথটি সেদিন চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে। তাই পরবর্তীকালে শুধু আমেরিকা-ইউরোপে নয়, সারা বহির্বিশ্বে রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে প্রসারিত করে দেবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে কিংবা তার অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে বা পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ ভাব-আন্দোলনের শৈশবাবস্থায় ব্যাপকভাবে বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের সামর্থ্য ছিল না। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে রামকৃষ্ণের পার্ষদরা বিবেকানন্দের আহ্বানে-নির্দেশে পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের জন্যে সাগরপাড়ি দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বহির্ভারতে বিশেষত পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবাদর্শ—যা শাশ্বত ভারতের বাণীবাহক তা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে প্রচার (Mission) ও প্রসারই রামকৃষ্ণ মিশনেব মুখ্য কাজ। এরই সঙ্গে মগ্ন হয়ে আছে অন্যান্য নানা আনুষঙ্গিক দিকগুলি। রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর 'বিদেশীয় কার্য' বিষয়ে এই দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, এ প্রসঙ্গটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কর্মধারা সম্পর্কে আমাদের একটি স্বচ্ছ-ধারণা গড়ে নেওয়া প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যে—আমেরিকায় প্রথম যে কেন্দ্রটি গডে উঠেছিল বিবেকানন্দের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত প্রচারের জন্য, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম হল 'বেদান্ত সোসাইটি', এবং তা প্রতিষ্ঠিত হল নিউইয়র্কে। পাশ্চাত্যে, এটিই প্রথম রামকৃষ্ণ সংঘ। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে বিবেকানন্দ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিসকোয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—'বেদান্ত সোসাইটি অব্ নর্দার্ন ক্যালিফোর্ণিয়া'। বিবেকানন্দের হাতে গড়া রামকৃষ্ণ মিশনের এই দুটি কেন্দ্র আজ শুধু আয়তনে বৃদ্ধি পায় নি, বৃদ্ধি পেয়েছে তার কর্মপরিধি এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবপ্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পল্লবিত ভূমিকা পালন করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ব্যাপক মানুষের সংযোগে এই প্রাচীন কেন্দ্র দুটি ভারতীয় সভ্যতার, ধর্ম-দর্শনের প্রাণকেন্দ্র রূপে ভারত আত্মার সঙ্গীত উচ্চকিত করে চলেছে পরম উল্লাসে।

॥ ২ ॥

আমেরিকা ও ইউরোপে রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রকাশ ও বেদান্ত কেন্দ্রগুলিকে সচল রাখা এবং তার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বেদান্তের ভাবধারা তুলে ধরার কাজেই বিবেকানন্দের সতীর্থদের মধ্যে আর যাঁরা অপরিসীম দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্বামী সারদানন্দ। তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে দু বছর (১৮৯৬ মার্চ—১৮৯৮ এর ফেব্রুয়ারী) অতিবাহিত করেছেন।

বিবেকানন্দ যখন আমেবিকা ও ইংলণ্ডে নিরন্তর প্রচারকার্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত তখন তিনি ইংলণ্ডে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে ডেকে পাঠান। শ্রীমা সারদাদেবীর আশীবাদ মস্তকে ধারণ করে স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল লণ্ডনে উপস্থিত হন। পথে ভূমধ্যসাগরে জাহাজ প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে আটকে পড়ে। কিন্তু তাতে সারদানন্দ বিচলিত হন নি মোটেও। ক্রমে প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে জাহাজ যখন রোমে থামলো তখন তিনি সেন্ট পিটারের চার্চ দর্শন করলেন। তাঁর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি সেন্ট পিটারের মূর্তির সামনে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলার মূলে নিশ্চিতভাবে ছিল সেন্ট পিটারের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন।[৫] আমরা তো জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময় উল্লেখ করেছিলেন—'শশী—(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও শরৎকে (স্বামী সাবদানন্দ) দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্টের (যীশু খৃষ্ট) দলে।'

বিবেকানন্দ এপ্রিলের শেষে লণ্ডনে পৌঁছে স্বামী সারদানন্দকে প্রচারের দায়িত্ব তুলে দেন। স্বামী সারদানন্দ বামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচারের জন্য নানা স্থানে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। একদিকে অপূর্ব বাগ্মিতা, অন্যদিকে ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম-দর্শন ও রামকৃষ্ণ ভাবধারা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধিটি কত প্রসারিত তা আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি। ১৮৯৬-এর ২৮ মে অক্সফোর্ডে বিবেকানন্দের সঙ্গে ম্যাক্সমূলারের প্রথম দেখা হয়। ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে 'A real Mahatma' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও বিবেকানন্দকে বলেন যে আরো তথ্য পেলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখতে প্রস্তুত। পরবর্তীকালে নানা তথ্য সংগ্রহ করে তিনি রচনা করেন বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ' (Ramakrishna: His Life and Saying)। ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছেন—'ঠাকুরের সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার যা প্রকাশ করেছেন তা আমি লিখে দিয়েছিলুম। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুরকে জনসমাজে প্রচার করেন। স্বামীজী নিজে না লিখে আমাকে লিখতে বললেন। আমি আপত্তি করলে বলেছিলেন, "আমি লিখলে বুড়োর মাথায় আবার ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।" আমি যা জানি সব লিখে দিলুম। ভেবেছিলুম স্বামীজী কাট-ছাঁট করে দেবেন কিন্তু তিনি দুই-একটি কথার বদল করে আর দু-এক জায়গায় ভাষার অত্যুক্তি তুলে দিয়ে গোটা লেখাটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্মরণ হয় ম্যাক্সমূলারও কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে তা ছেপেছিলেন।'[৬]

জুন মাসের শেষে বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দকে তাঁর স্টেনোগ্রাফার গুডউনের সঙ্গে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিউইয়র্ক, বোস্টন ও গ্রীন একরে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা ও ক্লাস শুরু করেন। বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,—'শরৎ যা করে, মূল ধরে করে। শরৎ-এর কাজ গভীর', —বিবেকানন্দের এ কথা যে কতটা সত্য তা আমরা বুঝতে পারি সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে তমোগ্ন চিত্তে সারদানন্দের রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবধারা প্রচার ও প্রসারে প্রয়াসী রূপটিকে লক্ষ্য করে। তাই তো আমরা দেখি পরবর্তীকালে বোস্টনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সারদানন্দের রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার ও প্রসারের ফলেই। সারদানন্দের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মিসেস ওলিবুল বলেছেন—'স্বামী বিবেকানন্দের প্রভা মার্তণ্ড সম, কিন্তু স্বামী সারদানন্দের প্রভা চন্দ্রমা সম।' নিউ জার্সির অন্তর্গত মণ্টক্লেয়ারে মিস্টার ও মিসেস হুইলারের বাড়িতে স্বামী সারদানন্দ নিয়মিত ক্লাস নিতেন। স্বামী অতুলানন্দ 'With the Swamis in America' গ্রন্থে লিখেছেন স্বামী সারদানন্দ হুইলারদের বাড়িতে থাকাকালে এক মজার ঘটনা ঘটে। তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতেন ও তাঁর দুটি ছবি মিসেস হুইলারকে দেখান। তিনি সেই ছবি দেখে চমকে যান এবং বলে ওঠেন—'সেই একই মুখ।' তখন স্বামী সারদানন্দ উৎসুক হয়ে জানতে চান, 'কি বলছেন আপনি?' উত্তরে মিসেস হুইলার জানান বহুবছর আগে তাঁর প্রথম যৌবনে, বিবাহের পূর্বে তিনি স্বপ্নে এক হিন্দুকে দর্শন করেন। সেই স্বপ্নদৃষ্ট মুখ আর এই ছবির মুখ একই। ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বিস্ময়ে বলেন, 'ইনিই সেই রামকৃষ্ণ এর আগে জানতাম না। সেই দর্শন এত দৃঢ় ও মনোমুগ্ধকর ছিল যে আমি সেই মুখখানি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি। সেই থেকে আমি যখনই শুনি, কোনো হিন্দু আমেরিকায় এসেছেন, আমি তাঁকে দেখবার জন্য এখানে-সেখানে যাই। কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হই। অবশেষে এখন আমি খুশি যে সেদিন স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখেছিলাম।'[৭]

এই ঘটনার উল্লেখ করে সারদানন্দজী বলেন,—'ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য নিজের ভক্তদের বেছে নেন। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। তাঁর পতাকার নিচে কাজ করা গৌরবের বিষয়। আমেরিকায় তিনি আমার কাজের সব যোগাড় করে দিয়েছিলেন; আমি কখনও একাকী ছিলাম না। তিনি বহু উন্নত চরিত্রের নারী পুরুষকে আমার কাছে এনেছিলেন;

যাঁরা আমাদের কাজে সহায়তা করেছেন ও ঠাকুরকে বিশেষভাবে ভালবেসেছেন।'

স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবপ্রচারে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কাজের জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারী স্বামী সারদানন্দ মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলিবুলকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে রওনা হলেন। ফেরার পথে লণ্ডন, প্যারিস, রোম হয়ে ৮ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় পৌঁছলেন। বহির্ভারত থেকে ভারতে পৌঁছে স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। এই সূত্রেই তিনি হয়েছিলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক। দীর্ঘদিন ধরে প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সমন্বয়ে তিনি তাঁব কাজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

॥ ৩ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠিয়ে ইংলণ্ডে প্রচারের জন্য স্বামী অভেদানন্দকে ডেকে আনেন এবং নিজে ভারতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে একটানা ১৮৯৬-এর আগস্ট মাস থেকে ১৯২১ (১৯০৬-এ ছ' মাসের জন্য ভারতে এসেছিলেন)-এর নভেম্বর পর্যন্ত পঁচিশ বছর পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করেছেন। প্রথম তিনমাস বিবেকানন্দ অভেদানন্দকে পাশ্চাত্যের অজ্ঞাত বিষয় শেখালেন এবং পল ডয়সন ও ম্যাক্সমূলার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে আসার পর অভেদানন্দ এক বছর ইংলণ্ডে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবাদর্শ প্রচার করেন। স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ এর ৯ আগস্ট নিউইয়র্কে পৌঁছোন এবং বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির কার্যভার গ্রহণ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবাদর্শ প্রচার করেন। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস এডিসন, এলমার্গ গেটস, প্রেসিডেন্ট ম্যাক কিংলে ও আলাস্কার গর্ভনর জন ব্রুডির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। বোস্টন ও কেমব্রিজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ল্যানমান, রয়সি, শীলার, উইলিয়াম জেমস্, লুইস জেনস্ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি কেমব্রিজ ও গ্রীন একর কনফারেন্সে যোগদান করে বেদান্তের বাণী প্রচার করেন।

আমেরিকায় যখন তিনি ধর্মপ্রচারের কাজে সুনাম অর্জন করেন তখন কিছু ঈর্ষান্বিত খ্রীষ্টান মিশনারী তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করে। স্বামী অভেদানন্দ নির্ভীক চিত্তে সমস্ত নিন্দার ছন্দ-তন্তু-জাল ছিন্ন কবে নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর কাজ করে চলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত জানতে পারি—'আমেরিকাতে যখন ছিলাম, মনে যদি কষ্ট হত, নিজের মনে নিজে গান গাইতাম। দুঃখ-কষ্ট সব শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাতাম। কখনো কখনো জপ-ধ্যান করতাম, কখনো পড়াশুনো করতাম, এমনি করে দিন কাটাতাম। সেখানে তো নিজের ভাবের লোক ছিল না, নিজের ভাবে নিজে একলা থাকতাম।... সত্যকে ধরে থাকলে বেশি বাধাবিঘ্ন আসে বটে কিন্তু সত্যকে ছাড়তে নেই। খুঁটি জোর করে ধরে রাখতে হয়, খুঁটি ছাড়তে নেই। দেখছো না, আমার উপর কত বাধা বিঘ্ন আসছে, কত ঝড বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক আমাব বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমার কিছু কবতে পারবে না। আমি শ্রীশ্রীঠাকুবকে ধবে রয়েছি।'[৩৮]

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেব আগস্ট মাসে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুবীয়ানন্দ নিউইয়র্কে পৌঁছোন ও মিস্টার লেগেটের রিজলির বাড়িতে অবস্থান কবেন। স্বামী অভেদানন্দ তখন গ্রীন একরে। বিবেকানন্দের টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি নিউইয়র্কে এসে দেখা করেন। ৭ নভেম্বর বেদান্ত সোসাইটির সদস্যরা বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা জানান। বিবেকানন্দ স্বামী অভেদানন্দের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতায় ৬০০-র বেশি লোক আসতেন এবং কারনেগি লাইসিয়াম হল ভাড়া করে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। স্বামী অভেদানন্দ নানা স্থানে গিয়েছেন—কানাডা থেকে মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন শহবে বক্তৃতা দিয়েছেন। শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গেও কিছুদিন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে দশ বছর নিরবচ্ছিন্ন প্রচারকাজ চালানোর পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ছ' মাসের জন্য ভারতে আসার আগে স্বামী বোধানন্দ তাঁর সহকারী হয়ে আসেন। তারপর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করে স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে আমেরিকায় ফিরে যান। তিনি স্বামী বোধানন্দকে পিট্‌স্‌বার্গ বেদান্ত কেন্দ্রে পাঠান ও স্বামী পরমানন্দকে নিউইয়র্কের ভার দেন। তারপর স্বামী পরমানন্দ বোস্টন যান, স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্কের ভার নেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ

নিউইয়র্ক থেকে ১০৭ মাইল দূরে বার্কশায়ার আশ্রমে স্থায়ী ভাবে বাস করতে থাকেন ও মাঝে মাঝে নিউইয়র্কে বক্তৃতা দিতে আসতেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামী অভেদানন্দ সতেরো বার আটলান্টিক মহাসাগর পারাপার করেছেন জাহাজে। কেবল আমেরিকায় নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, বাভেরিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড গিয়েছেন বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার করার জন্য। তাঁরই উদ্যোগে সমকালীন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। বর্তমানে সেই চিত্র দুটি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সংরক্ষিত আছে।

বহির্ভারতে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার ও প্রসারের কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী অভেদানন্দকে সূক্ষ্ম শরীরে কিভাবে নানা প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা, এমনকি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন সেকথা স্বামী অভেদানন্দ আমাদের জানিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদদের অসীম কৃপা ও করুণায় আগলে রাখতেন সূক্ষ্ম শরীরে। তাঁরই একটি অনুভবের নিরিখে অভেদানন্দ জানিয়েছেন—'একবারের কথা। লণ্ডন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাবো। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংলণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল "লুসিটেনিয়া"। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ মে ১৯১৫) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। টিকিট কিনবো, এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কিনতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করছেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিক-সেদিকে তাকালাম, কাউকেই দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে। কিন্তু সেবারেও ঠিক সে রকম। তখন টিকিট কেনা আর হল না। বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি "S. S. Lusitania is no more" অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। চোখে জল এলো। বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন।'[৯]

প্রসঙ্গত আমরা স্বামী প্রেমানন্দের কথা উল্লেখ করতে পারি। স্বামী প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গ পরিক্রমায় যাওয়ার সব ঠিক হওয়া সত্ত্বেও যাত্রাকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করতে গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন, না যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা। স্বামী প্রেমানন্দ যাওয়া স্থগিত রাখলেন। পরে জানা গেল জলপথে যে নৌকায় তাঁর যাওয়ার কথা ছিল তা জলে ডুবে গিয়েছে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পাশ্চাত্যে স্বামী অভেদানন্দ পরমনিষ্ঠার সঙ্গে এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার করে গেছেন অক্লান্ত ভাবে। তাঁর এই দীর্ঘ কর্মজীবনের কিছু নির্দশন বিবৃত আছে তাঁর রচিত একাদশ খণ্ডের গ্রন্থাবলীর মধ্যে। তাঁর রচিত 'Doctrine of Karma', 'Life beyond death', 'Reincarnation' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁরই বক্তৃতার সূত্রে রচিত হয়েছে যা এদেশে ও বিদেশে সমানভাবে জনপ্রিয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুমোদনে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন।

॥ ৪ ॥

আর পাশ্চাত্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। ১৮৯৯-এর জুন থেকে ১৯০২-এর জুলাই মাস পর্যন্ত তিন বছর তিনি পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রথমে আমেরিকায় যেতে রাজী হননি। বিবেকানন্দের শরীর তখন খুব খারাপ। ভারতের কর্মভার থেকে সাময়িক অব্যাহতি ও দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ভেবে মহানন্দ কবিরাজের পরামর্শে ও সতীর্থদের অনুরোধে বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে পাড়ি দিলেন। সঙ্গী হিসাবে তুরীয়ানন্দকে নিয়ে যেতে চাইলেন তিনি। তাই পাশ্চাত্যে যেতে অনিচ্ছুক তুরীয়ানন্দজীকে ডেকে প্রবল আগ্রহে সাশ্রু নয়নে বললেন—'হরিভাই, আমি ঠাকুরের কাজের জন্য বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে না?'

স্বামী তুরীয়ানন্দের আর অসম্মতি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। ১৮৯৯-এর ২০ জুন বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে পাশ্চাত্যে রওনা হলেন। জাহাজের মধ্যে একদিন তুরীয়ানন্দ নিবেদিতাকে জিজ্ঞেস করলেন সেখানে কিভাবে চলতে হবে? তার উত্তরে নিবেদিতা একটি ছুরির অগ্রভাগ ধরে হাতলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—'স্বামী, লোককে কিছু দিতে হলে এরূপভাবে দেওয়া চাই অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে অসুবিধে ও বিপদের ভাগটা নিজে নিয়ে সুবিধের ভাগটা অপরকে দিতে হবে।'

জাহাজ প্রথমে ইংলণ্ডের গ্লাসগোতে থামলো। তারপর আগস্টের শেষে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিউইয়র্ক পৌঁছলেন ও মিস্টার

লেগেটের রিজলি ম্যানরে দু'মাস অতিবাহিত করলেন। রিজলিতে থাকাকালীন একটা ঘটনার কথা জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী নিখিলানন্দকে জানিয়েছিলেন। মিসেস লেগেট স্বামীজীর বিছানাপত্র ঠিক আছে কিনা দেখভাল করতে গিয়ে দেখেন স্বামী তুরীয়ানন্দের বিছানা মেঝেতে। তিনি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন,—'স্বামী, কি ব্যাপার? বিছানার কি কোনো ত্রুটি আছে?' স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তরে জানালেন—'না, না, বিছানা ঠিক আছে। দেখুন, আমি স্বামীজীর সঙ্গে এক লেবেলে শুতে পারি না। তাই বিছানাটা খাট থেকে নিয়ে মেঝেতে পেতেছি।'[১০]

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি স্বামী তুরিয়ানন্দের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কতটা আকাশছোঁয়া ছিল তা আমরা এ থেকে বুঝতে পারি।

বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ মন্টক্লিয়ারে মিসেস হুইলারের বাড়িতে বেদান্তের ক্লাস শুরু করেন। তুরীয়ানন্দের মনে খানিকটা দ্বিধা ও সংশয় ছিল ঠিকমত ভাবপ্রচার হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়ে শোনালেন,—'ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। হরি ভাই, এখানে এখন তোমার জীবন দেখাও আপাতত ভারতকে ভুলে যাও।'[৯]

স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিতে সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস নিতেন। শনিবার শিশুদের বেদান্ত শিক্ষা দিতেন, ক্লাস নিতেন। শনিবার শিশুদের বেদান্ত শিক্ষা দিতেন গল্পের মাধ্যমে। একবার আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কেমব্রিজ কনফারেন্সে শঙ্করাচার্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্কে এক বছর ছিলেন। স্বামী অতুলানন্দ (সেই সময় ব্রহ্মচারী গুরুদাস) একটা কথা তুরীয়ানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'স্বামীজী সৎপ্রসঙ্গ করা কিরূপে আপনার পক্ষে সম্ভব হয়? আপনার ভাণ্ডার কি নিঃশেষিত হয় না?'

স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তরে জানালেন—'দেখো, আমি যৌবন থেকে এই জীবনযাপন করে আসছি। এটি আমার জীবনের অভিন্ন অংশ স্বরূপ হয়ে গেছে। মনে মা ধর্মভাবের রাশ ঠেলে দেন। তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত। যা খরচ হয়ে যায় মা তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ করে দেন।'[১১]

স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন বেদান্তের প্রতিমূর্তি এবং সবসময় ঐ ভাবেই থাকতেন। তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত—'হরি ওম্, তৎসৎ, শিব, শিব।' একদিন নিউইয়র্কের রাস্তায় বেড়ানোর সময় বলে ওঠেন, 'গুরুদাস! (অতুলানন্দ) সিংহতুল্য হও। পিঞ্জর ভগ্ন করে মুক্ত হও। একটা বড় লম্ফ দাও ও কাজ শেষ করো।'[১২]

বক্তৃতার চেয়ে ঘরোয়া কথাবার্তার মাধ্যমে স্বামী তুরীয়ানন্দ সকল স্তরের মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতার দৃঢ় ধারণা প্রোথিত করে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ও বেদান্তের কথা তাঁর মুখ দিয়ে সবসময় উচ্চারিত হত, —'সর্বদা খাঁটি হও। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়। সত্য, সত্য সৎ হও। অন্যকাজে জড়িয়ে পড়ো না। ঈশ্বর লাভের পথে সোজা চলো। অসীম সাহসে বুক ভরে রাখো। যৌবনেই আমি বেদান্ত অধ্যয়ন ও অভ্যাস আরম্ভ করেছিলাম। আমি সর্বদা চেষ্টা করতাম স্মরণ রাখতে যে আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা।'[১৩]

বেদান্তের বাণী যিনি নিজের শিরায়, উপশিরায় প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, তিনিই তো বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের আদর্শ ব্যক্তি। বিবেকানন্দ তাই তাঁকে চিনতে ভোলেন নি। আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়াতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তুলে দিলেন তাঁরই কাঁধে। বললেন, 'ভারতের স্মৃতি মুছে ফেলো, ক্যালিফোর্ণিয়াতে বেদান্তের পতাকা তোলো। বাকী সব মাই করবেন।'

মিস্ মিনি বুক নামে এক বেদান্তের ছাত্রী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়াতে ১৬০ একর জমি দান করেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মিস বুককে সঙ্গে নিয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক থেকে রওনা হন। বিবেকানন্দ ট্রেন থেকে ডেট্রয়টে নেমে যান আর তুরীয়ানন্দজীকে পূর্বোল্লেখিত শেষ নির্দেশ দিয়ে যান। এটাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুরীয়ানন্দজীর শেষ সাক্ষাৎ। এর আগে মে মাসে সানফ্রান্সিসকো ত্যাগের আগে সেখানকার ভক্ত-অনুরাগীদের বলেছিলেন,—'আমি তোমাদের কাছে স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠাবো। আমি তোমাদের কাছে বেদান্তের বক্তৃতা দিয়েছি। তুরীয়ানন্দের মধ্যে দেখতে পাবে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সে জীবনের প্রতিমুহূর্তে তা অভ্যাস করে। সে আদর্শ সন্ন্যাসী। সে তোমাদের পবিত্র অধ্যাত্ম জীবন-যাপন করতে সাহায্য করবে।'

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই মিস্ বুকের সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ লস্ এঞ্জেলসে পৌঁছোন। তারপর প্যাসাডেনাতে দু' সপ্তাহ মিড সিস্টারদের বাড়িতে থেকে ২৬ জুলাই সানফ্রান্সিসকোতে যান। সেখানকার বিবেকানন্দ অনুরাগীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বিবেকানন্দ তাঁদের যা বলেছেন তা উল্লেখ করেন। প্রত্যুত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ জানান,—'আমি একটি ছোট ডিঙি মাত্র। আমি ২–৩ জনকে এই সংসার সমুদ্রের অপর পারে

নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু স্বামীজী হচ্ছেন আটলান্টিক মহাসাগর পারাপারকারী বিশাল জাহাজ। তিনি হাজার হাজার লোককে পার করতে পারেন।'[১৪]

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট স্বামী তুরীয়ানন্দ ১২—১৩ জন উৎসাহী নারী পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে সানফ্রান্সিসকো থেকে মানহোসে ট্রেনে তারপর ঘোড়ার গাড়িতে মাউন্ট হ্যামিলটনের উপর দিয়ে ৪০ মাইল দূরে স্যান আন্তোনিও উপত্যকাতে পৌঁছলেন। এখানেই মিস্ বুকের দান করা সম্পত্তিতে শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এক অনুরাগী জানিয়েছেন—'স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার তীব্র জ্যোতিতে বহির্মুখ জড়বাদী পাশ্চাত্যবাসীদের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের সমগ্র ভূমির পরিচয় দিলেন। তাহাতে পাশ্চাত্য মানবের নবজন্ম হইল, পাশ্চাত্য মনের সুপ্ত সম্ভাবনারাশি জাগ্রত হইল। সংপ্রাপ্ত প্রেরণাকে জীবনে সজীব রাখিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ পাশ্চাত্য মনকে সুশিক্ষিত ও সঞ্চালিত করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনে শান্তি আশ্রম জন্মলাভ করিল।'[১৫]

এই শান্তি আশ্রমের স্থানটি একটি জনশূন্য মরু উপত্যকা। ঘর-বাড়ি নেই। বিদ্যুৎ নেই, জল ও বাজারঘাট বেশ কয়েক মাইল দূরে। সংকীর্ণ মেঠো রাস্তা। যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি সম্বল। গাছপালা খুব কম। স্থানটি সাপ, বিছা ও বিষাক্ত মাকড়সায় ভর্তি। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ বিশ্বাসী আমেরিকাবাসীদের বেদান্ত শেখাতে শুরু করলেন। ভোরে ব্রহ্মচারী গুরুদাস (স্বামী অতুলানন্দ) ওঁ, ওঁ, ওঁ শব্দে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে সকলের ঘুম ভাঙাতেন। সকাল পাঁচটায় ধ্যান, আটটায় ব্রেকফাস্ট, তারপর কাজ। দশটা থেকে বারোটা গীতা ক্লাস ও ধ্যান, একটায় মধ্যাহ্নভোজন এবং পরে বিশ্রাম। বিশ্রামের পর চলতো অপরাহ্ন-সান্ধ্যকালীন কাজকর্ম। ক্রমে স্থায়ী কেবিন ও ধ্যানঘর তৈরী হলো। সন্ধ্যা সাতটায় সাপার (রাতের খাবার), আটটায় ধ্যান ও ধর্ম প্রসঙ্গ চলতো। স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমবাসীদের বলতেন, 'আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ ঈশ্বরকে নিবেদন করা উচিত। তাহলে আমাদের দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। ...ধ্যানের দ্বারা মায়াজাল ছিন্ন হয়।'

একদিন শান্তি আশ্রমে প্রাতঃরাশের সময় নিজের গুরুদেব রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাবালুতার সঙ্গে বলে উঠলেন,—'...ঠাকুর এসেছিলেন পুরাতন বাণীকে নবজীবন, নবব্যাখ্যা দান করতে। প্রাচীন বাণীসমূহের তিনি ছিলেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং তিনি কিছু অভিনব বাণীও দিলেন। তিনি শিক্ষা

দিলেন আন্তরিক অনুরাগ দ্বারা সকল ধর্মপথে একই ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়। যা তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন, তাই তিনি শিক্ষা দিলেন। তাঁর জীবন অদ্ভুত, অভূতপূর্ব! তাঁর বাণী বুঝতে ও নিতে জগতকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। তিনি কোনো কৃতিত্বের দাবী করেন নি। তিনি সদা বলতেন, "মাই সব জানেন, আমি কিছু জানি না।" তাঁর নম্রতা যেমনি, সরলতাও তেমনি; আমরা প্রায় ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছি; কিন্তু তাঁর মত আর একটিও মহাপুরুষ দেখিনি।'[১৬]

শান্তি আশ্রম ছেড়ে ভারতে চলে আসবার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী গুরুদাসকে (অতুলানন্দ) আশ্রম পরিচালনার ভার দিয়ে বলেন,—'ক্রোধ, হিংসা ও গর্ব প্রভৃতি রিপু দমন করো, কারো পেছনে তার নিন্দা কোরো না। সব বিষয় সরল ভাবে সাক্ষাতে আলোচনা করো। কোন কিছু করণীয় হলে তুমিই অগ্রসর হবে। তখন অন্যেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেবে। তুমি না করলে কেউ কববে না। তুমি জানো এই জন্যই আমি এখানে সবরকম দৈহিক কাজও কবেছি।'

সব শুনে ব্রহ্মচারী গুরুদাস বললেন,—'ক্লাসগুলো সম্বন্ধে কি কবা যাবে? আমি কি শিক্ষা দেবো? আমি তো নিজে ছাত্র মাত্র।' —তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন—'তুমি এখনও বোঝো নি বাবা, আদর্শ জীবন যাপনই আসল কথা। জীবনই সৃষ্টি কবে জীবন। সেবা কবো, সেবা করো, সেবা কবো, —এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নম্র হও; সকলের সেবক হও। যিনি সেবা কবতে প্রস্তুত, একমাত্র তিনিই শাসন করতে সমর্থ। তুমি আমাদের কাছে বহু বছর বেদান্ত অধ্যয়ন করেছ। যা তুমি জানো তাই শিক্ষা দাও। তুমি যেমন দেবে, তেমনই পাবে... বাবা, ভারতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা আমি তোমাদেব দিয়েছি মুক্ত হস্তে। এই অমূল্য রত্ন সযত্নে রক্ষা করো... তোমাদের জীবনে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী... ঠাকুর তোমাদের কৃপা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাদের হাত ধরে রয়েছেন। তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করবেন।'[১৭]

স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুন সানফ্রান্সিসকো থেকে ভারতেব উদ্দেশে জাহাজে ওঠেন। রেঙ্গুনে পৌঁছে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সংবাদ খবরের কাগজে দেখে মর্মাহত হন প্রচণ্ডভাবে। সেই মর্মাহত হৃদয়ে কলকাতায় পৌঁছোন ১৪ জুলাই। তিন বছর স্বামীজীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার করে যে পথটি তিনি প্রসারিত করে দিলেন সেই পথেরই যাত্রী হলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

॥ ৫ ॥

স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর ভেঙে যাওয়ায় সানফ্রান্সিসকোর বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মিস্টার এম এইচ লোগান বিবেকানন্দের কাছে অপর একজন সন্ন্যাসীকে পাঠাতে অনুরোধ করেন। বিবেকানন্দ তখন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পাঠানোর জন্য মনস্থির করেন। কিন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের আমেরিকা যাত্রার পূর্বেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণ এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রথম সম্পাদনার দায়িত্বে থাকার দরুণ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পক্ষে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রত্যাবর্তনের পর পরই আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিছুদিন সময় হাতে নিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভার অর্পণ করে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি যাত্রা করলেন সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশে। এবং কলম্বো, জাপান হয়ে সেখানে পৌঁছোলেন ১৯০৩-এর ২২ জানুয়ারী।

সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছোনর পর পরই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজে মেতে উঠলেন। তিনি প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় গীতা ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপনিষদ ও প্রতি রবিবার সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে ক্লাস নিতেন ও বক্তৃতা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যের আগমনে ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেলো। ক্রমাগত ভক্ত-অনুরাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাঁর বক্তৃতা শুনতে জনসমাগমের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি জমি কিনে মন্দির নির্মাণ করার কাজে হাত দিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী সেই মন্দিরের উদ্বোধন হল। এটি পাশ্চাত্যের প্রথম হিন্দু মন্দির। এবং এখনও তা সানফ্রান্সিসকো শহরে একটি চিহ্নিত ঐতিহাসিক স্থান। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত ভক্ত-অনুরাগীদের উদ্দেশে তিনি যে বক্তৃতা করলেন, সেই বক্তৃতায় দৃপ্তকণ্ঠে বললেন,—'যদি এ মন্দির ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয়ে থাকে, তাহলে এটি তাঁর কাজের জন্যে দীর্ঘকাল সগর্বে দণ্ডায়মান থাকবে।' —আশ্চর্যের বিষয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সানফ্রান্সিসকোর ভয়াবহ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড এই মন্দিরের কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নতুন মন্দিরের জমিতে সাধুনিবাস গড়ে তুললেন। দশ জন পুরুষ ভক্ত বাইরে কাজ করতো ও তাঁর অধীনে ভারতীয় ব্রহ্মচারীদের মত জীবনযাপন করতো। তিনি নিজে রান্না করে খাওয়াতেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

জীবনী ও বাণী শোনাতেন ও শাস্ত্র থেকে নানা নীতিকথা ছাপিয়ে শিক্ষা দিতেন। বিবেকানন্দের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে উৎকৃষ্ট চরিত্রই অধ্যাত্মজীবনের পরম শক্তি। নিজের জীবনকে মেলে ধরে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ তুলে ধরে ভক্ত-অনুরাগীদের সংযত জীবনযাপন করতে শেখাতেন আর বলতেন,—'আমি তোমার দেহের প্রত্যেক অস্থি ভেঙে ফেলতে আদৌ ইতস্তত করবো না, যদি তার দ্বারা আমি তোমাকে অমৃতসাগরের তীরে টেনে নিয়ে যেতে পারি এবং তার মধ্যে নিক্ষেপ করি। কারণ তাহলে আমার কর্তব্য শেষ হবে।'[১৮]

প্রেমিক গুরুর ন্যায় অসংযত শিষ্যের কাছে এই বাণীটিই ছিল সংযত হবার প্রকৃত শিক্ষা।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ লস্‌এঞ্জেলসে প্রচারকার্য শুরু করেন। সানফ্রান্সিসকো থেকে লস্‌এঞ্জেলসের দূরত্ব ৫০০ মাইল। তাই একই সঙ্গে দুটি কেন্দ্র পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। তিনি বেলুড় মঠে একজন সহকারী সন্ন্যাসীকে পাঠানোর জন্য চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির সূত্রে স্বামী সচ্চিদানন্দ লসএঞ্জেলসে এলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অসুস্থ হওয়ায় দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তারপর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ থেকে পাঠানো হল স্বামী প্রকাশানন্দকে। তিনি সানফ্রান্সিসকোতে পৌঁছে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কাজে সহায়কের ভূমিকা নিলেন অনেকটাই।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। সকলের শেষে শুতেন ও সকলের আগে উঠতেন। তাঁর তেমন কোন বিছানা ছিল না। মেঝেতে কার্পেটের ওপর কম্বল বিছিয়ে আর একটি কম্বল গায়ে দিয়ে, নিজের বাহুতে মাথা রেখে শুতেন। সকালবেলায় কম্বল দুটি ভাঁজ করে অফিসের টেবিলের নীচে রেখে দিতেন। যোসেফ করভাক নামে এক হাঙ্গেরীয় যুবক বাইরের একটি প্রেসে কাজ করতো ও আশ্রমে এসে রাতে থাকতো। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সেই যুবকটির সাহায্যে যন্ত্রাদি কিনে ছাপার কাজ শুরু করলেন। দূরে অবস্থিত ও কর্মব্যস্ত ভক্ত-অনুরাগী—যারা নিয়মিত ক্লাসে যোগ দিতে পারতো না তাদের জন্য বেদান্তের বাণী 'Voice of freedom' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে ছেপে পাঠিয়ে দিতেন। ছাপা, লেখা, মুদ্রণ সৌন্দর্য এসব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। কেননা তিনিই ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। এই 'Voice of freedom' পত্রিকাটি

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত চালু ছিল। শ্রীম কর্তৃক অনূদিত 'The Gospel of Ramakrishna' (আমেরিকা সংস্করণ) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় সানফ্রান্সিসকো থেকে বের হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মন্দিরের দূরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১৯১২তে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি বছর সানফ্রান্সিসকোর ছাত্রবৃন্দ, যুবক-যুবতীদের নিয়ে শান্তি আশ্রমে কয়েক সপ্তাহ নির্জনবাস করতেন। কর্মযোগ, সাধন-ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও স্তব-স্তুতি, রাতে ধুনির সামনে ধ্যান ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আলোচিত হতো। শান্তি আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস সম্ভব নয় নানা প্রতিকূলতার কারণে, তাছাড়া সানফ্রান্সিসকো থেকে দূরত্বও অনেক। তাই সানফ্রান্সিসকো থেকে দেড় ঘন্টার পথ কংকর্ডে একটা বেদান্ত উপনিবেশ গড়বার প্রয়াসী হলেন। সেখানে বৃদ্ধ বয়সে ভক্ত-অনুরাগীরা অবসর জীবনযাপন করবেন—এটাও স্থির করলেন। ২০০ একর জমি ক্রয় করে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা হল। বেদান্ত সোসাইটির জন্য ২৫ একর জমি বরাদ্দ হল। সেখানে মন্দির ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল। ভক্তেরা নিজেদের চিহ্নিত জমিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসস্থান গড়ে তুললেন। প্রতি শনিবার ত্রিগুণাতীতানন্দ ভক্তদের নিয়ে মন্দিরে অধ্যাত্ম জীবন প্রসঙ্গে ও বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারে অংশ নিতেন নিরলসভাবে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকেই তাঁর নানা শারীরিক উপসর্গ দেখা দিল। তিনি জনৈক শিষ্যকে ডেকে বললেন,—'অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তে বহুবার আমি ভাবি আমার জীবন যাক, আমার জীবন শেষ হোক কিন্তু আমি তা করতে পারি না। কারণ যখন মনে এই চিন্তা আসে যে ঠাকুরের কাজ ঠিকমত চালিয়ে যাওয়া উচিত তখন প্রবল ইচ্ছার দ্বারা দেহকে কার্যক্ষম রাখি।'[১১]

এইভাবে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার করে গেছেন অক্লান্তভাবে। তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলি অত্যন্ত মর্মান্তিক। ক্রিস্টমাসের দুদিন পরে রবিবারের অপরাহ্নে মন্দিরে বক্তৃতার সময় এক বিক্ষুব্ধ যুবক তাঁর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ছাত্রটি আগে মন্দিরেই বাস করতো। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় তাকে মন্দির থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যুবকটি নিহত হয় ও ত্রিগুণাতীতানন্দ গুরুতরভাবে আহত হন। হাসপাতালে ভর্তি করা

হয় তাঁকে। প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে হাসপাতালে শোয়া অবস্থায় মিসেস পিটারসনকে ঠাকুরের মন্দিরের বেদী মেরামতের নির্দেশ দেন এবং নিহত যুবকটির জন্য বারবার অনুশোচনা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারী তাঁর সেবককে ডেকে বলেন, আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি, ঐ দিন তিনি দেহত্যাগ করবেন। রামকৃষ্ণ পার্ষদ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, নিরলস কর্মী, রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবপ্রচাবে অক্লান্ত প্রচারক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ১০ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে মর্ত্যলীলা শেষ করে রামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু ভক্ত-অনুবাগীদের প্রতি তাঁর শেষ আহ্বান চারিদিকে ছড়িয়ে পডলো। তাঁর সেই আহ্বান হল—'নিরন্তর কাজ করে যাও, নিজেকে সংযত কবো, চরিত্র গঠন করো, সহ্যের সীমারেখা বাড়িয়ে তোলো, আত্মজ্ঞান লাভ করো এবং মুক্ত হও।'[২০] একথা তো বেদান্তেবই কথা, একথা তো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের প্রথম ও শেষ কথা। পাশ্চাত্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে প্রথম শহীদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পার্থিব শরীর ত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর কীর্তি অক্ষয় হয়ে রইল।

॥ ৬ ॥

রামকৃষ্ণ মিশনের বহির্ভারতে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচাবে আমবা এতক্ষণ যাঁদের কথা আলোচনা করলাম তাঁদেরই নিরলস প্রয়াসে, প্রজ্ঞার পরিব্যাপ্তিতে বহির্ভারতে বাসিন্দা মর্ত্যভূমিব মানুষ-মানুষীর প্রাণ-মনে ছড়িয়ে পড়েছে অমৃতলোকের বেদান্তের নির্যাস, রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে। তাইতো উত্তরকালে বহির্ভারতে এক এক করে গডে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের নানা শাখাকেন্দ্র।

বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাকেন্দ্রগুলির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা দৃষ্টি ফেরাবো বিবেকানন্দের পদচিহ্নে যে দেশটি মহিমোজ্জ্বল হয়ে আছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি'র কথা। এই কেন্দ্রটি বিবেকানন্দ নিজেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে প্রতি মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিষয়ে, প্রতি শুক্রবার আলোচনা ভগবৎগীতা নিয়ে এবং প্রতি শনি ও রবিবার সমবেত প্রার্থনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত

হয় বিশেষ আলোচনাচক্র। সানফ্রান্সিসকোয় 'বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর নিজের হাতে। এখানে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দির। বর্তমানে সেখানে নিত্য-পুজো অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রবিবার এবং বুধবার সন্ন্যাসীরা ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে আদর্শ জীবন ও চরিত্রগঠনের আলোচনাচক্রে মিলিত হন, প্রতি শনিবার বিশেষ ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রতিদিন অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ আলোচনা ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয় অপরাহ্নে ও সন্ধ্যারতির পর। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রতিষ্ঠিত পুরনো মন্দিরটি ওয়েবস্টার স্ট্রিটে অবস্থিত। সেখানে প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রতি রবিবার ছাত্রদের জন্য একটি সারাদিন ব্যাপী শিক্ষাচর্চার আয়োজন হয়। সমুদ্রতীরে অবস্থিত নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ন্যাসীরা গিয়ে বেদান্তের বাণী সহজভাবে সকলের কাছে তুলে ধরেন। এই কেন্দ্রটির অন্তর্গত তিনটি রিট্রিট বা সাধন-ভজনের জন্য নির্জনাবাস আছে। সেগুলি হল—শান্তি আশ্রম, মান অ্যান্টিনিও ভ্যালিতে, ক্যালিফোর্নিয়ার শেকতাহয়ে এবং ওলেমায় ঘন বনের মধ্যে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি হল—'বেদান্ত সোসাইটি—পোর্টল্যান্ড'; 'বেদান্ত সোসাইটি—প্রভিডেন্স'; 'বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি—চিকাগো'; 'বেদান্ত সোসাইটি অব্ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া—হলিউড'; 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার- নিউইয়র্ক'; 'বেদান্ত সোসাইটি অব্ ওয়াশিংটন-সিয়াটোল', 'বেদান্ত সোসাইটি—সেন্ট লুইস'; 'বেদান্ত সোসাইটি—বার্কলে'; 'রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সোসাইটি—বোস্টন'; 'বেদান্ত সোসাইটি—স্যাক্রাম্যান্টো'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্য ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভাবাধারা দেদীপ্যমান রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো উপরের উল্লেখিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকা অভিযাত্রায় 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার অভিযাত্রায় সানফ্রান্সিসকোতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বেদান্ত সোসাইটি অফ নদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া'। 'পোর্টল্যান্ড বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দ অধ্যক্ষ থাকাকালীন, স্বামী প্রকাশানন্দের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং স্বামী প্রভবানন্দের তত্ত্বাবধানে। স্বামী অশেষানন্দ এবং স্বামী শান্তরূপানন্দের পরিচালনায় এই কেন্দ্রটি বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ

ভাবাদর্শ প্রচারে পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সানফ্রান্সিসকোর মাউন্টেবর জেলায় অবস্থিত এই কেন্দ্রটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সুন্দর কেন্দ্র রূপে বিরাজমান। এই কেন্দ্রে আছে বিশাল চত্বর জুড়ে বড় মাপের একটি বাড়ি। প্রতিদিন সকালে মন্দিরে নিত্যপুজো, জপ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় এখানে। আর আছে একটি গ্রন্থাগার। ভক্ত-অনুরাগীরা কেন্দ্রটি পরিচালনায় যিনি আছেন তাঁর অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে আশ্রমবাস করেন। মন্দিরে বেদান্ত এবং রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত নানা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ছুটির দিনগুলিতে। এছাড়া এই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্কুল কলেজ ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত যুবক-যুবতীদের ছুটির দিনগুলিতে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার সদুত্তর দেন। এই কেন্দ্রের অধীনে পোর্টল্যাণ্ড থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে দৃষ্টিনন্দন কলোম্বিয়া নদীর উপত্যকায় স্ক্যাপোজে ১২০ একর বনস্থলীতে একটি 'রিট্রিট' বা নির্জনাবাস আছে। এই নির্জনাবাসে অবকাশের দিনগুলিতে ভক্ত-অনুরাগীরা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা ও জপ-ধ্যানে অংশ নেন, আত্মজ্ঞান লাভ ও স্থিতিশীল জীবনে পৌঁছবার লক্ষ্যে। এখানে একটি ছোট মন্দিরও আছে।

'প্রভিডেন্স বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অখিলানন্দের উদ্যোগে। স্বামী অখিলানন্দ বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ জনপ্রিয় হবার সূত্রে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রভিডেন্সের এই কেন্দ্রে গড়ে ওঠে একটি মন্দির। ২২৪ এঞ্জেল স্ট্রিটে প্রতি রবিবার শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই শিশু শিক্ষার্থীদের অনেকেই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। প্রতি মঙ্গলবার মন্দিরে বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা-অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ ও ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর বক্তৃতা করতে বিভিন্ন শহরে—স্থানে যান। এই সূত্রে ভক্ত-অনুরাগীরা অনুরক্ত হন।

'চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের উদ্যোগে। এই কেন্দ্রটি ১২০ ইষ্ট দেলওয়ারা প্লেসে অবস্থিত। এই কেন্দ্রে একটি সুন্দর মন্দিরও আছে। সেই মন্দিরে নিত্য পুজো ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জীবনাবসান ঘটলে এই কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন

স্বামী বিশ্বানন্দ এবং তাঁরই সময় নতুন নাম হয় এই কেন্দ্রের—'দি বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি'। নিত্য পুজো ও সন্ধ্যারতি ছাড়া প্রতি রবিবার বিভিন্ন সেবা কার্যে এই কেন্দ্রে অবস্থিত ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং সপ্তাহে দুদিন বিবেকানন্দ-বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনাচক্র হয়। তাছাড়া এখানে একটি গ্রন্থাগার আছে এবং রামকৃষ্ণ-বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্রও আছে। মিশিগানের ফেনভিলের গ্যানজেশ শহরে ৬৭২৩ ১২২ এভিনিউ-এ একটি সাধুনিবাস ও নির্জনাবাস আছে। এটি এই কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে একটি মন্দির, একটি সভাগৃহ, একটি গ্রন্থাগার, একটি বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র, ভারতীয় শিল্প কলা নিয়ে একটি সংগ্রহশালা আছে। এখানেও প্রতিদিন মন্দিরে পুজো ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার ও মঙ্গলবার ভক্ত-সন্ন্যাসীরা নানা সেবাকাজে অংশ নিয়ে থাকে। এবং নির্জনাবাস—সাধন ভূমিতে আগত ভক্ত অনুরাগীদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী জপ-ধ্যান, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত আলোচনার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও 'চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি' সপ্তাহে দুদিন ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনগঠনের উদ্দেশ্যে সারাদিন কর্মশালার ব্যবস্থা করে।

হলিউডে অবস্থিত 'বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া' ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রভবানন্দের দ্বারা উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে একটি মন্দির আছে। আছে সাধুনিবাস, একটি কনভেন্ট এবং একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত-বিষয়ক পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করে চলেছে এই কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রটির অধীনে একটি প্রকাশনা বিভাগ আছে। সেটি হল সান্তাবারবারায় ৯২৭ ল্যাডিরা লেনে। আর ট্রাবুকোর ১৯৯৬১ লাইভ ওক ক্যানন রোডে অবস্থিত ট্রাবুকোতে একটি মন্দির, সাধুনিবাস এবং গ্রন্থ বিক্রয়কেন্দ্র আছে। এমনই আর একটি উপকেন্দ্র আছে সানদিয়াগোর ১৪৪০ ইউপাস স্ট্রিটে। এখানেও আছে একটি ছোট সুন্দর মন্দির ও সাধুনিবাস। প্রতিদিন সকালে মন্দিরে জপধ্যানে প্রাক্ মধ্যাহ্নে নিত্য পুজো অপরাহ্নে সেবাকাজ ও সন্ধ্যারতি ও রামনাম অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী, বেদান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহে প্রতিদিন। এবং রবিবারে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হন। দক্ষিণ প্যাসাডোনায় যে বাড়িতে

(৩০৯ মনটেরি রোড) স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বাব আমেরিকা অভিযাত্রায় অতিবাহিত করেছিলেন সেখানে বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত নানা সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এই স্থানটির দেখাশোনাব ভার হলিউডের এই কেন্দ্রের।

'নিউইয়র্ক বামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার', ২০০ ওযেষ্ট ৫৭ স্ট্রিটে অবস্থিত স্বামী নিখিলানন্দের উদ্যোগে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতি রবিবার এখানে নানা সেবাকাজ অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে অবস্থিত সন্ন্যাসী অধ্যক্ষকে আমেবিকাব বিভিন্ন শহরে ভাবতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষযে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে তুলনামূলক ধর্মালোচনা হয। বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে, দুর্গাপুজো, বুদ্ধদেব, শ্রীবামকৃষ্ণ, সারদাদেবী এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিথির দিনে। এই কেন্দ্রে একটি বড় গ্রন্থাগাব আছে। সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থও আছে। সব মিলিয়ে গ্রন্থেব সংখ্যা ১,০৫৮ এবং পত্র-পত্রিকাব সংখ্যা ১০। এই কেন্দ্র থেকে ইংবেজি গ্রন্থ মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। ভক্ত ও অনুবাগীরা নিয়মিত গ্রন্থাগাবে আসেন এবং অংশগ্রহণ করেন আলোচনায়। বিশেষ তাৎপর্যবাহী দিনগুলিতে অংশ নেন অনুবাগীবৃন্দ সাড়ম্বরে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কেব থাউজেন্স আইল্যাণ্ডে যে 'Inspired Talks' বা প্রেবণা সঞ্চারী বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে একটি বিবেকানন্দ কুটির নির্মিত হয়েছে। এই বিবেকানন্দ কুটিবে প্রতিদিন নানা বিষয় আলোচিত হয়। সন্ন্যাসী ছাড়া ছাত্রছাত্রীবা এখানে উপস্থিত থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতির শতবর্ষ সাড়ম্বরে এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই অনুষ্ঠান সরাসরি টেলিভিসনে দেখানো হয়েছিল। এই স্থানটি, এই কেন্দ্রটি রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা কবে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচতলা বিশিষ্ট স্থায়ী বাড়ি তৈরী হয় আবাসনভূমিতে।

সিয়াটলে 'বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েষ্টার্ন ওয়াশিংটন' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিদিশানন্দের উদ্যোগে। প্রতি রবিবার ভক্ত অনুরাগীদের সঙ্গে এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ বিভিন্ন সেবাকাজ পরিচালনা করেন এবং প্রতি মঙ্গলবার নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মজিজ্ঞাসু ভক্ত-অনুরাগীদের নানা প্রশ্নের সদুত্তর কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ দিয়ে থাকেন এবং চার্চে এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষকে আমন্ত্রিত করে নিয়ে যাওয়া হয়। হল্যাণ্ড, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে এই কেন্দ্রের

সন্ন্যাসীরা বেদান্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আলোচনায় অংশ নিতে যান। এই কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে। গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ হাজার। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্ত পুস্তক বিক্রয়ের জন্য একটি কেন্দ্র আছে।

বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত একটি বাড়ি আছে যেখানে সন্ন্যাসীবৃন্দ গিয়ে বিভিন্ন সময় অতিবাহিত করেন। প্রতি মাসে নির্জনবাস ও জপধ্যানের জন্য অ্যারিলিংটনের সংলগ্ন স্নোহোমিশ কানট্রিতে ট্যাপোভ্যানে এই নির্জনাবাস অবস্থিত।

'সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের উদ্যোগে। এই কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রতি রবিবার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। এই কেন্দ্রের বাইরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা প্রশ্নের সদুত্তরও তিনি দেন। সেই সঙ্গে কানসামে অবস্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন। এই কেন্দ্রে ২,৫৭০টি গ্রন্থ নিয়ে একটি গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এছাড়া আছে অডিও ক্যাসেট-এর লাইব্রেরী এবং প্রকাশনা বিভাগ। এই সূত্রেই তিনটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ভিডিও ক্যাসেট ও ছ'টি সঙ্গীতের ক্যাসেট, বারোটি গ্রন্থ এবং তিনটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বাণী সংবলিত প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

'বার্কলে বেদান্ত সোসাইটি' ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বামী অশোকানন্দের উদ্যোগে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। এই কেন্দ্রে প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতিদিন ভক্ত-অনুরাগীদের ধর্ম-দর্শন বিষয়ে উত্তর দেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। এই কেন্দ্রে ২,৭০০ টি গ্রন্থ নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বিভিন্ন শহর থেকে সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ আমন্ত্রিত হয়ে যান ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা করতে। এছাড়া মাসে দু'বার এই কেন্দ্রে সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন তিনি।

'বোস্টন রামকৃষ্ণ মিশন' ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী সর্বোগতানন্দের উদ্যোগে। এই কেন্দ্রটির পরিবর্ধনের জন্য স্বামী পরমানন্দের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ম্যাসচুসেটস্ ইন্‌স্টিটিউ অব টেকনোলজি, হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কেন্দ্র থেকে সন্ন্যাসীরা বক্তৃতা করতে যান।

এই কেন্দ্রের ৬০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাসফিল্ডে একটি উপকেন্দ্র পরিচালিত হয় এই কেন্দ্রের দ্বারা। এছাড়া ছোটদের জন্য বিভিন্ন কর্মশালা এবং ভক্তদের জন্য নির্জনবাসের ব্যবস্থা করে থাকে এই কেন্দ্র।

'স্যাক্রাম্যান্টো বেদান্ত সোসাইটি' ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায়। স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী বোধানন্দকে সাহায্য করার জন্য ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পৌঁছোন নিউইয়র্কে, আবার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্যের জন্য ভারতে ফিরে আসেন, তাঁর স্থান পূরণের জন্য জ্ঞানেশ্বরানন্দ যান। প্রতি রবিবার নানা সেবাকার্যে অংশ নেন এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসী ও ভক্ত-অনুরাগীরা। বুধবার সন্ধ্যায় বেদান্ত প্রসঙ্গ আলোচিত হয় এবং শনিবার সকালে 'সৎসঙ্গ' শীর্ষক একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেই অনুষ্ঠানে জপ-ধ্যান ও ধর্মীয় নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। রামকৃষ্ণ জীবন ও ভাবাদর্শ আলোচিত হয়। এখানে একটি ছোট মন্দির আছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সমবেত ধ্যান হয়। একটি গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা শহরের নানা স্থানে ভারতীয় ধর্ম দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শান্তি উদ্যান নামে চার একর জমির উপর আছে একটি নির্জনাবাস। অনুরাগীরা সেখানে নির্জনবাস করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে যথাযোগ্য মর্যাদায়।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার অভিযাত্রায় 'বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া' এবং তার আগে প্রতিষ্ঠিত 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি' এই দুটি কেন্দ্রের সাহায্যে বাকী ৪০টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহির্ভারতে। স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত কেন্দ্রের সম্প্রসারণে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নানাভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এটিকে রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী স্বামী প্রকাশানন্দের জীবনাবসান ঘটে। এখানে তিনি দীর্ঘ ২০ বছর নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। বেদান্ত প্রচারে যথার্থ যোদ্ধা স্বামী প্রকাশানন্দের নাম আমেরিকার মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে না। তাঁর মৃত্যুর পর স্বামী মাধবানন্দ প্রকাশানন্দের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর নিউইয়র্ক কেন্দ্রটি যা কিনা স্বামী বোধানন্দের নেতৃত্বে চালিত হতো, তাঁকে সাহায্য করার জন্য স্বামী রাঘবানন্দ গিয়েছিলেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি স্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর পরিবর্তে জ্ঞানেশ্বরানন্দ

তার স্থান গ্রহণ করেন। 'সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটি' শুধু বিভিন্ন কেন্দ্র তৈরীর উদ্যোগই গ্রহণ করেনি, এই কেন্দ্রের পরিবর্ধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ওলেমায় স্থিত পাহাড় এবং বনাঞ্চলে ২ হাজার একর কিনে সমুদ্রের ধারে তা বসবাসের জন্য উন্নত করে একটি রিট্রিট বা নির্জনাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরনো মন্দিরে চলতে থাকে সন্ন্যাসীদের জপ-ধ্যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কেন্দ্রের পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রসার ঘটে। স্বামী নিখিলানন্দ নিউইয়র্ক কেন্দ্রে অধ্যক্ষ থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে কিছু সংস্কৃত শাস্ত্রও ইংরেজিতে প্রকাশ করেন।

অরিগনে (Oregon) পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী প্রকাশানন্দ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্বামী প্রভবানন্দের তত্ত্বাবধানে। স্বামী দেবাত্মানন্দ এই কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে তিনি একটি বৈদিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২০৬ এন. ডবলিউ টুয়েন্টি ফিফথ্ অ্যাভিনিউতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী অশেষানন্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কারণ স্বামী দেবাত্মানন্দ স্বাস্থ্যের কারণে দেশে ফিরে আসেন। চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪৪ ইন্দ্র এলম স্ট্রিটে, সাউথ হাইড পার্কের কাছে নিজেদের প্রশস্ত জমিতে বড় বাড়ি নির্মাণ করে স্থানান্তরিত হয়। ওয়াশিংটনের সিয়াটল কেন্দ্রটি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে, ২৭৯১ এডওয়েতে স্থায়ী ভাবে সুন্দর আশ্রম গড়ে তোলে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেই সব কেন্দ্রের পল্লবিত প্রসার ঘটে।

স্বামী সর্বোগতানন্দ বোস্টন এবং প্রভিডেন্স দুটি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার তীব্র গতি লাভ করে। এক্ষেত্রে স্বামী প্রভবানন্দ বড় মাপের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত ভক্ত-অনুরাগীরা ছিলেন বেলুড় মঠ থেকে তাঁদের সন্ন্যাস দেবার অধিকার দেওয়া হল। স্বামী প্রভবানন্দের দ্বারা বেদান্ত এবং হিন্দুশাস্ত্রের নানা গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হলে স্থানীয় অনুরাগীরা সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহী হন। 'Vedanta and the West' নামে গ্রন্থটি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। একটি সুন্দর বেদান্ত ভিত্তিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় সান্তাবারবারায় ১৯২৬-এ তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী নির্বানানন্দের উপস্থিতিতে।

স্বামী প্রভবানন্দ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সানফ্রান্সিসকো গিয়েছিলেন স্বামী প্রকাশানন্দের সহকারী রূপে।

॥ ৭ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারে বড় মাপের সাফল্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সিঙ্গাপুর, আর্জেন্টিনা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ফিজিতে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়। সিঙ্গাপুর কেন্দ্রটি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী আদ্যানন্দকে অধ্যক্ষ করে পাঠানো হয়। প্রথমে ভাড়া বাড়িতে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ৯ নরিস রোডে নিজস্ব জমিতে নবনির্মিত রামকৃষ্ণ মিশন স্থানান্তরিত হয়। সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন নিরলস ভাবে নানা কাজ করে চলেছে শুরু থেকেই। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগারটি বর্ধিত আকারে উদ্‌বোধন করা হয়। সূত্রাকারে এইভাবে আমরা এই কেন্দ্রের কাজগুলি বিভক্ত করতে পারি—

ক) ৪৪টি দুঃস্থ ছাত্রদের থাকার জন্য স্টুডেন্টস্ হোম আছে।

খ) একটি কিণ্ডারগার্ডেন স্কুল আছে। সেখানে ১৮১ জন ছাত্র পড়াশুনা করে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই কেন্দ্রের আরো বিস্তার ঘটে।

গ) বিভিন্ন সময়ে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা সেই সভায় যেমন উপস্থিত থাকেন তেমনি থাকেন সন্ন্যাসীরাও।

ঘ) মিশনে প্রতিদিন ভক্ত ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঙ) একটি সুদৃশ্য আধুনিক গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে। বই-এর সংখ্যা ছ'হাজার। পনেরোটি পত্রপত্রিকা পাঠ করার সুযোগ পায় পাঠকেরা।

চ) সপ্তাহের শেষে বিশেষ বক্তৃতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে-আলোচনা সভা, সংস্কৃতিচর্চা এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়।

ছ) 'নির্বান' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

জ) একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। ২৫০ জন বছরে চিকিৎসার সুযোগ পান।

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্এয়ারস্-এ 'হোগার এসপিরিচুয়াল ডি রামকৃষ্ণ, বুয়েনস্এয়ারস্' (Hogar Espiritual De Ramakrishna, Buenosaires) রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন লাভ করে। দক্ষিণ আমেরিকার সমৃদ্ধশালী এই দেশটিতে এই কেন্দ্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্প্যানিস ভাষা ভালো জানতেন বলে তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছিলো। এই কেন্দ্রটিতে অধ্যাত্ম-বিষয়ক নানা কাজ-কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং সপ্তাহ শেষে ধর্মপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। এই কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার আছে। আছে প্রকাশনা বিভাগ। প্রকাশনা বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত ২৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জনৈক ভক্ত এটি পরিচালনা করেন। আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহরের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হন। আবার কখনো কখনো ব্রাজিলে বিভিন্ন আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যোগ দেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাব ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে। জার্মানীতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা প্রথম থেকেই ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের ভাব প্রচারের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে বিষয়টি। জার্মানীতে রিনেল্যাণ্ড-এর ওয়ে বা বার্ডেনে যান য্যোতিশ্বরানন্দ। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শীতের সময় থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যাণ্ডে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবপ্রচারের জন্য, সেখানে সেন্ট মরিজে স্টাডি সারকেল তৈরী করে পরে অন্যান্য স্থানে যান। তারপর সেখানে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে হল্যাণ্ড এবং প্যারিস ও লণ্ডনে যান। তাঁর এই পরিক্রমা সূত্রে হল্যাণ্ড অর্থাৎ নেদারল্যাণ্ডসে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি অব নেদারল্যাণ্ডস' (Ramakrishna Bedanta Verenigin Nederland, Amstelveen)—প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং এটি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতি রবিবার এবং সপ্তাহে একদিন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়। আর য্যোতিশ্বরানন্দের পরিক্রমার সূত্রে গড়ে ওঠে নির্জনাবাস এই কেন্দ্রের অধীনে। সাম্প্রতিককালে ইতালিতে এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে প্রতিদিন মন্দিরে পুজো, বৈদিক স্তোত্র পাঠ, ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এই কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার আছে। এই কেন্দ্র থেকে 'বেদান্ত' নামে ত্রৈমাসিক একটি পত্রিকা ডাচ ভাষায় প্রকাশিত হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় 'সেন্টার বেদান্তিক' (Centre Vedantique) —বেদান্ত সেন্টার ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ভাড়া বাড়িতে। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে একটি অত্যাধুনিক স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শনবাহিত নিজস্ব বাড়িতে কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয় জেনেভা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে। এই কেন্দ্রের মন্দিরে পুজো, জপ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ফ্রান্স, ইতালির নানা শহরে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে যান। জেনেভা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি অডিটোরিয়ামে তিনি প্রতি ছুটির দিন গীতা পাঠ করেন সন্ধ্যায়। আমরা তো জানি জেনেভায় অবস্থিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই শহরে নানা দেশের মানুষ বাস করেন। সেই সূত্রে নানা ধর্ম-তত্ত্বের আলোচনায় তাঁকে অংশ নিতে হয়।

১৯৫৫—৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতল বাড়ি তৈরী হয় এবং সেই বাড়িতে মহিলা ভক্তদের স্বতন্ত্রভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ এপ্রিল স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের মৃত্যুতে স্বামী নিত্যবোধানন্দ এই কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির ফলে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেন নি।

ফ্রান্সের গ্রেজে 'সেন্টার বেদান্তিক রামকৃষ্ণ' (Centre Vadentique Ramakrishna)—এই কেন্দ্রটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারিসে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। পরে নিজস্ব জমি ও বাড়ি তৈরী হয়। গ্রেজ, প্যারিস থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে একটি মন্দির আছে। জপ-ধ্যান হয়। সন্ধ্যায় ধর্ম-দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। রবিবার ও ছুটির দিনে নির্জন বাস, আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় এখানে। ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দেন এই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তাছাড়া ফ্রান্সের নানা স্থানে স্টাডি সার্কেল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবাদর্শ প্রচারে অংশ নেয়। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ অধ্যক্ষ হয়ে এই কেন্দ্রে যান। তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। জনৈক ভক্তের দেওয়া অর্থে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে গ্রেজে একটি বড় মাপের জমি কেনা হয়। জুন মাসে জমির দখলে নেওয়া হয় এবং পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলার পেছনে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের ভূমিকা স্মরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যান। ফলে বেদান্ত প্রচারে ভাঁটা দেখা যায়। তারপর বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি বেদান্ত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর স্বামী জ্ঞানানন্দ এই কেন্দ্রটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডের বর্ণ এণ্ডে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার' (Ramakrishna Vedanta Centre) ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। লণ্ডন থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। প্রতি রবিবার নানা সেবামূলক কাজ হয়ে থাকে। নির্জনবাস, উপাসনা, জপ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। ধ্যান ও তার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয় সন্ধ্যার পর। নানা স্থানে এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ আমন্ত্রিত হন। ধর্ম পিপাসু মানুষের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। জার্মানী, ফ্রান্সে নির্জনবাসের ব্যবস্থা করা হয় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে। 'বেদান্ত' নামে দ্বিমাসিক পত্রিকা এই কেন্দ্র থেকে ৪৫ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৪ হাজার ৪০০ পাউণ্ড বিভিন্ন দাতব্য কাজে ব্যয়িত হয়েছে ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ায় গত আর্থিক বছরে। স্বামী অব্যক্তানন্দ বেদান্ত প্রচারের কাজ লণ্ডনে এগিয়ে নিয়ে যান ১৯৪৯-এ স্বামী ঘনানন্দের পরিবর্তে। 'Vedanta for the East and West' দ্বিমাসিক পত্রিকা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে প্রকাশের ক্ষেত্রে অব্যক্তানন্দের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কাজ শুরু হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে কেন্দ্র করে বেদান্ত প্রচারে ইংলণ্ডের মানুষ-মানুষী বিশেষ আগ্রহসহ সমবেত হন। তাঁর দুই সতীর্থও সেখানে বেদান্ত প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। স্থায়ী বেদান্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দুই সতীর্থের সাহায্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে লণ্ডনে। ম্যাক্সমূলার, ই. টি. স্টার্ডির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো নিবেদিতা ও হেনরিয়েটা মূলারের উত্থান এখান থেকেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বামী আদ্যানন্দ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় বেদান্ত প্রচারে যান। জোহানেসবার্গ, ডারবান, পিয়েটার, মরিস্‌বার্গ এবং অন্যান্য স্থানে নানা বাগ্মিতার পরিচয় দিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র অবশ্য এসব স্থানে গড়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউরোপ ও আমেরিকার কেন্দ্রগুলি এবং বিভিন্ন স্টাডি সার্কেল সমবেতভাবে নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত চর্চা, জপ-ধ্যান, পত্র-পত্রিকার ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশ এবং নির্জনবাস ইত্যাদি কাজ করে চলেছে। সেই সমস্ত দেশের নিয়ম মেনে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এই সব কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

ফিজি দ্বীপভূমির 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্বামী অবিনাশানন্দের উদ্যোগে। ওই দ্বীপভূমিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের অনুরোধে আট মাস ওখানে বাস করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবাদর্শ প্রচার করেন তিনি। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে স্বামী রুদ্রানন্দ সেখানে যান। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বীকৃতি পায় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে প্রতিদিন মন্দিরে পুজো হয়। ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা হয়। এই কেন্দ্রটি একটি মাধ্যমিক স্কুল, একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করে। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,১৫০ জন এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৫ জন। সুসজ্জিত গ্রন্থাগারে ৩,২৭৪টি পুস্তক আছে। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এই কেন্দ্রটি। তাছাড়া দরিদ্র মানুষদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার জন্য নানা প্রকল্প রূপায়িত করে চলেছে এই কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ফিজি ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে আমন্ত্রিত হয়ে ধর্ম-দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা করতে যান। এখানে একটি স্টুডেন্টস্ হোমও আছে।

আফ্রিকা থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে স্বামী নিঃশ্রেয়ানন্দ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গিয়েছিলেন নাইজেরিয়া ও অন্যান্য দেশগুলিতে। সল্সবেরির রোডেস এভিনিউ-এ তিনি থাকতেন এবং ভাবপ্রচারে যেতেন নানা স্থানে। যদিও এখানে পরবর্তীকালে মিশনের কোন স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি।

মরিসাস দ্বীপপুঞ্জের ভ্যাকোজে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি মন্দির আছে। প্রত্যহ পুজো-সন্ধ্যারতি হয়। একাদশী তিথিতে রামনাম হয়। দুর্গাপুজো ও কালীপুজো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সাপ্তাহিক ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা হয় ছুটির দিনে। বিশেষ সাধন-ভজন ও নির্জনবাসের ব্যবস্থা হয়। এই কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার আছে। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৪,০৩৫। রয়াল রোডে অবস্থিত সেন্ট জুলিয়ান ডি হটম্যানে একটি উপকেন্দ্র আছে। এখানে একটি স্কুল আছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫। হিন্দি মাধ্যমের স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০। এখানে ছুটির দিন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

কানাডার রাজধানী টরেন্টোয় 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। অনুমোদন পায় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এখানকার অধ্যক্ষ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। এছাড়া ভক্ত-অনুরাগীদের নিয়ে

বার্ষিক সাধন-ভজনের ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নবনির্মিত ভবনে কেন্দ্রটি পরিপূর্ণভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে।

জাপানে 'নিপ্পোন বেদান্ত ক্যোক্ক কাঞ্জা কান' (Nippon Vedanta Kayak Kangiwa-Kan —বেদান্ত কেন্দ্র) ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের অনুমোদন পায়। প্রাত্যহিক সন্ধ্যায় ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এই কেন্দ্রে এবং টোকিওতে নির্জনবাসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে প্রতি মাসে। এই কেন্দ্র থেকে দ্বিমাসিক পত্রিকা জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয়। জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে নানা ধর্মগ্রন্থও।

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে প্রথমবার ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী পৌঁছেছিলেন। অধিবাসীরা তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিল। বিবেকানন্দ উত্তরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই শ্রীলঙ্কার মানুষজনেরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি। ভারতবর্ষ সংলগ্ন এই দ্বীপভূমিতে তারা কাজ শুরু করেন কিছু স্কুল পরিচালনার মধ্য দিয়ে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয় কলম্বো 'রামকৃষ্ণ মিশন' কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আশ্রমটি সৈনিকদের আবাসভূমি হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন পুনরায় তার কাজ শুরু করে। এই কেন্দ্রে যে কাজগুলি বর্তমানে হয়ে থাকে তা হল—

ক) প্রতিদিন মন্দিরে পুজো ও সন্ধ্যারতি হয়। বিভিন্ন উৎসব পালিত হয় এবং সাপ্তাহিক ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

খ) ৫,০০০টি গ্রন্থ নিয়ে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে।

গ) প্রতি রবিবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্র পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে প্রায় ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনো করে। এঁদের মধ্যে অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। তাদের বই-পত্র, পোষাক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

ঘ) অতিথি নিবাস সংযুক্ত এখানে একটি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র আছে। এখানে তুলনামূলক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঙ) কলম্বো শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম এই কেন্দ্রের অধীনে অবস্থিত। এটির নাম 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী হল'। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশে এটি নির্মিত হয়েছে।

চ) আর্থিক দিক থেকে দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য প্রকল্প চালু আছে। তাদের আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়।

ছ) দুঃস্থ-অন্ত্ত-কাতর মানুষদের জন্য বিশেষত শিশুদের জন্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কল্যাণমূলক কাজের প্রকল্পে তিন লাখ টাকা খরচ হয়েছে গত আর্থিক বছরে।

জ) কলম্বো শহর জুড়ে প্রত্যেক স্কুলে আদর্শজীবন ও চরিত্র গঠনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কেন্দ্রের অধীনে উপকেন্দ্র আছে বাত্তিকালোয়ায়। সেখানে তিনটি অনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জায়গা আছে।

ঝ) এখানে একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে নিত্যপুজো ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঞ) রবিবাসরীয় স্কুলে ৩০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়। এছাড়া শরণার্থী এবং দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের জন্য বই-পত্র পোষাক এবং বাড়ি তৈরীর সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। এই বাবদ বিগত আর্থিক বছরে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে।

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সোসাইটি' (Obschestro Ramkrisini Centreventi)। এই কেন্দ্রটি ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল। এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দতো সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ তেমনভাবে গ্রহণ করেনি। রাশিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে রাশিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে রুশ-ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ দ্রুত সঞ্চারিত হয়েছে। ভারতে এসে তাঁরা আরো বেশি এই ভাবাদর্শকে জানার জন্য উদ্যোগী। এই কেন্দ্রে নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। লিথুনিয়ায়ও তাঁকে যেতে হয়। বহির্ভারতের এই সব কেন্দ্রগুলিতে রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিথি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোন কোন কেন্দ্রে যীশুখ্রীষ্ট ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের দিন যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন দক্ষিণ ভারতের নানা প্রান্তে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার করে চলেছেন অক্লান্তভাবে, তখন তিনি ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনেও প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেছিল।

এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল ভারত সরকার, ব্রহ্মদেশ সরকার ও রেঙ্গুনের জনসাধারণের আর্থিক সাহায্যে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটিতে ৩০০ শয্যাসমেত অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল এবং একটি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাসপাতালের বহির্বিভাগীয় নতুন ভবনটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নতুন দুটি ভবন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে তা উৎসগীকৃত হয় ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই হাসপাতালটি তৎকালীন ব্রহ্মদেশের সৈনিকদের দ্বারা পরিচালিত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয় এবং পরপরই রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি পরিচালনার কাজটিও তারা বন্ধ করে দেন। তাই রেঙ্গুনের জনপ্রিয় রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়—এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রকাশিত বার্ষিক সাধারণ কার্যাবলীর ভিত্তিতে আমরা জানতে পারছি রেঙ্গুনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের আরো একটি কেন্দ্রে অবস্থিত সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে ৪৪,৭১৪টি গ্রন্থ ছিল যা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত। এই কেন্দ্রটির নাম ছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি'। এখানে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্ম বিষয়ক আলোচনা চক্র, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হতো। এজন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল বিবেকানন্দের নামে নামাঙ্কিত লেকচার হল। এই কেন্দ্রটি থেকে কিছু বই বার্মিজ ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই কেন্দ্রটিও ঐ বছরে একই কারণে বন্ধ হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী রেঙ্গুনের দুটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানী বোমা ও জাপানী সৈন্যদের ছোঁড়া গোলাগুলিতে রেঙ্গুনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি কেন্দ্রই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য, মানসপুত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামটি বিশেষভাবে যুক্ত। আজাদ্-হিন্দ্ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এস্.এ. আয়ারের দেওয়া তথ্য থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আজাদ্-হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মকেন্দ্র সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি প্রায়ই

যেতেন এবং মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতেন। আজাদ্-হিন্দ্ সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা এবং নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবনাথ দাস রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নেতাজীর গভীর যোগাযোগের কথা অপর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং কারাসঙ্গী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে বলেছিলেন। ১৯৪৫-এর ২৪ এপ্রিল, যেদিন রাত্রিতে নেতাজীকে প্রায় শত্রু-কবলিত রেঙ্গুন ত্যাগ করতে হয়, তার আগের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল একটি অনবদ্য মর্মস্পর্শী ঘটনাচিত্র দিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী,—'সেদিন ছিল সত্যি বিচিত্র এক আশ্চর্য দিন। আত্মনিবেদনের এক অবিস্মরণীয় দিন। রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বাহ্ন। আজীবনের স্বপ্ন ও আদর্শের গোটা আলেখ্য নিজের চোখের সামনে ভেঙে পড়ছে ঝুরঝুর করে। সম্মুখে শুধু অন্ধকারের পারাবার। সেই চরম সঙ্কট মুহূর্তে, রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বক্ষণে নেতাজী সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ খুলে পরেছিলেন পট্টবস্ত্র। শুচি-শুভ্র নির্বিকার যোগী একাকী চলে গিয়েছিলেন তাঁর আদর্শ দুই পুরুষ—জীবনদেবতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবায়তনে। রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরে। বসেছিলেন যুগ ঋষির মূর্তির সম্মুখে সমাহিত হয়ে তৎগত-তন্ময় চিত্তে। উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজেকে। মহাপ্রয়াণের পূর্বাহ্নে নিজেকে কি দেখতে চেয়েছিলেন তিনি? চিনেও কি ছিলেন? মৃত্যু যে মরা নয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে সব শেষ হয়ে যায় না,—একথা তাঁর মনে জেগেছিল। তিনি তাঁর অন্তর্দেবতা, জীবনদেবতার কাছ থেকে বোধহয়, সেই সত্যটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের জীবন যাঁর সাধনা স্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই জীবনের প্রভাব কত গভীর ও তীব্র হলে সেই পরম সঙ্কট মুহূর্তে—আমরা কল্পনাও করতে পারি না, নেতাজী অমন করে সমাহিত করতে পেরেছিলেন যেভাবে নিজেকে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।'[২১]।

মালেশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবেকানন্দ আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায় এটি। এই আশ্রমটি সচল থাকার ক্ষেত্রে স্বামী সর্বানন্দ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বামী বিদেহানন্দ দায়িত্ব নেন এটি বেলুড় মঠের অনুমোদন পাওয়ার পর। নানা সেবামূলক ও অধ্যাত্ম-চেতনা সম্প্রসারণের কাজে এই কেন্দ্রটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই কেন্দ্রে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ও একটি বিদ্যালয় ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে প্রধান কেন্দ্র এই কেন্দ্রের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেয়।

পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল চল্লিশের দশকের শুরুতে, সেই দুর্ভিক্ষে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য শুরু করেছিল এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তা চলেছিল। এই ত্রাণকার্যে খরচ হয়েছিল ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা। এই ত্রাণকার্যের জন্য বর্তমান পাকিস্তানের অধীন করাচি শহরে অবস্থিত (তৎকালীন ভারতবর্ষের অধীন) 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর শাখাকেন্দ্র থেকে ২,০০০ টন চাল পাঠানো হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছিল অর্থ ও নানা দ্রব্য-সামগ্রী সাহায্য রূপে। চলতি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে করাচিতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের এক সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ অগাস্ট তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ অগাস্ট যেদিন করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের বিলুপ্তি ঘটে সেদিন পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বভার পালন করেছেন। তিনি দায়িত্ব নেবার পর করাচি কেন্দ্রটি নানা কর্মসূচী রূপায়ণে সক্ষম হয় এবং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

স্বামী রঙ্গানাথানন্দ প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় 'গীতা প্রসঙ্গ' আলোচনা করতেন। প্রথম প্রথম ৫০-৬০ জন ভক্ত-অনুরাগী গীতা প্রসঙ্গ আলোচনা সভায় যোগ দিত। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেই সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এবং শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছে ছিলো ১০০০-এ।

ভারতীয় উপমহাদেশে গীতার বাণী মানুষের জীবনে কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তা তাঁর আলোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, সেই জন্যই শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত করাচি রামকৃষ্ণ মিশনে এই বিপুল সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতি ঘটতো। এই শ্রোতাদের মধ্যে শুধু হিন্দু শ্রোতাই থাকতো নয়, মুসলিম এবং খ্রীষ্টান শ্রোতাও থাকতো। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্নিহিত সিন্ধি স্কুলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিলো স্বামী রঙ্গনাথানন্দের উদ্যোগে। আসলে সেখানকার সিন্ধিরা ফার্সী, আরবী, উর্দু ভাষা সম্পর্কে যতটা অবহিত ছিল, ততটাই অনভিজ্ঞ ছিল সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জীবন ও বাণী সংস্কৃত ভাষা চর্চার মধ্যে দিয়েই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিখধর্মী মানুষদের মধ্যে তুলে ধরার জন্যই এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছিলো। সেইসঙ্গে শাশ্বত হিন্দু ধর্মের নানা অধ্যায়ের প্রসঙ্গও তুলে ধরা হতো।

একদিকে সংস্কৃত ভাষা চর্চার মধ্যে দিয়ে হিন্দু-শিখ ধর্মের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং গীতা-প্রসঙ্গ আলোচনা সভায় উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে আদর্শায়িত জীবন বোধের অনুপ্রাণণায় সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বালগঙ্গাধর তিলক রচিত 'গীতা রহস্য' এবং মহাভারত ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সাহিত্য গ্রন্থের বিক্রি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের ভ্রান্ত নীতির ফলে — লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলা দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল। সেই সময়ে করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজে স্বল্পকালের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিলো এবং দু'হাজার টন চাল ও সরবরাহ করা হয়েছিলো। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে সমাজসেবা ও আর্ত মানুষদের সেবার কাজে এই কেন্দ্রটি আত্মনিয়োগ করেছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধ্-এর অন্তর্গত সুক্কুর শহরে অগ্নিকাণ্ড জনিত ত্রাণসেবা কাজে অংশ নিয়েছিলো রামকৃষ্ণ মিশন সিন্ধ্ রাজ্যটি তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিলো। (এই কেন্দ্রটি প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) তাই বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সেবা কাজে অংশ নেবার জন্য সন্ন্যাসী ও অনুরাগীরা এসেছিলেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড: সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ তখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তিনি স্বামী রঙ্গানাথানন্দের আহ্বানে করাচী রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছিলেন এবং কয়েকদিন ছিলেন। একদিকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার প্রসার-এর দুটি কাজই করাচি রামকৃষ্ণ মিশন বিলুপ্তির আগে পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে করে গিয়েছে। করাচির রামকৃষ্ণ মিশনের বিলুপ্তির পর স্বামী রঙ্গনাথানন্দ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর করাচী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা দেশবিভাগের পর ভারতবর্ষে আগত হিন্দু শরনার্থীদের সেবায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের ত্রাণশিবিরে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ তারই সাক্ষ্য বহন করে। করাচির রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফর খানের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। করাচি রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের মদতে মৌলবাদী মানুষদের দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। আক্রান্তকারীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কিছু লুটপাঠ করে ও ওসব নিয়ে চলে যায়। এই পরিস্থিতিতে করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী আশ্রমটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি বেদনার বিষয়।

অব্যবহিত পরবর্তীকালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তার কর্ম পরিধি তেমন ভাবে 'রামকৃষ্ণ মিশন' কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর তেমন ভাবে তার কার্য প্রসারিত করতে পারছিল না বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার প্রেক্ষিতে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠের নির্দেশ অনুযায়ী এই কেন্দ্রটি তার কর্মপরিধি ক্রমশঃ গুটিয়ে আনে দেশবিভাগের পরপরই অর্থাৎ ১৯৪৭-এ। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছরের ১৫ আগষ্ট এই কেন্দ্রটি পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বৃহত্তর অংশটি বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান যেমন গঠিত হয়েছিল তেমনি পাঞ্জাবের একটি অংশের বিভাজনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এই পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল লাহোর কেন্দ্রটি। লাহোর কেন্দ্রটি বন্ধ হওয়ার পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীগড়ে নতুন করে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ ৮ ॥

অবিভক্ত ভারবর্ষের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) এবং বর্তমান পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজটি নানাভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য কেন্দ্রের মতই সংগঠিত হতো। এই সূত্রে সেখানে শিক্ষার সম্প্রসারণে বিদ্যালয়, সচেতনতার জন্য গ্রন্থাগার এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অঙ্গীভূত দাতব্য চিকিৎসালয় চালু ছিল। ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারসহ বিশাল কর্মপরিধির কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু কালের নির্মম আবর্তনে রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র দুটি যেমন বন্ধ হয়েছে, সময়ের অভিঘাতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ায় লাহোর ও করাচি কেন্দ্র দুটির বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু সংখ্যালঘু হয়েও হিন্দু-বাঙালীদের বসবাসের সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি তাদের কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা ও সরকারী বে-আব্রু আক্রমণের মুখে পড়েও। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পাকিস্তান যখন স্বাধীন 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল তখন রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে তাদের যে সমস্ত কাজকর্ম শুরু করেছিল, সেই কাজকর্ম আজও অব্যাহত। পশ্চিমবাংলার মত পূর্ববাংলা একই কর্মধারায় প্রসার লাভ করেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে কিন্তু পরবর্তীকালে তা রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের ঝাপ্টায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে বাঙালি আজ দুটি ভাগে

বিভক্ত। তাই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বাংলাদেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলির আলোচনা 'বহির্ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয় এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়। পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে মূল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করে। তার নাম হয় 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের সংখ্যা ১০টি।

প্রথম এবং প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় অবস্থিত। ঢাকায় এই 'রামকৃষ্ণ মিশন' ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ তখন সশরীরে বর্তমান। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি অনুমোদন পায় বেলুড় মঠের। এই কেন্দ্রটি একাধারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যকে বাস্তবায়িত করে চলেছে। অন্যদিকে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ ও উৎসবাদি পালন করে থাকে এই কেন্দ্রটি। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ-মানুষী এখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কার্যাবলীর মধ্যে আছে—একটি গ্রন্থাগার। ১,৩০০টি গ্রন্থ আছে এখানে। এছাড়া একটি পুস্তক প্রকাশনা কেন্দ্র আছে। এ পর্যন্ত ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং বেদান্ত বিষয়ে। একটি এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসালয় এবং একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় আছে এই কেন্দ্রটিতে। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে ঢাকা শহরতলী ও সংশ্লিষ্ট গ্রামের মানুষেরা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই দুটি চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে গড়ে ৪৫,০০০ মানুষ-মানুষী বছরে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এখানকার মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে ৪০০ ছাত্র নিয়মিত পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। এছাড়া একটি স্টুডেন্টস্ হোম আছে। ৫৬ জন ছাত্র সেখানে থাকার সুযোগ পায়। ভোকেশনাল ট্রেনিং সেণ্টার আছে। ঢাকার আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ ও সেবাকাজ অনুষ্ঠিত হয় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে।

'নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি ছোট গ্রন্থাগার আছে আর আছে একটি এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসালয়, যার মাধ্যমে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৭,০০০-এরও বেশি সাধারণ মানুষ স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের বরিশালে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রের অধীনে গ্রন্থাগারে ২,৬৬৮টি গ্রন্থ আছে। এছাড়া দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে।

এখানে এ পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৬২,০০০ মানুষ। আশ্রমে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয় ছুটির দিনে। ৫৮ জন ছাত্রের থাকার জন্য ছাত্রাবাস আছে। এখানে নিত্য পুজো, প্রার্থনা, সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়।

'বালিয়াটি রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন' ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের অনুমোদন পায়। এখানে একটি ছোট গ্রন্থাগার আছে। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৭১০। এখানে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। স্বল্পমূল্যে এই চিকিৎসালয় থেকে ১৫,৭০৯ জন মানুষ-মানুষী (নতুন ৩৯৫ জন) চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রীহট্ট বা সিলেটে 'রামকৃষ্ণ আশ্রম' বা 'রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি' ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬-এ বেলুড় মঠের অনুমোদন পায়। নিত্য পুজো ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে ধর্মপ্রসঙ্গে বিভিন্ন-ধর্ম-দর্শন সম্পর্কিত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি দাতব্য এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে এখানে। বছরে গড়ে প্রায় ৩০০ জন মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। বন্যাজনিত ত্রাণকার্যে অংশ নেয় এই কেন্দ্রটি। রান্না করা খাবার ছাড়া বন্যার্ত মানুষদের বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে। পাঠকক্ষসহ একটি গ্রন্থাগার আছে এখানে। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৭২৪টি। আর ছাত্রাবাসে ১৯ জন ছাত্রের থাকার সুবন্দোবস্ত আছে।

'ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের অনুমোদন পায়। এখানে একটি মন্দির আছে। ছুটির দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি ছোট গ্রন্থাগার আছে। সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৯৪৫। একটি ছাত্রাবাস আছে, সেখানে ৩৭ জন ছাত্রের থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য একটি চতুষ্পাঠী আছে। ছাত্রসংখ্যা ৩৬। এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ১৪২। আর আছে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়। সেখানে বছরে গড়ে প্রায় ৭০০ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায়।

'ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি মন্দির আছে। সেখানে নিত্য পুজো সন্ধ্যারতি ও তারপর ভজন পরিবেশিত হয়। ছোট একটি গ্রন্থাগার আছে এখানে। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৭৫০। এখানকার ছাত্রাবাসে ২২টি ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা আছে।

আর আছে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়। সেখানে বছরে গড়ে প্রায় ৭,৫০০ জন মানুষ স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে বন্যা কবলিত প্রতিকূল মানুষদের উদ্ধার ও তাদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালিত হয়। সেই ত্রাণকার্যে রান্নাকরা খাবার দেওয়া ছাড়া জামাকাপড়, শীতবস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি দেওয়া হয় স্থিতিশীলভাবে জীবনধারণের জন্য। মাঝে মাঝেই এই কেন্দ্রটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ-মানুষীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য এগিয়ে আসেন।

'হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে নিত্য পুজো, সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর ধর্ম প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি পায় বেলুড়মঠের প্রধান কেন্দ্রের কাছ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি যে কাজগুলি তারপর থেকে করে চলেছে তার মধ্যে আছে সর্বসাধারণের জন্য একটি গ্রন্থাগাব পরিচালনা। সেই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৬০০টি। এছাড়া আছে একটি ছাত্রাবাস। সেই ছাত্রাবাসে ২৫ জন ছাত্র থাকতে পারে। আর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্য নিয়ে দরিদ্র মানুষদেব বিভিন্ন সময়ে চাল ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু, জামাকাপড় এবং নগদ অর্থ-সাহায্য করে সমাজে বেঁচে থাকা—মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের সংযুক্তির প্রয়াস চালানো হয়।

'দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই কেন্দ্রটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রে আছে একটি মন্দির। অতি সম্প্রতি এই কেন্দ্রে একটি সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মন্দিরে প্রতিদিন পুজো এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, প্রার্থনা-সঙ্গীত, ভজন ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আশ্রমস্থিত মন্দির প্রাঙ্গণে এবং কখনো কখনো শহরের গুরুত্বপূর্ণ নানাস্থানের ভাবগম্ভীর পরিবেশে। এখানে একটি দাতব্য এ্যালোপ্যাথি ও একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। এছাড়া আছে ভ্রাম্যমান দুটি চিকিৎসাকেন্দ্র। এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রের সাহায্যে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ ভাবে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রতিবছর গড়ে

প্রায় ৩৩,০০০ মানুষ দাতব্য হোমিওপ্যাথি-এ্যালোপ্যাথি-ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এখানে যে ছাত্রাবাসটি আছে তাতে ১৮টি ছাত্র নিয়মিত থাকে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে নানা সময় সাহায্য করা হয়। দক্ষিণ বাংলাদেশের এই স্থানটিতে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা দেখা দেয়। সেই বন্যার কবলে পড়া মানুষদের উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পরিচালনা করে এই কেন্দ্রটি। বিগত আর্থিক বছরে ৩,৮৯৬টি পরিবারের মধ্যে এই কেন্দ্রটি সুসংগঠিত ভাবে ত্রাণকার্য সম্পন্ন করেছে। বিভিন্ন সময়ে বন্যা ও অন্যান্য সংকটজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই কেন্দ্রটি ত্রাণকার্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং সেইসব ত্রাণকার্যে প্রায় ৪,০০০ পরিবারবর্গ উপকৃত হয়। এই কেন্দ্রে আছে একটি গ্রন্থাগার। সেই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩,০১৫টি। এই কেন্দ্র থেকে ১৯ টি রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ-বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩৩ জন।

'বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এটি রামকৃষ্ণ মঠ শ্রেণীভুক্ত হলেও এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেবাকাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রাত্যহিক পুজো ও সন্ধ্যারতি ছাড়াও সপ্তাহে ছুটির দিনে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। মিশনারী কাজগুলির মধ্যে আছে। ক) একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা। এই গ্রন্থাগারে পড়ার সুযোগ পায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৭৫৯ এবং ৫টি পত্রপত্রিকা নিয়মিত সেখানে পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন সকলে। খ) একটি দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। সেখানে বছরে গড়ে প্রায় ৮,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। গ) এখানে একটি ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ৩৪টি ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা আছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি কেন্দ্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাব তিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এছাড়া কোন কোন কেন্দ্রে দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সকল উৎসব অনুষ্ঠানে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক মানুষ যোগ দিয়ে থাকেন।

॥ ৯ ॥

বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে প্রধানত বেদান্ত এবং বেদান্তের প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচারের প্রতি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় নামকরণের মধ্য দিয়েই রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ — যা কিনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের স্বল্পকালের মধ্যেই দেশে দেশান্তরে বিভিন্ন মানুষ-মানুষীকে আকৃষ্ট করেছিল — তারই প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দ দু' দুবার সাগর পাড়ি দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য সতীর্থ স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পাশ্চাত্যে পাঠিয়েছিলেন। এঁরা নিরলস এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিকূল পরিবেশে বেদান্ত এবং রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন আমেরিকা ও ইউরোপে। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পরিশেষে যে কথাটি উল্লেখ করতে হবে তা হল, পাশ্চাত্যে এঁদের প্রচারের সূত্র ধরেই সাধারণ মানুষ-মানুষী বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং অনেকেই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্রগতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা দেখতে পাই আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া — পাঁচটি মহাদেশেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরাধিকারী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসীরা বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রচার এমনই তুঙ্গে পৌঁছেছিল যে, ভক্ত-অনুরাগীদের সাহায্যে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বেদান্ত কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেই বেদান্ত কেন্দ্রগুলির প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

এই বেদান্ত কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে আজও সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষ-মানুষীরা বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শ আপন আপন জীবনের মর্মমূলে প্রোথিত করে উত্তরণের পথটি খুঁজে নিতে চাইছেন। তাইতো ধনী দেশগুলির মানুষ আজ জড়-সভ্যতার ও ভোগবাদী মানসিকতার মায়াজাল ছিন্ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে জীবনে শান্তির পথ, মুক্তির পথ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথটি খুঁজে নিতে চাইছেন। তাই চারটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত কেন্দ্রগুলিতে ক্রমাগত মানুষের ঢল নামছে, এটি

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, ব্রত ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেই কার্যাবলীর মধ্যেই বিদেশীয় কার্যবিভাগে নির্দিষ্ট হয়েছিল বেদান্তসহ অন্যান্য ধর্মের মূলগত সত্যকে বহির্ভারতের মানুষ-মানুষীর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্গাতা ও বেদান্তের প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সমন্বিত ভাবাদর্শও প্রচার করা। বহির্ভারতে সেই কাজই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের কেন্দ্রগুলিতো একসময় ভারতবর্ষের অধীনে ছিল। স্বভাবতই সেই কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার আগে পূর্ববঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদ পরিক্রমা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককালে দুর্ভিক্ষ ও বন্যাত্রাণমূলক কাজে ছুটে গেছেন রামকৃষ্ণ পার্ষদেরা এবং বিবেকানন্দেব সন্ন্যাসী শিষ্যেরা। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সূচনা এইভাবে ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এই সূত্র ধরেই নানাস্থানে বিভিন্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই কেন্দ্রগুলি পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে অবস্থিত প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়েছে। সেই অনুমোদিত কেন্দ্রগুলি বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসার, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মানসিকতা নিয়ে সেবামূলক কার্য পরিচালনা করে চলেছে।[২২]

॥ ১০ ॥

এ প্রসঙ্গে শেষ কথাটি হল, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের উপর। রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে 'ভারততীর্থ' কবিতায় লিখেছিলেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'[২৩] প্রাচ্য অর্থাৎ ভারতবর্ষের কাছ থাকে পাশ্চাত্যের অনেক কিছু জানার ও শেখার আছে—বিবেকানন্দ একথা অনেক আগেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। তা হল বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ। আবার পাশ্চাত্যের কাছ থেকেও প্রাচ্য অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষেরও কিছু জানার ও শেখার-নেওয়ার আছে। এই একসেপটেন্স ও এ্যাসিমিলেশন বা গ্রহণ ও সমন্বয়, আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই নতুন পৃথিবী জন্ম নেবে—এটাই ছিল বিবেকানন্দের কাঙ্ক্ষিত বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ধীরে ধীরে হলেও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। ভারতে ও বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস সে কথাই প্রমাণ করে।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ—স্বামী ওঙ্কারানন্দ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮১, পৃঃ ১২৭
২. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৯৯, পৃঃ ৯২
৩. Vivekananda Centenary Volume, 1963, P-170
৪. উদ্বোধন, ৩৬ বর্ষ, পৃষ্ঠা—১২৯–১৩১
৫. উদ্বোধন, ২৯ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, পৃ: ৫১৫
৬. স্বামী সারদানন্দের জীবনী, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৮, এবং সারদানন্দ চরিত, স্বামী প্রভানন্দ, ১৪০২, পৃ: ১০৪
৭. ঐ, পৃ: ৭০
৮. যেমন শুনিয়াছি—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, ১ম ও ২য় ভাগ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৯, পৃ: ১৬২ ও ১৭০
৯. মন ও মানুষ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ১৩৬৩, পৃঃ ৩৩০–৩৩১
১০. Swami Vivekananda in the West; New discoveries—Meri Louise Burke, 1987. Vol-1, P-112
১১. পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ শিষ্য, স্বামী চেতনানন্দ, 'উদ্বোধন', ৯৯ তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪০৪, পৃঃ ১৭২
১২. স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১, পৃঃ ৫৮
১৩. ঐ, পৃঃ ৫৮
১৪. ঐ, পৃঃ ৬০
১৫. Vedanta and the West, Swami Turiananda, 1952, p-155
১৬. স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ৭১
১৭. ঐ, পৃঃ ১০৩
১৮. ঐ, পৃঃ ১০৮–১৯
১৯. নবযুগের মহাপুরুষ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২–৮
২০. নবযুগের মহাপুরুষ, পৃঃ ৩৯–৪০
২১. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১৩৯৭, পৃঃ ৮৯৪–৮৯৫
২২. বহির্ভারতের কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন বছরের বার্ষিক কার্যবিবরণী (Annual General Report) থেকে।
২৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৬৮, পৃ: ১৯৫

শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প ও আধ্যাত্মিকতা প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশন

শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের শেষ কথাটি হল 'Man making'। আমরা তো জানি যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসে সচেতনতা, আর সেই সচেতনতার মধ্য দিয়েই সম্প্রসারিত হয় আদর্শ মানুষের জীবন। সেই মানুষের জীবনের সম্প্রসারণে সুস্থ সমাজ জন্ম নেয়, আর সেই সমাজই রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই স্থিতিশীল জীবনের লক্ষ্যে, মানুষের উত্তরণের পথটি চিহ্নিত করার জন্য সকলকে আশীর্বাদ করে বলতেন—'তোমাদের চৈতন্য হোক।' এই চৈতন্যের অধিকারী অর্থাৎ চেতনাবাহিত পূর্ণাঙ্গ মানুষ তাঁর আত্মশক্তির স্ফূরণে জগৎটাকে উল্টে দিতে পারে, নতুন ভাবে গঠন করতে পারে পৃথিবী। স্বামী বিবেকানন্দ এমন সচেতন-পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষই তো চেয়েছিলেন। তাই তিনি অজ্ঞ, কাতর, নিপীড়িত মানুষদের সচেতন করে তোলার জন্যে শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবেকানন্দ জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন আমাদের দুটি জাতীয় মহাপাপ—ক) সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা, খ) নারী জাতিকে পদদলিত করা। এই জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে যথার্থ শিক্ষা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। এই শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে একদিকে অজ্ঞ কাতর দুঃখী মানুষেরা, অন্যদিকে সমাজের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ নারীরা যথার্থ ভাবে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জীবনের সার্বিক লক্ষ্যে উত্তরণের পথটি নিজেরাই চিনে নেবে।

বিবেকানন্দের এই আহ্বানকে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা জানি, আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর সুসংগঠিত ভাবে স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত

মানুষদের মধ্যে প্রথম ত্রাণকার্য শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা প্রসারের কাজও শুরু করেছিলেন তিনি। স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ এ কাজ শুরু করেছিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কন্‌খল-এ সন্ন্যাসীদের চিকিৎসার জন্য বিবেকানন্দের নির্দেশে চিকিৎসালয় স্থাপন করার পর নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি শুধু ত্রাণকার্য নয়, পাশাপাশি আনন্দের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সচেতন করে তোলাই ছিল বিবেকানন্দের লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠলো রামকৃষ্ণ মিশনের। সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন বিগত একশো বছরে নানা ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতে তাঁদের পরিচালিত শাখা কেন্দ্রগুলিতে।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত হয় সারগাছিতে নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে অজ্ঞ-কাতর মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হয়েছিল। আর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর কলকাতার বাগবাজারে নারীদের জন্য 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিই ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ। নিবেদিতার উপর ভার পড়েছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার। পরে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'নিবেদিতা স্কুল'। পরবর্তীকালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ভার অর্পিত হয় শ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের উপর। বর্তমান কলকাতায় একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটি। সমসাময়িককালে কন্‌খল সেবাশ্রমে, বারাণসী সেবাশ্রমে, বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রধান কেন্দ্রে, মাদ্রাজের মায়লাপুর প্রভৃতি শাখা কেন্দ্রে গড়ে ওঠে নৈশ বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। প্রাচীন গুরুকুল প্রথা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমিক পরিবেশে আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, দেওঘরে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশ জুড়েই রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সন্ন্যাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বেহিসাবী ত্যাগ ও তিতিক্ষায়। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ে তাঁরা হলেন স্বামী নির্বেদানন্দ, স্বামী সদ্ভাবানন্দ,

স্বামী গণেশানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী হিরন্ময়ানন্দ প্রমুখ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বালিকা বিদ্যালয় ও সহ-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়। সেই সঙ্গে কেরালায়, অরুণাচল প্রদেশে, বিহারের রাঁচি, জামশেদপুর প্রভৃতি স্থানে উপজাতি আদিবাসী অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে বহু বিদ্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। শুধু শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সচেতন হয়ে উঠলেই চলবে না। স্বনির্ভর জীবিকা নির্বাহেরও পথ খুঁজে নিতে হবে। বিবেকানন্দ তার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সাধারণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে যারা উচ্চ শিক্ষায় সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় তারা ছাড়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার উপর বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে গুরুত্ব দিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বিভিন্ন কেন্দ্রে। এরই সঙ্গে গড়ে উঠেছে কৃষি শিক্ষালয়, ভাষা শিক্ষালয়, কম্পিউটার শিক্ষালয়, অন্ধ ছাত্রদের শিক্ষালয়, গ্রাম উন্নয়ন শিক্ষালয়, শিক্ষক শিক্ষণালয়, নার্সিং প্রশিক্ষনালয়, সর্বোপরি শিল্প ও কারিগরী ও শিক্ষালয়। এ ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, দর্শনজাত শিক্ষা, নিরক্ষরতামুক্ত শিক্ষা, জনশিক্ষা, শিশু শিক্ষা ইত্যাদি সম্প্রসারিত হয়েছে গত একশো বছরে।

॥ ২ ॥

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই যে কেন্দ্রটির কথা তুলে ধরতে হবে তা হলো বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রের অধীনে আছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :— ক) বিদ্যামন্দির—আবাসিক মহাবিদ্যালয়, এখানে উচ্চমাধ্যমিক শাখা সহ বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে বছরে গড় ছাত্রের সংখ্যা ৪১৩ জন। খ) শিক্ষণমন্দির—আবাসিক উচ্চশিক্ষক শিক্ষণালয়, এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১ জন। গ) শিক্ষণমন্দির—এটি একটি কারিগরী শিল্প শিক্ষালয়। এখানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। এর ছাত্র সংখ্যা ৪১৫ জন। এছাড়া এর সঙ্গে সংযুক্ত কমিউনিটি পলিটেকনিকে ২,০৫৭ জন ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায়। আর কম্পিউটার শিক্ষার্থীদের জন্য আছে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

৫৫০ জন। ঘ) শিক্ষা শিক্ষায়তন—এখানে দুটি বিভাগ আছে। একটি জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এবং অপরটি হায়ার সেকেন্ডারী ভোকেশনাল সেকসান। এই দুটি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫ ও ৮৬। এখানে ড্রাফটস্‌ম্যান ও ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল কাজের শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা—১২২ ঙ) জনশিক্ষা মন্দির—এর মাধ্যমে ১৮টি প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হয় ৪৫১ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে। আর এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছে অনগ্রসর ও অনুন্নত শিক্ষার্থী। এখানে প্রধানত দর্শনের মাধ্যমে (অডিও ভিসুয়াল) শিক্ষা দেওয়া হয়। ছ) সমাজসেবক শিক্ষামন্দির—এটি একটি অবৈতনিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশিক্ষণালয়। এখানে প্রতি বছর ২১জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামের উন্নয়নে অংশ নেয়। জ) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার—এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারটিতে আছে ২৩,০৬২টি গ্রন্থ। এটি বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তরে গিয়ে সেখানকার মানুষদের গ্রন্থপাঠে আগ্রহী করে তোলে। সেইসব গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ঝ) অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা—এখানে ৫৬ জন শিশুকে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং অবৈতনিকভাবে হাতেব কাজের শিক্ষা দেওয়া হয় ১০০ জনকে। আর ৯২৫ জন দরিদ্র ছাত্রকে টেলারিং, উল নিটিং, কার্পেন্টারী ও বুক বাইণ্ডিং-এর শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষোক্ত শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়সীমা নির্দিষ্ট। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি গুরুকুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তাই এই কেন্দ্রটির শিক্ষালয়গুলি অধিকাংশই আবাসিক তাই শিক্ষার মান, চরিত্র, গঠন, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা অনায়াসে আমাদের নজর কাড়ে। এই আবাসিক বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন গ্রন্থাগারটিও শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়ক। সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য ব্যাপক প্রয়াস বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নরেন্দ্রপুর, রহড়া, দেওঘর, কোয়েম্বাটুর, বরাহনগর, জামশেদপুর, কাটিহার, চেন্নাই (চারটি শিক্ষালয়), পুরুলিয়া ইত্যাদি। এছাড়াও আছে রামহরিপুর সারগাছি, সরিষা, টাকী, মালদহ, মেদিনীপুর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, মহীশূর, আসানসোল প্রভৃতি।

আলং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটি পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধানত উপজাতি-অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট। এই বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং

ছাত্রীরা একসঙ্গে পড়াশুনার সুযোগ পায়। ছাত্রসংখ্যা ১,৮৩৩ জন ও ছাত্রীসংখ্যা ৫৭২ জন। ছাত্রাবাসে বিনা ব্যয়ে ২৭৫ জন ছাত্র থাকতে পারে। পাঠকক্ষ সহ একটি বড় গ্রন্থাগার এখানে আছে। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১১,৬৪৫ আর নিত্য পড়ার জন্য আছে ৪৬টি পত্র-পত্রিকা।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৭৫ জন ছাত্র আছে। ছাত্রাবাসে ৪৬ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। আসানসোলের শহরতলীতে আছে দুটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় দুটির ছাত্র সংখ্যা ২৮১ জন। পাঠকক্ষ সহ গ্রন্থাগার আছে এখানে এবং সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৪,০৭৫ টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৭টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শহরের উপকণ্ঠে সুন্দর পরিবেশে এই কেন্দ্রটির স্থানান্তরণের কাজ চলেছে বর্তমানে।

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এখানকার ছাত্রসংখ্যা ১,১৪৩ জন। এছাড়া আছে দুটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রসংখ্যা ২৫৬ জন। আর আছে পাঠকক্ষ সহ একটি বড় মাপের গ্রন্থাগার। তাতে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫,৭৩৫টি। দর্শনজাত শিক্ষার (ভিসুয়াল এডুকেশন) জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট আছে। এই ভিসুয়াল ইউনিটের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের কাজ চলেছে নিয়মিত।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ হোম বা কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি ছাত্রাবাস আছে দরিদ্র ও মেধাবী কলেজে পড়া ছাত্রদের জন্য, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৬,৫১০টি। এখানে একটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৭ জন। আর আছে সরকার অনুমোদিত শিল্পপীঠ। এখানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে ছাত্র সংখ্যা ৪৮০ জন। এখানে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার আছে, আর তাতে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১২,৮৫৮টি। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে বেশ কিছু দরিদ্র ছাত্রকে কার্পেন্টারী, ওয়েলডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১২,৫৭৬টি গ্রন্থ নিয়ে আছে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী গ্রন্থাগার এবং এই সঙ্গে আছে অবৈতনিক পাঠকক্ষ। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারটি ব্যবহারের সুযোগ পান। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

চেঙ্গেলপেট্টু রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মিশনেব মাধ্যমে দুটি উচ্চমাধ্যামিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই দুটি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১,৮২৯ জন ও ছাত্রীসংখ্যা ৭৩৮ জন। এছাড়া দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেখানে ১,৬৪২ জন শিক্ষার্থী আছে। ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায ৬০ জন ছাত্র। এখানে দুটি গ্রন্থাগার আছে এবং সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১০,০১৪টি।

চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ) বামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটির মাধ্যমেই তিনটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েব মধ্যে একটি ইংবেজি মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩,১১৬, প্রাথমিক বিদ্যালয়েব ছাত্রসংখ্যা ৭১৭ জন ও ছাত্রীসংখ্যা ৬৩৩ জন। ৫৯ জন ছাত্রেব থাকাব একটি ছাত্রাবাস আছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রন্থাগাবে ৪৪,১০৪ টি গ্রন্থ আছে। চেন্নাই বামকৃষ্ণ মিশন সাবদা বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হয ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রেব মাধ্যমে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয এবং একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পবিচালিত হয়। এছাড়া একটি প্রাথমিক বিদ্যালয এবং একটি কিণ্ডাব গার্ডেন বিদ্যালয় পবিচালিত হয। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৪৫০ জন, ৭৪৫ জন, ৭৬৭ জন এবং ২৭৩ জন। দুটি ছাত্রীবাসে ১১৭ জন ছাত্রীব থাকাব ব্যবস্থা আছে। দুটি গ্রন্থাগাবে ৩৭,৫৭২টি গ্রন্থ আছে। প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাব সংখ্যা ১১টি। চেন্নাই বামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম প্রতিষ্ঠিত হয ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রধান কেন্দ্রেব অনুমোদন করে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি অবৈতনিক আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়েব ছাত্রসংখ্যা ১৮৫ জন। আব আছে একটি অবৈতনিক আবাসিক কাঁরিগবী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেখানে তিন বছরেব ডিপ্লোমা কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে কাবিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪০ জন। এখানে একটি অবৈতনিক ছাত্রাবাস আছে, সেখানে ২১ জন থাকার সুযোগ পায়। ৩,৩৩৩টি গ্রন্থ ও ২৮টি পত্র-পত্রিকা নিয়ে একটি গ্রন্থাগাব আছে। আর আছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়—শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭৫, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪৪০ জন। মাধ্যমিক বিদ্যালযে ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ২৯ জন ছাত্র থাকতে পারে। বিগত আর্থিক বছবে নগদ ২৬ হাজার টাকা গবীব ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। চেন্নাই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ ১৯৪৬

খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কেন্দ্রের অধীনে আছে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ আছে। এই কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্ররাও পড়াশুনার সুযোগ পায়। এটি চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অনুমোদিত। এই মহাবিদ্যালয়ে ২,১৪৬ জন ছাত্র আছে। বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের নানা বিষয় এখানে পড়ানো হয় এবং পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য গবেষণার সুযোগ পায় এখানে ছাত্ররা। এই কলেজের গ্রন্থাগারটি খুবই সমৃদ্ধ। এখানে ৮০,১৯৯টি গ্রন্থ আছে, আর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৭৪টি। ৭,৬৪,৫৪০ টাকা ছাত্রদের স্কলারশীপ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য গত আর্থিক বছরে ব্যয়িত হয়েছে।

কোয়েম্বাটুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। বিশাল চত্বর জুড়ে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। এই কেন্দ্রটির অন্তর্গত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হল—ক) আবাসিক বিদ্যালয়—ছাত্রসংখ্যা ২৩১। এই ছাত্রদের মধ্যে কিছু অন্ধ ছাত্রও আছে। তারা একই সঙ্গে এখানে পড়াশুনা করে। খ) একটি মাধ্যমিক স্তর ভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণালয় আছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ জন। গ) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ৭৭১ জন। ঘ) একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, যার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,২৩৯ জন। তার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ২৬৯ জন। এর মধ্যে দ্বিপ্রাহরিক আহার দেওয়া হয় ৩৬৫ জনকে। ঙ) একটি স্বশাসিত শিক্ষক শিক্ষণালয় আছে। এই শিক্ষণালয় থেকে বি.এড., এম.এড., এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৮ জন। শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের জন্য এখানে কুড়িটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, গবেষণা বিভাগ ছাড়াও প্রকাশনা বিভাগ আছে। চ) স্বশাসিত কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগ সহ একটি কলেজ আছে, সেখানে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পড়াশুনার সুয়োগও পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫১ জন। ছ) শরীরশিক্ষা বিষয়ক একটি কলেজ আছে এখানে; শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৬ জন। এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্রীড়াবিষয়ক বিদ্যালয় আছে। সেখানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে। গত আর্থিক বছরে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ৯৬টি ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তাদের বিশেষ কয়েকটি খেলাধূলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ধারাটিও অব্যাহত থাকে। ঝ) একটি স্বশাসিত কারিগরী বিদ্যালয় আছে। সেখানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে সিভিল, মেকানিক্যাল, রুরাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬৯ জন। এছাড়া এখানে ৩৮৯ জন গ্রামীণ যুবককে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়াব জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একটি শিল্প বিদ্যালয়ও আছে। সেখানে দু' বছরের কোর্সে নিটিং, টার্নিং, ড্রাফটস্‌ম্যানশিপ, মোটব-মেকানিক, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং, কম্পিউটার সফটিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীব সংখ্যা ১৮৯ জন। ঞ) আর একটি শিক্ষা বিভাগ আছে। সেখানে প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কে প্রায়োগিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এখান থেকে সম্প্রতি কিছু শিল্প সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। ট) বালওয়ারি শিক্ষাকেন্দ্রে ১৪৬টি শিশু শিক্ষা পায়। ঠ) একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে, সেই গ্রন্থাগাবে ১০,০৪,৯৯২টি গ্রন্থ এবং ২,০৯৭টি পত্র-পত্রিকা সংগৃহীত আছে। ড) আটটি ছাত্রাবাসে ১,৩৭২ জন শিক্ষার্থী থাকার সুযোগ পায়।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। দেওঘবে (বৈদ্যনাথধাম) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ পদার্পণ করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শ্রীবামকৃষ্ণ মথুরবাবুব সঙ্গে তীর্থ পর্যটনে কাশী যাবার পথে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত সচল শিবদের প্রত্যক্ষ করে কাশী যাওয়া স্থগিত রেখে ত্রাণকার্য শুরু কবেছিলেন। সেই সূত্রে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তবায়ন ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে। প্রকৃত অর্থে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা সেদিনই হয়ে গিয়েছিলো। স্বামী বিবেকানন্দ দেওঘরে একাধিক বার এসেছেন। একবার তিনি এক মুমূর্ষু রোগীর সেবাকাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' ব্রত উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে দেওঘরের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই দেওঘর শিবক্ষেত্র রূপে সারা ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রথম কাজ শুরু করেছিল। এখানে ইংরেজি মাধ্যমে ৩৭০ জন ছাত্রসহ আবাসিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টি শুধু বিহারে নয়, সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল শিক্ষাকেন্দ্র রূপে চিহ্নিত। দিল্লীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা এই বিদ্যালয়টি অনুমোদিত। প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশের হার শতকরা ১০০'র মধ্যে ১০০ ভাগ। শুধু তাই নয়, সারা ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর ১ থেকে ২০'র মধ্যে বহু সংখ্যক ছাত্র থাকে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্থান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি অধিকারের ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। এই বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রন্থাগারে ২৩,৫৩৯টি

গ্রন্থ এবং ৭৪টি পত্র-পত্রিকা আছে। শুধু উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এই কেন্দ্রটি করে না, সঙ্গে সঙ্গে তফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অবৈতনিক 'Study come coaching centre' পরিচালনা করে। এখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫০ জন। এদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এখানে একটি বড় দুগ্ধালয় আছে। সেখানে উন্নত প্রজাতির বহু সংখ্যক গরু আছে। উৎপাদিত দুগ্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং 'Study come coaching' সেন্টারের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, আলোচনাচক্র ছাত্র-শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। এটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। বিহারের বিখ্যাত এই শিল্পাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটির ভূমিকা বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল। এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে পাঁচটি মাধ্যমিক স্কুল পরিচালিত হয়। এর মধ্যে দুটি ছাত্রদের জন্য, দুটি ছাত্রীদের জন্য এবং একটি ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্য (সহ শিক্ষা)। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের সংখ্যা ১,২৬৭ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ১,৬৫৫। এছাড়া এই কেন্দ্রটির সাহায্যে পরিচালিত হয় চারটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১,৮১১ জন এবং ১,৪৪১ জন। আর দুটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয় হিন্দি ভাষার মাধ্যমে। সেখানে ছোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা—ছাত্র ২৬৫ জন ও ছাত্রী ২৩৬ জন।

উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা এবং হিন্দি দুটি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয় আরো একটি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়, সেখানে ছাত্রদের সংখ্যা ৪৩০ ও ছাত্রীদের সংখ্যা ২৩০। সবমিলিয়ে ১২টি গ্রন্থাগার আছে। সেই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৪১,৫০৮টি। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে একটি Book Bank পরিচালিত হয়। এখানে ১২২ জন ছাত্রের অবস্থানের জন্য একটি ছাত্রাবাস আছে। এই ছাত্রাবাসে প্রধানত সমাজের অনুন্নত শ্রেণী এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে আগত আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল ছাত্ররা থাকতে পারে। এর মধ্যে ৬০ জন ছাত্র বিনাব্যয়ে থাকার এবং খাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। এই কেন্দ্রে আছে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিনামূল্যে পড়বার জন্যে একটি পাঠকক্ষ। এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৬,৩৪২ এবং পত্র-পত্রিকা

৩০টি। সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে এবং উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে নানা বক্তৃতার আয়োজন হয়ে থাকে। প্রতিদিন শিল্পাঞ্চলের এবং সন্নিহিত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে দুটি 'অডিওভিসুয়াল' ইউনিটের মাধ্যমে দর্শনজাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবাহটি প্রচার-প্রসারিত হয়ে থাকে।

শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা আমরা জানি। কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত পাঠকক্ষ সহ গ্রন্থগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৯,২১১ এবং সাময়িক পত্রপত্রিকা ও দৈনিক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৮৯। কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রটি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। সেখানে ছাত্রের সংখ্যা ৮৪১। উত্তরপ্রদেশের শিল্প শহরে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে বড় মাপের ভূমিকা নিয়েছে এই কেন্দ্রটি, তা উল্লেখিত তথ্য থেকে বোঝা যায়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান কেন্দ্রের অনুমতি পায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

বিহারের কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় এটি। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রের সংখ্যা ৭৪৩ ও ছাত্রীদের সংখ্যা ১৫৬। এছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক একটি স্কুলও আছে। সেখানে ছাত্রসংখ্যা ২৯২ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ১৭০। একটি ছাত্রাবাস আছে এখানে। সেখানে ৪৪ জন ছাত্র থাকতে পারে। আর আছে একটি গ্রন্থাগার এবং বিনামূল্যে পড়াশুনোর জন্য একটি পাঠকক্ষ। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৭৭৫ এবং পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৩।

কেরালার কোঝিকোড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এবং অনুমোদন পায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা—ছাত্র-৮৯৪ ও ছাত্রী-৮৫৪ জন। এছাড়া একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেখানে ৪২৪ জন ছাত্র এবং ৩৮০ জন ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পায়। আর আছে একটি ছাত্রাবাস। সেখানে ৭৫ জন ছাত্র থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী ইষ্টানন্দের উদ্যোগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুন্দরবনে নদী-নালা পরিবেষ্টিত এই স্থানটি সেই সময়ে ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং অনুন্নত। সেই পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলো। সেটি আজও শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা

পালন করে চলেছে। এখানে বর্তমানে ছাত্রের সংখ্যা ৬৬৭ জন। এখানে একটি জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। ছাত্রের সংখ্যা ৩০৩। মেয়েদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রীর সংখ্যা ২৮৪ জন। ছাত্রাবাসে ৬৩ জন থাকার সুযোগ পায়। ৭টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ২৩১ জন তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রে ২টি গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা ৪,৫৮৩। ২০ জন শিক্ষার্থীকে গ্রাম উন্নয়নের প্রকল্পে তাঁত-বস্ত্রবয়ন এবং কাঠের জিনিসপত্র তৈরীর জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুন্দরবনের অন্তর্গত রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি ৭০ বছর ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রাম, উন্নয়নে যেমন কাজ করে চলেছে, তেমনি প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষ-মানুষীদের খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। বর্তমানে যাত্রা সুগম হলেও এই অনুন্নত অঞ্চলের মানুষের উন্নতির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি।

ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশের গর্ব, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের একটি ভাড়া বাড়িতে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হয়েছে এই কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে পল্লবিত কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। সেই কর্মযজ্ঞের বিভিন্ন দিকগুলি হল—

ক) এখানে একটি আবাসিক মহাবিদ্যালয় আছে। যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত সাম্মানিক পরীক্ষায় এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশেষত বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি স্থান প্রায় প্রতি বছরই লাভ করে। এখানে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে সাম্মানিক স্নাতক ছাত্রের সংখ্যা ৩৬০। তার মধ্যে ৮৭ জন বিনামূল্যে শিক্ষা এবং ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে ছাত্রের সংখ্যা ২৭২। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে পশ্চিবঙ্গের মধ্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান সামগ্রিক বিচারে সব সময় প্রথম। N.C.C ও N.S.S. শাখা এখানে অত্যন্ত সক্রিয়।

খ) এখানে একটি আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রসংখ্যা ৭৬৮। ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ (পূর্বতন শিক্ষা বিভাগ) এই বিদ্যালয়টিকে

ভারতবর্ষের একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার একশোর মধ্যে ১০০ শতাংশ তো বটেই, বেশিরভাগ বছরে প্রথম বিভাগে পাশের হারও ১০০ শতাংশ। স্থানাধিকারীদের মধ্যে ১ম থেকে ২০'র মধ্যে ৪-৫ জন প্রতি বছরই থাকে। ৫০ জন বিনামূল্যে শিক্ষা ও ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। N.C.C এবং স্কাউটের দুটি শাখা এই বিদ্যালয়ে আছে।

গ) এই কেন্দ্রে আছে একটি অনাবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রের সংখ্যা ৪৪১ জন।

ঘ) লোকশিক্ষা পরিষদ সামাজিক-গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপক ভাবে কাজ করে চলেছে। কাজগুলি হল—

১) লোকশিক্ষায় যে কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয় তা হল—সারা ভাবতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষা, নিবক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা প্রকল্প—২৫০টি কেন্দ্রেব মাধ্যমে।

২) ৩৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রথাবহির্ভূত (Non Formal) শিক্ষা দেওয়া হয়।

৩) শিশু কল্যাণের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পে বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালিত হয় বেশ কয়েকটি।

৪) কৃষিকাজের উন্নতির জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা এই কেন্দ্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৫) গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য আছে গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি একটি শ্রমিক বিদ্যাপীঠ পরিচালনা করে। সেখানে শহরতলীর বিভিন্ন ছাত্র স্বনির্ভর প্রকল্পের অধীন মেকানিক্যাল, সিভিল, মোটর মেকানিকস্, ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে।

৬) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দর্শনজাত—শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে একটি অডিওভিসুয়াল ইউনিট কাজ করে।

৭) গোপালন, হাঁস, মুরগী, মৎস্য পালনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে। অত্যাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম এবং গবেষণালব্ধ বিষয় কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর দেওয়া হয়।

৮) এই কেন্দ্রে একটি প্রকাশনা বিভাগ আছে। এ পর্যন্ত ২৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'সমাজশিক্ষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ঌ) জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের অধীনে ১০৫ জন ছাত্রকে নিয়ে মুক্তবিদ্যালয় পরিচালিত হয় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে।

ঙ) বিবেকানন্দ সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যে সেবা-কল্যাণমূলক কাজ অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি হল—

১) উত্তর কলকাতার রামবাগান অঞ্চলে হরিজন অর্থাৎ সমাজের অনগ্রসর মানুষের জন্য বস্তি উন্নয়ন এবং সেই সূত্রে সম্প্রতি চারতলা বিশিষ্ট অট্টালিকা তৈরী হয়েছে। সেখানে বস্তিবাসীদের স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। সেই এলাকার অনগ্রসর মানুষদের মধ্যে হস্তজাত বিশেষত বেতের শিল্প নির্মাণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যেমন স্বনির্ভরশীল হচ্ছেন তেমনি বিদেশে তাঁদের তৈরী জিনিসপত্র রপ্তানি হচ্ছে। আমেরিকা-রাশিয়ায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে এখানকার গুণী শিল্পীরা গিয়েছেন।

২) এখানকার শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য দুটি প্রি-বেসিক স্কুল আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা—৮০।

৩) দুটি জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা—১৭০।

৪) ৩০ জন শিশুকে নিয়ে প্রতিদিন নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

৫) ২টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১,০০০ জন মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান।

৬) পুস্তক ও শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯১ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৭) বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। যেখানে ২০ জন বয়স্ক মহিলা শিক্ষা পান।

৮) গত আর্থিক বছরে ৩,২৯৪ জন শিশুকে সুস্বাস্থ্য প্রকল্পে সুষম খাদ্য, দুধ সরবরাহ করা হয়েছে।

৯) ৮৩০টি বই নিয়ে আছে গ্রন্থাগার।

১০) আর নরেন্দ্রপুরে অনগ্রসর জাতি-উপজাতির জন্য ১টি ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ৩০ জন ছাত্র থাকার সুযোগ পায়।

চ) বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে ঐ রামবাগান অঞ্চলে ১৮টি বহুতল অট্টালিকা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি অট্টালিকার কাজ শেষ হয়েছে এবং সেখানে বস্তিবাসীদের হাতে ঘরগুলিতে থাকার জন্য চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের হাতে চাবিগুলি তুলে দেন।

ছ) নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা পরিচালিত লুইব্রেল পদ্ধতিতে একটি অন্ধ-বালক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই বিদ্যালয়ে যেমন একদিকে সাধারণ শিক্ষা-সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি কৃষিজাত-হস্তজাত শিল্প উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা শিক্ষাও দেওয়া হয়। আবাসিকের সংখ্যা ১৬০। এখানে একটি গ্রন্থাগার আছে, শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অন্ধ শিক্ষক আছেন।

জ) এখানে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থের সংখ্যা এখানে ৬,১০,৬৪৫। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৬৪।

ঝ) এখানে একটি কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শর্টহ্যাণ্ড-টাইপ রাইটিং, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিপ্লোমা) শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই তিনটি বিভাগে ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে—৯০, ২০, ১৮। এই শিক্ষার্থীদের বিনাব্যয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঞ) গত আর্থিক বছরে ২,৩৮,৭৭৯ টাকা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ছাত্রদের এবং ২,৭৮,৩৩৭ টাকা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারীদের নগদ অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষেরও একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৬৭১ জন ছাত্র এই বিশিষ্ট আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় প্রতি বছরে। ভারত সরকার আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মডেল স্কুল রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে। এই বিদ্যালয় থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫ জন ১ম থেকে ২০তম স্থানাধিকারীর মধ্যে থাকে। ১০০-র মধ্যে ১০০ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এই ছাত্রদের মধ্যে পুরুলিয়ার আদিবাসী ছাত্রও আছে। তাদের ছাত্রবৃত্তি ও আর্থিক সাহায্যও করা হয়ে থাকে। মোট ছাত্রের মধ্যে ২৫% সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসী ছাত্র। এছাড়া এখানে একটি প্রি-বেসিক স্কুল আছে ছোটদের জন্য। ছাত্র সংখ্যা ৫১। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি ফ্রি কোচিং সেন্টার আছে। সেখানে ৬৯ জন শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পায়। অডিও ভিসুয়াল ইউনিটের মাধ্যমে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে এই কেন্দ্রটি। ছোট একটি চিড়িয়াখানাও আছে। আছে একটি সংগ্রহশালা। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

উপজাতি প্রধান অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশের নরোত্তম নগরে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয় ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সূত্রে এই কেন্দ্রে পরিচালিত হয় একটি ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চ মাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয়। ছাত্র সংখ্যা ৬২০। তারা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চারুকলা, উদ্যানবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা বিষয়েও প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। এছাড়া একটি গ্রন্থাগার আছে এখানে। গ্রন্থের সংখ্যা ১০,৮৪৫। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৮৩। একটি অডিও ভিসুয়াল ইউনিটের মাধ্যমে উপজাতি প্রধান গ্রামে দর্শনজাত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণাও গড়ে তুলতে সাহায্য করা হয়।

উত্তর ২৪ পরাগণার খড়দহের রহড়ায় রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম অনাথ ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। পিতা-মাতা, অভিভাবকহীন ছাত্রদের যথার্থ মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এই কেন্দ্রটি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছরে এটি খড়দহে স্থানান্তরিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাঁর নাম প্রথমেই আসে, তিনি স্বামী পুণ্যানন্দ। এই কেন্দ্রের অধীনে যে কর্ম-সেবাযজ্ঞ চলেছে তা হল—ক) ৬০০ অনাথ ছাত্রকে নিয়ে আছে একটি মাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয়। সেই অনাথ ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুস্থ এবং আদর্শ পরিবেশ পেলে ও যথার্থ ভালোবাসা-সহযোগিতা পেলে অনাথ ছাত্ররাও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উজ্জ্বল নজির রাখতে পারে; তারই বড় দৃষ্টান্ত হল এই কেন্দ্রের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়টি। অনাথ ছাত্ররা কোন কোন বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় পাশের হার ১০০%। এই বিদ্যালয়ে বেশ কিছু অনাবাসিক ছাত্রও শিক্ষার সুযোগ পায়।

খ) এই কেন্দ্রের অধীনে আছে একট প্রি-বেসিক স্কুল। এখানে ৬১ জন শিক্ষার্থী আছে।

গ) ১,০৩২ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আছে ৫টি বেসিকস্কুল।

ঘ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১টি। ছাত্রসংখ্যা ৪৯৫।

ঙ) স্নাতকোত্তর শিক্ষা-শিক্ষণ আবাসিক মহাবিদ্যালয় আছে। বছরে ১১২ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সুযোগ পান।

চ) এই কেন্দ্রের অধীনে আছে একটি উন্নতমানের সাম্মানিক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের মহাবিদ্যালয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী সহ ছাত্র সংখ্যা—১,১৫৩ জন।

ছ) একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ ও উচ্চমাধ্যমিক কারিগরী বিদ্যালয় আছে। ছাত্রসংখ্যা ১১৬।

জ) আর একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। সেখানে ইলেকট্রিক্যাল, কার্পেন্টারি, বেকারি, প্রিন্টিং টেক্‌নোলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

ঝ) এখানে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণালয় আছে। প্রতি বছর ৬০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সুযোগ পান।

ঞ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য একটি আবাসিক প্রশিক্ষণালয় আছে। সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪।

ট) মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য যে ছাত্রাবাস আছে যেখানে ২৭৮ জন থাকার সুযোগ পায়।

ঠ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রবাসে ৪৯৫ জন থাকার সুযোগ পায়।

ড) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জেলাগ্রন্থাগারটি এই কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। ৪৭,৭৫৪টি গ্রন্থ রয়েছে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২৪। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়। দর্শনজাত-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আছে একটি অডিওভিসুয়াল ইউনিট।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আর যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি হল—বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত রামহরিপুর রামকৃষ্ণমিশন। মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন। উত্তর ২৪ পরগণার টাকি রামকৃষ্ণ মিশন।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেখানে ছাত্রের সংখ্যা ৬১১ এবং তিনটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল আছে। ছাত্র সংখ্যা ৬২০, ছাত্রী সংখ্যা ২৭১। একটি আবাসিক নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণালয় আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮। দুটি ছাত্রাবাসে ২৩৮ জন ছাত্র থাকে। সাতটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫,৭৯৭টি, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২২। সারগাছি কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে সমাজের দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি কমিউনিটি সেন্টার আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২৩। এই কেন্দ্রের অধীনে জেলা শহর বহরমপুরে একটি উপকেন্দ্র আছে। সেখানে ৪ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র বিনা ব্যয়ে থাকে। সেখানেও আছে একটি বড় মাপের গ্রন্থাগার।

রামহরিপুরের ছাত্রাবাসে ১৪১ জন ছাত্র থাকে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংখ্যা ৭,০০০, পত্রপত্রিকার সংখ্যা ১৬। রামহরিপুর কেন্দ্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষকেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ৯৮৭। ছাত্রাবাসে ১৯৮ জন থাকার সুযোগ পায়; তার মধ্যে ১২ জন বিনাব্যয়ে। ছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,০৯২। ছাত্রীবাসে ১৮২ জন থাকার সুযোগ পায়। তার মধ্যে বিনা ব্যয়ে থাকে ১২ জন। ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০০ ছাত্র, ছাত্রী ৪১৯। দুটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য মহিলা প্রশিক্ষণালয় আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩। ২২ জন মহিলাকে নিয়ে একটি কারিগরী শিক্ষালয় আছে। সেখানে মহিলারা তাঁত, সূচিশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩। গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যা ২১,৬৬১। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৭।

ওড়িশার পুরী রামকৃষ্ণ মিশনে আছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ সহ শিশুদের জন্য আছে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭,৩৭৭। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৬১। ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায় ৭২ জন। এর মধ্যে ৫২ জন উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর। এরা সকলে মিশন পরিচালিত কোচিং-এ পড়ার সুযোগ পায়।

আসামের শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুমোদন পায়। এখানে একটি ছাত্রাবাস আছে। ১৭০ জন উপজাতি শ্রেণীভুক্ত ছাত্র থাকে। একটি গ্রন্থাগারও আছে। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৮৫৫ টি।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে এই কেন্দ্রটির ভূমিকা অপরিসীম। এখানে একটি সৃজনশীল প্রায়োগিক শিল্পের স্থায়ী কেন্দ্র আছে। ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে এখানে আলোচনা হয়। শিশু বিভাগ সহ আছে একটি গ্রন্থাগার। এখানে পাঠকক্ষ আছে। ৪,০০০ গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থাগারে। ইংরেজি মাধ্যমে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। ছাত্র সংখ্যা ২৪৭, ছাত্রী সংখ্যা ২০০।

চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে ৮,১৫২টি গ্রন্থ আছে, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২০। ছাত্রাবাসে ২০ জন কলেজের ছাত্র থাকার সুযোগ পায়।

জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। অনুমোদন পায় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৪,৮৭৮, পত্র-পত্রিকা সংখ্যা ১২।

রাজস্থানের খেতড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৫,২১২, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২৭। ৪০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আছে নার্সারী স্কুল। দুটি প্রথাবহির্ভূত স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০। বালিকাদের জন্য একটি কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র আছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। খেতড়ি ছাড়াও রাজস্থানের অন্যান্য কেন্দ্রে শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। জয়পুর রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান কেন্দ্রের দ্বারা অনুমোদিত হয় ১৯৮৮তে। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৬,৬৮০।

গুজরাটের লিমডি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮তে। অনুমোদন পায় ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে নিয়মমাফিক। ছাত্রদের শিক্ষাখাতে ও দুঃস্থদের জন্য বিভিন্ন সেবাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন আলোকচিত্র সম্বলিত প্রদর্শনী লিমডি দরবার হলে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার নারায়ণপুরে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উপজাতি প্রধান অঞ্চলে কৃষিকাজ সম্বলিত এবং ৬৮৬ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে এখানে। ৪৩৪ জন ছাত্রদের নিয়ে একটি আবাসিক বিদ্যালয় আছে। একটি বহুমুখী কর্ম প্রশিক্ষণালয় আছে। এখানে কৃষি, হর্টিকালচার, কারপেন্টারি ও মৌমাছি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। নির্ধারিত স্বল্পমূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ৬টি কেন্দ্র আছে। উপজাতি শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য আছে ৫টি উপকেন্দ্র। সেগুলি অবস্থিত কুতুল, ইরাক-ভাত্তি, কুন্তলা, কাছাপাল এবং আকাবেদা অঞ্চলে।

নতুন দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, অনুমোদন পায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান ভারতের রাজধানীর এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার আছে। তিনটি বিভাগ—শিশুবিভাগ, সাধারণ বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ। গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা ৩৫,৮৪৪ আর থাকে ১৪৮টি পত্র-পত্রিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রদের পুস্তক ও সহায়ক পুস্তকের সংখ্যা ৮,২১৩। ২৩৪টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত আর্থিক বছরে রামকৃষ্ণ মিশনের সুসজ্জিত অডিটরিয়ামে। ১২৩টি বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে দিল্লী-নতুন দিল্লীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রতি রবিবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনার রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাটনার রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৯,৫৮৭, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৪৯। ছাত্রাবাসে ২০ জন ছাত্র বিনাব্যয়ে থাকার সুযোগ পায়। একটি পাঠকক্ষ আছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন সংস্কৃতি প্রসারিত করে দেবার জন্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। অনুমোদন পায় ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি ওয়েলফেয়ার হোম আছে। ৫০ জন শিক্ষার্থী বিনাব্যয়ে থাকার সুযোগও পায় এখানে।

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে ৩৯,৯১৮টি গ্রন্থ আছে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৯৩। একটি পাঠকক্ষ আছে। বিগত ৩৫ বছর ধরে 'বিবেকজ্যোতি'—ত্রৈমাসিক হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে এই কেন্দ্র থেকে। ছাত্রাবাস আছে একটি। দুঃস্থ-মেধাবী ছেলেরা এখানে থাকার সুযোগ পায়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।

রাচির মোরাবাদিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৮১,৫১৬ ও পত্র-পত্রিকা ১১০টি। দিব্যায়ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কথা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। দিব্যায়নের মাসিক বুলেটিন 'দিব্যায়ন সমাচার' প্রকাশিত হয় এখান থেকে। ৫৫টি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে এই কেন্দ্রটি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৯০২ জন। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

সালেম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, অনুমোদন পায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ৬,৯৯৯টি গ্রন্থ সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার আছে। দরিদ্র শিশুদের মধ্যে দুধ, টিফিন নিত্য বণ্টন করা হয়। গ্রন্থসংখ্যা ৫০০। অন্ধ ও কুষ্ঠ মানুষজনদের নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের সময়।

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। পাঠকক্ষসহ গ্রন্থ সংখ্যা ২১। ২৬ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। এছাড়া ভারতীয়

ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনেব আশ্রমে ও আশ্রমের বাইবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ সংস্কৃতি কেন্দ্র (পূর্বতন কুইনটন মেমোরিয়াল হল) বিভিন্ন সময়ে ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা সভা হয়ে থাকে।

শিকড়া কুলীনগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' ব্রতকে সফল কবতে। এখানে আছে একটি নার্সিং স্কুল। গ্রন্থাগারে ১৯,৩৫২টি গ্রন্থ রয়েছে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৬৩। গত আর্থিক বছরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই কেন্দ্র করে থাকে আশ্রম প্রাঙ্গনে এবং শহরেব বিভিন্ন স্থানে। ১০৮টি দরিদ্র ছাত্র নিয়ে একটি ছাত্রসংঘ আছে। এই সকল ছাত্রদের একদিকে আদর্শ জীবনবোধ ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেওয়া হয় অন্যদিকে খেলাধুলাব মাধ্যমে শারীরিক উন্নতিব প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। এদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ পডবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে পুষ্টিব জন্য ভালো খাদ্য সববরাহ করা হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এখানে একটি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল আছে। ৩৮ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। স্কুলটি উত্তরপ্রদেশে সরকাবি নার্সিং স্কুল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত। তীর্থযাত্রীও দরিদ্রদের খাদ্য বস্ত্র এই কেন্দ্র দান করে। ৪,৬৩৬টি গ্রন্থ আছে গ্রন্থাগারে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা-২৭। বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়ে থাকে দুঃস্থ মানুষ-মানুষীদের এই কেন্দ্রের মাধ্যমে। ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা ও ভক্তিমূলক সংগীত অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সময়ে।

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, অনুমোদন পায় ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে প্রধানত উপজাতি শিক্ষার্থীদের একটি বড মাপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১১৫ জন উপজাতি ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। এই কেন্দ্রের উপকেন্দ্র আগরতলায় একটি ছাত্রাবাস আছে— সেখানে ৫ জন থাকার সুযোগ পায়। ১,৬৫৭টি গ্রন্থ আছে গ্রন্থাগারে। উপজাতি প্রধান গ্রামীণ অঞ্চলে উন্নতিব নানা পবিকল্পনা রূপায়িত হয়।

মালদা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটি ৬২০ জন ছাত্র বিশিষ্ট একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। একটি গ্রামীণ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে মোহনপুরে— ছাত্রসংখ্যা ৫৮, ছাত্রীসংখ্যা ৬৩। দুটি নার্সারী স্কুল আছে। শিক্ষার্থী ১২২ জন। ৭৮ জন ছাত্র

ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। অবৈতনিক গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে একটি। গ্রন্থের সংখ্যা ৮,০৭২। দুঃস্থ মানুষদের অর্থ, নানা জিনিসপত্র পোষাক,পরিচ্ছদ সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন সময়ে। গত আর্থিক বছরে বন্যাত্রাণে ১,৬২,০০০ টাকা খরচ হয়েছে এই কেন্দ্রের মাধ্যামে।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্র সংখ্যা ৭৩১। দুটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে—সেখানে ছাত্রসংখ্যা ৩৩৭, ছাত্রীসংখ্যা ১৩৪। আছে একটি প্রি-বেসিক নার্সারী স্কুল। ১,২২২ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। ৮,৯৫৬টি গ্রন্থ আছে গ্রন্থাগারে। ৫৪,৭৯১ টাকা বন্যাত্রাণে ব্যয়িত হয়েছে গত আর্থিক বছরে। প্রতিদিন ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হয় মন্দির প্রাঙ্গণে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তমলুক কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুমোদন পায়। এখানে একটি শিল্প শিক্ষালয় আছে, আছে তিন বছরের একটি কারপেন্টারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮। এখানে একটি নিম্ন মাধ্যমিক এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৪৮ ও ১৫১। বিনাব্যয়ে ১০ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। মিশন গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা-১০,৪৫১, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা-২৩। বিভিন্ন উৎসবে নতুন বস্ত্র ও শীত বস্ত্র দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি ও ভক্তিমূলক সংগীতের অনুষ্ঠান হয় মন্দির প্রাঙ্গণে।

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন ১৯১০এ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পরিকল্পনায় এটি তৈরী হয়। দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক অনুদান ও দরিদ্রদের শীতবস্ত্র ইত্যাদি বাবদ ২১,৮৫৬ টাকা খরচ হয়েছে গত আর্থিক বছরে। গ্রন্থাগারে দুটি বিভাগ আছে সাধারণ ও শিশুদের জন্য, গ্রন্থসংখ্যা-২৫,৭২৯। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা-৫৭। বিনামূল্যে গত আর্থিক বছরে ২৫ জন দুঃস্থ শিশুকে দুধ ও বিস্কুট প্রতিদিন দেওয়া হয়েছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বাগ্মিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে থাকে নিয়মিত। কুম্ভমেলার সময় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ত্রাণ শিবির খোলা হয়। প্রদর্শনী ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থাকে।

বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা ৫,৪৬০। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৮। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল আছে—ছাত্র সংখ্যা ১৪০, ছাত্রী ১৩১। স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও নৈতিক

মূল্যবোধের জাগরণে বাঁকুড়া শহরে নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন তৈরী হয়েছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের উদ্যোগে। এখানে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। একটি ছাত্রাবাস আছে। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা ২১,১২৮, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৮৩। স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ের আলোচনা করে থাকে এই কেন্দ্র।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুমোদন পায়। গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা ৫,৬৬৯। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৪০। ৩২ জন ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে দুটি দাতব্য চিকিৎসালয়, কারপেন্টারি ও টেলারিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে গত আর্থিক বছরে। এছাড়া কেন্দ্রটির অভ্যন্তরে এবং বাইরে ভারতীয় দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে আছে একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়। গ্রন্থাগারে ১,৯৮৭টি গ্রন্থ রয়েছে। গ্রামীণ শিশু কল্যাণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জয়রামবাটী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। দুটি জুনিয়র বেসিক এবং দুটি প্রি-বেসিক স্কুল আছে। ১,৯৬৪টি গ্রন্থ আছে গ্রন্থাগারে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৬৭টি ছাত্র বিশিষ্ট একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে—ছাত্রসংখ্যা ২৪৩, ছাত্রীসংখ্যা ১০৮। একটি কর্ম প্রশিক্ষণালয় আছে—শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৪। ১৪১ জন ছাত্রের ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা আছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা ১০,২২০, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৬টি। দর্শনজাত শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আছে অডিওভিস্যুয়াল একটি ইউনিট। পল্লীমঙ্গল প্রকল্পের সাহায্যে নানা কাজ বাস্তবায়িত হতে থাকে গ্রামীন দরিদ্র মানুষদের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে।

করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে ৭২ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা ৪,৯৭৭টি, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১০টি। ৩২০টি শিশুকে নিয়ে নৈতিক শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় দুঃস্থদের। আশ্রমের মন্দিরে এবং বাইরে ধর্ম-দর্শন বিষয়ে আলোচনা সভা হয়।

দেরাদুনের কিষাণপুর রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৭৪-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৩৮৪টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৮টি।

ম্যাঙ্গালোব রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রে একটি ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ১১৫ জন ছাত্র আছে। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৪,১১৬টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৬টি। মিশনের অভ্যন্তরে ও বাইরে নানা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভক্ত-অনুরাগীদের নির্জনবাসে থাকার ব্যবস্থা করে এই কেন্দ্র।

১৯৩২-এ মুম্বাই (বোম্বাই) রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা ৫৬,৬৮৪। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৮৯। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প এবং আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন কাজ করে থাকে কেন্দ্রটি। এছাড়া একটি ছাত্রাবাসসহ টেলারিং স্কুল ও কৃষি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয় সক্কর গ্রামে, যা কিনা মুম্বাই থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা ৯৪৭টি। চারটি শিশু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। গত আর্থিক বছরে ৭৬,৯৯০ জনকে নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়েছে। ৭,৬১৭ নগদ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে দুঃস্থদের। বিপুল পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে রোগী-দুঃস্থ-দরিদ্র মানুষদের। মুম্বাই শহরে কর্মব্যস্ত ওরলিতে একটি উপকেন্দ্র আছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত বিষয়ক সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্রও আছে এখানে।

রাজমাহেন্দ্রী রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা ৮,৯৮৮টি, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২৩টি। এখানে একটি ফ্রী হিন্দি কোচিং সেন্টার আছে যার শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১৭ জন।

উপরিউল্লিখিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি ছাড়াও বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কাজ বাস্তবায়িত করেছে এবং করে চলেছে। এগুলির মধ্যে আছে—হাসপাতাল পরিচালনা, দাতব্য চিকিৎসালয় পবিচালনা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় পরিচালনা যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া মঠ কেন্দ্রগুলির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলির মধ্যে আছে গ্রন্থাগার পরিচালনা, আবাসিক নার্সিং স্কুল, ছাত্রাবাস, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অনুদান, শিক্ষা সামগ্রী প্রদান, বিদ্যালয়ের পোষাক প্রদান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, জনকল্যানকর কাজে অংশগ্রহণ, সমাজের অনগ্রসর মানুষের উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাওয়া। সার্বিক সংস্কৃতির বিকাশ, চরিত্রগঠনের কর্মসূচী রূপায়ণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত গ্রন্থপ্রকাশ, নির্জনবাসের ব্যবস্থা করা, সুস্থিত আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্যে উত্তরণ, বৃদ্ধাশ্রম

পরিচালনা, ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে আছে পোন্নামপেট রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কালাডি রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, পালই রামকৃষ্ণ মঠ (১৯২৭), আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ, বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসাত রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠ, ভবানীপুর রামকৃষ্ণ মঠ, কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ মঠ, চণ্ডীপুর, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, ইছাপুর, জামতাড়া, কাঞ্চীপুরম্, মাদুরাই, মায়াবতী, নাগপুর, নাট্টারামপল্লী, উটকামাণ্ড, পুনে, পুরী, কইল্যাণ্ড, রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশন, শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রম, ত্রিভাল্লা, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম। এই কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে :

১৯২৭, ১৯৩৬ (১৯৪১), ১৯২৬, ১৯১৬ (১৯৮৭তে স্বতন্ত্র কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ), ১৯২৭ (১৯২৯, ১৯৬১ (১৯৮৬), ১৯০৩, ১৯৬১ (১৯৮৫), ১৮৯৯, ১৯৮৬, ১৯৪৬, ১৯২১, ১৮৮৩ (১৯৪৩), ১৯১৬, ১৮৯৭, ১৯২২ (১৯৭৩), ১৯৯৪, ১৯২১, ১৯৩২, ১৯৭৫ (১৯৮৭), ১৮৯৯, ১৯২৮, ১৯০৮, ১৯২৬, ১৯৮৪, ১৯৩২, ১৯১৫, ১৯২৭, ১৯১৩ (১৯৮৬তে স্বতন্ত্র কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ), ১৯০২। কেরলের তিরুবন্তীপুরম্ কেন্দ্র ৭৬ জন শিক্ষার্থীকে নার্সিং প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কালাডি কেন্দ্রে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রের সংখ্যা ২৯০ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১২২ জন। সংস্কৃত মাধ্যমে একটি নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় আছে। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২৬ ও ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী আছে। ১৫৮ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা ৭৭৮টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২০। প্রকাশনা বিভাগ আছে। হরিজন ছাত্র-ছাত্রীদের টাইপ রাইটিং, টেলারিং, হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা আছে। ৩০টি হরিজন শিশুর জন্য ক্রেশ (শিশুদের দিবসকালীন রক্ষণাবেক্ষণ) আছে। রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমটি মঠ শ্রেণীভুক্ত হলেও এই কেন্দ্রটি রামকৃষ্ণ মিশনের যা কার্যধারা তা বাস্তবায়িত করে থাকে। এখানে অন্যান্য কর্মধারার পাশাপাশি একটি পাঠকক্ষ সহ একটি গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থসংখ্যা ৩২,৩২১ আর পত্র-পত্রিকা সংখ্যা ১৪৭। পাঠকক্ষে বিনামূল্যে অধ্যয়নের সুযোগ আছে, এই কেন্দ্রে একটি প্রকাশনা বিভাগ আছে। এপর্যন্ত ১০টি গ্রন্থ গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোত্' নামে গুজরাটি ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিগত আর্থিক বছরে ২১৯টি ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও

ভক্ত-অনুরাগীদের জন্য রিট্রিট এবং যুবকদের জন্য বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের কাজ করে চলেছে এই কেন্দ্রটি।

মহীশূর কেন্দ্রে গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। আছে একটি প্রকাশনা বিভাগ — কানাড়া ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩,৫৫০টি। ত্রিচূড় কেন্দ্রে গুরুকূল শিক্ষার প্রথায় ১৩৭ জন ছাত্রকে আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে হরিজন ২০, অনাথ ২৭। মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৯৭ জন। সংস্কৃত প্রশিক্ষণালয় আছে, মালায়ালাম ভাষায় প্রকাশনা বিভাগ আছে। 'প্রবুদ্ধ কেরলম্ পত্রিকা' প্রকাশিত হয় এই কেন্দ্র থেকে।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্রটি প্রধানত 'উদ্বোধন' কেন্দ্র নামে পরিচিত। এখান থেকে বাংলা ভাষায় প্রচুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি এখান থেকে প্রকাশিত হয়। বারাসাত কেন্দ্রটির গুরুত্ব এই যে স্বামী শিবানন্দ এখানে জন্মগ্রহণ করেন। আলমোড়া কেন্দ্রটি স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন।

আঁটপুর মঠ নানা কারণে বিখ্যাত। এখানে স্বামী প্রেমানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদা দেবী পদার্পণ করেছিলেন আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ২৪ ডিসেম্বর রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ৮জন সতীর্থকে নিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে আগুনের সামনে সন্ন্যাস নেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের গুরুত্ব অপরিমেয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এটিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম কেন্দ্র। এই পুণ্যস্থানেই একদা স্বামীজীর মত রামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যদের হাতে রুদ্রাক্ষের মালা ও গেরুয়া বস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে এই পুণ্যস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি ঘটে। হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রের গুরুত্ব স্বামী রঙ্গনাথানন্দের অবস্থানকে কেন্দ্র করে। বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম-দর্শনের প্রবক্তা স্বামী রঙ্গনাথানন্দের সান্নিধ্য পাবার জন্য এখানে ছুটে আসেন বহু ভক্ত-অনুরাগী। চেন্নাই কেন্দ্র থেকে তামিল ভাষায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা', তেলেগু ভাষায় 'বেদান্তম্ কেশরী', 'দা ভারতী' প্রকাশিত হয়ে থাকে। মায়াবতী কেন্দ্র বিবেকানন্দ নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায়, বিশেষত ইংরেজি গ্রন্থ সমূহ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা এখান থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই কেন্দ্রের সঙ্গে মিষ্টার এবং মিসেস সেভিয়ারের নাম বিশেষভাবে যুক্ত। স্বামী শিবানন্দ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষাপ্রসারে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা স্মরণ করে স্বাধীন ভারতেব প্রথম গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচাবী জানিয়েছেন—'আমরা সকলেই বামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ এই শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে যুক্ত কবা হয়েছে। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে শ্রীবামকৃষ্ণদেবের নাম—এই ঐতিহ্যই যথেষ্ট। এই এমন এক নাম যা বাঙালী তথা ভারতীয়দের জীবনে গতি সঞ্চার করেছে।' এই অভিমত থেকে আমরা বুঝতে পারি মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মান কেন এত উঁচুতে।

এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিব গুরুত্ব উল্লেখ করে আবাব আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা (গ্রন্থাগারেব মাধ্যমেও), সংস্কৃতি ধর্ম-দর্শন চর্চা, সাহিত্য প্রকাশনার মধ্য দিয়ে এই কেন্দ্রগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয়টি উচ্চকিত করেছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন—দুটি পৃথক কর্মধারায় ব্যাপৃত। কিন্তু আমরা মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রেব কর্মধাবাব সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় কবলে দেখতে পাব যে 'বহুজন হিতায বহুজন সুখায়' এর আদর্শটি মিশনেব কেন্দ্রগুলিব মতো মঠের কেন্দ্রগুলিও বাস্তবায়িত কবে চলেছে। শিক্ষাব প্রদীপটি রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র শুধু অনির্বাণ বাখে নি, তা প্রসারিত করে দিয়েছে সর্বস্তরে, সর্বজনের মাঝে। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গুণগত মানে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই উজ্জ্বল শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে নানা বৃহৎ কর্মকাণ্ডে প্রগতির বীজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। উন্নত চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, আদর্শায়িত জীবনবোধ, আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং সার্বিক সচেতনতায় আত্মস্থ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার একটি পর্ব সম্পূর্ণ কবে যখন বৃহত্তর-উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারপর দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে যেভাবে যুক্ত হচ্ছে নানা কর্মকাণ্ডে তা ভারতবর্ষের প্রবহমান চিন্তাধারা—যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চেতনার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে, তাবই স্বর্ণবিভাটি বিকশিত হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সাফল্যে এবং সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হবার এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে, সে কথা আমাদের জোরের সঙ্গে বলতে হবে। আবার রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যাপক সচেতনতা, জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে চলেছে। রামকৃষ্ণ মঠ শুধু আধ্যাত্মিকতার

বিকাশেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, রামকৃষ্ণ মিশনের মত গ্রন্থাগার, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা — দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মানুষ-মানুষীদের এগিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি আদর্শায়িত জীবনবোধে উন্নীত করা — এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লালিত ভাবনাটিকে বাস্তবায়িত করে চলেছে। রামকৃষ্ণ সংঘের দুটি স্বতন্ত্রধারা হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে মঠ ও মিশন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শটি এবং বহুজনায় হিতায় 'বহুজন সুখায়'এর কাজটি একই ভাবে পালন করে চলেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন গুণগত মানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের নজির রাখতে সক্ষম হয়েছে বিগত বছর গুলিতে, সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, পরিবেশ সচেতনতা, নান্দনিক চেতনার দিক থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশেষভাবে। এইগুলি ভারতের বিভিন্ন মনীষী-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদ, রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কিংবা স্নাতক স্তরেই নয়, রামকৃষ্ণ মিশন নিম্নবুনিয়াদি, প্রাথমিক স্তর শিক্ষার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, গণশিক্ষার ক্ষেত্রেও নিয়েছে উজ্জ্বল ভূমিকা। দর্শনজাত শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন বড় মাপের সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে। আসলে শিক্ষার এই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে মানুষকে যথেষ্টভাবে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়াসী হয়েছে এবং যথেষ্ঠ সফল হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন। তাই আজ ভারতজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উত্তীর্ণ বিদ্যার্থীর সমাদর সর্বত্র। তাই জোর দিয়ে একথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের সর্বস্তরে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন যে ভূমিকা নিয়েছে তা এই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ যেমন সাধারণ মানুষকে আদর্শায়িত জীবনবোধের দিক ছুঁয়ে মানসিকভাবে ধর্মোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তেমনি মঠ ও মিশন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি সার্বিক সচেতনতার পথটি করে তুলেছে প্রশস্ততর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক পরিচয় ও পরীক্ষার ফলাফল পরিশিষ্ট অংশে যুক্ত হল।

॥ ৩ ॥

আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃতি প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিকতা প্রসারণের বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। সারাবছর ধরে দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ, ধর্ম-দর্শন বিষয়ক গ্রন্থপাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের শাশ্বত বাণী উচ্চকিত করে তুলতে চেয়েছে এবং এখনও করে চলেছে। অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ধর্মের সত্যরূপকে প্রকাশিত করে তুলেছে, এবং সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সম্মিলিত ১৮০টি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে। এগুলির মধ্য দিয়ে ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ পঠিত আলোচিত হয়ে থাকে। আর এই সূত্রে মানুষের সচেতনতা ও জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

বেদান্তের নানা ভাষা, গীতা, ভাগবৎ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের নানা ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে ভারতের মানুষের অবগত হয়। বিশেষত এযুগের বেদ-বেদান্ত সম্মিলিত ভাবের রূপ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীমাসারদা দেবী', 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মালিকা' গ্রন্থ পাঠ করে ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিরা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকেন। অন্যান্য ধর্মের ধর্মাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পর্ষদের আবির্ভাব তিথি, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, শিবরাত্রি প্রভৃতি রামকৃষ্ণ মিশনে উদ্‌যাপিত হয়। এভাবেই ধর্মের বাইরের রূপ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন। তারপর অন্তঃস্বরূপটির উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হন, যা কিনা বিবেকানন্দের ভাষায় অন্তরে দেবত্বের প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আমাদের সকলের জীবনে আছে পরম ব্রহ্ম, মাঝখানে আছে আড়াল। এই সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেছেন — পাকা আমি ও কাঁচা আমি। সক্রেটিস বলেছেন — Eternal ও Relative truth। রবীন্দ্রনাথ আবারো বলেছেন, বড় আমি ও ছোট আমি। স্বল্পাক্ষর-নিরক্ষর, মানবতার চিরপূজারী লালন ফকির তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' দুই আমির মাঝে আড়াল, তা অন্ধ লোভ-লালসা আর আত্মকেন্দ্রিকতার আড়াল — এই আড়ালকে সরিয়ে দিতে পারলে পাকা আমি ও কাঁচা আমির সংমিশ্রণ ঘটবে। আমি যে পরম ব্রহ্মের সন্তান তা বুঝলে ব্রহ্মলাভ ঘটবে। ভারতের শাশ্বত চিন্তা চেতনার প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ঈশ্বর লাভ প্রসঙ্গ এইভাবে আমাদের

কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। স্বকীয় উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যাই। মানুষ অমৃতের সন্তান, যে যেখানেই থাকুক না কেন, তার চলার লক্ষ্য স্থির করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ বারবার ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন আধ্যাত্মিকতা প্রসারে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীটি সযত্নে পৃথিবীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সকল দেশের মানুষদের উত্তরণের পথটি প্রশস্ত করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। তাই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষাপ্রসারের জন্য এবং স্থিতিশীল জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছোবার অভীপ্সায় সৎসঙ্গ, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচনার কথায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর তা সম্ভব হয় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থপাঠ আলোচনা শোনার মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশন তাই ভারতীয় নানা ভাষায় শুধু নয়, স্প্যানিশ, জার্মানি, ডাচ, চিনা, জাপানি, ইতালিয়ান, উর্দু, সিলোনি ইত্যাদি ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষকে মুক্তির-উত্তরণের পথ দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে চায়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তা কয়েকটি সূত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তুলে ধরছে পারি।

ক) শত শত নর-নারী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ করে আত্মোপলব্ধি এবং 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে।

খ) হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ অনেকটা হ্রাস করেছে।

গ) ভারতের শাশ্বত ধর্মকে বুঝতে অনুভব করতে পেরেছে সাধারণ মানুষ।

ঘ) অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এবং একই সূত্রে সবধর্ম সমন্বয় সাধনায় উপনীত হয়েছে এই তথ্যটি উচ্চকিত করার জন্য তুলনামূলক ধর্মচর্চার আয়োজন হয়েছে।

ঙ) এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শুধু নয়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী উপলব্ধি করে ধর্মের মূল তত্ত্বটি অনুভব করতে পেরেছে। সংঘাত অনেক কমে এসেছে।

চ) দ্বৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যে তথাকথিত বিরোধ চলে আসছিল তার মধ্যে ঐক্যবিধান সাধিত হয়েছে। এ সব কিছু যে সাধকের উপলব্ধির পথে সাধারণ স্তর মাত্র তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে।

ছ) ভারতের শাশ্বত ধর্ম, আধ্যাত্মিক মানবিকতামূলক সর্বজনীন সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

জ) কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মকে আলিঙ্গন করার পথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন।

ঝ) কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের যে কোন একটি পথ ধরে এগোলে ধর্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্ভব—একথাও তাঁরা উপলব্ধির নিরিখে জানিয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়টিকে বোঝাতেন 'যার পেটে যা সয়' বাক্যটি উচ্চারণ করে। সংশ্লিষ্ট সাধনার সরলীকরণের পথটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উন্মোচিত করলেন।

ঞ) এখানে শ্রীরামকৃষ্ণই ইষ্ট-গুরুরূপে বিরাজমান। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মত এখানে তথাকথিত গুরুবাদের স্থান নেই। সংঘ-গুরু বা সংঘ্যাচার্যরা মন্ত্রদীক্ষার মাধ্যমে এবং সৎপরামর্শের দ্বারা ভক্ত-অনুরাগীদের শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পৌঁছে দেন।

ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিকতার প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা এককথায় বলে বোঝান যাবে না। রামকৃষ্ণ মিশন সমাজসেবী সংস্থা নয় তা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় গঠিত আধ্যাত্মিক সংগঠন এটি। মানুষের আত্মশক্তি স্ফূরণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন আর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ওই স্ফূরণের বিশেষ প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের অভিমতটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—'স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ। তাঁর নামের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের এই মহাদেশের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা যেমন একদিকে পূর্ণ করেছেন তেমনই তা পাশ্চাত্যে প্রসারিত করেছেন। তাঁর আত্মিক শক্তি ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় শিল্প সংস্কৃতির নানা স্তরে অভিব্যক্ত। ভারতের চিরন্তন সত্তাকে তিনি মূর্তি দিয়েছেন ও বাঙ্ময় করে তুলেছেন।'[২]

॥ ৪ ॥

শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের। সারা ভারত পরিক্রমা এবং পাশ্চাত্য অভিযানের মধ্য দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রজ্ঞাদৃপ্ত ধারণা জন্মেছিল তাঁর। তিনি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ

মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় সর্বধর্মের ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকটি নিজে অঙ্কিত করে দিয়েছেন। আবার তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রচ্ছদ দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রচ্ছদটি একেবারে কদর্য'।[৩] বলা বাহুল্য, স্বামীজীর চিঠি পড়ে প্রচ্ছদের পরিবর্তন করেছিলেন তৎকালীন সম্পাদক। রবি বর্মার ছবি স্বামীজী দেখেছেন। কিন্তু তিনি উচ্চপ্রশংসা করেননি। তাঁর ছবি এদেশিয় হলেও তাতে যে বিদেশি আদল ছিল, তাই তিনি মন্তব্য করেছেন—'বড় জোর ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে একটা আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্র, পটো ভালো। তাঁদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ্ আছে। ও সব রবি বর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়! বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি আছে ভালো।'[৪] বিবেকানন্দের এই আভাস বিদগ্ধ শিল্পবেত্তার পরিচয়বাহী।

কলকাতা জুবিলি আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে অনেক মৌলিক চিন্তাচেতনা প্রসারিত করে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, উল্লেখ করেছিলেন,—'মানুষ যে জিনিস তৈরী করে তাতে কোন একটা Ideal Express করার নাম Art যাতে Idea-র Expression নেই, রঙ-বেরঙের পরিপাট্য থাকলেও তাকে প্রকৃত Art বলা যায় না। ঘটি বাটি পেয়ালা প্রতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ভাব প্রকাশ করে তৈরী করা উচিত।'[৫]

অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দের শিল্প চিন্তা সম্পর্কে মৌলিক অভিব্যক্তির কথা শুনে কৃতজ্ঞ চিত্তে জানিয়েছিলেন—'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলা বিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারতো।... আপনি ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আশীবাদ করুন আপনার নিকট যে সকলভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।'[৬]

বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্যা নিবেদিতা শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সে কথা আমরা জানি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, প্রমথকুমার ঠাকুর নিবেদিতার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বিবেকানন্দের কত গভীর জ্ঞান ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে। রণদাপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির নির্মাণে প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলা একত্রিত করার অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'এই ভাবী মঠ-মন্দিরটি নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্বন্ধে যত সব idea নিয়ে এসেছি তার সবগুলি এই মন্দির নির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করবো।'[৭] তিনি বেলুড় মঠের ভাবী মন্দির সম্পর্কে আরো বলেছিলেন,—'বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে।... আর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও নাট-মন্দিরটি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁকার বলে ধারণা হবে। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্রে সম্মিলিত হয়েছে।'[৮]

স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দের অভিমত—এই রেনেসাঁসের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতকালে যেমন সকল জাতির আর্টের অভ্যুদয় হয়েছিল, তেমনি নবযুগের সকল সভ্যতার একত্রীভূতযোগ হবে।

বিবেকানন্দের ভাব নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধানকেন্দ্র বেলুড়মঠের যে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হয়েছে (১৯৩৮) তাতে বিবেকানন্দের সব আইডিয়া রূপায়িত করা যায়নি একথা সত্য। কিন্তু তবুও মন্দিরটি ভারতের স্থাপত্য শিল্পের অনন্য দৃষ্টান্তরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিবেকানন্দের পরিকল্পিত রামকৃষ্ণ মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে ইউরোপীয় ও ভারতীয় স্থাপত্য কলা। আবার ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে মিশর ও বৌদ্ধ স্থাপত্যকলার। এখানকার সমস্ত স্থাপত্যকলা হল শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ—'যতমত ততপথ' এই প্রতীকী ভাবনা নিয়ে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মন্দির সর্বধর্ম সমন্বয়ের উজ্জ্বল প্রতীক এবং প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন উপাসনালয়। শিল্প জগতে রামকৃষ্ণ মন্দিরের স্থাপত্য শিল্প এক নতুন সংযোজন। ঐতিহ্যবাহীত ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যরীতির অনুসরণ না করে একটা স্বতন্ত্র রীতি অনুসৃত হয়েছে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ স্থাপত্যে। এই রীতি অনুসরণ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতের এবং বহির্ভারতের নানা শাখা কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আমরা বুঝতে পারি বিবেকানন্দের চিন্তাসূত্রে 'রামকৃষ্ণ স্থাপত্যের' অপূর্ব মহিমা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের গল্প ও উপদেশ, তাঁর জীবন ও বাণী নিয়ে, শ্রীমাসারদা দেবীর জীবন ও বাণী নিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে একাধিক চিত্রিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী, সুনীল পাল, নিত্যানন্দ ভকত প্রমুখ সংশ্লিষ্টজনেরা এই কাজে তাঁদের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এবং যথাথ ভাবটি পরিস্ফুটিত করেছেন। এছাড়া অতুল বসু, সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার, পরিতোষ সেন, বিকাশ ভট্টাচার্য, ওয়াসিম কাপুর, নীরেন দাশ, বিমান দাশ, অলকেন্দু পত্রী, বিকাশ বসু, পুর্ণেন্দু পত্রী, রীতা ঝুনঝুনওয়ালা প্রমুখ ভারতীয় শিল্পী, পাশ্চাত্যের এ.এ. চিত্রক, ফ্রাঙ্ক ডোরাক, হফম্যান প্রমুখ ষিশিষ্ট শিল্পীরা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি বিভিন্ন ভাবে এঁকেছেন — যাকে আমরা রামকৃষ্ণ শিল্পচর্চা বলে অভিহিত করতে পারি। এ সব কিছুর মিল মিশে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকাটি আমাদের কাছে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অফ কালচার সহ রামকৃষ্ণ মিশনের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণ কেন্দ্রে যে সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির এই পরম্পরায় বর্তমানকে স্পর্শ করেছে অতীত। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন বড় শিল্পী, তাঁর সেই শিল্পিত মনের হদিশ পেয়েছেন প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় রামকৃষ্ণ মিশনের শিল্পচর্চা তাই গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে। শুধু এদেশে নয়, দেশান্তরের মানুষজনেদের নান্দনিক চেতনাকে আরো বেশি উদ্‌বোধিত করেছে তা।

রামকৃষ্ণ মিশনের শিল্প সংস্কৃতি বিকাশে যে কেন্দ্রটি বড়মাপের ভূমিকা নিয়েছে তা কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অফ কালচার। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বর্তমান দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল অট্টালিকায় এই সংস্কৃতি কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই কেন্দ্রটি।

ক) ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ-সার্বিক রূপচ্ছবিটি তুলে ধরেছে একদিকে। অন্যদিকে তার প্রকৃত ভাষ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ-মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে স্বরূপটি করেছে উন্মোচিত সর্বজনের সমক্ষে। পাশ্চাত্য থেকে আগত ভারতপ্রেমীরা এই কেন্দ্রে এসে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির সম্যক ধারণাটি গড়ে নিতে পারেন।

খ) ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে বহির্ভারতের শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা, প্রদর্শনী ও মতামত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতির ঐক্যবোধ গড়ে তোলার একটি মুখ্য ভূমিকা এই কেন্দ্রটি নিয়েছে।

গ) ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রবহমান ঐতিহ্য আধুনিক কালের মানুষের কাছে তুলে ধরার কাজে এই কেন্দ্রটি নিরলস ভাবে ব্রতী।

ঘ) প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের সেতুটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে এই কেন্দ্রটি।

ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকায়িত শিল্পী। তাই লোকায়ত শিল্প সংগ্রহ ও চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এখানে।

তাই আমরা দেখতে পাই দুটি ভাগে বিন্যস্ত হয়েছে শিল্প প্রদর্শন কক্ষ। তার একটিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাশ্বত শিল্প নিদর্শন, অন্যদিকে লোকায়ত শিল্পের নানা নিদর্শন—লোকায়ত শিল্পের সামগ্রিক রূপচ্ছবিটি প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে। আর দ্বিতীয় কক্ষে ভারতীয় শিল্পকলার অগ্রগতির ছবিটি নানাচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। সেখানে ঐতিহ্যের ক্রম-পরম্পরাটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। প্রসঙ্গত, নন্দলাল বসুর জন্মশতবার্ষিকীতে ভারতীয় ললিতকলা একাদেমির সহযোগিতায় এবং তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে নন্দলাল বসুর আঁকা গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলি নিয়ে যে বড়মাপের প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে আমরা ভারতীয় শিল্পকলার ধ্রুপদী ঐতিহ্যের শেকড়টি যে কত গভীরে প্রোথিত তা আমরা জানতে পেরেছি এবং আধুনিক যুগের শিল্পকলার বিন্যাসটিও প্রত্যক্ষ করেছি। এই কেন্দ্রে ভারতীয় প্রথায় শিল্পকলা শিক্ষা দেবার জন্য সারদাদেবীর নামাঙ্কিত একটি শিক্ষণকেন্দ্র আছে। সেখানে কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়া তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে মতামত বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত অডিটোরিয়ামে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দেশ-বিদেশের উজ্জ্বল ব্যক্তিরা আলোচনা চক্রে মিলিত হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে আছে একটি অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার। সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১,৬১,৮১৭ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার (দেশি-বিদেশি) সংখ্যা ৪২৪। ছোটদের জন্য আছে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার। সেখানে গ্রন্থের সংখ্যা ১২,৯৩৪। কিশোর-কিশোরীদের জন্য অন্য একটি গ্রন্থাগার আছে। সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৫,৮০২। এই কেন্দ্রে অতিথি নিবাসে বিভিন্ন সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানা গোত্রের মানুষজন আসেন। তাই একটি চমৎকার সার্বজনীন উপাসনালয় আছে। এছাড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগীদের জন্য আছে একটি সুন্দর মন্দির। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ে বিগত আর্থিক বছরে ৩০৬টি

বক্তৃতা সভা আয়োজিত হয়েছিল। এই বক্তৃতা সভায় দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছিলেন। সংগীত সম্মেলন, শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা চক্র, পারস্পরিক মত বিনিময় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩৩টি। তাতেও দেশ-বিদেশের গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা অংশ নিয়েছেন। আর দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন শিল্প, সংগীত ও দর্শন রসিকেরা। এখানে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার সূত্র ধরে দেশি-বিদেশি নানা ভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলি হল—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, জাপানিজ, ইটালিয়ান, আরবিক, চাইনিজ, ফার্সী, ইংরেজি, স্প্যানিশ, বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু এবং হিন্দি।

এই কেন্দ্র থেকে শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক ও নানা ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে আছে The Cultural Heritage of India। বিগত ৪৭ বছর ধরে একটি মাসিক Bulletin প্রকাশিত হয়ে আসছে। ভারততত্ত্ব বিষয়ে এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে নিরন্তর গবেষণা কার্য চলেছে দেশ-বিদেশের নানা গবেষকদের নিয়ে। সম্প্রতি একটি বিবেকানন্দ আরকাইভিস্ বা সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে বিবেকানন্দ চর্চায় সঠিক ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে।

॥ ৫ ॥

সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত। ভারতীয় সঙ্গীত প্রধানত একটি আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সঙ্গীতের ললিত ঝঙ্কার, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনাকে ধ্বনিত করে চলেছে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে। সঙ্গীত সাধনারই অঙ্গীভূত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর জীবনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা সঙ্গীত সাধনার গভীর তলাতলের কিছুটা আন্দাজ পেতে পারি। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর মধ্যে ভৈরবী, ললিত, বাগেশ্রী, মালকোষ প্রভৃতির মধ্যে আছে এক করুণ আত্ম-নিবেদনের অভিব্যক্তি, আছে সাধনার মধ্য দিয়ে আরাধ্যকে পাবার এক গভীর আর্তি। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর অন্যতম লক্ষ্য হল সাধনা—সাধনার স্তরকে বিকশিত করা এবং আত্মানুভূতিকে পরম প্রাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

তাই অন্তর বিকাশের পরম এক মাধ্যম হল সংগীত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অন্তর বিকাশের সার্বিক মাধ্যম রূপে সংগীতকে গ্রহণ করেছিলেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সংগীত অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গীভূত। 'ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার দু-হাজার

বছরের ঘনীভূত রূপ' বা বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা যাঁর ধেয়ানে মিলিত হয়েছে তিনি অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনা-তপশ্চর্যার সঙ্গে সংগীত যুক্ত হয়ে আছে ওতপ্রোত ভাবে। সংগীতের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব যেমন তিনি প্রকাশ করেছেন বারে বারে পার্ষদদের-ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে, তেমনি সংগীত শ্রবণের মাধ্যমে আত্মস্থ হয়েছেন, সমাধিস্থ হয়েছেন অনিবার অর্থাৎ অন্তর দেবতার মিলন ঘটেছে জীবনদেবতার সঙ্গে; ব্রহ্মের সঙ্গে পরমব্রহ্মের। প্রথম সাক্ষাতে বিবেকানন্দের কণ্ঠে গান শুনে তিনি যে বিভোর হয়েছিলেন তার প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনয় বিধৃত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রসহ নানা শাখা কেন্দ্রে নিত্য কিংবা সপ্তাহন্তে বা মাসে অথবা বিভিন্ন উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া গান যার অধিকাংশ রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের রচনা, সেই গানগুলি এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রমুখের রচিত নানা গান ও স্তোত্র পরিবেশিত হয়ে থাকে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখের রচিত গানে শ্রীরামকৃষ্ণ খুঁজে পেতেন বিশ্বাস, ভক্তি ও ভাবের মিশ্রণ। ভক্ত-অনুরাগীদের চিত্তও তিনি ঐ সকল গানের মধ্য দিয়ে রাঙিয়ে দিতেন। গৃহী পার্ষদদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ সংগীত রচনা করতেন। আর গায়কদের মধ্যে ছিলেন শ্রীম, নরেন্দ্রনাথ, রামলাল, ত্রৈলোক্যনাথ, বৈষ্ণবচরণ, ভাই ভূপতি, নীলকণ্ঠ ও আরও অনেকে। ঈশ্বর-অধ্যাত্মচিন্তার সূত্রে শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারা সংগীতের প্রবহমানতা ক্রম পারম্পর্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান ও নানা শাখা কেন্দ্রে পরিবেশিত গানে।

রামকৃষ্ণ মিশনের শুরু থেকেই সাধনা-আরাধনার সূত্রে সংগীতের চর্চা চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক সংগীতটি (খণ্ডন-ভব-বন্ধন; জগ-বন্দন; বন্দি তোমায়), অভেদানন্দ রচিত শ্রীসারদাস্তোত্রম্ (প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং / নররূপধরাং জনতাপহরাং) মিশ্র তিলক কামোদ রাগে নিবদ্ধ। এই স্তোত্র-সংগীত দুটি রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্রে সন্ধ্যারতির সময় সন্ন্যাসী ও ভক্ত-অনুরাগীদের কণ্ঠে যখন গীত হয় তখন এক বিশেষ ভাবের সঞ্চার ঘটে। অন্তরদেবতার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে বাইরের আমি। এছাড়া সংগীতের নিয়মিত অনুশীলন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের অভিমত,—'ভারতে নাটক ও সংগীত অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত। উহাদিগকে লোকে ধর্ম সাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। লোকের

ধারণা—প্রেম সংগীতই হউক বা যাহাই হউক, সংগীত মাত্রেই যদি কেহ তন্ময় হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার অবশ্য মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস ধ্যানের দ্বারা যে ফললাভ হয়, সংগীতেও তাহা হইয়া থাকে।'[৯] বিবেকানন্দ নিজে উচ্চাঙ্গ সংগীত ভালোবাসতেন এবং গাইতেন। রামকৃষ্ণ মিশনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা তাই পল্লবিত ভাবে প্রসারিত। উৎসব-অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া মিশনের নানা কেন্দ্রে বিভিন্ন সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের (কণ্ঠ এবং যন্ত্র) আয়োজন হয়ে থাকে।

রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে সন্ন্যাসীদের বা আমন্ত্রিত শিল্পীদের গীত গানগুলির মধ্যে অধিকাংশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্গত। এগুলির ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ও কঠিন তালের উপর ভিত্তি করে রচিত। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত 'অন্তরে জাগিছ মা, ' অন্তর যামিনী' সংগীতটি সুরমল্লার ঝাঁপতালে রচিত। গনেন্দ্রনাথ রচিত 'গাও হে তাহার নাম, রচিত যারে বিশ্বধাম'—খাম্বাজ ও চৌতালে গীত হয়ে থাকে। বিবেকানন্দ রচিত আরাত্রিক ভজনটি মিশ্রকল্যাণ রাগের চৌতালে, ত্রিতালে, একতালে রচিত। ভজন, ভক্তিসংগীত, কালীকীর্তন, শ্যামাসংগীত ও রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দ বিষয়ক গান রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে গীত হয়। এই গানগুলির মধ্যে বেশ কিছু গান স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ গীতিকারদের রচনা। ধ্রুপদাঙ্গের গান ছাড়া লঘু সুরের গানও গীত হয়ে থাকে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ গীত গান; বিশেষত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত রচিত গান—'ডুব দেরে মন কালী বলে', 'কে জানে গো কালী কেমন', 'শ্যামা মাকি আমার কালো রে,' কুবিরের 'ডুব ডুব সাগরে আমার মন', দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত 'ভব সাগর তারণ কারণ হে / রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন হে'—ইত্যাদি সংগীতগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বহু লোকসংগীতও রচিত হয়েছে। এই লোকসংগীতগুলি মূলত বাউল শিল্পীরা গেয়ে থাকেন। দুটি গানের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে—ক) 'এসেছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে' খ) 'পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে।' শেষের গানটি বিভিন্ন সংগীত শিল্পী বিভিন্নভাবে গেয়ে থাকেন।

ভারতে ও বহির্ভারতের রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে, বাংলা ভাষা ছাড়া ইংরেজি ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় সংশ্লিষ্ট সংগীতগুলি অনূদিত

হয়েছে। শুধু তাই নয়, তা গীতও হয়। সংগীতের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সকল ধর্মসাধনার ও অধ্যাত্ম অভিযাত্রার সহায় রূপে বাংলাদেশের ও প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের সাধক-সাধিকাদের রচিত গানকেই গ্রহণ করেছিলেন। গান জীবনের জাগরণের একটি অঙ্গ বা সামগ্রী, গান প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীদের দেহের মধ্যে প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার একটি প্রত্যক্ষ উপায়, গান সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ও অপার্থিব শক্তির অধিকারী করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছিলেন নিজের জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে।'[১০]

রামকৃষ্ণ মিশন তো শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগীত চর্চা ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোতস্বিনীর বুকে তুলে দিয়েছে নতুন পাল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বিবেকানন্দকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন কিভাবে সাধন করা যায়—উত্তরে বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন, 'তুই তাঁর গান কর, ঠাকুরের গান মনে নেই।' এই বলে তিনি দুটি গান গাইলেন—

ক) নামেরই ভরসা কেবল।

খ) আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক সংগীত, শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া সংগীত, রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দকে নিয়ে রচিত সংগীত—সর্বোপরি, বিবেকানন্দের গাওয়া সংগীত বিভিন্ন সময়ে গীত হয়ে চলেছে। আর তার মধ্য দিয়ে নৈরাশ্য পীড়িত দ্বন্দ্বমুখর জীবনে মানুষ শক্তি ও শান্তির পথটি খুঁজে পাচ্ছে। জীবনের জাগরণ ও উত্তরণের ক্ষেত্রে সর্বোপরি ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গানগুলির ভূমিকা অপরিসীম।

॥ ৬ ॥

এই আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত এবং রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্য প্রকাশ করে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। প্রকাশনা জগতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকাটিও বড় মাপের। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবাদর্শ প্রসারে উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছে। উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, রামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর চেন্নাই ও রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অফ কালচার, এবং অন্যান্য শাখা কেন্দ্র থেকে

প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত-ভারতীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে একাধিক অধ্যাত্ম পিপাসা যেমন মেটাচ্ছে তেমনি ভারতীয় ধর্ম দর্শন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করে চলেছে। আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সাহিত্য নতুন জীবনে পথের সন্ধান দিয়েছে। প্রসঙ্গত বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে তার লেখা চিঠিপত্রে তাঁর শক্তি বিরাজ করেছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে এই চিঠিগুলি পাঠ করবে তার মধ্যেও সেই শক্তি সঞ্চারিত হবে। একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। সন্ন্যাসীরা রামকৃষ্ণ মিশনে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন তাঁরা বিবেকানন্দের বাণীর দ্বারাই। সেই বাণী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছে রামকৃষ্ণ মিশনের উপরিল্লিখিত প্রকাশন কেন্দ্রগুলি। তাই আমরা দেখতে পাই অগণিত শহীদ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফাঁসীর রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করেছেন বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ করে। কোটি কোটি মানুষের স্বাজাত্যবোধ তিনি জাগ্রত করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, তিলক, অরবিন্দ, জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পড়ে দেশাত্মবোধে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। একথা তাঁরা তাঁদের লেখনীতেই জানিয়ে গেছেন। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ছাড়াও নারী প্রগতি, শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন — সংগীত-শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক চেতনার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলির প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ নোবেল লরিয়েট ফরাসী সাহিত্যিক রোমা রোলাঁকে বলেছিলেন, 'যদি ভারতবর্ষকে জানতে চান তা হলে বিবেকানন্দকে পড়ুন।' বিবেকানন্দকে পড়ে রোমা রোঁলা কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থটির ভাব ভাষার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে দীনেশচন্দ্র সেনকে পাঠ করতে বলেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষায় রচিত-অনূদিত গ্রন্থগুলির ভূমিকা অপরিসীম। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের 'উদ্বোধন' কার্যালয় (কলকাতার বাগবাজারে অবস্থিত) থেকে, উত্তরপ্রদেশের পিথোরগড় জেলার মায়াবতী কেন্দ্র থেকে (কলকাতায় উপকেন্দ্র এন্টালীতে অবস্থিত), এবং চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ) শহরের মায়লাপুর কেন্দ্র থেকে বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি, নেপালী ও দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্য প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন' কার্যালয় থেকে

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রধানত বাংলা এবং হিন্দি-ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যা ৫০০। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' (দু'খণ্ডে বিন্যস্ত), 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' (নতুন আঙ্গিকে দিনাংকানুসারে প্রকাশিত', 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রসঙ্গ', 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' (দুখণ্ডে বিভক্ত), 'অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি', 'আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা', 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিত মা সারদা', 'শ্রীশ্রী মা সারদাদেবী', 'শ্রীশ্রী মায়ের কথা', 'যুগজননী সারদা', 'চিরন্তনী সারদা', 'আলোকচিত্রে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকথা', 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (দশ খণ্ডে বিভক্ত), 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (তিন খণ্ডে বিন্যস্ত), 'পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ নতুন তথ্যাবলী' (প্রথম খণ্ড), স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী', 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী', 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে', 'বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ', 'আলোকচিত্রে বিবেকানন্দের জীবনকথা', ইংরাজীতে 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' (বাংলায় অনূদিত—'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি'), হিন্দিতে 'বাচ্চো কি বিবেকানন্দ', 'বাচ্চো কী মা সারদাদেবী' ইত্যাদি।

এছাড়া সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাবলীর অনুবাদ, ধর্মপ্রসঙ্গে প্রকাশিত বিবিধগ্রন্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের জীবনচরিত-পত্রাবলী-স্মৃতিকথা, ধ্যান-জপ, দান ও ভ্রমণের নানাগ্রন্থ।

মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে ইংরেজি, হিন্দি ও নেপালী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে রোমা রোলাঁ রচিত 'দি লাইফ অব্ রামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ-এ বায়োগ্রাফি অব্ পিকচারস্', 'রামকৃষ্ণ এন্ড্ হিজ ডিসাইপেলস্', 'সারদাদেবী: দি গ্রেট ওয়ান্ডার,' 'শ্রীসাবদাদেবী: এ বায়োগ্রাফি ইন পিকচারস্', 'ইন দি কমপ্যানি অব্ দ্যা হোলি মাদার,' 'কমপ্লিট্ ওয়ার্কস অব্ স্বামী বিবেকানন্দ' (৯ খণ্ডে প্রকাশিত), 'লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ 'বিবেকানন্দ: ম্যান এন্ড হিজ ম্যাসেজ,' 'রেমিনেসেন্স অব স্বামী বিবেকানন্দ,' 'লেকচারস ফর্ম কলম্বো টু আলমোড়া,' 'লেটারস অব্ স্বামী বিবেকানন্দ', 'বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট: নিউ ডিসকভারিস' (ছয় খণ্ডে প্রকাশিত) 'গ্রেট উইমেন অব ইণ্ডিয়া', 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' ইত্যাদি। এছাড়া আছে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের জীবন ও বাণী, ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক নানা গ্রন্থ। আর আছে 'কমপ্লিট্ ওয়াকর্স অব্ সিস্টার নিবেদিতা' (৫ খণ্ডে বিভক্ত), নিবেদিতার লেখা 'দি ওয়েভ অব্ ইন্ডিয়ান লাইফ', 'কালী দা

মাদার', হিন্দিতে 'বিবেকানন্দ কা মানবতাবাদ,' 'ইচ্ছাশক্তি আউর উসকা বিকাশ,' নেপালী ভাষায়—'রামকৃষ্ণ কী কথা', 'বিবেকানন্দ কী কথা' ইত্যাদি।

চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ)-এর মায়লাপুর কেন্দ্র থেকে ইংরাজীতে ২২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে —'রামকৃষ্ণ—গ্রেট মাস্টার' (২টি খণ্ডে), 'দ্যা গসপেল অব্ রামকৃষ্ণ,' 'বৈদিক রিলিজিয়ন এন্ড ফিলজফি,' 'দি গসপেল অব্ হোলি মাদার, (দুটি খণ্ড), 'স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া,' 'বেদান্ত ইন প্র্যাকটিস্' ইত্যাদি অনূদিত গ্রন্থ। এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অর্থাৎ তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালায়ালাম্ ভাষায় লেখা মৌলিক নানা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৬০০টি।

এই তিনটি প্রধান প্রকাশনা কেন্দ্র ছাড়া নাগপুর কেন্দ্র থেকে হিন্দিতে ১৫০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—'মা সারদা', 'বিবেকানন্দ সাহিত্য সঞ্চয়ন', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বচন সূত্র' (তিন খণ্ড) 'অমৃতবাণী', 'আত্মানুভূতি তথা উসকে মার্গ', ইত্যাদি।

কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অফ্ কালচার থেকে ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় প্রায় ২৫টি বই রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,' 'শতরূপে সারদা,' 'বিবেকানন্দের বেদান্ত চিন্তা,' 'কালচারাল হেরিটেজ অব্ ইন্ডিয়া' (৬টি খণ্ড), 'আমার ভারত-অমর ভারত,' 'পালস উইসডস্', 'মাই ইন্ডিয়া দি ইন্ডিয়া ইটারনাল,' 'রিজিয়ানস্ অফ দি ওয়ার্ল্ড,' 'বিলিয়ান এন্ড দি কালচার,' 'রিলিয়ান এন্ড দি সায়াম্স,' ইত্যাদি।

এছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রকাশিত এই সকল গ্রন্থগুলির মধ্যে .দিয়ে একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রজ্ঞাদৃপ্ত মননিষ্ঠ পর্যালোচনাকে করেছে প্রসারিত, অন্যদিকে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে দেশ-বিদেশের মানুষকে করেছে অবহিত।

ইংরেজিতে যাকে Hagiography বলে, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলি তার আওতায় পড়ে না, আমাদের এক বড় জীবনবোধের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। জীবনী সাহিত্যের দিক থেকেও এই গ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম। আবার ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি একালের মানুষজনদের চিন্তা-চেতনাকে নতুন ভাবে উদ্দীপ্ত করেছে।

এছাড়া বহির্ভারতেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাই সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি একদিকে ভারতীয় সাহিত্যে ও অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্র এক ভুবন রচনা করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্পর্শে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ অন্যান্য প্রকাশন সংস্থাও প্রকাশ করে চলেছেন। বিশিষ্ট বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী-লেখকগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসছেন। (উল্লেখযোগ্য আনন্দ পাবলিশার্স-এর স্বামী লোকেশ্বরানন্দ রচিত 'তব কথামৃতম্', 'শ্রীম' কথিত 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত', সংকলিত গ্রন্থ 'শাশ্বত বিবেকানন্দ', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ চরিত', শঙ্করী প্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ: কবি চিরন্তন', 'লোকমাতা নিবেদিতা (১—৪ খণ্ড)', রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-অভেদানন্দ-বেদান্ত গ্রন্থ সমূহ, মণ্ডল বুক হাউস প্রকাশিত শঙ্করী প্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১—৭ খণ্ড)', ঈশারউড-এর 'রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ', মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং সিগনেট প্রেস প্রকাশিত ঐ লেখকেরই 'পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীমা,' নবভারত প্রকাশন-এর 'নিবেদিতার পত্রাবলী', 'সহাস্য বিবেকানন্দ', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানীর রোমা রোলাঁর 'রামকৃষ্ণ জীবনী ও বিবেকানন্দ জীবনী' পুস্তক বিপনী প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'রক্তাক্ত চরণে যাঁর পথ চলা', 'মার্কসবাদীদের চোখে বিবেকানন্দ' ইত্যাদি।) সঙ্গত কারণেই এই ভুবন ক্রম প্রসারিত হচ্ছে—সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষ্য অনুযায়ী এই সকল গ্রন্থগুলি হলো Material Food-এর পাশাপাশি Spiritual Food[১২]। বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, মানুষের জীবনের বিবর্তন থেমে নেই। তা নিরন্তর চলছে। এই বিবর্তন মানুষের মনে। মানসিক বিবর্তনের পটভূমিতে বর্তমানের টালমাটাল পরিস্থিতিতে এই Spiritual Food অর্থাৎ ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি-অধ্যাত্মচিন্তা বিষয়ক গ্রন্থগুলি মানুষ-মানুষীদের উত্তরণের পথ দেখাবে—এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

॥ ৭ ॥

ভারতীয় শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য—সব কিছুর উদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক রূপান্তর তা বিবেকানন্দ বার বার উল্লেখ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য নান্দনিক চেতনার মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতি-সংগীত-শিল্প বিচার করতে চান নি। সত্য সুন্দর শিবের মানদণ্ডে তা বিচার করেছেন।

ভারত ও বহির্ভারতের বুদ্ধিজীবীরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে উপকৃত এবং .অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ম্যাক্সমূলার, টলস্টয়, জোসেপ কাপলান, আঁদ্রে জিদ্, রবার্ট জোম্পে, পার্পী হাউসটন; একালের রাশিয়ার ই.পি. চেলিসেভ, ও রিবাকভ, চিনের জিন চুয়ান প্রমুখের উক্তিতেই তা বিধৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ইংরেজি, ফরাসী, জাপানী, ডাচ, স্প্যানিশ, চিনা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে ইংরাজি, ফরাসী, স্প্যানিশ ভাষায় বেশ কয়েকটি পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। আসলে বুদ্ধিজীবী মানুষেরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে ত্যাগাদর্শের সঙ্গে জীবনের বস্তুগত লক্ষ্যকে যুক্ত করতে পারলে জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি লাভ সম্ভব। তাই ভারতে-বহির্ভারতে এই গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি বিকাশে এই গ্রন্থগুলি নিয়েছে একটি বড় মাপের ভূমিকা।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প-আধ্যাত্মিকতার বিকাশের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন আসলে বৃহৎ অর্থে মানবসেবার-সমাজসেবার কাজটিই পরিপূর্ণ করে চলেছে। শুধু ত্রাণকার্য জনিত সীমায়িত সেবা নয়, বিবেকানন্দ মানবিকতার প্রসারে, মানবসেবার ক্ষেত্রে এই পূর্ণতর মানসিকতাই পোষণ করতেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 'Religion is not exclusive of social life in an exaggerated emphasis on spirituality we tended to neglect social concerns. Today, the time has come when we have to interpret religion as a call to serve God in the souls of men and to make their starving bodies and farnished minds elevate and protect themselves from sorrow. That is Religion. That is Politics. That is Patriotism. That is Piety. That is Vivekananda.'[১২]

শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য, সংগীতে ও আধ্যাত্মিকতা প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতে ও বহির্ভারতে যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে তা আমরা স্বল্পায়তনে আলোচিত এই প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে টের পেয়ে যাই। এই শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার ধারাটি শুধু অব্যাহত নয়, তা আরও বর্ণোজ্জ্বল করার প্রয়াসে মেতে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশন। সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে উল্লসিত হবার এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয়বস্তু।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. উদ্বোধন, ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৫৫, পৃ: ৪৪০
২. President of India, Radhakrishnan's Speeches and Writings, May 1962—May 1964, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1965, P. 188.
৩. পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা-২৯৪, পৃ: ৪৭০
৪. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ: ২১৫
৫. ঐ, ৯ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ: ১৯০-১৯২
৬. ঐ, পৃ: ১৯০-১৯২
৭. ঐ, পৃ: ১৯১
৮. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১৩৯৭, পৃ: ৬০৭-৬০৮
৯. ঐ, পৃ: ৫৭৮
১০. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, ১৩৯৪, পৃ: ৪৪১
১১. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা—১৭৯, পৃঃ ৩১০
১২. The Hindu, Published from Madras, 1946.

অন্তরের শান্তি চিত্তের বিশ্রাম : রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠ

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় নিষিক্ত অনুভব বক্ষপটে ধারণ করে মন্দাকিনী ছন্দে এগিয়ে চলেছে সাগর সঙ্গমে। আন্তর্জাতিক মহানগরী, একদা ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার বিপরীত অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে দীর্ঘ ৩১ একর জমিতে গড়ে উঠেছে শাশ্বত ভারতের চিন্তা-চেতনার নব তরঙ্গে উদ্ভাসিত ধর্ম ও কর্মের পীঠস্থান বেলুড় মঠ। আধুনিক পৃথিবীর মুক্তিদাতা, সকল সংকটের নিরসনকারী, সমন্বয়ের আচার্য 'অবতার বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দিরকে মধ্যমণি করেই বেলুড় মঠের অবস্থান। প্রধান ধর্মগুলির ভাবের মিলমিশে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যশৈলীর, নান্দনিক চেতনার অপূর্ব-শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই মন্দির—বাস্তবিক ক্ষেত্রে যা সর্বজনীন উপাসনালয়। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে বিশাল নাটমন্দির, সবশেষে গর্ভমন্দির। সেখানে 'নয়নাভিরাম' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসে আছেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে প্রায় অস্তমিত। চুপিসারে অন্ধকার নামছে। পাখিরা বৃক্ষরাজিতে ফিরছে ক্লান্ত হয়ে। কুলায় ফেরা বিহঙ্গদের কলকাকলি ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে আসছে। গোটা পরিবেশ শান্ত। কল্লোলিনী গঙ্গার প্রবহমানতার শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখার প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠ।

গঙ্গার কোণ ঘেঁসে তিনটি মন্দির। পুণ্যসলিলা গঙ্গা স্পর্শ করে পাড় বাঁধানো বিশাল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এলেই শ্রীমা সারদাদেবীর মন্দির। ওড়িশা স্থাপত্যে নির্মিত ছোট মন্দির। সুন্দর শাড়িতে আচ্ছাদিত শ্রীমা। সামনে বিধৃত মায়ের চরণের আলতা ছাপ। কুলুঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু

দিনের পুরনো ছোট ছবি। বর্ণহীন ছবিটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনা কঠিন। অভয়দাত্রী মায়ের সজ্জিত পটচ্ছবিতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। পলক পড়ে না। মায়ের মুখের স্মিত হাসি থেকে উৎসারিত আলো ক্রমাগত মনের সব কালিমা অন্ধকার মুছে দিচ্ছে। অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে সেই আলো শুধু জমাট অন্ধকারকে সরিয়ে দেয়নি—অন্তর-বাহির আলোয় আলোয় আলোকময়। সসীম থেকে অসীমে। আলোয় ভরে গেছে সমস্ত ভুবন। আপনা থেকেই কণ্ঠে উঠে আসে—'এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে কী উৎসবের লগনে। সব আলোটি কেমন করে ফেল আমার মুখের পরে'![১] আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীলাই তো প্রতিদিনের উৎসব। আর আলোর বর্ণবিভা তো তাঁকে ঘিরেই। তাই তাঁর মুখোমুখি হয়ে 'গীতাঞ্জলি'র চরণগুলি সবাইকে শোনাতে ইচ্ছে করে উচ্চকণ্ঠে—'আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা / আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা।/ নাচে আলো নাচে ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে—/ বাজে আলো বাজে ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—/ জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা।/ আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।/ আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।/ মেঘে মেঘে সোনা। ও ভাই, যায় না মানিক গোনা—/পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই, পুলক রাশি রাশি—/ সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।'[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্যায় কিলবিল করা মানুষ-মানুষীদের দেখার ভার মহাসমাধির আগে শ্রীমা সারদাদেবীর উপর অর্পণ করে গিয়েছিলেন। এ দেখা তো শুধু দেখা নয়। তাদের স্থিতিশীল জীবনে পৌঁছে দেওয়া, মুক্তির—উত্তরণের রাঙা পথটি দেখিয়ে দেওয়া, চিনিয়ে দেওয়া। প্রয়োজনে বকল্‌মায় সব দায়িত্বও নেওয়া। মা তো তাই নিয়েছেন। বহুশ্রুত সেই গানটির কয়েকটি কলি মনে পড়ল—'মা আমাদের, আমরা মায়ের, ভাবনা কি আর আছে ভাই!' মাকে স্মরণ করে ভাসিয়ে দাও জীবনতরী। তিনি সার্বিক লক্ষ্যে তা পৌঁছে দেবেনই। এই ভরসা নিয়ে সকল স্তরের মানুষ সমবেত হন মায়ের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলে, সদলে অবশ্যই যান। নাটমন্দিরে ঠাকুরের মুখোমুখি বসে কিংবা গর্ভমন্দিরের পূর্বে-পশ্চিমে বসে জপ-ধ্যান করেন; কিন্তু মা'র কাছে দ্রুত ছুটে যাওয়ার বাসনা—প্রবল বাসনা জাপটে ধরে। সেই যে স্বামী প্রেমানন্দ মা'র সম্পর্কে চমৎকার ভঙ্গিতে বলেছিলেন—'ঠাকুর তো দেখেশুনে, বেছে তবে নিতেন আর মা নির্বিচারে সকলকে কাছে টেনে নিতেন। এর ফলে কত বিষের যন্ত্রণা তিনি সয়েছেন।'[৩]

সইবেনই তো। তিনি নিজের মুখে বলেছেন—'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।' শুধু বলেনই নি। নিজের জীবনে তা বারবার প্রমাণও করে দিয়েছেন। তাইতো মা'র কাছে সেকালে-একালে সকলের ছুটে যাওয়া বিদ্যাপতির ভাষায়,—'তিলে তিলে নূতন হৈয়' অর্থাৎ শ্রীমাকে প্রতিদিন আমরা দেখছি নতুন নতুন ভাবে। তাই প্রতিদিন বহু অনুরাগীর প্রণাম তাঁরই চরণ ছুঁয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এই একই কথা। অনুরাগের আসল রূপ তো এটাই। শুধু বেলুড় মঠে নয়, একই চিত্র দেখা যাবে বাগবাজারে উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে। দেখা যাবে খোদ জয়রামবাটীতে।

সাধারণ মানুষ কেন, সন্ন্যাসীদেরও দেখেছি মা'র কাছে প্রবল আগ্রহে ছুটে যেতে। সন্ন্যাসীদের কথা যখন এল, তখন মানস পটে ভেসে উঠল স্বামীজী—স্বামী বিবেকানন্দের কথা। প্রবল প্রতাপান্বিত স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে স্বামী শিবানন্দকে লিখছেন চিঠিতে, —'মা ঠাকুরণ কি বস্তু বোঝনি, বুঝতে পারনি এখনও, কেহই পার না, ক্রমে পাববে। ...আমার জীবন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যান তাতে আমি ভীত নই, কিন্তু মা ঠাকুরণ গেলে সর্বনাশ।'[৪] আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপটি স্বামীজীই ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তাইতো বেলুড় মঠের জমি কেনার পর স্বামীজী অশক্ত শরীরে মাকে তা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন অত্যুৎসাহে। আসলে আদ্যাশক্তি মহামায়া পদচারণা না করলে সে জমি শুদ্ধ হতে পারে না। আর জমি শুদ্ধ না হলে সেখানে আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক পীঠস্থান, সার্বজনীন উপাসনালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির গড়ে উঠতে পারে না। এই অনুভব উপলব্ধি থেকেই স্বামীজীর তৎপরতা মাকে নিয়ে, সব আয়োজন মাকে ঘিরে। আসলে মা তো সত্যিকারের মা, জগৎজননী—গুরুপত্নী নন, পাতানো মা নন। কথার কথায় মা নন। সত্যিকারের মা। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন যে, মা আর তিনি একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ। মাও তা মেনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে ষোড়ষী রূপে ফলহারিণী কালীপুজোর দিন পুজো করেছেন। নারীদের উপর পৌরাণিক কাল থেকে যে অত্যাচার-অবিচার হয়ে আসছে তারই প্রতিবিধান এই পুজো। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা তাই বলেন, সাধনার সমস্ত অর্ঘ নিবেদনের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—কিভাবে নারীকে সম্মান করতে হয়। কোন্ দৃষ্টিতে নারীকে দেখতে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবী বলতেন,—'জান তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'[৫]

মায়ের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব স্পষ্ট-প্রতীয়মান। পার্ষদেরা মাকে দেখেছেন, বুঝেছেন, চিনেছেন আপন আপন অনুভবের নিরিখে। তাই স্বামীজীর কাছে মা 'জ্যান্ত দুর্গা'। ব্রহ্মানন্দজীর কাছে 'আদ্যাশক্তি মহামায়া'। প্রেমানন্দজীর কাছে 'রাজ-রাজেশ্বরী'। শিবানন্দজীর কাছে 'জগৎজননী'। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ গৃহী পার্ষদদের কাছে 'তত্ত্বজ্ঞানদায়িনী', অভেদানন্দজীর ভাষায় 'প্রকৃতিং পরমাং'। মা নিবেদিতার কাছে একাধারে যুগে যুগে, দেশে-দেশান্তরে আবির্ভূতা জননীসত্তার মিলিত রূপ। অন্যদিকে স্নেহবিগলিত চিত্তের অপরূপা অধিকারিণী। একালের ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিকের চোখে 'বেদান্তের ফলিত রূপ'।[৬] মায়ের কথা বলে বা শুনে শেষ করা যাবে না। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।'[৭] এতক্ষণের অনুধ্যানের সূত্রে এটুকু বুঝতে পারি, তিনিই অগ্নি, তিনিই শান্তি জল। মা'র মন্দিরে মা'র মুখোমুখি হয়ে সকল অনুরাগী-ভক্ত-মানুষ-মানুষীর অনুভব কিন্তু এটাই। তাই মা'র চরণে আভূমি প্রণতি জানানোর পর সত্যি সত্যি অনুভব করা যায় অনিবার শান্তি বারির প্রলেপ, অমেয় স্পর্শ।

জয়রামবাটীতে চট্ করে যাওয়া যায় না। তাই অনুরাগী ভক্তেরা সদলে কিংবা একাকী যান বাগবাজারের উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে। আর আসেন গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড় মঠে। তুলনায় বেলুড় মঠের গুরুত্ব ও বিরাট পরিসর ভক্ত-অনুরাগীদের বেশি আকর্ষণ করে। মায়ের কাছে আসা-যাওয়া চলে নিরন্তব। আসেন নানা জন, ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে। আসেন বহির্ভারত থেকেও। শ্রীমার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর।

মায়ের মন্দির থেকে দক্ষিণের পথ ধরে এগোতেই চোখে পড়ে সবুজ ঘাসের মখমলে বসে থাকা অবাঙালি ভক্তদের। প্রতিদিন দিনান্তে এঁরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে মা এবং স্বামীজীর মন্দিরের মাঝখানে বসে রামকথা পাঠ করেন। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা এঁরা। এঁরা বেলুড় মঠের পুণ্যভূমিতে বসে ভগবৎ কথায় যখন মেতে ওঠেন, তখন মনে পড়ে সেই বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনের অবাঙালি মালবাহকের কথা। শ্রীমার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছিল জান্‌কী মা অর্থাৎ সীতাকে। এঁরাও প্রত্যাবর্তনের পথে যখন মাকে প্রণতি জানায় তখন কি রামকথা পাঠের পর মা'র মধ্যে খুঁজে পায় সীতাদেবীকে! পায় নিশ্চিন্তভাবেই। ডায়মণ্ডকাটা বালা পরিহিতা মাকে সীতার রূপে ঠাকুর প্রত্যক্ষ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলায় সন্ধ্যার আবছায়ায়। আর সুদূর লণ্ডনের চার্চে মেরির মুখের মধ্যে নিবেদিতা দেখেছিলেন

মাকে। প্রতিদিন সকালে সরকারী ব্যবস্থায় দেশি-বিদেশি পর্যটকেরা যখন আসেন এখানে, তখন বিদেশি পর্যটকেরা মা'র মুখের মধ্যে নিবেদিতার মতোই কি খুঁজে পান মা মেরিকে?

গঙ্গার পশ্চিম পাড় কাশী-বারাণসী সম। এ কথাও মা জানিয়েছিলেন বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার কালে স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী উৎসাহিত হয়েছিলেন। সেই স্বামীজীর মন্দিরে পৌঁছে গেছি। স্বামীজীর মন্দিরে অবস্থানের ভূমিটি বেশ খানিকটা নীচে। জোয়ারে পরিপূর্ণ গঙ্গার স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য সামীপ্য রেখেই কি স্বামীজীর মন্দিরটি নির্মিত! হয়তো তাই, কেননা মঠ যখন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে, তখন পঞ্চতপার পর মা দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার মধ্যে দাঁড়িয়ে। তাঁর অর্ধেকটা শরীর জলের নীচে অর্ধেকটা জলের উপরে। কিছুক্ষণ শ্রীমা চোখ বন্ধ করে ঐ দৃশ্যটি মনের মণিকোঠায় ধরে রাখতে চাইছিলেন। তারপর যখন আবার গঙ্গার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তখন তিনি দেখলেন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নেই, আছেন নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ দু'হাতে গঙ্গার পুণ্য বারি ছড়িয়ে দিচ্ছেন গঙ্গার দু'পারে মানুষ-মানুষীদের উদ্দেশে। এ গঙ্গা বারি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে শান্তির ঝরণা হয়ে গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তো তামাম পৃথিবীর মানুষ-মানুষীকে শান্তি ও স্থিতিশীল জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য, আর সেই কাজের দায়িত্ব তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীকে। সেই দায়িত্ব রূপায়ণের রূপকার হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই, সেদিন শ্রীমা দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। পরিপূর্ণ গঙ্গা স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই নির্মিত হয়েছে বিবেকানন্দ মন্দির ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারী। মন্দিরের পূর্বপ্রান্তের দেওয়ালে মিউর‍্যালে রয়েছে বিবেকানন্দের ধ্যানস্তব্ধ মূর্তি। মূর্তিটির দিকে তাকালেই মনে পড়ে আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের সঙ্গমে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে ভারত পরিক্রমান্তে তিনদিন-তিনরাত ধ্যানমগ্ন বিবেকানন্দকে। এই পোশাকের সঙ্গে তাঁর সেদিনের পোশাকের মিল ছিল না, কিন্তু প্রলম্বিত ভাবনাটি ছিল একই। সেদিন তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল তা তিনি কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন।

এই উচ্চারণের মধ্যে ছিল মানবমুক্তির বিশেষত ভারতের তথা বিশ্ব মানবের মুক্তি-পথের অন্বেষণ। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পাশ্চাত্যে পৌঁছে, পাশ্চাত্য জয় করে তিনি যখন ফিরে এসেছিলেন এই ভারত ভূমিতে, তখন তাঁর কণ্ঠটি আর কাতর নয়, বজ্রদৃপ্ত। পাশ্চাত্য থেকে লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে আগেই অনুভব করা গিয়েছিল তাঁর বুকের গভীর

উত্তাপ। আর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত দীর্ঘ পরিক্রমা, নানা সম্বর্ধনার উত্তরের প্রদত্ত অভিভাষণে তাঁর কণ্ঠ থেকে বিচ্ছুরিত হলো অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে সমগ্র শৈথিল্য, ক্লীবতা, জড়তা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। ফিনিক্স পাখির মতোই তা থেকে জন্ম নিল নতুন চেতনা। আর সেই চেতনা আঘাত হানলো ভারতবাসীর অন্তরে-বাহিরে বিশেষত তরুণ-তরুণীদের হৃদয়তন্ত্রীতে, শিরা-উপশিরায় জাগলো শিহরণ, বাড়লো রক্তের সঞ্চালন গতি। যে নতুন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং যে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে পথ দেখাবে, তার নির্যাস তিনি বহন করেছিলেন আপন হৃদয়ে এবং তা ছড়িয়ে দিলেন কথার মালা গেঁথে। ভারতবাসী নতুন ভাবে জেগে উঠলো তীব্র উৎসাহ উদ্দীপনায়। তরুণ, যুব সমাজ মেতে উঠল এই মাতৃযজ্ঞে। বিবেকানন্দের আহ্বান মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শেখালো, মাতৃভূমিকে অকেজো দেবদেবীর চেয়ে গরীয়সী সাকার দেবীমূর্তিতে রূপায়িত করলো। তাই তো আমরা দেখলাম বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুবসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়লো পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মোচনে। কেন না তারা জেনেছিল বিবেকানন্দের কাছ থেকেই—'পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই'।[৮] তাই ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পর সহিংস ও অহিংস দ্বিধারায় স্বাধীনতা আন্দোলনে তরুণ সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৮৯৭-এ বিবেকানন্দের কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—'এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।' বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বহু তরুণের রক্ত ঝরেছে। ফাঁসীর মঞ্চে বহু শহীদের জীবনের জয়গান মুখরিত হয়েছে। তরুণ-তরুণীরা প্রবাহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অত্যাচারের বন্যায় প্রতিরোধের পথ গড়ে তুলেছে—আর এসব সম্ভব হয়েছে বিবেকানন্দের বজ্রদৃপ্ত আহ্বানের সূত্রেই। প্রসঙ্গত বিশেষ ভাবে মনে পড়ে তাঁর 'মানসপুত্র' যথার্থ অর্থে 'ভাবশিষ্য' সুভাষচন্দ্রের কথা। একটি মানুষ আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে বিবেকানন্দের আহ্বানকে পরম যত্নে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে কীভাবে অন্তরীণ অবস্থায় শ'খানেক পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রাতের অন্ধকারে কলকাতা ছেড়ে, ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানি পৌঁছলেন, সেখান থেকে ডুবো জাহাজে জাপানে। তৈরী হলো আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী, সে কথা সর্বজনবিদিত।

শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, গোটা ভারতবাসীকে বিবেকানন্দ শুনিয়েছিলেন উজ্জীবনের মন্ত্র, আত্মশক্তিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার

সাহস যুগিয়েছিলেন, 'তত্ত্বমসি' ও 'সোহম্'-মন্ত্র দু'টির সংযুক্তিতে আত্মজ্ঞান লাভের পথটি দিয়েছিলেন চিনিয়ে। 'আমিই ঈশ্বর'—একথা তাঁর মুখে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। এই ঈশ্বর ইট-কাঠ-পাথরের মাটির দেবতা নন, জীবে-জীবে তাঁর অধিষ্ঠান। তাই তিনি বললেন, 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' ধর্মের ধারণাকে নতুনভাবে গেঁথে দিলেন আমাদের জীবনের অভিধানে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বিবেকানন্দের মূর্তিতে দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল। এ শুধু আমার নয়, যত যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী সর্বোপরি অনুরাগী ভক্তবৃন্দ আসেন তাঁরাও নিশ্চিতভাবে এইভাবেই বিবেকানন্দ-অনুধ্যান করেন। খুব বেশি রঙিন নয়, বেশির ভাগটাই সাদা ফুলে সাজানো। ঘরটি থেকে ভেসে আসে এক অনিন্দ্যসুন্দর নির্যাস। বিবেকানন্দের সেই নির্যাসের মধ্যেই যেন আছে একালের নুইয়ে পড়া, ভাঙাচোরা, তমোনিশায় আচ্ছন্ন মানুষ-মানুষী, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার অগ্নিস্পর্শ। বিবেকানন্দকে প্রণাম জানানোর চেয়ে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছেটা রক্তগোলাপের চেতনায় জাগরূক থাকে। লক্ষ্য করা গেছে, একালের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, দেশে-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে বেলুড় মঠে ছুটে এসে বিবেকানন্দের সামনে নতজানু হয়ে বসেছে। আপন অনুভবের অনুরণনে বিবেকানন্দ-চেতনাকে প্রসারিত করে সমস্ত তমসা, রিরংসাকে সরিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের শুভ্রতা ও স্নিগ্ধতাকে বক্ষপটে ধারণ করতে চেয়েছে।

রামকৃষ্ণ-ভাবধারাকে গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি। সারা বিশ্বে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই ভাবাদর্শ আর তারই প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে বেলুড় মঠ। বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধির আগে বিবেকানন্দকেই বলে গিয়েছিলেন,—'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানেই আমি যাব ও থাকব।'' কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে সংরক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের আংশিক চিতাভস্ম এবং বাকী অংশটি আলমবাজার মঠ থেকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি হয়ে পৌঁছেছিল এই বেলুড় মঠেই। আর, সেই পুণ্য-পূত-পবিত্র চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির। এই নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী। গর্ভমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব ধ্যানতন্ময় অপূর্ব মূর্তিটি অবস্থিত। এই মন্দিরেই নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের পুজো এবং ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে অনুষ্ঠিত

হয় মঙ্গলারতি। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষ থেকে এবং বহির্ভারত থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্দর্শনে। মন্দিরের স্থাপত্য শিল্পের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

আসন্ন সায়াহ্নে নাটমন্দিরের প্রথম অংশে সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা বসেছেন। অল্প ব্যবধানে বসেছেন মাতৃমণ্ডলী। তাঁদের পিছনে পুরুষ ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ। নির্দিষ্ট সময়ে বিবেকানন্দ বিরচিত শ্রুতিনন্দন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যথার্থ প্রণতি নিবেদনের আকুতি সহ শুরু হলো সেই 'খণ্ডন ভব বন্ধন...' আরতির স্তোত্রটি। গর্ভমন্দিরে শুরু হলো আরতি। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো বিবেকানন্দ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি পরিপূর্ণ প্রণতির স্তোত্র। সে এক অপূর্ব পরিবেশ। এই পরিবেশেই তো অন্তরের চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে আসে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত বিশ্রামের কোলে ঢলে পড়ে। দৃষ্টিতে মনে মুখে মধু ঝরে। 'মধুবাতা-ঋতায়তে'-র মতো এমন পরিবেশেই শান্তির অবগাহন, মুক্তির প্রলম্বিত পথ চিনে নেওয়া যায়। যিনি 'অবতার বরিষ্ঠ' তিনি সব ভাব, সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের, সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন আনন্দের সাম্রাজ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে প্রবেশ করে ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ সেই আনন্দের রাজ্যে অনায়াসেই পৌঁছে যান। তাই, দেশ-বিদেশের ভক্তরা শুধু নন, পর্যটকেরাও ছুটে আসেন একবার তাঁর দর্শনে। সন্ধ্যারতির মতোই প্রভাতের মঙ্গলারতির পরিবেশ আরও বেশি 'চিৎঘনানন্দ'-এ পরিপূর্ণ। অবশ্য, সেই আনন্দের স্পর্শটুকু পান আন্তর্জাতিক এবং আন্তর্দেশীয় অতিথি ভবনে অবস্থিত ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ, পান আশপাশের প্রতিবেশিরা, আর নিত্য পান বেলুড় মঠে অবস্থিত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মহম্মদ দাউদ রববর মতে 'অবতার বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদের সকলের 'ফ্রেন্ড কাম ফিলজফার'। তিনি মানুষকে প্রতিকূলতার পার থেকে অনুকূলতার পারে পৌঁছে দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সত্যিই তাই। তিনি আমাদের কাঁধে হাত রেখে নিত্য বলে চলেছেন, —'মানুষ তুমি ভালো, তুমি আরো ভালো হয়ে ওঠো, তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দরতম হয়ে ওঠো, তুমি শুদ্ধ, তুমি শুদ্ধতম হয়ে ওঠো, তুমি পূর্ণ, তুমি পূর্ণতম হয়ে ওঠো।'[১০] শ্রীরামকৃষ্ণের এই আহ্বান ঐ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মঙ্গলারতির পর মন্দিরে কান পাতলে

শোনা যায়। নিত্য নানান রঙের বস্ত্রে আচ্ছাদিত, উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ (তিনি তো রসেবশেই থাকতে চেয়েছিলেন) স্মিত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে সকলকেই আপন লক্ষ্যে (মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ) পৌঁছে দেবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।

এছাড়া বেলুড় মঠে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ মন্দির রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শতবর্ষের ঐতিহ্যের গৌরব দীপ্তিকে বহন করে চলেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দীর্ঘ দু'দশক অধ্যক্ষ থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পল্লবিত বিস্তার ঘটেছিল। লোকগুরু রূপে তাঁর পরিচয় সকলেরই জানা। আবার তিনিই তো ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র'। বিবেকানন্দের জীবনাবসানের পর লোকহিতার্থে, মানবসেবাযজ্ঞের ঋত্বিক তো ছিলেন তিনিই। তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তিটির দিকে তাকালে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের উন্মেষ-পর্বের কত ইতিহাসই না মনে পড়ে। কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তিনি—তাই তাঁর মন্দিরে অষ্টধাতু নির্মিত বালগোপালের ছোট মূর্তি বিরাজমান এবং তা নিত্য পূজিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের অধ্যাত্মচিন্তা, সাধারণ মানুষ-মানুষীকে সাধনমার্গের পথটিকে চিনিয়ে দেওয়ার দীর্ঘ অভিপ্সার কথা আমাদের জানা। তাঁর মন্দিরে তাঁর মুখোমুখি হয়ে তাঁকে প্রণাম জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে অধ্যাত্ম জীবনের বন্ধ দরোজাগুলি আপনা থেকেই খুলে যায়। তাই ভক্ত অনুরাগীরা নিবিষ্ট চিত্তে স্মরণ করেন তাঁকে। তাঁকে স্মরণের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ 'মানসপুত্র'-কে স্মরণের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ-মননের পথটি প্রশস্ত হয়ে যায় অনায়াসে। ব্রহ্মানন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারী। ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে, বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, যেখানে বিরাজ করছেন মৃন্ময়ী রূপে চিন্ময়ী, জগৎজননী-ভবতারিণী। ভারত তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসের এক অত্যুজ্জ্বল পীঠস্থান। বারান্দার এই কোণ থেকেই ভক্ত-অনুরাগীরা নতজানু হয়ে আভূমি প্রণতি জানান ভবতারিণী মা কালীকে। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদেরও দেখেছি একই প্রথা অনুসরণ করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুরনো মন্দিরটি আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। সেখানে বারেকের জন্য ভক্তেরা ছুটে যান প্রণতি জানাতে, আর অতীত ইতিহাসকে স্পর্শ করতে। অনেক ভক্ত-অনুরাগী ঐ পুরনো মন্দিরে বসে একান্তে দীর্ঘ সময় ধরে জপ-ধ্যান করে চলেন। সেই মন্দিরের পাশেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের ঘর। দরোজার ফাঁক দিয়ে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও সুসজ্জিত শয্যা দর্শনের মধ্য দিয়ে

তাঁর অমেয় স্পর্শ অনুভব করা যায়। এই বাড়ির নীচেই বেলুড় মঠের কার্যালয়, সেখানে নিত্য মানুষের যাতায়াত। ভোগ-প্রসাদ পাওয়ার জন্য এখানে ভক্ত-অনুরাগীরা যেমন আসেন, তেমন বিদেশিরা আসেন নানা তথ্য সংগ্রহে। বেলুড় মঠের নিত্যপুজোর সুচারু ব্যবস্থা, নানা উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা এখান থেকেই হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাসগৃহটি গঙ্গার তীরে দোতলায় অবস্থিত। ঘরটি চমৎকারভাবে সুসজ্জিত। এই ঘরেই আছে বিবেকানন্দের ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত সামগ্রী। সেগুলি দেখতে দেখতে বিবেকানন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই আমরা। অন্তর্দেবতাকে প্রণাম করার সুযোগ মেলে এইখানেই। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী মহম্মদ আলি, মতিলাল নেহরু ও কস্তুরবাকে নিয়ে বিবেকান্দের তিথি-পুজোর দিন বেলুড়মঠে এসেছিলেন। বিবেকানন্দের বাসগৃহে প্রবেশ করে তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে প্রণতি জানিয়েছিলেন, আর তাঁর আসার সংবাদ পেয়ে বিবেকানন্দের বাসগৃহের সামনে সবুজ ঘাসে মোড়া ময়দানে সমবেত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। গান্ধীজী সেদিন তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন একটাই কথা—'আজ এই পুণ্যদিনে আপনারা এই পুণ্যভূমি থেকে একটুকরো মাটি নিয়ে যান, আর মাটির সঙ্গে আপনাদের অন্তরে অবস্থিত বারুদের সংযোগ ঘটান, তা থেকে যে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হবে তাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।'[১১] বিবেকানন্দের এই বাসগৃহে শুধু গান্ধীজী কেন, দেশ-বিদেশের কত মনীষী, কত বুদ্ধিজীবী, প্রশাসনের উচ্চতম কত না ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ঘটেছে। সে কথা থাক। সাধারণ ভক্ত-অনুরাগীরা বিবেকানন্দের ঘরের সামনে, জানালা দিয়ে বিবেকানন্দের ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আর পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, বিবেকানন্দ নিজের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের যে দণ্ডায়মান ছোট ছবিটি রাখতেন—তা এই ঘরেই অবস্থিত। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, এ যুগের মুক্তিদাতা গুরু-শিষ্যের তন্নিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। স্বামী বিবেকান্দের তিথি-পুজোর দিন ঘরের পাশের বারান্দায় আয়োজিত হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আমরা তো জানি, বিবেকানন্দ ছিলেন সুরসাধক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর ব্যবহৃত সঙ্গীত সামগ্রী তাঁর ঘরেই পরম যত্নে বিদ্যমান।

বেলুড় মঠের আরো একটি আকর্ষণ—ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সমাধিস্থান। এই সমাধিস্থানে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী

অদ্বৈতানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রমুখের মহাপ্রয়াণের পর পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়েছিল। পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত ঘেরা এই স্থানটিতে গেলেই সংশ্লিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের ত্যাগপূত জীবন ও নানা কর্ম ও অধ্যাত্ম জগতের শিখরে উত্তরণের প্রসঙ্গটি মানসপটে ভেসে ওঠে। এই সমাধিস্থলের পাশেই আছে দু'টি খণ্ডে বিভক্ত সমাধিস্থল। একটিতে পূর্ণাহুতি দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের জীবনাবসানের পর তাঁর দেহকে। আর একটি খণ্ডে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ও ব্রহ্মচারীদের জীবনাবসানের পর পার্থিব দেহ পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়। এই স্থানটি পবিত্র, অগণিত ভক্ত বেলুড় মঠে এলেই এই দু'টি স্থানে (পূর্বে উল্লেখিত রামকৃষ্ণ পার্ষদদের সমাধিস্থল ও বর্তমান সংরক্ষিত সমাধিস্থল) প্রণতি জানাতে ছুটে আসেন নগ্ন পায়ে। আসলে অনেক গৃহী ভক্তদের মন্ত্রগুরুর সমাধিস্থল এই স্থানটি। তাই এর আকর্ষণ ভক্তদের কাছে অপরিসীম।

এই সমাধিস্থলের পশ্চিম প্রান্তে আছে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষের বাসস্থান। গিরিশচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের অর্থে। এই বাড়িটিতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কয়েকজন অধ্যক্ষ। এঁদের মধ্যে আছেন স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দ। রামকৃষ্ণ সম বিবেচিত হন সংঘাচার্য—অধ্যক্ষেরা ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে। তাই, তাঁদের দর্শন ও প্রণামের জন্য ভক্ত-অনুরাগীরা সমবেত হন। এখানে বিভিন্ন সময়ে অধ্যক্ষবৃন্দ ভক্তদের মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন এবং এখনও দিয়ে থাকেন। ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে এই ঐতিহাসিক ভবনটির গুরুত্ব অপরিসীম।

এবার পুরনো মঠ অর্থাৎ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করতে হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আলমবাজারস্থিত ভাড়া বাড়িটি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুনের ভূমিকম্পে যখন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল তখন গঙ্গার বিপরীত তীরে এই বাগানবাড়িতেই উঠে এল মঠ-মিশন। এই বাড়ি থেকেই বর্তমান বেলুড় মঠের নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয় মঠ-মিশনের প্রধান কার্যালয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী।[১২]

এখানে মা অবস্থান করেছেন, পঞ্চতপা করেছেন। এখানে বসে স্বামীজী ও সতীর্থরা নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই অপরিসীম তাৎপর্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক গঙ্গার তীরে অবস্থিত দ্বিতল এই বাড়িটি সহ প্রশস্ত জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ আগষ্ট অধিগ্রহণ

করে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেন। অধিগৃহীত হওয়ার পর পূর্বাবস্থা বজায় রেখে সংস্কার করা হয়েছে বাড়িটি। বেলুড় মঠে আগত পুণ্যার্থীদের কাছে এই বাড়িটি একটি স্বতন্ত্র অনুভূতি বহন করে আনে। নির্জনতা ও প্রকৃতির শ্যামলিমার হাত ধবাধরি করে অন্য এক ভুবনে পৌঁছে যান সকলে। যে ঘরে মা থাকতেন, সেই ঘরটিতে মা পটে এখন অবস্থান করছেন। গঙ্গার পথচলার শব্দ শুনতে শুনতে তমোগ্ন চিত্তে নির্জন পরিবেশে মার মুখোমুখি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার অমেয় উপলব্ধি বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিবেকানন্দ পরিকল্পিত বেদ-বিদ্যালয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বিপরীতে গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালে রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম। এখানে সংবক্ষিত আছে বামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী ও তাঁর পার্ষদদের ব্যবহৃত সামগ্রী ও পত্রাবলী। আগে এ বাড়িটি ছিল রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রধান কার্যালয়। 'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এর প্রতিষ্ঠা দেরিতে হলেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক, ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে এটি একটি পরম প্রাপ্তি। আনন্দের বিষয় এই 'মিউজিয়াম'-এর পরিধি ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। তৈরী হচ্ছে নতুন ভবনও। অল্পদিনের মধ্যে সকলের কাছে এই সংগ্রহশালাটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের নির্যাস বহন করে উপস্থিত হবে।

'মিউজিয়াম'-এর পাশেই 'শোরুম'। এখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্যের নানা ছোট বড় গ্রন্থ সাজানো রয়েছে। আছে ঠাকুর-মা-স্বামীজী ও অন্যান্য পার্ষদদের ছবি। অধ্যক্ষ-সহাধ্যক্ষদের ছবিও আছে। ভক্ত-অনুরাগীরা ইচ্ছে মতো ঘুরে ফিরে প্রয়োজনীয় বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁরা এখানেই পেয়ে যান তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ছবিসমূহ আর অসংখ্য গানের ক্যাসেট। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীকে কেন্দ্র করে নির্মিত এইসব ক্যাসেটের চাহিদাও বিপুল। ভক্তিগীতি, আরতিস্তোত্র সহ ভজনাগুলির সুর-মূর্ছনা শুধু ভক্ত-অনুরাগীদের নয়, সাধারণ পর্যটকদেবও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সারদাপীঠের তৈরী 'গঙ্গা' ধূপকাঠির চাহিদা এত বেশি যে সব সময় ঠিকমতো যোগান দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। 'পল্লীমঙ্গল'-এর একটি 'শো-রুম' আছে আরোগ্যভবনের প্রবেশ পথে। এখানেও পাওয়া যায় নানান সামগ্রী। গ্রামীণ মানুষ-মানুষীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় আসন, ব্যাগ, বস্ত্রসামগ্রী, কাঠের সিংহাসন, ধূপকাঠি তৈরী করেন—তা এখানে ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। আসলে এইসব জিনিসপত্র কেনা বা সংগ্রহের মধ্য দিয়ে ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে যেমন আরো

বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চান, তেমনি তা প্রসারিত করে দিতে চান নানা স্থানে।

'আরোগ্য ভবন'-এর কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই আরোগ্য ভবন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন পরিচালন সমিতির অভিনব-সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের সুস্থিতিশীল বাস্তবায়ন। যে সকল সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁদের ভাবাদর্শ প্রচার-প্রসার ও বিপুল কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে আজ বার্ধক্যে উপনীত, তাঁদের থাকবার জন্য সু-পরিকল্পিত ও আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত এই আরোগ্য ভবন। বহু ভক্ত অনুরাগী প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁদের ত্যাগব্রতী জীবন-অনুধ্যানকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানাতে অপরাহ্ণের নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করেন। শোনেন অতীত দিনের ইতিহাস, কর্মযজ্ঞের বিবরণ আর আত্মজ্ঞান লাভ, অধ্যাত্ম-সাধনমার্গে আরো এগিয়ে যাবার পরামর্শ—অবশ্যই ঠাকুর-মা-স্বামীজী ও পার্ষদদের প্রদর্শিত-প্রজ্ঞাপিত পথ ধরে, তাঁদের কথক স্পন্দের ঝংকারে।

প্রবীণ সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল আরোগ্য ভবনে ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ যেতে পারেন কিন্তু যেতে পারেন না ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। কারণ সেখানে নির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে, সুকঠিন তপশ্চর্যার মধ্যে গড়ে ওঠেন আগামী দিনের রামকৃষ্ণ সংঘের কাণ্ডারীরা। তাই বিধি-নিষেধ তো থাকবেই! মঙ্গলারতি ও সন্ধ্যারতির সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে তাঁদের দেখা মেলে। দেখলে বোঝা যায় তাঁদের শুভ্র পোশাকের মত নিরন্তর কর্ম-জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে তাঁদের শুদ্ধ-পবিত্রতার স্বরূপটি। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের পিছনে উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে আছে বড় মাপের সাধু নিবাস। এখানে বেলুড়স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা যেমন থাকেন, তেমনি বিভিন্ন-শাখা কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরাও থাকার সুযোগ পান। এখানে অবশ্য সাধারণ ভক্ত অনুরাগীদের অবাধে প্রবেশ নিষেধ।

বেলুড় মঠে প্রবেশের প্রধান দরোজা অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের দিকে এগোবার সময় ডান দিকের দীর্ঘ এবং সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়িটি হল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল নব নির্মিত এই কার্যালয় ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ঘড়ি ধরে যেখানে নিরন্তর কাজ চলেছে। কাজ করে চলেছেন সন্ন্যাসী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীরা। সে কাজ পল্লবিত ধারায় প্রসারিত। ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে অবস্থিত ১৩৬টি শাখা কেন্দ্র এবং তার অন্তর্গত নানা উপকেন্দ্রের সমস্যার সমাধান, নতুন কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের প্রয়াস, ত্রাণকার্যের

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা, হিসেব-নিকেশ, যুবক-যুবতীদের রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গাইড লাইন-সুপবামর্শ দেওয়া এমনই সব জরুরী হাজারো কাজ। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, এত সব কাজ চলেছে—তা ভিতরে বা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। সবটাই চলেছে তীব্র গতিতে এবং নীরবে আর তার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে অবস্থিত শাখা কেন্দ্রগুলিতে। ওয়ার্ক-কালচার, কর্মসংস্কৃতি বা কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা আর পরিচ্ছন্ন পরিবেশটি বারেকের জন্য দেখতে হলে একবার প্রবেশ করতে হবে এখানে। ভক্ত-অনুরাগীরা নির্দিষ্ট সময় মেনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে-কক্ষে যান। কর্মরত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে ফেরেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয় প্রধানত ভক্ত-অনুরাগীদের অর্থানুকূল্যে। সেই অর্থের পরিমাণ সামান্য থেকে বিপুল। ভক্ত-অনুরাগীরা এবং সাধারণ মানুষ তা পৌঁছে দেবাব জন্য এখানে আসেন।

প্রধান প্রবেশদ্বারের ডান দিকে আছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত-অনুরাগী এবং সাধারণ মানুষেরা হোমিও ও এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার প্রাথমিক স্তরের সুযোগ পেয়ে থাকেন প্রতিদিন এখানে। এর পাশে আছে বড় ডাকঘর। গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ এই ডাকঘরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এরই পূর্ব-দিকে বেলুড় মঠের সীমানার বাইরে অবস্থিত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কটি প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের অর্থ সংক্রান্ত নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত।

ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে বেলুড মঠের দুর্নিবার আকর্ষণ আরো একটি কারণে—দুর্গাপুজো, শ্রীরামকৃষ্ণের তিথি-পুজো, শ্রীরামকৃষ্ণের আর্বিভাব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব, শ্রীমা সাবদাদেবীর তিথি-পুজো এবং স্বামীজীর তিথি-পুজো। এছাডা আছে বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান-উৎসবগুলিতে সারাদিন মানুষ-মানুষী বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হন, যোগ দেন আনন্দযজ্ঞে। সুশৃঙ্খল পরিবেশ, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা—সকলের নজর কাড়ে। সরকারী প্রশাসনিক স্তরের নানা মানুষজনের মুখে শুনেছি বারবার—প্রাসঙ্গিক বিষয়টি। তাঁরা বিস্মিত হন অসংখ্য মানুষ-মানুষীকে এমন চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভেবে। প্রশাসনের সামান্য নিয়মমাফিক সাহায্য থাকলেও আসলে ভক্ত-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষেরা শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এসে তন্ময় হয়ে যান। সেই তন্ময়তা থেকেই জন্ম নেয় শৃঙ্খলা মেনে চলার শপথ। সেই শপথের ব্যত্যয়

কখনো ঘটেনি। ক্রমাগত ভক্ত-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এর ব্যত্যয় আগামী দিনে ঘটবে না বলেই বিশ্বাস, স্থির বিশ্বাস! শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের তিথি-পুজো ও নির্দিষ্ট কিছু উৎসব ভক্ত-অনুরাগীদের উপস্থিতিতে সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বেলুড় মঠে প্রতিদিন, বিশেষত ছুটির দিন ও উপরে উল্লেখিত দিনগুলোতে এত মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও, মঠের পরিচ্ছন্নতা দেখে দৃষ্টি নান্দনিক সুখে উল্লসিত হয়ে ওঠে। মনে প্রাণে এক অনাবিল আনন্দ প্রবাহিত হয়। সাম্প্রতিককালে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কত না ভাবনা চিন্তা চলছে। গোটা ভারতবর্ষের পরিবেশবিদ্‌রা বেলুড় মঠে এলে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষার পাঠ নিয়ে যেতে পারেন। এই পরিচ্ছন্ন-সুবিন্যস্ত পরিবেশই ভক্ত-অনুরাগীদের বারবার শুধু আকর্ষণ করে না, নিজের অবস্থানভূমিটি পরিচ্ছন্ন রাখাব প্রেরণা যোগায়।

বেলুড মঠের সঙ্গেই সংলগ্ন রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বৃহত্তর শাখা কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ। এখানেও চলেছে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে অন্ন সমস্যা মেটানোর বিশাল কর্মযজ্ঞ। এখানে আছে দুটি উচ্চতর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এছাড়াও আছে বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আছে সংগ্রহশালা, তত্ত্বমন্দির, জনশিক্ষা মন্দির, বিবেকানন্দ প্রেক্ষাগৃহ সহ আরো অনেক কিছু। যে সকল ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দের পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-কর্মযজ্ঞ দেখার সুযোগ অন্যত্র হয় না, তাঁরা এখানে অনায়াসে তা পেয়ে যান। বেলুড মঠে এসে ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের কাছে এটি একটি উপরি লাভ।

আগেই উল্লেখিত 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।' তাই শেষ কথা বলার অধিকার যে কারোর নেই। তবুও একটি পর্বে এসে আমাদের থামতেই হয়। বেলুড় মঠের সার্বিক পরিবেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামীজীর অবস্থান, পার্ষদের পাদস্পর্শে পুণ্য — এইস্থানে এসে অগণিত ভক্ত-অনুরাগীরা ক্রম পরম্পরায়, ধারাবাহিকভাবে অন্তরের শান্তি, চিত্তের বিশ্রাম পান। দৃষ্টিতে বিধৃত হয় এক নতুন পৃথিবী। যে পৃথিবীর স্বপ্ন স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, যে পৃথিবীর সন্ধান দিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা এসেছিলেন। আজ তাঁরা সূক্ষ্ম শরীরে এখানে বিরাজমান। তাই পৃথিবীটা সচল। আর সচল পৃথিবীর বাসিন্দা সাধারণ মানুষ, দেশি-বিদেশি পর্যটক, সর্বোপরি ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ এই বেলুড় মঠে এসে মন্দিরে, প্রাঙ্গণে, আকাশে, বাতাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীর আহ্বান কান পেতে শোনেন, তাঁদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে শত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে

ফিরে যান স্ব-স্ব-ভূমিতে। সেখানেই প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়ে প্রোথিত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের বীজ। সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত বৃক্ষরাজি ও তার শতফুলের বিকাশে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুক্তির-উত্তরণের পথ প্রশস্ত হবে, শুধু তাই নয়, সকলেই মুক্তির সাম্রাজ্যে পৌঁছবেন—আর সেজন্যই তো শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজী অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। আমরা নিশ্চয় তাঁদের বিমুখ করবো না। করবো না বলেই তো নিত্য এত ভক্ত-অনুরাগীদের আবহমান বেলুড় মঠে আসা যাওয়া।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ: ১৭
২. ঐ, পৃ: ৪৩৩
৩. স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃ: ১৩১—৩২
৪. পত্রাবলী, অখণ্ড, পত্রসংখ্যা-১৫৪, ১৩৮৪, পৃ: ২৫৬
৫. শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩৮১, পৃ: ১৪৬
৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ: ৪
৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, ঐ, পৃ: ১৮৪
৮. রাখাল বেনু পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৮৬
৯. স্বামি-শিষ্য সংবাদ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ৮৫, ১৪০০ বঙ্গাব্দ
১০. God of All, Edited by Claude Alan Stark, 1974, Massachusets, P. 190-99
১১. History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Swami Gamvirananda, 1983, P.223
১২. এ বিষয়ে তথ্য সহ বিস্তৃত আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র : 'উদ্বোধন'

সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ নরলোকের লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং সুরলোকের প্রজ্ঞার মেলবন্ধনে প্রথম পাশ্চাত্য অভিযানে বিজয়ীর মুকুট মাথায় নিয়ে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে যখন অক্লান্ত, সেই সময় স্থায়ী সংঘ—রামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণের গুরুত্ব অনুধাবনে খুঁটি-নাটি বিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা যেমন সাকার রূপ নিয়েছিল (ইংলণ্ডের রিডিং থেকে ১৮৯৬-এর ২৭ এপ্রিল, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিটি স্মরণযোগ্য), তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র প্রকাশের বিষয়টিও তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল প্রায় দু'বছর আগে। তাই আমরা দেখি, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে সতীর্থদের উদ্দেশে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সম্বোধন করে যে দীর্ঘ চিঠিটি লিখছেন, তাতে উল্লেখ করছেন,—

> 'একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদনা) করতে হবে, আদ্দেক বাংলা, আদ্দেক হিন্দি—পারো তো আর একটা ইংরেজিতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজের subscriber (গ্রাহক) সংগ্রহ করতে ক'দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে Subscriber (গ্রাহক) যোগাড় করুক। গুপ্ত (শরৎচন্দ্র গুপ্ত—স্বামীজীর শিষ্য, সন্ন্যাস নাম—স্বামী সদানন্দ) হিন্দি দিকটা লিখুক বা অনেক হিন্দি লিখবার লোক পাওয়া যাবে।'[১]

সতীর্থদের উদ্দেশে আলমবাজার মঠে লেখা স্বামীজীর চিঠির উদ্ধৃত অংশটি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ। আর সেই উদ্যোগের কথা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ জানিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

'উদ্বোধন' পত্রিকার বীজ এই সূত্রেই প্রোথিত হয়েছিল মনে-মননে, চিন্তায়-চেতনায়। বিবেকানন্দ ত্রিগুণাতীতানন্দের উদ্যোগের নির্যাসবাহী পত্র পেয়েই উত্তর দিলেন। লিখলেন আমেরিকা থেকে—

'...তোমার কাগজের idea (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০্ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নেই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার করে নে। এই চিঠির জবাব—চিঠির উত্তরে আমি ৫০০্ টাকা পাঠিয়ে দেবো। ৫০০্ টাকায় কিছু আসে যায় কি? খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে; তুই আপনার দেশি ধর্মের প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবী জানা মুসলমান-ভায়া ধরে যদি পুরনো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করতে পারো ভালো হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে, যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item (নিয়মিত বিষয়) হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায় তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধ'রে কাগজ গছিয়ে দিবি। ...চালাও কাগজ, কুছ পরোয়া নেই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করছিস। বাহবা, সাবাস।'[২]

স্বামীজীর এই চিঠিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে। গুরুত্বগুলি সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়াবে—১) ত্রিগুণাতীতানন্দজীর উদ্যোগকে স্বামীজী স্বাগত জানিয়েছেন এবং পত্রিকা প্রকাশে তৎপর হতে নির্দেশ দিয়েছেন, উৎসাহের পালে বইয়ে দিয়েছেন উজানের হাওয়া। ২) প্রাথমিক স্তরে ৫০০ টাকা পাঠানোর তৎপরতা তারই প্রকাশ। ৩) 'দেশিধর্ম' অর্থাৎ ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম (শ্রীরামকৃষ্ণ যার মূর্ত বিগ্রহ) প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠুক প্রকাশিতব্য পত্রিকা—তার প্রতি সচেতনতা। ৪) পত্রিকার অসাম্প্রদায়িক রূপ ও বিকাশ। ৫) বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকায় বাংলার, বাঙালীর ইতিহাস নেই বলে যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন, সেই প্রাদেশিক মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠে স্বামীজী অন্য ভাষায় লেখা ভারতীয় ইতিহাসের তর্জমা ধারাবাহিক প্রকাশের উপর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ফার্সী ভাষায় লেখা ইতিহাসকেই তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তখনও পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা প্রামাণিক ভারতীয় ইতিহাস লিখে

উঠতে পারেন নি। স্বামীজীর 'ভাবতচিন্তা'য় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভাবতী' (১৮৭৭) পত্রিকার সাযুজ্য-সামীপ্য লক্ষ্যণীয়। ৬) নিয়মিত লেখকের বিষয়টি তাঁব ভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। তাই প্রাথমিক স্তবে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ('শশী'), স্বামী সারদানন্দ ('শরৎ') ও স্বামী অভেদানন্দ ('কালী') প্রমুখ সতীর্থদের লেখার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। ৭) গ্রাহকদের কথাও বিশেষভাবে ভেবেছেন। কিভাবে গ্রাহক সংগ্রহ করতে হবে—সেই পথের হদিশও দিয়েছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ ত্রিগুণাতীতানন্দকে যখন এই চিঠিটি লিখছেন, তখন মাদ্রাজ থেকে তাঁর প্রিয় যুব-শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলের উদ্যোগে পাক্ষিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫-এর ১৪ সেপ্টেম্বর) ইংবেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান ইংরেজি ভাষায় মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' (প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ড. নাজুণ্ডা রাও-এর তত্ত্বাবধানে, মাদ্রাজ থেকে)। স্বামীজীর অভীপ্সা অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় পত্রিকা চাই! বাংলা ভাষা স্বামীজীর মাতৃভাষা। এই ভাষাতেই 'অবতার বরিষ্ঠ' শ্রীবামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবন নিষিক্ত অনুভব-উপলব্ধির প্রেক্ষিতে অমৃত কথা বলেছেন। তিনি আরো জানতেন,—'যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? ...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।'[৩] এ সেই মাতৃভাষা—বাংলা ভাষা। তাই বাংলা ভাষায় পত্রিকা চাই! চাই দৈনিক পত্রিকা!

বাংলা ভাষায় পত্রিকা—দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অভীপ্সা এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকা আনুষ্ঠানিক প্রকাশের কথা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন,—

> 'আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া যায়, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাঁহার গুরুভাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন, উহা বিস্তর অর্থ সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল।

স্বামীজীর নিজের নিকটে এক সহস্র টাকা ছিল, ঠাকুরের একজন গৃহস্থ ভক্ত (হরমোহন মিত্র) আর এক সহস্র ধার দিলেন—ঐ টাকায় কার্যারম্ভ হইল। একটি প্রেস (স্বামীজীর জীবনকালে নানা কারণে বিক্রি করে দেওয়া হয়) খরিদ করা হইল এবং শ্যামবাজার, রামচন্দ্র মৈত্রের গলিতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসাকের বাটীতে ঐ প্রেস স্থাপিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের (বঙ্গাব্দের) ১ মাস ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রের 'উদ্বোধন' নাম মনোনীত করিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বহু আশীর্বাদ করিলেন।"[৪]

স্বামী বিবেকানন্দের অভীপ্সাকে বাস্তবায়িত করে 'ব্রহ্মবাদিন্', 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকা স্বল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হলেও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল 'উদ্বোধন'ই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ থেকে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ) কর্তৃক প্রথমাবধি সম্পাদিত। 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর সম্পাদক ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল (পত্রিকাটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়) আর 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক ছিলেন প্রথম দু'বছর রাজম আয়ার (দু'বছর পূর্ণ হবার পর মাসিক এই পত্রিকাটি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এক মাস বন্ধ থাকে এবং তৃতীয় অর্থাৎ ঐ বর্ষের আগস্ট সংখ্যা থেকে বিবেকানন্দ শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দেব সম্পাদনায় উত্তর প্রদেশের মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। গত ১৯৯৬-এ পত্রিকাটির শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে)। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার উদ্দেশ্য নির্ধারণ কবে দিয়ে স্বামীজী উপনিষদের বাণীকে উচ্চকিত করেছিলেন,—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার আদর্শ তাঁরই নির্দেশে হয়ে উঠেছে—'Arise! Awake! and stop not till the goal is reached' আর 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথমে আদর্শ হলো ছান্দোগ্য উপনিষদের বাণী,—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। আমরা দেখতে পাই প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় এই বাণী বিধৃত। তারপর এই বাণীর পরিবর্তে 'উদ্বোধন' নামের সঙ্গে সংগতি রেখে চালু হল স্বামীজীরই নির্দেশে—'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' (শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন কর্তৃক অধুনা প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার নামকরণ হয়েছে শেষোক্ত শব্দটি নিয়ে—'নিবোধত')।

প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করবো রামকৃষ্ণ মঠ-রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকাগুলির কথা। 'বেদান্ত কেশরী' মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই)

মায়লাপুর রামকৃষ্ণ মঠ থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯১৩তে অর্থাৎ 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হবার পর পরই। মাসিক এই পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মাসিক 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা' পত্রিকা দুটিও মাদ্রাজের মায়লাপুর মঠ থেকে যথাক্রমে তামিল ও তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে ক্রমপরম্পরায় বিগত ৭৭ ও ৫৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্‌টিটিউট অব্ কালচার থেকে মাসিক 'বুলেটিন অফ দি রামকৃষ্ণ মিশন অব ইন্‌স্‌টিটিউট অফ কালচার' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে ৪৮ বছর ধরে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'সমাজশিক্ষা' প্রকাশিত হচ্ছে ৪০ বছর ধরে। মাসিক 'প্রবুদ্ধ কেরলম্' মালায়ালাম ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে বিগত ৮২ বছর ধরে ত্রিচূর কেন্দ্র থেকে। ৪২ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে মারাঠী ভাষায় মাসিক 'জীবন বিকাশ' পত্রিকাটি নাগপুর কেন্দ্র থেকে। মাসিক 'শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোত্' এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হচ্ছে গুজরাটী ভাষায় রাজকোট কেন্দ্র থেকে। হিন্দিতে ত্রৈমাসিক 'বিবেকজ্যোতি' ৩৫ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর কেন্দ্র থেকে।

বহির্ভারতের লণ্ডন কেন্দ্র থেকে দ্বিমাসিক 'বেদান্ত ফর ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট' ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে একটানা ৪৬ বছর। ওয়াশিংটন কেন্দ্র থেকে ত্রৈমাসিক 'গ্লোবাল বেদান্ত' পত্রিকাটিও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। সিঙ্গাপুর কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'নির্বাণ' পত্রিকাটির ভাষাও ইংরেজি। ফ্রান্সের গ্রেজ কেন্দ্র থেকে ফরাসী ভাষায় ত্রৈমাসিক 'বেদান্ত' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে ৩২ বছর ধরে। স্প্যানিশ্ ভাষায় মাসিক 'বুলেটিন' প্রকাশিত হয় আর্জেন্টিনার বুয়েনস্ এয়ারস্ কেন্দ্র থেকে।

॥ ২ ॥

মধ্যযুগের (১৩৫১—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) খোলস থেকে বেরিয়ে সাহিত্যে আধুনিক যুগের পত্তনের (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—১) আবেগ নির্ভরতার পরিবর্তে মনন, [illegible] তথ্যের উপস্থাপনা। ২) পদ্যের পরিবর্তে গদ্যের উপর ভর দিয়ে সাহিত্যের পল্লবিত বিস্তার, স্বভাবতই গদ্যের অনুষঙ্গে মননশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধের ব্যাপক প্রকাশ। ৩) বিগলিত অন্ধ ভক্তি-বিহ্বলতার পরিবর্তে যুক্তিনিষ্ঠতা, তার্কিক বিচার, বিশ্লেষণ। ৪) মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারে নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

মুদ্রিত আকারে প্রকাশে মানুষের সচেতনতাবৃদ্ধি। ৫) দৈব নির্ভরতার পরিবর্তে মানবিকতার প্রতি গভীর আস্থা স্থাপন।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গদ্য নির্ভরতা নিয়েছে স্বতন্ত্র বর্ণবিভা। বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলনে (১৭৭৮) গদ্য রচনার পথ মসৃণ হয়। ১৯৭৮এ হ্যালহেডের ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ছাপা হয়। ব্যাকরণের বাংলা উদাহরণগুলি ছাপা হয়েছিল চার্লস উইলকিন্স নির্মিত বিচল বাংলা হরফে। বাংলা হরফ তৈরীর কাজে উইলকিন্সের প্রধান সহযোগী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। বাংলা গদ্যের সার্থক ও সার্বিক পথচলার ক্ষেত্রে এই প্রয়াস এক কথায় বৈপ্লবিক। বাংলা গদ্যের ইতস্তত লিখিত পরিচয় আমরা পেয়েছি মধ্যযুগে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র কিছু টীকায়, 'শূন্যপুরাণে'র ভাঙা পদ-বন্ধে, প্রাচীন চিঠিপত্রে, সরকারী আদেশনামায়, দলিল-দস্তাবেজে, মানুষ-মানুষী ক্রয়-বিক্রয় পত্রে, সহজিয়া বৈষ্ণবদের রচিত পুঁথিতে ও পোর্তুগীজ পাদ্রিদের উদ্যোগে কিছু লেখালেখির মধ্যে। উনিশ শতকের শুরুতেই ইংরেজদের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক পথ চলা শুরু হয় প্রধানত দুটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে—ক) খ্রীষ্টান ধর্মের জয়গান ঘোষণা করে বাইবেল বাংলায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এবং হিন্দু ধর্মের নিন্দা-কুৎসা করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রণের মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য বাঙালীদের খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন। খ) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশ শোষণ-শাসনের প্রেক্ষিতে সাগর পার থেকে আসা রাজকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং), প্রতিষ্ঠা (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর শিক্ষক, লেখকদের মধ্যে উইলিয়াম কেরী ছাড়া বাকি সকলে ছিলেন বাঙালি। এই বাঙালিদের মধ্যে 'টুলো পণ্ডিতে'রা সংখ্যায় ছিলেন বেশি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকেরা বেশির ভাগ অনুবাদ ও কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করলেও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলির গদ্য ছিল আড়ষ্ট, জটিল, গতিহীন, যথার্থ যতি-ছেদ চিহ্নবিহীন। তাতে ছিল অন্বয়ের অভাব, তৎসম শব্দের ব্যাপক উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যেতে পারে 'উশৃঙ্খল গদ্য'। তবে এই গ্রন্থগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল সাহিত্যের গদ্যরূপে নয়, সাহিত্য-সুলভ মনোভঙ্গির পরিচায়ক রূপে। রামমোহন গদ্য রচনার জন্য কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ দুটি—ক) সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সতীদাহ প্রথা রদ করবার অভিলাষে। খ) ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তনে। প্রথম কারণটির জন্য রক্ষণশীল

হিন্দুদের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে যুক্তি-তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মসীযুদ্ধে নামতে হয়েছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুবাদ করতে হয়েছে নির্বাচিত বেদান্তগ্রন্থ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার জন্য। রামমোহন বহু ভাষা জানলেও সাহিত্যের গদ্য আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর সামনে আদর্শ গদ্যরীতি ছিল না, তাই তাঁর গদ্যও 'উশৃঙ্খল', বাধা-বন্ধনহীন। এই 'উশৃঙ্খল' গদ্যকে যিনি প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সালংকরা করলেন, পূর্বসূরীদের ত্রুটিগুলি দূর করে সুললিত—রোমান্টিক-সাহিত্যের গদ্যের জন্ম দিলেন—তিনি হলেন বিদ্যাসাগর মশাই। তাঁর গদ্যের উপর ভর দিয়েই বাংলা সাহিত্য ছড়িয়ে দিয়েছিল তার ডালপালা। প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) গদ্যকে 'মেছুনিদের গদ্যভাষা' আখ্যা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের গদ্যকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। গত শতাব্দীর অন্তিমে সে যুগের খ্যাতিমান লেখকেরা অনুসরণ করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে। রবীন্দ্রনাথের হাতে গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাংলা গদ্যের পালাবদল ঘটলো। বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মাঝখানে যিনি বাংলা গদ্যকে '...সাফ ইস্পাত দুমড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না,"[৫] করে তুললেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

বাংলা গদ্যের বিবর্তনে সাময়িক পত্র-পত্রিকা একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ—এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় সকল লেখকেরই প্রবন্ধ-নিবন্ধ-নকশাধর্মী রচনা-উপন্যাস প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। গত শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে বর্তমান শতাব্দীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত নানা ধারায়, নানা বিষয়ে যত লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে তার সিংহভাগ এই সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। . .

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রায় সহস্রাধিক সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব পত্র-পত্রিকার আয়ুষ্কাল এক মাস থেকে একশো বছর। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষের শিরোপা ধারণ করেছে 'উদ্বোধন' এবং 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'। তবে দুটি পত্রিকার প্রকাশকালের মধ্যে বড় মাপের পার্থক্য আছে। 'উদ্বোধন' প্রথম পাক্ষিক রূপে এবং দশম বর্ষে পৌঁছে মাসিক পত্রিকা রূপে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষে পদার্পণ করে বাংলা সাময়িক পত্রের ভুবনে স্বর্ণবিভার উজ্জ্বলতা নিয়ে আজ ধ্রুবতারা রূপে বিরাজমান। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' একশো বছর (১৮৯৪—১৯৯৪) অতিক্রম করেছে ঠিকই কিন্তু এই পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অসমর্থ হয়ে কখনো ছ'মাসের ব্যবধানে

'যুগ্ম সংখ্যা' রূপে আবার কখনো অর্থ ও নিষ্ঠার অভাবে বছরের চারটি সংখ্যা একত্রিত হয়ে 'বার্ষিক পত্রিকা' রূপে প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বোধন' (১২০৫–১৩০৪) পত্রিকার ক্ষেত্রে এমনটি কখনই হয় নি। তাছাড়া প্রকাশকালের দিক থেকে ব্যবধানের কথা আগেই উল্লিখিত।

॥ ৩ ॥

শতবর্ষের মুকুট পরিহিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার এই গৌরবদীপ্তি, গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা আলোচনার মুহূর্তে সালতামামির দৃষ্টি নিয়ে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির দিকে আমরা তাকাবো।

প্রথম বাংলায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রের নাম—'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮)। মাসিক এই পত্রিকাটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ক্লার্ক মার্সম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। আয়ুষ্কাল দু'বছর দু'মাস। মোট ২৬টি সংখ্যার মধ্যে প্রথম ১৬টি বাংলা ও ইংরেজিতে অর্থাৎ দ্বিভাষিক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে ঐ শ্রীরামপুর মিশন থেকেই জি. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটি অর্ধশতকব্যাপী চলেছিল। কলকাতা থেকে বাঙালির উদ্যোগে এবং সম্পাদনায় প্রথম যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম 'বেঙ্গলী গেজেট' (১৮১৮)। জেমস অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০)-এর অনুসরণে, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এই পত্রিকটি এক বছরের বেশি চলেনি। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে দ্বিভাষিক 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা প্রকাশ করলেন খ্রীষ্টান যাজকদের দ্বারা হিন্দুধর্মের ব্যাপক নিন্দার জবাব দিতে। তবে পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি। তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৮২১-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল সাপ্তহিক 'সংবাদ কৌমুদী'। তারাচরণ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রমথনাথ শর্মা) এই পত্রিকাটির পরিচালনায় ছিলেন বটে কিন্তু নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল রামমোহনের। ভবানীচরণ 'অংশিগণের সহিত ধর্মবিষয়ে ঐক্যমত্য না হওয়ায়', 'সংবাদ কৌমুদী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এর সূত্রে আমরা জানতে পারি যে রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' এই পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। খ্রীষ্টান মিশনারী ও রামমোহনের দ্বন্দ্বে যেমন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও 'সংবাদ কৌমুদী' পিছনে ছিল তেমনি রামমোহনের প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও ভবানীচরণকে সম্পাদক নিয়োগ

করে প্রকাশ করলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্ন তিরিশ বছর প্রকাশিত হয়েছিল। তবে 'সংবাদ কৌমুদী' বেশি দিন চলেনি। ইতিহাসের নিরিখে একটা কথা বলা প্রয়োজন, তা হল—রামমোহনের ব্রাহ্মসভা তখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয়নি, আলেকজাণ্ডার ডাফ ভারতে আসেননি (১৮৩০); সেই সময় খ্রীষ্টান মিশনারীগোষ্ঠী, রামমোহনপন্থী ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিবাদ পত্রিকাগুলি প্রকাশের প্রধান কারণ, কোন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে নয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশের ক্ষেত্রে শোনা যায় ব্যাপক গঙ্গাজল ব্যবহারের কথা। পরবর্তীকালে এ কাজ করেছিল রক্ষণশীল 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১) পত্রিকা। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র নিজস্ব প্রেস থাকায় ভবানীচরণ বাংলায় 'শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা', 'মনুসংহিতা' ছাপিয়ে বার করেছিলেন। রামমোহন ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত' (১৮২৯) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পত্রিকাটি চলেছিল দশ বছর।

সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে দৈনিক বা প্রাত্যহিক পত্রিকায় উত্তরণের মধ্যে সমকালে চমক সৃষ্টি করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। রক্ষণশীল হিন্দু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর্থিক সহায়তায় 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে উনিশ বছরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাতে। ঈশ্বরচন্দ্র পরে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সংস্পর্শ থেকে বেরিয়ে এসে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক বা প্রাত্যহিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রভাবশালী এই পত্রিকাটি প্রচার সংখ্যার দিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। পত্রিকাটি স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল। ১৮৫৯-এ ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁব অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ কবেন। তাঁর অবর্তমানে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় (সেকালের শ্রেষ্ঠ-প্রথম সার্থক বাংলা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের লেখালেখির জগতে প্রবেশ এই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার হাত ধরে ঈশ্বর গুপ্তের সস্নেহে। সাহিত্যিক আড্ডা 'সংবাদ প্রভাকর'কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল)।

'সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় 'সংবাদ ভাস্করে'র (১৮৩৯) নাম। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে) ছিলেন খুব চতুর। প্রথমে রামমোহনের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিছুদিন

পর তাঁর সংস্পর্শ ত্যাগ করে ব্রাহ্মবিরোধী রক্ষণশীল হিন্দুদের 'ধর্মসভা'য় যোগ দিয়ে নন্দলাল ঠাকুরের অনুগত হন। পরে 'ইয়ংবেঙ্গল'দের অন্যতম দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ লাভ করেন। নানা শিবির পাল্টে পত্রিকাটিকে প্রায় কুড়ি বছরের বেশি টিকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। সাপ্তাহিক রূপে শুরু হলেও পরে বারত্রয়িক অর্থাৎ সপ্তাহে তিন দিন পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আশি বছরের এই মাসিক পত্রিকাটি পূর্বে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির তুলনায় ছিল উচ্চাঙ্গের। প্রথম পর্বে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ। অক্ষয়কুমাব ছিলেন সম্পাদক। তাঁব মৃত্যুর পর সম্পাদনার দায়িত্ব ক্রম পরম্পরায় যাঁরা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতী' (১৮৭৭) প্রকাশের আগে 'তত্ত্ববোধিনী'ই ছিল ঠাকুরবাড়ির কাগজ। 'ভারতী' প্রকাশের পরও সেই কৌলিন্য বজায় ছিল। মধুসূদন সহ ঠাকুর বাড়ির এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত বহু বিদগ্ধ লেখকের লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তিনটি স্থায়ী অবদান সুচিহ্নিত করেছে—ক) শুধু ব্রহ্মোপসনা-বেদান্ত বিষয়ক লেখা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, সমসাময়িক ঘটনা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-শোষণের ফলে নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুরবস্থার কথা তুলে ধবে ও সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে সু-সম্পাদিত মননশীল পত্রিকার আদর্শ স্থাপন করেছে। খ) গদ্যকে নিছক সাময়িকতা থেকে মুক্ত করে প্রজ্ঞা, মনন ও উপলব্ধির বাহন করে তুলেছে। গ) বিধবা বিবাহকে প্রকাশ্যে সমর্থন যুগিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি প্রথম তুলে ধরেছিলেন ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ তাঁদের পরিচালিত দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪২) পত্রিকায়। 'সংবাদ ভাস্কর' বিধবা বিবাহ বিল পাশের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রকাশকালে ও অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। ডেভিড হেয়ার সদ্য পরলোকগত (১৮৪২), মধুসূদন মাইকেলে পরিণত (১৮৪৩), কলকাতা মেডিকেল কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত, বেথুন স্কুলের দ্বার উদ্‌ঘাটিত (১৮৪৯), বেথুনের মৃত্যু (১৮৫৩)

এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন নবজাত। এ সবের সূত্রে কলেজ শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণ ঘটেছে। চিন্তা-চেতনায় প্রবাহিত হয়েছে প্রজ্ঞা-সমৃদ্ধির হাওয়া। এই প্রেক্ষাপটেই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বা Vernacular Literature Society পরিচালিত প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প সাহিত্য দ্যোতক নামকরণেই ইঙ্গিতবাহী এই পত্রিকাটি ছাপা হত ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে জে. টমাসের তত্ত্বাবধানে। বিষয় অনুষঙ্গের পাশাপাশি মুদ্রণের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকাটি প্রকাশের প্রথম থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এই পত্রিকার প্রকাশে যেমন ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষায় এই ধরণের পত্রিকার বিলম্ব প্রকাশে আক্ষেপ করেছেন। দশ বছর চলার পর পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটে।

১৮৫৪-এর পর লর্ড ডালহৌসির আমলে ডাক চলাচলের সুব্যবস্থা ও রেলগাড়ি চালু হওয়ায় রাজধানী কলকাতার সঙ্গে শহরতলী ও মফস্বল, গ্রাম-গ্রামান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়ায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও দূরান্তরের গ্রাহক-পাঠকদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে হয়। ইতিমধ্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের আকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা। ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ (যা কিনা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে চিহ্নিত ও স্বীকৃত) ও নির্মম ভাবে কোম্পানীর শাসকদের দ্বারা তা দমনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস ভিন্ন পথে বাঁক নেয়। কোম্পানীর পরিবর্তে ভারতবর্ষ শাসন-শোষণের ভার তুলে নেয় ব্রিটিশ সরকার। এরই পাশাপাশি দেশাত্মবোধ-জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে বাঙালি তথা ভারতবাসী। এই পর্বে বিদ্যাসাগর মশাই-এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর। মাঝে একবছর বন্ধ থাকার (১৮৮০-তে) পর নবরূপে প্রকাশিত হয়ে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিচার পদ্ধতির তীক্ষ্ণ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠত 'সোমপ্রকাশ'। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)-এর সূত্রে উত্থিত জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনও (১৮৫১) 'সোমপ্রকাশ'-এর সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায় নি। কেন না 'সোমপ্রকাশ' রায়তদের স্বার্থ দেখত

ও তাদের স্বার্থে লড়াই করত। বাঙালির জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এই পত্রিকাব ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠত। ক্রমাগত ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় জোবদার হয়ে ওঠায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' চালু কবে সাময়িক পত্রের কণ্ঠরোধ করবাব জন্যে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। বাগ্মী—সেকালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কেশবচন্দ্র যোগ দেওয়ায় ব্রাহ্মসমাজে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। এই সূত্রে স্ত্রী শিক্ষা—নারী স্বাধীনতার প্রসার; বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-পণপ্রথা বিলোপের পক্ষে এবং মদ্যপান ও বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন জোরদাব ভাবে চালানোব জন্য স্বতন্ত্র সাময়িক পত্রের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের তাগিদে 'বামাবোধিনী' ও 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়। 'অবলাবান্ধব' দীর্ঘদিন স্থায়ী না হলেও জয়নগর-মজিলপুববাসী তরুণ ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত মাসিক 'বামাবোধিনী' পঞ্চাশ বছরেরও বেশি একটানা প্রকাশিত হয়েছে। নাবী আন্দোলন-নারী প্রগতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা বর্ণোজ্জ্বল। কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেবের প্রচার আনুকূল্যে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এক হাজার থেকে তিন হাজাবে পৌঁছেছিল। এক পয়সায় 'সমাচার' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করে (১৫ নভেম্বর ১৮৭০) কেশবচন্দ্র সেন সেকালে সাড়া জাগিযেছিলেন। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি অভিনব ঘটনা। ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা প্রথমে সরাসরি ও ১৮৭৮-এর পরে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার বহু রচনাই লেখা হত চলিত গদ্যে। তবে তা সার্থক চলিত গদ্য নয়। 'সুলভ সমাচারে'র গ্রাহক সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৬-তে দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মানসিকতার ফলে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দেবেন্দ্রনাথের সংসর্গ ত্যাগ করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। 'সুলভ সমাচার' ছিল মুখ্যত এই 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র মুখপত্র। কুড়ি বছর এককভাবে চলার পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট 'কুশদহ' পত্রিকার সঙ্গে মিশে গিয়ে 'সুলভ সমাচার-কুশদহ' নামে যৌথভাবে চলেও বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের রাজভক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসা এবং অবতারতত্ত্বে বিশ্বাস ও কোচবিহারের নাবালক রাজার সঙ্গে নিজের বালিকা কন্যার

বিবাহদানের প্রতিবাদে ব্রাহ্ম সমাজে আবার ভাঙন দেখা দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের মুখপত্র রূপে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রকাশিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী এর আগে 'সমদর্শী' (১৮৭৪) নামে একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। 'তত্ত্বকৌমুদী'ও খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। এই পর্যায়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা হল সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' (১৮৮৩)। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ। পত্রিকাটি একুশ বছর চলেছিল।

এ পর্যন্ত আলোচিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিকে যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা বলা যাবে না। যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)। বঙ্কিমচন্দ্রের এবং অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রেব অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকাটি স্থায়ী হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল গত শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে। বঙ্কিমচন্দ্র (১–৪ সংখ্যা) ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট লেখকেরা। এঁরা হলেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন, গঙ্গাচরণ সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি এই 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এককথায় বলতে গেলে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম একাই ছিলেন একশো। 'বঙ্গদর্শনে'র মতো জ্যোতিষ্মান না হলেও 'জ্ঞানাঙ্কুর' এবং 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকা দুটি যৌথভাবে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' (১৮৮২) নামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন সেকালের নামী লেখকেরা। এঁরা হলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ। স্থায়িত্বকাল অবশ্য বেশি নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যদি সুজলা-সুফলা-মলয়া-শীতলা মাতা বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'র সম্মিলিত শক্তিকে উচ্চকিত করে তুলতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা। 'ভারতী' পত্রিকা নানা পর্বে প্রায় পঞ্চাশ বছর চলেছিল। প্রথম প্রকাশ থেকে নানা পর্বে ক্রমানুযায়ী 'ভারতী' সম্পাদনা করেছেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী (দু'জনই স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা),

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলি হল 'বালক' ও 'সাধনা'। পত্রিকা দুটি বেশিদিন চলেনি।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে আসে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১), 'সাহিত্য' (১৮৯০), সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' (১৮৯১), 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (১৮৯৬)-র নাম। 'সাহিত্য' ও 'বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-পার্ষদ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'বঙ্গবাসী', 'সাহিত্য', 'হিতবাদী'র আয়ুষ্কাল থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র আয়ুষ্কাল ছিল অনেক বেশি। একটানা ষাট বছরেরও বেশি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় উচ্চাঙ্গের মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। বার্ষিক গ্রাহক মূল্য দু'টাকা। নান্দনিক সচেতন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ। এত সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সমাহার সত্ত্বেও স্বল্পকাল চলার পর 'প্রদীপ' অকস্মাৎ নিভে গেল। 'প্রদীপ' সম্পাদনার অভিজ্ঞতা নিয়ে এলাহাবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' (১৯০১)। সাত বছর এলাহাবাদ থেকে প্রকাশের পর ১৯০৮-এ 'প্রবাসী' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকলো। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পথ চলে সর্ব ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ 'প্রবাসী' নিরবচ্ছিন্ন ৬৯ বছর প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে চলতি শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত সকল বিশিষ্ট লেখকের লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছে। পরিপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকার মেজাজ-বৈশিষ্ট্য-গুণাবলী 'প্রবাসী'তে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়।

বিংশ অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্রিকাগুলি হল—'মানসী' (১৯০৯), 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩), 'সবুজপত্র' (১৯১৪), 'কল্লোল' (১৯২৩), 'উত্তরা' (১৯২৫), 'বিচিত্রা' (১৯২৭), 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৭), 'পরিচয়' (১৯৩১), 'দেশ' (১৯৩৩), 'কবিতা' (১৯৩৫), 'অমৃত' (১৯৬১) 'কথাসাহিত্য' (১৯৪৯), 'নবকল্লোল' (১৯৬০) প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলির আয়ুষ্কাল যথাক্রমে ১৮, ৫৭, ১৩, ৩৯, ১৩ প্রকাশিত হয়ে চলেছে, প্রকাশিত হয়ে চলেছে, ২৫, ১৮, ৪৯ ও ৩৮ বছর। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলির ভূমিকা অপরিসীম।

॥ ৪ ॥

বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার সালতামামির সূত্রে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল তা হল, —ক) বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা। খ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রসরমানতা ও সাহিত্যের আঙিনায় উজ্জ্বল প্রবেশের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির গুরুত্ব। গ) সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস, সাফল্য ও জনপ্রিয়তা। ঘ) সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশে সাহিত্যের প্রসারিত আঙিনাটি চিনে নেওয়া এবং সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ঙ) সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে 'ধর্ম'-এর অবস্থান। চ) সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির স্থায়িত্ব। ছ) নান্দনিক সচেতনতা।

শেষোক্ত পাঁচটি বিষয়ে জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে শতবর্ষে পৌঁছেছে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন' পত্রিকা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষে পৌঁছনোর বিষয়টি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন, তেমনি বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এতক্ষণের আলোচনায় সেটি সূর্যোকরোজ্জ্বল প্রভাতের উল্লসিত রক্তারুণ প্রভায় প্রমাণিত। এবার প্রশ্ন দুটি বিষয় নিয়ে —ক) 'উদ্বোধন' কি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র? খ) সামাজিক সাহিত্যের নির্যাস 'উদ্বোধন' কতটা শতবর্ষে চলার পথে বহন করেছে এবং পাঠক মহলে ছড়িয়ে দিয়েছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, 'উদ্বোধন' নিছক শুধুমাত্র ধর্মীয় পত্রিকা নয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর উদ্দেশ্যে। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের ভাব-বৈশিষ্ট্য-লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও তাই। স্বয়ং বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা' অংশের সমাপ্তিতে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন সেই কথাই,—'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের জন্যই আপনার শরীর অপর্ণ করিতেছে।"[৬] এই অভিমতের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে 'উদ্বোধন' পত্রিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি। বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের সমন্বয়ের উপর জোর দিয়ে 'উদ্বোধন' তার অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তুলে ধরেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে 'সকল প্রশ্নের মীমাংসা' অর্থাৎ শুধু ধর্ম নয়, ইতিহাস,

সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, ভ্রমণ, অর্থনীতি এবং অবশ্যই সাহিত্য বিষয়ক নানা অনুসন্ধিৎসার দ্বার উন্মোচন করেছে 'উদ্বোধন'। 'সমাচার দর্পণ', 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'সংবাদ কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মতো 'আমার ধর্ম ভালো, তোমার ধর্ম খারাপ'—এই কূপমণ্ডুকতা, 'মতুয়ার বুদ্ধি'সম্পন্ন মানসিকতায় ধর্ম নিয়ে পারস্পরিক 'দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে'র থেকে বিরত থেকেছে 'উদ্বোধন'। স্বামীজীর এই আহ্বানকে সামনে রেখে 'বুধমণ্ডলী' ধর্ম-দর্শন নিয়ে সদর্থক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, কারোর ভাবকে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে 'উদ্বোধন'-এর পাতায় দীর্ঘ একশো বছর ধরে। একশো বছরে প্রকাশিত ধর্ম-দর্শন আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে আমরা দেখতে পাই বেদান্ত, গীতা, কোরান, ধম্মপদ, বুদ্ধদেব, মহাবীর, জৈনধর্ম, যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে গঠনমূলক (Constructive Idea) এবং সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক রচনাভঙ্গি।

'উদ্বোধন' পত্রিকার আরো একটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামীজী ঐ 'প্রস্তাবনা'য় লিখছেন,—'ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।'[৭] সমন্বয়ের আদর্শ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান কথা। পাশ্চাত্য পরিক্রমার সূত্রে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের ত্রুটি যেমন ধরতে পেরেছিলেন, ভারত পরিক্রমায় এদেশের মানুষের দুর্বলতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাধ্যমে প্রাথমিক ভাবে বাঙালিদের চেতনায় আঘাত হেনে বৌদ্ধ যুগ থেকে শ্রীচৈতন্যবাহিত পথে প্রতিবাহিত সাত্ত্বিক ভাবের পাশাপাশি রজোগুণের অধিকারী করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রথম দিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ বাঙালি জীবনে বিবেকানন্দ বাণীর উত্তাপ বাঙালি সমাজে, বিশেষত তরুণদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল আর তারই ফলশ্রুতি ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গজনিত আঘাতের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালি তরুণদের প্রত্যাঘাত। বিবেকানন্দের জীবিতাবস্থাতেই তাঁরই নির্দেশে তাঁর সতীর্থরা

পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন সেখানকার মানুষ-মানুষীকে সত্ত্বগুণের অধিকারী করে তুলতে, শাশ্বত জীবনের মর্মবাণী হৃদয়তন্ত্রীতে গেঁথে দিতে। সেই কাজ আজও চলেছে। পাশ্চাত্যের জড়-ভোগবাদী মানুষ ক্রমশ জীবনের তলাতল অন্বেষণে ব্রতী হয়েছে—হচ্ছে। পাশ্চাত্যে থেকে বা পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে সন্ন্যাসীরা যে সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লিখেছেন তা পড়ে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে পারছি। শুধু তাই নয়, স্বামীজী নিজেও অভিজ্ঞতার নিরিখে এই বিষয়ে জানিয়েছেন ঐ 'প্রস্তাবনা'তেই,—'তবে যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর-মানসপুত্র, তাঁহাদের ভাবরাশির, চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।'[৮]

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা জোরের সঙ্গেই বলব যে, 'উদ্বোধন' সার্বিক সাহিত্যের নির্যাস বিকচিত কুসুমের ন্যায় যেমন নিজে বহন করেছে তেমনি তা আবহমান পাঠকচিত্তেও পৌঁছে দিয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার আগে স্বামীজীর ক্ষোভ মথিত অভিমতটি জেনে নেব প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পার্থিব বিদ্যা—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, শিল্প-ভাস্কর্য ইত্যাদি, —'আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ইওরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।'[৯] স্বামীজী পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে, সাহিত্য এমনই একটি বিষয় যে বিশাল-উদার বক্ষপটে সব কিছু অর্থাৎ সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মনীতি, শিল্পকলা ইত্যাদি অনায়াসে ধারণ করতে পারে। স্বামীজী কথিত ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়েই আমরা গ্রীক তথা পাশ্চাত্যের (স্বামীজীর কথায় পাশ্চাত্যের সর্বত্র গ্রীসের ছায়া পড়েছে) নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শতবর্ষ ধরে নানা বিষয়ে যে সকল লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে তা সাহিত্যেরই বিষয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে জানিয়েছেন,—'যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চালিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না,

তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকাবে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিলে তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, তাহা অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি (creation)।'[১০] বিষয় বিন্যাসে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য সূচিত হলেও বাস্তবিক দিক থেকে সবই দেদীপ্যমান সাহিত্যের সামগ্রী বা বিষয়-অন্তর্ভুক্ত। তাই 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত সব লেখালেখিই বাংলা সাহিত্যের ঝাঁপিতে গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয়।

॥ ৫ ॥

'উদ্বোধন' পাক্ষিক রূপে প্রথম ন'বছর প্রকাশিত হয় ডবল ডিমাই বা প্রচলিত বই-এর সাইজে। দশম বর্ষে পৌঁছে মাসিক পত্রিকা রূপে তার আত্মপ্রকাশ। পাক্ষিক রূপে যখন প্রকাশিত হত তখন প্রচ্ছদপটে লেখা থাকত—'ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা'। 'বার্ষিক গ্রাহক মূল্য' ছিল ২ টাকা। শতবর্ষে পদার্পণ পর্যন্ত 'উদ্বোধন' পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি একের পর এক ওল্টালে আমরা দেখতে পাই যে জীবিতাবস্থাতে বিবেকানন্দই ছিলেন 'উদ্বোধন'-এর প্রধান লেখক। জীবনাবসানের পরও তাঁর অপ্রকাশিত বাংলায় লেখা ও অনূদিত চিঠিপত্র, বক্তৃতা অগ্রন্থিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রস্তাবনা'। পরের সংখ্যায় 'সখার প্রতি' কবিতা, ইংবেজিতে রচিত 'রাজযোগ'-এর বাংলায় অনূদিত নির্বাচিত অংশ, 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত 'কনভার্সেসন উইথ স্বামীজী'র অনুবাদ—'স্বামীজীর সহিত কথোপকথন'। তৃতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি ছিল স্বামীজীর লেখা—'জ্ঞানার্জন'। চতুর্থ সংখ্যায় কোন লেখা না থাকলেও পঞ্চম সংখ্যার সূচনায় ম্যাক্সমূলার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী 'এ রিয়েল মহাত্মা' গ্রন্থের বড সমালোচনা 'ম্যাক্সমূলার কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটির প্রকৃত মূল্যায়ন আমরা যেমন লক্ষ্য করি তেমনি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রবাহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সমালোচনার উজ্জ্বল আদর্শের নজির। ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে স্বামীজীর সুবিখ্যাত আবহমান ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-চেতনা, সমাজচেতনা, দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গণচেতনার উদ্ভাসনে ইতিহাস অন্বেষণ ও বিশ্লেষণে ভারতচেতনায় সমুজ্জ্বল, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অমূল্য সঞ্চয় 'বর্তমান ভারত' রচনাটি প্রকাশিত হতে থাকে। দশম ও চতুর্দশ সংখ্যায় রসরচনাগুচ্ছ 'ভাববার কথা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

ভবানীচরণ বা কালীপ্রসন্নের মত বা 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নক্সা স্বামীজী রচনা করেন নি। তাঁর রসরচনা স্ল্যাং বা আক্রমণাত্মকও নয়। তিনি পজিটিভ আইডিয়ার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তাই কালের গর্ভে তা বিলীন হয়ে যায় নি, একালেও তাঁর সেই রচনাগুলি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিতে যে সূক্ষ্ম humour ও দ্যুতিময় wit লক্ষ্য করা যায় তা পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরসূরী প্রমথ চৌধুরীর লেখায় অনুপস্থিত।

প্রথম বর্ষের পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ভ্রমণকাহিনী 'বিলাতযাত্রীর পত্র'। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'পরিব্রাজক'। বিবেকানন্দের আগে হিমালয় ভ্রমণকথা লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ, সমকালে ধারাবাহিক ভাবে, পরবর্তীকলে রবীন্দ্রনাথের 'যুরোপ যাত্রীর ডায়েরী', 'যুরোপ প্রবাসীর পত্র' এবং আরো দেশ-বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'বিলাতযাত্রীর পত্র' বা 'পরিব্রাজক' নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়। বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সহজাত নিরাঁসক্তির সঙ্গে মিশেছে 'পরিব্রাজকে'র সর্বত্র পরিহাসদীপ্ত মণি-মাণিক্যের অন্বেষণ, প্রাণের গভীরে প্রবাহিত হয়েছে ভারতসংস্কৃতির যুগযুগান্তবাহী অধ্যাত্মচেতনার ঐতিহ্য আর এরই পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে হুগলি নদীতে চড়া পড়ার ইতিহাস, গঙ্গার শোভা ও বাংলার সৌন্দর্যের অবনতির কারণ, বঙ্গোপসাগরের অনুপুঙ্খ বিবরণ, জাহাজ শিল্পের ক্রমবিবর্তন, সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম, আরব ও মিশরীয় সভ্যতার কাহিনী, রেড-সীর বৃত্তান্ত, সুয়েজখালে হাঙ্গর শিকার, ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক বিবরণে ইহুদী ও খ্রীষ্টানধর্মের আলোচনা, ইউরোপীয় সভ্যতা ও প্রসঙ্গত সমকালে উন্নত বা উন্নতিকামী জাতির নৃতাত্ত্বিক আলোচনা, ইউরোপীয় নানাদেশের বর্ণনা ও বিশেষত্ব ইত্যাদি। স্বামীজীর এই অনবদ্য রচনা শুধুমাত্র ভ্রমণকাহিনী নয়, তার থেকে বেশি কিছু—একথা বাংলা সাহিত্যে সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ ও বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার সংযোজনে। এই রচনাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ আষাঢ় থেকে তৃতীয় বর্ষের ১ বৈশাখ পর্যন্ত ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার ইউরোপ ও আমেরিকা পরিক্রমণের সময় 'পরিব্রাজক' লেখা হয়। সমকালে ভারতীয় বা প্রাচ্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আদর্শের তুলনামূলক বিষয়টি স্বামীজীর চিন্তায় গ্রথিত ছিল। নেপল্‌স ত্যাগ করে স্বামীজীর জাহাজ মার্সাইতে থেমেছিল, তারপর সোজা একেবারে লণ্ডন। একথা 'পরিব্রাজকে'র পৃষ্ঠায়

স্বামীজী নিজেই জানিয়ে তারপর লিখেছেন,—'ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের তো নানা কথা শোনা আছে—তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতিনীতি আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি বলবো। তবে ইওরোপীয় সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত—এসব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল।'[১১] এই অসমাপ্ত বক্তব্যই হল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনাটি। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের সময় স্বামী সারদানন্দ—তখন একই সঙ্গে মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন 'উদ্বোধন' কার্যালয়ের কর্ণধার ও প্রাণপুরুষ, ভূমিকায় লিখলেন—

> 'এই প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়: একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর; দেশী জিনিসের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী: হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।'[১২]

ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার বিষয়টি সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার অন্তর্নিহিত কারণটির দিকে আমরা এবার দৃষ্টি ফেরাব। 'উদ্বোধন' প্রকাশের পর পাঠক সমাজে বিপুল সাড়া জেগেছিল, ভক্তরা দলে দলে গ্রাহক হয়েছিল—তা কিন্তু নয়। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতাও ছিল। এসব কথা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীজীকে চিঠি লিখে জানানোর পর, স্বামীজী লণ্ডন থেকে ১০ আগস্ট ১৮৯৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন,—'সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) বলে, কাগজ চলে না। ...আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব advertise

করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি—গড় গড় করে Subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভটচায্যিগিরি (পৌরাণিক গ্রন্থাদির অনুবাদ, শাস্ত্রীয় মীমাংসা, পৌরোহিত্যের ন্যায় ও স্মৃতি ব্যাখ্যা) তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে! যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। "টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা", হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার গ্রাহক পর্যন্ত আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে? ... তোমরা যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারুর নেই। এক লাইন লিখবার ... ক্ষমতা কারুর নেই—সব খামকা মহাপুরুষ!"[১৩]

চিঠির এই অংশটুকু পড়ে আমরা বুঝতে পারছি যে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে স্বামীজী গভীর ভাবে সচেতন ছিলেন। পাঠক-লেখক, আর্থিক সমস্যা নিরসনে তাঁর সেদিনের উদ্যোগ-প্রয়াসের পথ ধরেই 'উদ্বোধন'-এর নিরবচ্ছিন্ন চলা এবং শতবর্ষে পদার্পণ। এই চিঠির পর পরই স্বামীজী লিখলেন 'বিলাতযাত্রীর পত্র' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। 'উদ্বোধন'-এর সামনের সমস্যাজনিত আবরণ অনেকটা সরে গেল। সতীর্থেরা লিখতে শুরু করলেন। পত্রিকাটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হল। স্বামীজীর সংশ্লিষ্ট রচনাগুলি ছাড়া সতীর্থদের লেখা বাংলা পত্রাবলী 'উদ্বোধন'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী আমেরিকা থেকে স্বামীজী 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে যে চিঠি লেখেন তা 'বাঙ্গালা ভাষা' শিরোনামে বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা'র ৬ষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। বিবেকানন্দের মৌলিক বাংলা রচনাগুলি শুধু বিষয়ের উৎকর্ষতায় নয়, ভাষার সৌকর্যেও নবযুগের সূচক। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর অভিমত,—'বাঙ্গালা ভাষা স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যেদিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই সেই ভাষাই লোকে কয়... যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাংলাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়ার ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।'[১৪] স্বামীজী কলকাতার ভাষা অর্থাৎ কথ্য-চলিত ভাষাকেই নবযুগের ভাষা রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। যদিও সাধু ও চলিত দুই

গদ্য রীতিতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা-লেখনী দেদীপ্যমান। চলিত ভাষায় তিনি যেমন উদাত্ত প্রাণবন্ত ও বৈদ্যুতিক গতিসম্পন্ন তেমনি সাধুভাষার ভাবগাম্ভীর্যের যথার্থ ধারক-বাহক। শেষ পর্যন্ত চলিত ভাষাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সমকালীন সাহিত্যের প্রবহমানতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ সাধারণের মধ্যে দ্রুত পৌঁছে দেবার তাগিদে। তাই আমরা তাঁকে বলতে দেখি, —'ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাংলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে ভাষার দম কমে যায়। বিশ্লেষণ করে verb-এর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে।'[১৫] এই সঙ্গে সঙ্গেই সাধুভাষা, তৎসম শব্দ বহুল দীর্ঘ বাক্য গঠন ইত্যাদির বিরুদ্ধে লেখেন,—'এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে সেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, কোন কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প-সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।'[১৬]

এই পত্রাংশটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের পর চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস শুরু হয় এবং বিশ বছরের মধ্যে সাধুভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪)-এর যুগ থেকে এই ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর আগে বিবেকানন্দই প্রথম চলিত ভাষাকে সচেতন ভাবে সাহিত্যের আদর্শ ভাষার আসনে বসিয়েছিলেন। হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) তাঁর নক্সায় উত্তর কলকাতার কথ্য যে ককনি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা মননশীল সাহিত্যের ভাষা নয়। আবার পত্র লেখার ভাষাকে আদর্শ করে রবীন্দ্রনাথ যে চলিত রীতিতে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশ করেছেন তাও মননিষ্ঠ নয়। মননিষ্ঠ চলিত ভাষার মাধ্যমে বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনা করে চলিত ভাষার রাজপথটি উন্মোচন করে দিয়েছেন। সেই পথের অন্যতম দিশারী নিঃসন্দেহে প্রমথ চৌধুরী।

স্বামীজীর অনূদিত প্রবন্ধ ও একটি অগ্রন্থিত কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গে ইতি টানবো। স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিক্রমায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসিডোনায় শেক্সপীয়ার সমিতিতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ' বিষয়ে যথাক্রমে ৩১ জানুয়ারী ১৯০০, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯০০ এবং

৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০০ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইংরেজিতে তার অনুবাদ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল চতুর্দশ বছরের নবম, একাদশ, দ্বাদশ ও ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই লস এঞ্জেলসে, 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট' বিষয়ে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ ছাপা হয় পঞ্চদশ বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায়। মধ্যযুগ থেকেই অনুবাদ সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে বাংলায়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। স্বামীজীর লেখা বা বক্তৃতার অনুবাদ এবং আরো কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদ যা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত (এ বিষয়ে পরে আলোচিত হবে) তা প্রবহমান বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে নবতর দ্যুতিময় সংযোজন। স্বামীজীর অগ্রন্থিত প্রবন্ধটির শিরোনাম—'অধিকারি-বাদের দোষ'। বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী ভক্ত-শিষ্যদের কাছে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এটি। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ সেটি লিখে রেখেছিল। পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার 'উদ্বোধন' পত্রিকায় পূর্বোল্লিখিত শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত না হওয়ায় এখন থেকে প্রায় পঁচাশি বছর আগে প্রকাশিত সমাজ জীবনে স্মার্ত বা স্মৃতির পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের যে অপব্যাখ্যা করেছেন সে সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ-মননের অধিকারী স্বামীজী যা জানিয়েছেন তা বর্তমানকালের আগ্রহী-কৌতূহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তার নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি,—'প্রাচীন ঋষিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের দোহাই দিয়া যেভাবে লোকশিক্ষা জনসমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই শিক্ষা প্রণালী আমি বিশেষ আপত্তিকর জ্ঞান করি। ঐ সময় হইতে স্মৃতিকারেরা সর্বদাই 'ইহা কর', 'উহা করিও না' ইত্যাদি রূপে লোককে বিধিনিষেধ দিয়া গিয়াছেন। ...বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাঁহারা কখনই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর।'

॥ ৬ ॥

'উদ্বোধন' পত্রিকার একশো বছরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখযোগ্য যে সকল লেখকদের সন্ধান পাই তাঁরা হলেন সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী জগদীশরানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ,

স্বামী চেতনানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ প্রমুখ এবং সাম্প্রতিককালের বেশ কয়েকজন নবীন সন্ন্যাসী। গৃহীভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) প্রমুখ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, শিল্পী, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (পরমহংস রামকৃষ্ণ), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (অন্ন সমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয়), আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন (ইতিহাসের উপাদান), নলিনীকান্ত গুপ্ত (উপনিষদের সুন্দর), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কথা ও সুর), প্রিয়রঞ্জন সেন (কথামৃত ও রামপ্রসাদ), দিলীপকুমার রায় (কীর্তন ও উচ্চ-সংগীত), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ধর্মশিক্ষা-মণিপুর: পুরাণ সমন্বয় মূর্তি), বিধুশেখর ভট্টাচার্য (ধর্মের ফল), রেজাউল করিম (ধর্ম যায় কিসে?, ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির এক অধ্যায়, ধর্ম সমন্বয়, সাধু), অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি), মহম্মদ শহীদদুল্লাহ (প্রেমের পথে, ঐ সব মূঢ় মূক মুখে দিতে হবে ভাষা), নন্দলাল বসু (ব্যবহারিক শিল্প), খগেন্দ্রনাথ মিত্র (ভগবান রামকৃষ্ণ, বাংলার বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিবাদ, ধর্ম ও সমাজ, প্রাচীন গৌড়বাসীর সমুদ্রযাত্রা), অসিতকুমার হালদার (ভারতশিল্পী, শিল্প ও শিল্পীর মন), ক্ষিতিমোহন সেন (মধ্যযুগে সহজিয়া ও সেবা, সাধু-সন্ত কবীরের গুরুবন্দনা), রমেশচন্দ্র মজুমদার (যত মত তত পথ, যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংস, হিন্দুধর্মের দ্বিগ্বিজয় ও রামকৃষ্ণ), কালিদাস নাগ (রামকৃষ্ণ, রোমা রোলাঁ, ভারতীয় শিল্প জাগরণে বিবেকানন্দ নিবেদিতা অধ্যায়), বিনয়কুমার সরকার (রামকৃষ্ণের কিস্মৎ), বিমানবিহারী মজুমদার (শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা), মোহিতলাল মজুমদার (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা), কৃষ্ণকুমার মিত্র (রামকৃষ্ণ পরমহংস) দীনেশচন্দ্র সরকার (চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ) এস. ওয়াজেদ আলি (হিন্দু-মুসলমানের মিলন, সত্যের পথ), শ্রীঅরবিন্দ (বিশ্বরূপ দর্শন, সাধনা ও প্রেম, ভারতের জাগরণ, শ্রীরামকৃষ্ণ), যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য)।

প্রয়াত স্বনামধন্য উপরোক্ত লেখকবৃন্দের লেখা বৈচিত্র্যপূর্ণ মননশীল প্রবন্ধগুলি (বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত) 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে শুধু সহস্র আলোর দীপনে উদ্ভাসিত করেনি, বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে যুক্ত করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট কবিজনেরা একাধিক কবিতা লিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকার লালিত্যকে যেমন উচ্চকিত করেছেন, তেমনি বাংলা কাব্যসাহিত্যের

শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এঁরা হলেন—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বনফুল, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দিলীপকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ। একালের বিশিষ্ট কবিজনেরাও পিছিয়ে থাকেন নি। এঁরা হলেন অরুণ মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, শান্তি সিংহ প্রমুখ; আর তরুণ প্রতিভাশালী কবিদের মধ্যে ব্রত চক্রবর্তী, প্রমোদ বসু, সুব্রত রুদ্র, মঞ্জুভাষ মিত্র, শ্যামলকান্তি দাস, কৃষ্ণা বসু, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভাবাদর্শ বজায় রেখে একালের কবিজনেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আধুনিক ও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিবর্তনের ধারাটি সুচিহ্নিত করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

এঁরা ছাড়া অনেকেই কবিতা লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে। সেই সমস্ত কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সেকালের মহিলা কবিদের মধ্যে আছেন,—সরলাবালা সরকার, ননীবালা দেবী, অপর্ণা দেবী, অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, শেফালিকা দেবী, বসুধারা গুপ্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময়ী দেবী, ছায়া সরকার, বিভা সরকার, প্রতিভা দেবী, সুষমা দেবী, সুনয়নী দেবী, বেগম সুফিয়া কামাল, ভ্রামরী দেবী প্রমুখ।

'উদ্বোধন'-এ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে মহিলারা পিছিয়ে থাকেননি। এঁদের লেখা প্রবন্ধগুলি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আঙিনাটিকে প্রসারিত করেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অছেন সরলাবালা সরকার (নিবেদিতা, দেবশক্তি-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, যোগিনী মার জীবন নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'সন্ন্যাসিনীর আত্মকথা' ইত্যাদি), সীতা দেবী (ভগিনী নিবেদিতা), আশা দাস (ঔপনিষদিক শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা), শেফালিকা দেবী (মৃত্যু ও অমৃততত্ত্ব), নলিনী ঘোষ (নারী ও সাধনা, মন ও সাধনা), সরলা দেবী (শ্রীমায়ের কৃপা), সুধা সেন (মহাপ্রভু চরণে রূপ-সনাতন), সান্ত্বনা দাশগুপ্ত (ধারাবাহিক প্রবন্ধ—নিবেদিতার সমাজচিন্তা, ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ: ২ পর্বে), রমা চৌধুরী (ধারাবাহিক—দশ বেদান্ত সম্প্রদায়, বেদান্ত ও সূফী দর্শন), আশাপূর্ণা দেবী (রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিকতা, এ যুগের অসুখ, সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা, কিছু ভাবনা কিছু কথা, বর্তমান সমাজ ও শ্রীশ্রীমা—ইত্যাদি), কবিতা সিংহ (শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারী সমাজ, কবি সারদা), বন্দিতা ভট্টাচার্য (ধর্মে ও দর্শনে ভারতীয়

সভ্যতার ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও আমরা, ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প আন্দোলন ইত্যাদি), চিত্রা দেব (জীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, ভারতের স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা), চিত্রা বসু (স্বামীজীর আমেরিকান ভক্ত জোসেফিন ম্যাকলাউড, বিবেকানন্দ বৃত্তে আরেকটি নাম: শ্রীমতী হেল), কণা বসুমিশ্র (আজ নারীজাগরণে শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন প্রয়োজন), বিজয়া চক্রবর্তী (রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুশোক এবং দুঃখ), ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবেকানন্দগত প্রাণ শরচ্চন্দ্র), নীলিমা লাহিড়ী (বৈষ্ণব সাহিত্যে মানবতাবাদ) প্রমুখ। বন্ধনীর মধ্যে প্রবন্ধের নামেই বিষয় পরিস্ফুট।

॥ ৭ ॥

'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাগুলির দিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি প্রসারিত করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ বর্ষের ষোড়শ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি 'মাধুকরী' শীর্ষকে প্রকাশিত হয়। নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা থেকে প্রবন্ধটি আহৃত। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম সমন্বয়ের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে,—'বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।' 'ভারততীর্থ' কবিতার মধ্যে এই কথাই ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। এরপর তিরিশ বর্ষের এগারো সংখ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি লিখে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, সেই 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তেত্রিশ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় 'এশিয়া' পত্রিকা থেকে 'মাধুকরী' শীর্ষকে 'আইনস্টাইন'কে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি চমৎকার। বিশ্বকবি-সাহিত্যিকের চোখে বিশ্ববিজ্ঞানীর স্বচ্ছ-নির্মোহ মূল্যায়ন। আটত্রিশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' শিরোনামের বিখ্যাত কবিতাটি। স্বল্প কথায় অন্তর্লীন ভাবের প্রকাশে ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে বিশ্ববাসীর প্রণতি পৌঁছলো কেন এবং কিভাবে তা অসাধারণ নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। এই কবিতার সঙ্গে সংগতি রেখেই গীতবিতানে 'পূজা' পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস'[১৭] গানটি। তেতাল্লিশ বর্ষের নবম অর্থাৎ শারদীয়া সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় পাতা জুড়ে আর্টপ্লেটে

রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর ছবিও। আসলে এই বছরের (১৯৪১) ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যা 'উদ্বোধন'-এর জন্যই লেখা তা রবীন্দ্রনাথের লেখার ব্লক করে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির কোন শিরোনাম নেই। তবে কবিতাটি পড়ে, জীবনদেবতার উদ্দেশে লেখা তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ কবিতাটি 'পূজা' পর্যায়ের গানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: রবীন্দ্ররচনাবলীতে।[১৮] গান বা কবিতাটি হল—'পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোনখানে/তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।/ কি অচেনা কুসুম গন্ধে / কি গোপন আপন আনন্দে / কোন পথিকের কোন গানে / তোমার পরশ আসে কখন কে জানে? / সহসা দারুণ দুখতাপে/সকল ভুবন যবে কাঁপে / সকল পথের ঘোচে চিহ্ন / সকল বাঁধন যবে ছিন্ন / মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে / তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।'[১৮] এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল স্বামীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যাত সেই অভিমত—

> 'বিবেকানন্দ বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়! ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।'

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে স্বামী অশোকানন্দের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী সম্পর্কিত লেখাটি লিখেছিলেন।

এরপর সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যমণ্ডিত প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাব। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'উদ্বোধন'-এর পাতায়। প্রবন্ধগুলি হল, স্বামী সোমেশ্বরানন্দের 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র', হরপ্রসাদ মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ধারণা', অমূল্যভূষণ সেনের 'শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ', অনিলেন্দু চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্র সাধনায় আত্মবাণীর অগ্রণী ভূমিকা', 'সর্বাস্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ: বিচিত্র সাধনায় ঐকতান', 'রবীন্দ্র সন্দর্শন: বৈচিত্র্য বিরোধ ও উত্তরণ', 'রবীন্দ্র

দৃষ্টিতে শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্র', অরবিন্দ বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ', জ্যোতির্ময় বসুরায়ের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ', সুশীলকুমার রুদ্রের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি। এই প্রবন্ধগুলি বাংলা সমালোচনা সাহিত্য এবং রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

॥ ৮ ॥

আরো যেসব প্রবন্ধ বাংলা মননশীল সাহিত্যের প্রসার ঘটিয়েছে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে তা হল,— আনন্দ বাগচীর 'চরিত্র গঠনে সাহিত্য', 'অমৃত কথন', বলাই দেবশর্মার 'সাহিত্যের ত্রয়ী — বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ', সুধীরচন্দ্র চাকীর 'রামায়ণ থেকে কালিদাস', যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'মুসলমান কবি রচিত চৈতন্যবন্দনা', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শিবদর্শনে', রাধাগোবিন্দ বসাকেব 'শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধুরভাব সাধন', হরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'কোরানে ত্বলাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ', 'কোরানে জকাৎ বা দয়াদাক্ষিণ্য', 'কোরানে প্রার্থনা ও ইহার তাৎপর্য', 'মৌলানা রুমীর প্রেমধর্ম', প্রণবকুমার ভট্টাচার্যের 'গৌড়দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস', দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি', পবিত্র সরকারের 'প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা', স্বামী পরাশরানন্দের 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব', বিমলকুমার দত্তের 'হিন্দুমূর্তির উদ্ভব ও বিকাশ', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মনেমনে', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ', 'ভারত এবং আলবিরুনি', রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তীর 'কবি ভবভূতি ও উত্তররামচরিত', সচ্চিদানন্দ ধরের 'বৌদ্ধ সংঘ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ', প্রণবরঞ্জন ঘোষের 'আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন', 'বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য পত্রিকায় উদ্বোধন', 'পাতা ঝরে পাতা আসে', নিমাইসাধন বসুর 'রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য',[১১] 'জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ', সন্তোষকুমার ঘোষের 'অপেক্ষায় আছি', 'ক্রুশে আর ক্যানসারে কোন ভেদ নেই', শংকর ঘোষের 'উনবিংশ বাংলা সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতি', 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের উষাকাল', 'হাসির ভগীরথ পরশুরাম', শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা গদ্যে মধুসূদনের প্রভাব', সংঘমিত্রা দাশগুপ্তের 'প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাজীবন', অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন: প্রাচীন ও মধ্যযুগ', 'উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন', 'আধুনিক ভারতের প্রথম সমাজ সংস্কারক রামমোহন', 'দারাশুকো-—রাজনীতিবিদ্

ও দার্শনিক', সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের 'বর্তমান সভ্যতার রূপ', উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের, 'রামমোহনের ব্যক্তিত্ব : সাংবাদিক ও লেখক', সীতানাথ গোস্বামীর 'প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের প্রভাব', প্রেমবল্লভ সেনের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সংকট ও সমাধান', কুমুদবন্ধু সেনের 'বাংলা সাহিত্যের আদর্শ ও গতি', রঞ্জিত কুমার আচার্যের 'সূফী সাধনা ও সূফী সাধক', বরুণকুমার চক্রবর্তীর 'টডের রাজস্থান ও বাংলা উপন্যাস', সুবোধ চৌধুরীর 'মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরস', স্বামী অচ্যুতানন্দের 'বুদ্ধ-জীবন', হরিপদ চক্রবর্তীর 'আত্মজিজ্ঞাসা', জীবন মুখোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ-এর মাতৃমূর্তি', উদয়কুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা সাহিত্যে গঙ্গা', তরুণ সান্যালের 'ফরাসী বিপ্লবের দুশো বছর', অনিলেন্দু চক্রবর্তীর 'পয়ারের পদসঞ্চার : ছন্দপাঠ ও কবিতাপাঠ', শিশির করের 'গিরিশচন্দ্রের রাজরোষে নিষিদ্ধ নাটক', সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবনার প্রতিরূপ', নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'নিবেদিতা ও ভারতীয় নাটক', 'শ্রীরামানুজ চরিত ও বাংলা নাটক', 'বুদ্ধ-চরিত : এডুইন আর্নল্ড ও গিরিশচন্দ্র', 'শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র', বিষ্ণুপদ পাণ্ডার 'ওড়িয়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব', দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'দার্জিলিং কালিম্পং-এর লামাদের ধর্ম', দিলীপকুমার দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মদর্শন', 'কৃষ্ণ চিন্তায় নবজাগরণ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য', স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের 'বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', 'সোভিয়েত বিবেকানন্দ অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার', নীরদবরণ চক্রবর্তীর 'বুদ্ধদেবের ধর্ম', 'সমাজসেবার নবরূপ', চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'বাংলার শাক্ত উৎসবের প্রাচীনতা', যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থের 'ভারতীয় আর্য সভ্যতায় নারীর স্থান', স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দের 'ব্রাহ্মসমাজ ও দুর্গাপূজা', অমলেশ ত্রিপাঠীর 'গান্ধী নেহরু ঐতিহ্য ও আধুনিকতা', কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের 'ডেভিড হেয়ার', যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'কেতকদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গল পুঁথির পরিচয়', মহম্মদ শহীদুল্লাহের 'চৌরঙ্গীনাথ', সুখরঞ্জন চক্রবর্তীর 'মহাকাব্য হিসাবে মনসামঙ্গলের স্থান' প্রভৃতি। শেষোক্ত তিনটি প্রবন্ধ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে।

'উদ্বোধন' মননশীল সাময়িক-সাহিত্য পত্র। একশো বছর ধরে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত, ভ্রমণকাহিনীই প্রকাশিত হয়েছে। একটি উপন্যাস ও কয়েকটি গল্প প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির নাম 'ঝালোয়ার দুহিতা'। মীরাবাঈ-এর জীবন নিয়ে গিরিশচন্দ্রের ধর্ম-ইতিহাসমূলক এই উপন্যাসটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় সূচনাকালে ধারাবাহিক

প্রকাশিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন। গল্পগুলি হল—'বাঙ্গাল' (১/১০), 'গোবরা' (১/১১), 'বউ বউ' (১/২০), শরচ্চচন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পের নাম 'দুইটি বন্ধু' (৩/৬), ফরাসী গল্প থেকে অনূদিত কিরণচন্দ্র দত্তের গল্পের নাম 'ক্যারিস্টু' (১/১২), দেবেন্দ্রনাথ বসুর গল্পের নাম—'সন্ন্যাসীর দান' (১৫/৮), চন্দ্রশেখরানন্দের গল্পের নাম 'দুরন্ত' (৩০/৯)। উপন্যাস ও গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না নিলেও সেবাব্রত, নীতিপরায়ণতা, নিঃস্বার্থপরতার দিকটি বড় হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে প্রতিফলিত করে যে গল্প-উপন্যাস লেখা যায়—তা এখানে প্রমাণিত।

সূচনা পর্বের কয়েকটি প্রবন্ধের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন। সিদ্ধেশ্বর রায়ের 'জন্মান্তর', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'আশাবাণী' (১/৫), শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'মনস্তত্ত্ব' (১/৪), প্রবোধচন্দ্র দে'র 'অন্নচিন্তা' (১/৩ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত)—ইত্যাদি বিষয় ভাবনা, চিন্তার গভীরতা ও রচনা নৈপুণ্যে চমৎকার হয়ে উঠেছে। পববর্তী স্তবেব কয়েকটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এগুলি হল—চন্দ্রনাথ দত্তের 'মানবধর্মের ইতিহাস', 'কথা', সতীশচন্দ্র আচার্যের 'ভারতের গৌরবের কাহিনী ও ভাবতের ইতিহাস'। এছাডা সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, মিল, বেন্থাম, স্পেনসারের দর্শনের বিষয় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গে আমরা আগে আলোচনা কবেছি। সূচনা পর্বে, পরবর্তীকালে অনুবাদের মধ্য দিয়ে ধর্ম-দর্শনের ব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনূদিত 'শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্' প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন একটি সভায়, সেই সংস্কৃত বক্তৃতাটি বাংলায় অনূদিত হয়ে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দের ইংরেজি 'রাজযোগ' থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দের বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের পাশাপাশি বিশেষভাবে উল্লেখ্য পণ্ডিত তর্কভূষণের শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার—শংকরাচার্যের ভাষ্যের অনুবাদ (১/৭ থেকে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত), যা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। অনুবাদ বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'বিবেকানন্দষ্টকম্'-এর ও স্বামী বাসুদেবানন্দ অনূদিত বিশিষ্ট ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁন্স-এর 'বুদ্ধবাণী' (ফরাসী ভাষা থেকে) শুধু অনবদ্যই নয় দুই মহাপুরুষের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও প্রণতি নিবেদন।[২০]

॥ ৯ ॥

বাংলা সাহিত্যের দুটি বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে 'ভ্রমণ সাহিত্য' ও 'চরিত সাহিত্য'।[২১] 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী ও চরিত সাহিত্যে সংশ্লিষ্ট শাখা দুটিকে শুধু উজ্জ্বলতর করেনি, তাতে যুক্ত করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

স্বামী শুদ্ধানন্দ দক্ষ অনুবাদকই ছিলেন না, ছিলেন শিল্প-সাহিত্য সচেতন লেখক। তাঁর বহু কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাইতো পরবর্তীকালে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকও হয়েছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের 'আমার তিব্বত ভ্রমণের একটি পরিচ্ছেদ' প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ সাহিত্যের আঙিনায় পৌঁছে গেল 'উদ্বোধন'। এরপর দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে 'উদ্বোধন'-এর পাতায়। উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী ও লেখকদের কথা আমরা এবার তুলে ধরবো। স্বামীজীর 'পরিব্রাজকে'র কথা', শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'দেরাদুন' প্রথম পর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিশীলিত ভঙ্গিতে, ভাব ও ভাষার মাধুর্যে প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনীগুলো হল — স্বামী সুন্দবানন্দের 'ইলোরা ও অজন্তার পথে', স্বামী অপূর্বানন্দের 'কৈলাস ও মানস সরোবর', স্বামী নিরাময়নন্দের 'চেরাপুঞ্জির চিঠি', 'কাবেরীর উৎস মণ্ডলে', সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর 'রামসাগর ভ্রমণ' (দিনাজপুরে অবস্থিত), স্বামী ধর্মেশানন্দের 'মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী', স্বামী দিব্যাত্মানন্দের 'উটিপি ও মূকম্বিকায়', মায়াময় মিত্রের 'চন্দ্রনাথ ভ্রমণ' (আসামে অবস্থিত), অতুলকৃষ্ণ দাসের 'কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'ত্রিপুরাসুন্দরী দর্শন' (দেবীর ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান, পূর্বে কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত), বিষ্ণুপদ পাণ্ডার 'আন্দামানে একমাস', স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'কাবেরীর উৎস সন্ধানে', হীরাবতী দত্তগুপ্তের 'অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে', অমিয়কুমার হাটির 'প্যারিস পেরিয়ে', স্বামী আত্মস্থানন্দের 'ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম', মুক্তি করের 'মধ্য প্রাচ্যের পথে পথে কয়েকটা দিন', 'ইস্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন', সুনন্দা ঘোষের 'মহাভূত মহাতীর্থ' (দক্ষিণ ভারতের বিশেষ কয়েকটি মন্দির পরিক্রমা), স্বামী চেতনানন্দের 'সাগর পারের এক দেবীতীর্থ', স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'পাশ্চাত্যদেশে কিছুদিন', 'সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েকদিন', অজিতকুমার মাইতির 'যুগে যুগে প্রভাস', 'যমুনোত্রীর পথে', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাশী', রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'আলমোড়া যাত্রীর ডায়েরী', 'নর্মদা অমরকণ্টক',

দিলীপকুমার দত্তের 'দেবীতীর্থ জ্বালামুখীর পথে', স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দের 'কুম্ভযাত্রীর ডায়েরী', স্বামী অলোকানন্দের 'তীর্থক্ষেত্র: সহস্রদ্বীপোদ্যান', স্বামী জিতাত্মানন্দের 'মহাশ্বেতা মায়াবতী', স্বামী চৈতন্যানন্দের 'মহাপুণ্যা নর্মদা', স্বামী অচ্যুতানন্দের 'উত্তরকাশীর নচিকেতা-তাল', 'মধু বৃন্দাবনে', জ্যোৎস্না রায়চৌধুরীর 'দেবীতীর্থ কামাখ্যা', স্বামী বিমলাত্মানন্দের 'আলমোড়া ঘুরে এলাম' প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নব্বই বর্ষ পূর্তির পর বর্তমান সম্পাদক ভ্রমণ কাহিনীগুলি 'পরিক্রমা' শীর্ষকে ছবি সহ প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করছেন। সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ কাহিনীগুলি পড়তে পড়তে আমাদেরও মানস ভ্রমণ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ কাহিনীগুলির বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক ভাবমাধুর্যে অবগাহন।

বিবেকানন্দ ছিলেন শিল্প সচেতন, নান্দনিক চেতনার অধিকারী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিক্রমায় তাঁর সেই চেতনা আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল। জীবনের উপান্তে পৌঁছে ভারতীয় শিল্প-কলার নব উত্থান-জাগরণ তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। সমকালীন ভারতীয় নানা শিল্পীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পে নবজাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই বিস্তৃত ইতিহাস আমরা জানি। বিবেকানন্দ প্রবর্তিত পত্রিকা 'উদ্বোধন'-এ শিল্পকলা নিয়ে প্রবন্ধ-আলোচনা থাকবে না, তা কি হয়! হয় না বলেই 'উদ্বোধন'-এর পাতায় শিল্পকলা নিয়ে বিশিষ্ট শিল্পীদের, ইতিহাসবেত্তার যে সকল লেখালেখি বেরিয়েছে তা বিগত একশো বছরে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বেরোয় নি, একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি। সেই লেখাগুলি এ প্রজন্মের শিল্পীদের চলার পথের দিশারী। আমরা এবার লেখাগুলির দিকে ফিরে তাকাব। লেখাগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু', বন্দিতা ভট্টাচার্যের 'ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্প আন্দোলন', কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর 'ভারতীয় চিত্র-শিল্পকলায় যামিনী রায়', রঘুনাথ গোস্বামীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-শিল্পী নন্দলাল', রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পকলায় আচার্য নন্দলাল', 'আচার্য নন্দলাল ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ', বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনের 'জীবনশিল্পী আচার্য নন্দলাল', 'শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ', 'শিল্পী অসিতকুমার হালদার', গৌতম হালদারের 'শিল্পী অসিত হালদারকে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি' (অসিত হালদারের প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে, পূর্বে উল্লেখিত), কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের 'বাংলার বাস্তু শিল্পে পোড়ামাটির কাজ', 'ভারতীয় ভাস্কর্যে নটরাজ' প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক বড় পরিচয়, তিনি লোকশিল্পী। গ্রামীণ জীবনে লোকসংস্কৃতির নির্যাস নিয়ে তাঁর এগিয়ে চলা। রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রসারে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। 'উদ্বোধন' পত্রিকার নব্বই-এর দশক থেকে গুরুত্ব দিয়ে 'লোকসংস্কৃতি' বিষয়ক প্রবন্ধ নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছে। আগেও বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধগুলি হল — অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া', কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর 'বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী প্রসঙ্গ', সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকসংস্কৃতি' প্রভৃতি।

॥ ১০ ॥

'উদ্বোধন'-এর সূচনা পর্বে 'সম্পাদকীয়' (যা এখন 'কথাপ্রসঙ্গ' রূপে সর্বজনবিদিত, তা লেখা হত না। থাকতো স্বামী ব্রহ্মানন্দের লেখা 'পরমহংসদেবের উপদেশ'।) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। দশম বর্ষের একাদশ সংখ্যা থেকে ছাপা হয় ধারাবাহিক ভাবে স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আগে স্বামীজীর লেখাই প্রাধান্য পেয়েছে। আগে সে কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এবার অনুল্লেখিত স্বামীজীর লেখাগুলির সঙ্গে পরিচিত হব। 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধটি দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় বার হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারী আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা পত্রটি সূচনা প্রবন্ধ রূপে ঐ নামে ছাপা হয়। 'প্যারিস প্রদর্শনী' ('ভাববার কথা' সংকলনে 'প্যারি প্রদর্শনী' নামে প্রকাশিত) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের বিংশ সংখ্যায়। 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায়। 'গাই গীত শোনাতে তোমায়' কবিতাটি প্রকাশিত হয় পঞ্চম বর্ষের নবম সংখ্যায়। স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা ছাড়া স্বামী শুদ্ধানন্দ ইংরেজি নানা রচনার অনুবাদ করে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করেন। অনূদিত রচনাগুলির মধ্যে আছে — 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'বহুত্ব ও একত্ব', 'কর্মজীবনে বেদান্ত', 'পত্রাবলী', 'জ্ঞানযোগ' (ধারাবাহিক ২/১৬ থেকে) ইংরেজি কবিতা 'Song of the Sannyasin', থেকে 'সন্ন্যাসীর গীতি' (২/১৭) নামে প্রকাশিত। 'ভারতীয় রমণী' প্রবন্ধটিও ইংরেজি থেকে অনূদিত। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় সংশ্লিষ্ট রচনাগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়। আমরা উল্লেখযোগ্য, সমধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলির নামই কেবল উল্লেখ করব। প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকেরা হলেন—স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'মানুষ বিবেকানন্দ', 'ভারত সভ্যতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ', স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আলোকে সংগীত', স্বামী গম্ভীরানন্দের 'অবতারবরিষ্ঠ', স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের 'বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ', স্বামী ভূতেশানন্দের 'স্বামী বিবেকানন্দ: বিশ্বশান্তি ও আধুনিক বিজ্ঞান', রেজাউল করিমের 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দান', নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংগীতে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও উদ্বোধন পত্রিকা', 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনী: বঙ্গরঙ্গমঞ্চ', 'প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ: নাটক বিল্বমঙ্গল', 'বাংলা নাট্য সাহিত্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধাবা', 'উনিশ শতকের নারীসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ', জলধিকুমার সরকারের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী', 'হিন্দু সমাজে জাতিভেদ সম্পর্কে স্বামীজীব অভিমত', 'স্বামীজীর ইসলাম প্রীতি', শংকরীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ মন্দির', 'বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী', 'সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ', সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ', সান্ত্বনা দাশগুপ্তের 'কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ: আধুনিক মননে ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে', হোয়ায় জিন্ চু-আনের 'চীনের জনগণ স্বামীজীকে ভুলতে পারে না', প্রণবরঞ্জন ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও শ্রীবামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার', 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যে হাস্যরস', 'বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ' 'বিবেকানন্দ সাহিত্যে হাস্যরস', অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত: ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে', 'শিক্ষাবিদ্ বিবেকানন্দ', 'স্বামী বিবেকানন্দের অবদান' 'রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমাদের প্রয়োজন কেন', অমিয়কুমার হাটীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধুনিক বিজ্ঞান', ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা কাব্যসাহিত্যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ', জ্যোতির্ময় বসুরায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও উইলিয়ামস্', আবুল হাসানতের 'বিবেকানন্দের ইসলাম ভাবনা', ইন্দিরা গান্ধীর 'স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ', 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে', শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দ দর্শনে মানবসত্তা ও মানবিকতাবাদ', অরুণকুমার বিশ্বাসের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ী: কিছু অপ্রকাশিত তথ্য', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আলোকে বাংলা সাহিত্য', গোবিন্দগোপাল

মুখোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ', ই. পি. চেলিশেভের 'বিবেকানন্দ চর্চা : মানবজাতির সেবাস্বরূপ', এ. পি. ন্যাচুক দানিলচুকের 'বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন জীবন দর্শন : একটি নতুন বেদান্ত', সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গিরিশ সাহিত্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ', অনিলকুমার চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে কবিত্ব', তারকনাথ ঘোষের 'যুগধর্ম : শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য', রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে শিল্পী নন্দলাল বসু', স্বামী আত্মস্থানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ : এক নতুন ধর্মের প্রবক্তা', তামসরঞ্জন রায়ের 'স্বামীজী ও গান্ধীজী', এ. এল. ব্যাসমের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বশান্তি', স্বামী প্রভানন্দের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে কাশীপুর উদ্যানবাটীর তাৎপর্য', অমিয়কুমার মজুমদারের 'সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র', নীহার মজুমদারের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন', পরিমলকান্তি দাসের 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে রমণী', প্রণবেশ চক্রবর্তীর 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত', উদয়কুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা ভাষা : বিবেকানন্দের গদ্য', ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষালের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারীসমাজ', নির্মলকুমার রায়ের 'পুরোনো কলকাতার পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ', নিশীথরঞ্জন রায়ের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা', পূর্বা সেনগুপ্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ : এক নতুন অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা', বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দের নান্দনিক ভাবনা', হরপ্রসাদ মিত্রের 'বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যতা', স্বামী সোমেশ্বরানন্দের 'স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা : নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা', সুকুমার সেনের 'স্বামীজীর বাংলা রচনা', প্রেমবল্লভ সেনের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে নবযুগের বাণী' প্রভৃতি।

এই তালিকায় কে নেই? আছেন দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের বিদগ্ধজন; বিষয় বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে নেবেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

'চরিত-সাহিত্যে'র কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। চরিত-সাহিত্যের মধ্যে নানা বিভাজন আছে। আত্মচরিত (Autobiography), জীবনচরিত (Biography), সাধু-সন্তের জীবনী (Hagiography), স্মৃতিকথা (নিজের বা অন্যের সম্পর্কে Memoirs)। স্বামী সারদানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'কে Hagiography বা সাধু-সন্তের জীবনী রূপে চিহ্নিত করা হলেও তার মধ্যে সমগ্র যুগের ছবিটি উদ্ভাসিত। 'উদ্বোধন'-এর পাতায়

রামকৃষ্ণানন্দের 'রামানুজচরিত' প্রথম পর্বে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা জীবনচরিত রূপে এটি একটি অনবদ্য রচনা। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের নিয়ে, শ্রীমা সারদাদেবীকে নিয়ে নানা 'স্মৃতিকথা', 'উদ্বোধন'-এর পাতায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট স্মৃতিকথাগুলি পড়তে পড়তে আমরা চিন্ময়লোকে পৌঁছে যাই। তিনটি স্মৃতিকথা যা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের বিশেষভাবে নাড়া দেয়—ক) স্বামী শুদ্ধানন্দের 'স্বামীজীর অস্ফুটস্মৃতি', খ) স্বামী ধর্মানন্দের 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি', স্বামী অন্নদানন্দের 'অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতি'।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রথম থেকেই স্বামীজীর অভীপ্সা অনুযায়ী তা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই আলোচনায় অন্যান্য অনেক লেখা ও লেখকের নাম উল্লেখ করা গেল না সেজন্য দুঃখিত। সাম্প্রতিক কালের লেখাগুলিও আলোচনাতে বাদ রেখেছি কারণ সে বিষয়ে পাঠকেরা অবহিত।

॥ ১১ ॥

নব্বই বছর অতিক্রম করার পর 'উদ্বোধন' পত্রিকাব আঙ্গিকের পবিবর্তন ঘটেছে। প্রচ্ছদপট থেকে 'অন্তর্পটে'র পরিবর্তনের শত-সহস্র স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন নবীন সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (এত কম বয়সে আগে বোধহয় কেউ সম্পাদক হন নি)। প্রসঙ্গক্রমে আমরা প্রথম বর্ষ থেকে শতবর্ষে পদার্পণ পর্যন্ত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকের নাম ক্রমপরাম্পরায় তুলে ধরছি। এঁরা হলেন—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক), স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দ (ব্রহ্মচারী নির্মল—যুগ্ম ভাবে), স্বামী সারদানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ (ব্রহ্মচারী বিমল) ও স্বামী গঙ্গেশানন্দ (ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য—তিনজনে একত্রে), স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ (যুগ্মভাবে), স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ (যুগ্ম ভাবে), স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ (যুগ্ম ভাবে), স্বামী সুন্দরানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী ধ্যানানন্দ, স্বামী অজজানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

'মুদ্রণ বিপ্লবের সাহায্য গ্রহণ করে 'উদ্বোধন' সমকালীন প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে গিয়ে লণ্ডন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যে চিঠি (১০ আগস্ট ১৮৯৯)

লিখেছিলেন, তাতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক-পাঠকের, লেখকের অভাব এবং আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন। শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা আজ নতুন যৌবনে সজ্জিত। গ্রাহক সংখ্যা চল্লিশ হাজার। পাঠক সংখ্যা কম করে দু' লক্ষ। নানা বিষয়ে লেখবার জন্য লেখকেরা 'উদ্বোধন'-এর দপ্তরে হাজির। বিদগ্ধ লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, নানা শাখা কেন্দ্রের বিভিন্ন সংবাদ এবং সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের পল্লবিত সংবাদের প্রকাশ 'উদ্বোধন' পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। বিষয়বৈচিত্র্য পাঠকদের কাছে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রজ্ঞা ও মননের পাশাপাশি বিশুদ্ধ হালকা হাসি। স্বামীজীর আদর্শে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরোজা আরো বেশি খুলে গিয়েছে। অর্থ সংকটের সমাধান শুধু হয় নি, তৈরি হয়েছে ভারী অঙ্কের অর্থের বিশেষ তহবিল—আপৎকালীন প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। বেড়েছে কর্মী সংখ্যা, বেড়েছে তাঁদের সুযোগ-সুবিধা, চালু হয়েছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম্পিউটার। ভারতবর্ষের নানা স্থানে গ্রাহকভুক্তির কেন্দ্র খোলা[২১] হয়েছে। পত্রিকার ভাষা, বানানবিধিতে লেগেছে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত আধুনিকতার ছোঁয়া। স্বামীজী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন,—'এই পত্রের ভাব ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।'[২২] শতবর্ষে 'উদ্বোধন' ভাব, ভাষা, এক কথায় বলতে গেলে সবদিক থেকে 'নূতন ছাঁচে' গড়ে, হয়ে উঠেছে তিলে তিলে তিলোত্তমা। স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল, বিনা পয়সায় সকল মানুষের কাছে 'উদ্বোধন' পৌঁছে দেবেন লক্ষাধিক সংখ্যা ছেপে। স্বামীজীর সেই অভীপ্সা এখনো পূর্ণ হয় নি ঠিকই, তবে গ্রাহকদের কাছ থেকে যে অর্থ বর্তমানে নেওয়া হয় তা সাম্প্রতিককালে চালু প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্র-পত্রিকার থেকে অনেক কম। তবে লক্ষাধিক সংখ্যা এখনও ছাপা না হলেও যেভাবে দ্রুত 'উদ্বোধন' পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়ছে তাতে আগামী দিনে স্বামীজীর সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে—এটা আমাদের বিশ্বাস। রামকৃষ্ণ সংঘের স্থায়িত্ব সম্পর্কে স্বামীজীর অভীপ্সা বাস্তবায়িত যেমন হবে, তেমনি 'উদ্বোধন' পত্রিকাও সমান তালে এগিয়ে যাবে। এখন অপেক্ষা শুধু সময়ের।[২৩]

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. পত্রাবলী, অখণ্ড, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা—১২২, পৃ: ১৯৫–১৯৬
২. ঐ, পত্রসংখ্যা ২৫৭, পৃ: ৪২৩–৪২৪
৩. বাঙ্গলা ভাষা, ভাববাব কথা, বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯, ১৩৯৬
৪. স্বামি শিষ্য সংবাদ, ১৪০০, পূর্বকাণ্ড, বিংশ বল্লী, পৃ: ১২১
৫. বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯
৬. বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮
৭. বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৭
৮. ঐ, পৃ: ২৪
৯. ঐ, পৃ: ২৯
১০. সাহিত্য, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিশ্বভাবতী, ১৩৮১, পৃ: ১৯-২০
১১. ঐ, পৃ: ৯২
১২. ঐ, পৃ: ১১৫
১৩. পত্রাবলী, অখণ্ড, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা ৪৪৩, পৃ: ৬৫৬-৬৫৭
১৪. বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯
১৫. স্বামি-শিষ্য সংবাদ, পৃ: ১২২
১৬. বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০
১৭. ববীন্দ্র বচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্কবণ, ১৩৬৮ পশ্চিমবঙ্গ সবকাব, পৃ: ১৬৯, সংগীত সংখ্যা—৫৫৭
১৮. তদেব, পৃ: ১৭৪, সংগীত সংখ্যা ৫৭২
১৯. সাম্প্রতিক কালে নয, ৮৮ তম বর্ষেব ১ম সংখ্যায প্রকাশিত, পৃ: ২৪
২০. বন্ধনীব মধ্যে বর্ষ ও সংখ্যা উল্লিখিত।
২১. বাংলা চবিতসাহিত্য বা জীবনীসাহিত্যেব সূত্রপাত মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র কবে।
২২. স্বামি শিষ্য সংবাদ, পৃ: ১২২
২৩. বামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত অন্যান্য ভাষাব পত্র-পত্রিকাব তালিকা সংগৃহীত হযেছে বামকৃষ্ণ মিশনেব বার্ষিক কার্যবিববণী থেকে। প্রথম থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত 'উদ্বোধন' পত্রিকা দেখাব সুযোগ পেয়েছি উদ্বোধন কার্যালয়েব গ্রন্থাগাব এবং বামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অফ কালচাবেব গ্রন্থাগাব থেকে।

রামকৃষ্ণ মিশন : ইতিহাসের একটি পর্ব ও পর্বান্তরের ইতিহাস

রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষে পৌঁছেছে। ছড়িয়ে পড়েছে তার অসংখ্য ডালপালা সারা বিশ্ব জুড়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষে পদার্পণ নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় আলোকোজ্জ্বল আলপনা। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসেই বা কেন, পৃথিবীর ইতিহাসেও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষে বহুমুখী কর্মধারায় প্রসারিত এমন আর দ্বিতীয় সংঘ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ খণ্ডিতভাবে দেশের মধ্যে স্বল্প আয়তনে কিছু সেবা কাজ এবং সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছে কিন্তু 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর জন্য সুপ্রাচীনকালে যেমন বৌদ্ধ সংঘ-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, একালে তারই যুগোপযোগী আধুনিক প্রতিষ্ঠান হলো রামকৃষ্ণ মিশন। বৌদ্ধ সংঘ আজ ক্ষয়িষ্ণু ও ইতিহাসের ধূলি ধূসরিত পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা প্রায় ম্লান হয়ে গেছে। মানুষের 'হিতার্থে' গৌতম বুদ্ধের ধ্যান-ধারণায় আত্মস্থ হয়ে, প্রাচ্যের প্রমিথিউস বিবেকানন্দের উদ্যোগে ও নিরলস প্রয়াসে 'আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ', উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতে ও বহির্ভারতে। যদিও এই রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্গাতা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং এই মিশনের আলোকবর্তিকা শ্রীমা সারদাদেবী, আমরা আগেই তা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। পরিশেষে পৌঁছে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শতবর্ষ অতিক্রান্ত রামকৃষ্ণ মিশনের মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি স্বভাবতই অনিবার্য হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিগত একশো বছরের নানা দিক নিয়ে যেমনই আমরা আলোচনা করেছি, তেমনই সাম্প্রতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সাফল্য

কতটা ভারতীয় জনজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি রূপরেখা নানা তথ্যের মাধ্যমে আমরা তুলেও ধরেছি। কিন্তু শতবর্ষ আগে যে লক্ষ্য সামনে রেখে রামকৃষ্ণ মিশন তার অভিযাত্রা শুরু করেছিল, শতবর্ষ পরে সেই অভিযাত্রায় ভারতবর্ষের মানুষ কতটা সামিল হতে পেরেছে এবং কতটা পারেনি তার দিকে এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাব। প্রথমে দুটি কথা আমাদের বলে নিতে হবে। প্রথমত—বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেলেও, এই ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি ছিল বিবেকানন্দের প্রথম এবং প্রধান ধ্যান ও জ্ঞান। তাই ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আমরা শতবর্ষ উত্তীর্ণ পর্বান্তরের প্রেক্ষাপটে আলোচনার মুখটা ঘুরিয়ে দেব। দ্বিতীয়ত—রামকৃষ্ণ মিশনের বাস্তবিক রূপকার ও প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের অভীপ্সা ও তার বাস্তবায়নের সদিচ্ছা-অনিচ্ছার বলয়টি পরিপূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়েই সংগঠিত হবে পর্বান্তরের এই মূল্যায়ন।

আর এ মূল্যায়নে ব্রতী হতে হবে শতবর্ষ পূর্বের দিনগুলির সঙ্গে বর্তমানের সংযুক্তিতে। রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ নাম দুটি সম্পূরক। বিবেকানন্দের জীবনটা বড় বেশি রক্তাক্ত। বাস্তবের সেই রক্ততটে রামকৃষ্ণ মিশনের পথ চলা ও পল্লবিত প্রসার।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ রক্তাক্ত চরণে পথ হেঁটেছেন এই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এ যেন পায়ে পায়ে জরিপ করা। বিবেকানন্দ একশো বছর আগে এই ভারতে যা দেখেছেন দু' চোখ ভরে, যা অনুভব করেছেন হৃদয় জুড়ে, যা শুনেছেন নির্মমে-কোমলের সংযুক্তিতে, তা থেকে একশো বছর পরের ভারতবর্ষের ছবিটা খুব বেশি পাল্টেছে কি? তিনি দেখেছিলেন আত্মবোধহীন, আত্মবিশ্বাসহীন সাধারণ মানুষ-জনেদের, দেখেছিলেন অশিক্ষিত, নিরক্ষর ভারতবাসীদের, দেখেছিলেন জাতীয়তাবোধহীন বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে, মানবিকতার চরম অপমানকে, ধর্মের নামে বেহিসেবী শোষণকে।

বিবেকানন্দের রক্তাক্ত চরণে দেখা, অনুভব করা, হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে প্রবাহিত একশো বছর আগের ভারতবর্ষের সাযুজ্যই আজকে আমরা শুধু প্রত্যক্ষ করি না, বরং আরো বেশি অবক্ষয়ের শত চিহ্ন নিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এই ভারতবর্ষ খণ্ডিত ভারতবর্ষ।

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দ সেদিন দেখেছিলেন যে আত্মবিশ্বাস আত্মবোধহীন বৃহত্তম মানব সমাজকে—আজকের ভারতবর্ষেও সেই ছবি হারিয়ে যায়নি; বরং তা আকারে-প্রকারে বেড়েছে। সেদিন একদিকে আংশিক নবজাগরণ, অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহ উত্তরকালের মানুষের মনোবল-আত্মবিশ্বাসকে বাড়ায় নি; বরং দুর্বল করেছে, ভাবের ঘরে করেছে আবদ্ধ।

তারই প্রমাণ প্রায় দুশো' বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাগপাশে আবদ্ধ ভারতবর্ষ। তাই সিপাহী বিদ্রোহের পর নব্বই বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে। এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান অপরিসীম। সেকথা আগে বিশদ ভাবে আলোচিত। ১৯৪৭-এ রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। আসলে, তুর্কী আমল (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির শাসনে-শোষণে দীর্ঘ সাড়ে সাতশো' বছর শৃঙ্খলিত থাকায় ভারতবর্ষের মানুষের আত্মসম্বিৎ লোপ পেয়েছে, আত্মসচেতনতার পথ থেকে বহু যোজন ব্যবধান তৈরী হয়েছে। আদর্শায়িত জীবনবোধের পথের পথযাত্রী হতে পারেনি তারা। তাই শাসনে শোষণে, নিপীড়নে, অত্যাচারে এবং বিদেশি শক্তির দাসত্বে তাদের মেরুদণ্ডটি গিয়েছে ভেঙে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর আগেই বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন আদর্শ মানুষ যারা, তারা একাধারে হবে দেশের-দশের জন্য বলি প্রদত্ত। বজ্রের ন্যায় দৃঢ় চিত্তের অধিকারী, অকপট চরিত্রবান মানুষের জন্যে তাঁর কণ্ঠে আর্তি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছে। তিনি 'মানুষ' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, 'মান' আর 'হুঁস' নিয়ে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠা এবং মানুষ হয়ে ঐ অন্ত্য নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আর এই জন্যেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন ১৮ থেকে ২৫ বছরের যুবকদের উদ্দেশে। কেননা তারাই তো শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'কাঁচা দুধ' অর্থাৎ নিরাবৃত্ত সত্তার উজ্জ্বল উচ্ছল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নতুন যৌবনের দূত'। এই যুবকদের বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 'বহু' সংখ্যায়। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেশ কিছু যুবক দেশমাতৃকার জন্যে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করেছে। আর স্বল্প সংখ্যক যুবক সংসার পরিজন প্রিয়জন ছেড়ে মানব হিতার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাঙ্খিত পথটিকে করেছে প্রশস্ত।

এই স্বল্প সংখ্যক যুবকদের সংগঠিত করেই রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হয়েছিল। পথ যেমন পথের হদিশ দেয়, কাজও দেখিয়ে দেয় তার বহুমুখী রূপটিকে। একদিকে মানবসেবা, অন্যদিকে ঐ পিছিয়ে পড়া মানুষদের সচেতন করা ও স্বনিভর আর্থিক বনিয়াদ গড়ে দিয়ে জীবনের মূলস্রোতে সামিল করার প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষার আলোটি তাঁরা অনির্বাণ রেখেছেন। ১৯০২-এ বিবেকানন্দের তিরোধানের পর রামকৃষ্ণ মিশনের পথ চলা থেমে যায়নি বরং রামকৃষ্ণ পার্ষদ ও বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগত যুবক এবং গৃহী-ভক্ত-অনুরাগীদের সম্মিলিত চেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশন বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে পাশ্চাত্যের নানা দেশে পৌঁছে গেছে তাদের অঙ্গীকার নিয়ে। এ প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত আলোচনা কবেছি আগের পনেরোটি পবিচ্ছেদে বিভক্ত প্রবন্ধগুলিতে।

স্বর্ণবিভায় শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্ণ মিশন সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নজির সৃষ্টি কবেছে, তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলতে হবে সীমায়িত পবিসরে এ এক অপরিমেয় প্রয়াস।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন — রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর তার বাস্তবায়নে নিরলস প্রয়াসী হলেও আরো বহু যুবকের, আরো বহু মানুষের সদর্থক উপস্থিতির অভাবে, যে ব্যাপক প্রসারের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দ তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং স্বাধীনতা পূর্বকালে একদিকে ব্রিটিশ রাজরোষ বহ্নির কবলে পড়েছে রামকৃষ্ণ মিশন, অন্যদিকে স্বাধীনোত্তরকালে স্বল্পসংখ্যক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর মাধ্যমে অগণিত সমস্যার সমাধানে, জাতীয় চেতনার সম্প্রসারণে ও মানুষের ইপ্সিত লক্ষ্যে উত্তরণের পথে রামকৃষ্ণ মিশন আরো ব্যাপক ভূমিকা নিতে পারেনি। এই না পারার অন্যতম আরো একটি বড় কারণ স্বাধীনোত্তরকালের মানুষজনেদের বিভ্রান্ত করার যে অপপ্রয়াস নানা দিক থেকে চলেছিল তা আজও অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক কালে প্রগতিশীল নানা আন্দোলন, স্লোগান, মিটিং, মিছিল দেখছি প্রতিদিনই। এখন প্রশ্ন — তবে কেন যুবকের দল বিভ্রান্ত, নৈরাশ্যের শিকার, ড্রাগের নেশায় আসক্ত? এ প্রসঙ্গে কেউ বলবেন বেকারী, দারিদ্র্য; সেটা বাস্তব সত্য, কিন্তু সমীক্ষা করলে দেখা যাবে চাকুরীহীন অপেক্ষা চাকুরী করা যুব সমাজ সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত অন্ধকাধে — অবক্ষয়ে।

অভিজ্ঞতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সদ্য চাকুরী পাওয়া একজন যুবক নীতিবোধ আত্মবোধ বিস্মৃত হয়ে উৎকোচ নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন অবাক হতে হয় এই ভেবে যে প্রশাসনিক সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে কঠিন আইন ভাঙা হচ্ছে কত সহজে! একশো বছর আগে মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, করণিকেরা এইভাবেই উৎকোচ নিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে, ফুলে ফেঁপে ওঠা জমিদার, ইজারাদারেরা প্রজা শোষণের অর্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় বিশাল অট্টালিকা বানিয়ে ছোট-বড় ইংরেজ শাসকদের অর্থবিত্ত দিয়ে, মদ্য পান করিয়ে, বাঈজী নাচের আসর বসিয়ে, নানা উৎসবে নিমন্ত্রণ করে এনে, নাট্যাভিনয়ের আসরে নিয়ে আসতেন খেতাব পাওয়ার আশায়; অর্থাৎ 'প্রিন্স' 'রাজা', 'রায়বাহাদুর', 'স্যার'—ইত্যাদি খেতাবের জন্য তাঁদের আয়োজন, উপকরণ ও খোশামদের শেষ ছিল না। আজকেও এই প্রাপ্তির আশায় বিভোর সরকারী বে-সরকারী সর্বস্তরে উঁচু মহলে, উৎকোচ আদান প্রদানের কথাতো প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে, নীচু মহলের ঘুণ ধরা ছবিটা না হয় বাদই দিলাম। আত্মবোধহীনতা থেকে এই সব দুর্নীতি জন্ম নেয়। সেকালেও নিয়েছে, একালে তার শাখাটি পল্লবিত হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা তাই হারিয়ে গেছে—এর কারণ আত্মবিশ্বাসহীনতা। পণপথার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হয়ে কত যুবতীকে নবপর্যায়ে সতীদাহের শিকার হতে হয়েছে এবং হচ্ছে—তার হিসেব পুলিশের নীল খাতায় সবটা নেই।

বিবেকানন্দ তাই বারবার বলেছেন আত্মবোধের জাগরণ চাই; আত্মবিশ্বাসী মানুষ চাই—শুধু আত্মবিশ্বাস নয়, তিনি এই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন একটি অসাধারণ উষ্ণ উত্তাপবাহী বিশেষণ। 'অগ্নিময় আত্মবিশ্বাস', যে আত্মবিশ্বাসে, আত্মবোধের জাগরণে প্রমিথিউসের শৃঙ্খল ছিঁড়ে গিয়েছিল।

জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম-উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকোপ বেশি। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবাদও মাথাচাড়া দিচ্ছে। উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, বিন্ধ্যাচল, গোর্খাল্যাণ্ড, উদয়াচল—এইসব রাজ্য গঠনের দাবী উঠছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের সার্বিক চেহারাটি, সমস্যার শিকড়টিকে না জেনে, না বুঝে, না দেখে সংবাদপত্রে, আকাশবাণীতে, দূরদর্শনে বিবৃতি দিচ্ছেন। সমগ্র ভারত পরিক্রমা তাঁদের কাছে বিলাস যাত্রা। যদিও মাঝেমধ্যে মানবশৃঙ্খল,

সম্ভাবনা যাত্রা—ইত্যাদির কথা শোনা যায়; কিন্তু এগুলির কোনটিই কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি, কণ্টকিত সমস্যা সমাধানের মর্মমূলে ঢেউ তুলতে পারেনি। একটা উপব-উপর, ভাসা-ভাসা লোক দেখানো গোছের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবেকানন্দের অসংখ্য বিদ্রোহী উক্তিতে মিশে আছে একদিকে শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের উত্থান অর্থাৎ শূদ্র জাগরণের কথা, মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি 'প্রলেতারিয়েত রেভেলিউশন'। আরেকদিকে জাতীয় সংহতির অমোঘ বাণী এটি। দেশের বৃহত্তম একটি অংশকে দারিদ্র্য-বঞ্চনার মধ্যে রেখে দেশ কখনও শক্তিশালী হতে পারে না; বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দেবেই। এটা যেমন স্বামীজী বোঝালেন, তেমনি জাত-পাতের ভিত্তিতে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখলে, সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করলে স্বতন্ত্র অবস্থানের দাবী উঠবেই, একথাও প্রতিধ্বনিত করলেন। সংহতির আরেকটি মূল কথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকা। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। আজকে এ দুটিরই অভাব। তাই বারে বারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভিজে যায় ভারতের মাটি। বিবেকানন্দ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সম্মিলন। তাই দেখি আলমোড়া থেকে নৈনিতালের মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে চিঠিতে লিখেছিলেন—'এই জন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মে পরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে[১]।' এটুকু লিখেই বিবেকানন্দ থেমে গেলেন না—তিনি আরো লিখলেন—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ঐশ্লামিক শরীর সমন্বিত হলে সুদৃঢ় ভারত গড়ে উঠবে। এখন থেকে একশো বছর আগে বিবেকানন্দ জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন, অথচ আজও আমরা তার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারলাম না। তাইতো বারে বারেই রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ভারতের মাটি। একই সঙ্গে অন্ত্যজ গোত্রের মানুষদের, গান্ধীজীর কথায় যাঁরা 'হরিজন', তাঁদের উচ্চবর্ণের মানুষেরা জীবন্ত পুড়িয়ে মারছে, নানা অধিকার থেকে করছে বঞ্চিত। এটিও একটি জ্বলন্ত সমস্যা।

সংহতি রক্ষায় শ্রদ্ধাশীলতা একটি বড় বিষয়। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা

জানাচ্ছেন—'স্বামীজী মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না যে, মুসলমানগণের এদেশে অধিকার বর্তমান। তাহার অন্যতম কারণ হইল মুসলমান কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও রাজ্যশাসন পদ্ধতি গ্রহণ। নীচবংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কেবল উচ্চ সামাজিক অধিকার প্রদান পূর্বক উন্নত করা নহে, পরন্তু এই অতি শান্ত জাতির মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার জন্য এবং বাধা প্রদানের প্রচেষ্টা এই উভয় আদর্শের সংরক্ষণ ও উন্নয়ণ দ্বারা তাহারা যে উপকার সাধন করিয়াছে, তাহাও স্বামীজীর নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না।'[২] নিবেদিতার সূত্রে আমরা আরও জানতে পারছি বিবেকানন্দ সম্রাট আকবরের প্রশংসা করতেন বিশেষভাবে, সাজাহানের শৈল্পিক মানসিকতা বিবেকানন্দকে বিস্মিত করেছিল। তিনি তাজমহল দেখে মোগল স্থাপত্যের শিল্পরীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সিরাজদৌল্লার কথাও বারে বারে তিনি উল্লেখ করতেন। এই শ্রদ্ধাশীলতার অভাবই আমাদের জমাট অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিবেকানন্দের শ্রদ্ধাশীলতা কতটা উঁচুতে অবস্থান করত এবং তা কতটা স্বচ্ছ ছিল তা আমরা বুঝতে পারি তিনি যখন বলেন, এ ভারতবর্ষ সকলের—হিন্দুর, মুসলমানের, আর্যের-অনার্যের—যে নিজেকে ভারত ঐতিহ্যেব সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পেরেছে—এ ভারতবর্ষ তাদের সকলের।

জাতীয় সংহতির প্রসঙ্গে আরেকটি বড বিষয় হল—দেশপ্রেম। আজকের দিনে যা উধাও হয়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে ভারতবর্ষের নামটি ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় বিবেকানন্দ হলেন ভারত আত্মার প্রতীক। আর রোমা রোলাঁকে তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষকে চিনতে জানতে বুঝতে হলে বিবেকানন্দকে পড়ুন।' আসলে বিবেকানন্দের কাছে এই ভারতভূমি ছিল—'যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী', তাই অগ্নিদীপ্ত দেশপ্রেমের হাজারো দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি।

॥ ৪ ॥

একটা প্রশ্ন নানাভাবে আমাদের 'নাডা দিচ্ছে। সন্ন্যাসীর কি কোন দেশ আছে? সকল দেশইতো তাঁর দেশ। তাইতো তিনি 'বিশ্বনীড়মের' স্বপ্ন দেখেন, ওয়ালর্ড আইডেনটিটির কথা বলেন। নিউইয়র্ক থেকে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে ১৮৯৪-এর ১৮ নভেম্বব যে চিঠি বিবেকানন্দ লেখেন তাতে ভারতের অবনতির কারণগুলো তুলে ধরেন আর বিশ্ববাসীর

সঙ্গে ভারতীয়দেব অবাধ মেলামেশার প্রসঙ্গটি উচ্চারণ করেন।[৩] এই সূত্রে আমরা শুনতে পাই তাঁর বিশ্বসত্তার প্রতি প্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণাকে —'আমি কি শুধু ভারতবর্ষের? না সারা বিশ্বের।' এই সূত্রে আমরা বলতে পারি দেশে দেশে তাঁর দেশ আছে। বিশ্বে তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন একটা আন্তর্জাতিক সংঘের, আন্তর্জাতিক সংহতির, আন্তজার্তিক বিধানের কথা। এই চাওয়ার মধ্যে কোন চাতুর্য ছিল না, ছিল আন্তরিকতার আত্যন্তিকতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত 'লীগ অফ নেশনস্' তৈরী হয়েছিল শান্তির জন্য, পাবস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য, আর যাতে বিশ্বযুদ্ধ না হয় সেদিকে তাকিয়ে। কিন্তু এই সংগঠনে আন্তরিকতা ছিল না, ছিল স্বার্থপরতা—তাই অল্প দিনের মধ্যে সংগঠিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাঁচ কোটি মানুষের মারণযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। বারুদের গন্ধ মিলিয়ে যেতেই আবার প্রতিষ্ঠিত হল U.N.O. বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। এই সংস্থা বড বড় দেশগুলির তাঁবে পরিণত। উন্নয়নশীল, পিছিয়ে থাকা বা ছোট দেশগুলি এই সংস্থায় কোন সুযোগ পায় না। অথচ বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এমন এক আন্তর্জাতিক সংঘ, যেখানে ছোট বড সব রাষ্ট্রই সমান গুরুত্ব পাবে, আর তারই মধ্য দিয়ে শান্তির স্বপক্ষে এক প্রেক্ষাপট রচিত হবে, মানুষ বিশ্বসত্তার সন্ধান খুঁজে পাবে। এরই আঙিনায় দাঁড়িয়ে 'বিশ্ব নাগরিক' রূপে গর্ববোধ করবে। বিবেকানন্দ ভাবিত ভুবনখানি রচিত হয় নি। বিশ্ব শান্তির জন্য তাঁর গভীর আকুতিও বাস্তবায়িত হয় নি। তাই শান্তির জন্য আমরা মিটিং, মিছিল করে চলেছি, পায়রা ওড়াচ্ছি, 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' আর 'বারুদ নয়, বসন্ত চাই' বলে স্লোগান দিচ্ছি, দেওয়াল লিখছি প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা নিয়ে; কিন্তু হিংসাব দিশারীরা নির্ভাবনায় বানিয়ে চলেছে মারণযজ্ঞের নানা অস্ত্র, পরীক্ষা চালাচ্ছে আনবিক, পারমানবিক, রাসায়নিক বোমার শক্তিমত্তা বিষয়ে। এই পটভূমিতেই রামকৃষ্ণ মিশন বিশ্বশান্তির প্রয়াসে ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম-দর্শন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে বিশ্বজুড়ে প্রচার করে চলেছে।

॥ ৫ ॥

মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা। মানুষ অমৃতের সন্তান। সে পাপ করে, অন্যায় করে আবার ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিবেকানন্দের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, —'গরুতে মিথ্যে কথা কয় না, দেয়ালে

চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, দেয়াল থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কয় আবার সেই মানুষই দেবতা হয়'।[৪] কি করে হয়? আসলে মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী। এই শক্তিকে চেনা ও জানার উপায় হচ্ছে শিক্ষা। বিবেকানন্দ তাই শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিশেষ ভাবে। সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই শিক্ষা মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক'। রক্তাক্ত চরণে ভারত পরিক্রমা করে বিবেকানন্দ এই সত্যটিকে বুঝতে পেরেছিলেন—শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষেরা পদদলিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। তাই চাই শিক্ষা—সার্বিক শিক্ষা। তিনি পাশ্চাত্য থেকে আলাসিঙ্গা সহ অন্যান্য যুবকদের কিংবা গুরুভাইদের লিখেছেন দরিদ্র, অত্যাচারিত, শোষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কথা। বিবেকানন্দের কথাতেই বলি—'মনে কর, কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায় নানা উপায়ে, নানা কথা, map, camera, globe, ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতি কল্পে বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা! ফলকথা "If mountain does not come to Mohomed, Mohomed must come to mountain" (পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবেন)।'[৫] বিবেকানন্দ বলতে চাইলেন গরিবেরা এত গরিব তাই তারা যদি বিদ্যালয়ে না যায়, তবে বিদ্যালয়কে পৌঁছতে হবে গরিবের দ্বারে। বিবেকানন্দ শিক্ষার উপর এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে সতীর্থদের এই শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন—আজ থেকে একশো বছর আগে।

বিবেকানন্দ কেতাবী শিক্ষা অর্থাৎ ক্যারিয়ারিষ্ট শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। একশো বছর আগে তাঁর চিন্তা আজকের দিনে অতিমাত্রায় বাস্তব রূপ নিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যাঁরা আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, দেশে-দেশান্তরে তাঁদের সিংহভাগ রামকৃষ্ণ মিশনকে এই ক্যারিয়ার গড়ার আশ্রয়স্থল রূপে বেছে নিয়েছে বিশেষ ভাবে। আজকের কৃতি ছাত্ররাও সেই পথের পথিক। এই মানসিকতার পরিবর্তন দরকার।[৬] রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে সাফল্যের পথে অগ্রসর হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিবেকানন্দের আহ্বানকে ভুললে চলবে না। স্বার্থপরতা-আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। জীবনে জীবন যোগ করতে হবে। তা না হলে

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ্, প্রমুখ সকলে যদি যথাযথ মানবতার পূজারী হয়ে ওঠেন তবেই সমাজ, রাষ্ট্র তার চলার ছন্দটি খুঁজে পাবে। এজন্যই প্রয়োজন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে লালিত হওয়া।

বিবেকানন্দ শিক্ষাকে পণ্য করে তোলার বিরুদ্ধে জোরালো মতপ্রকাশ করেছেন। তিনি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন একটা পাখি দুটি ডানা না হলে উড়তে পারে না; তেমনি একটি সমাজ অগ্রগতি-প্রগতির পাখা মেলতে পারে না, যদি তার দুটি ডানা শক্ত-সবল না হয়। এই দুটি ডানার মধ্যে একটি হল পুরুষ, অন্যটি হল নারী। নারী যদি শিক্ষিত না হয়, তবে সে সমাজ মুখ থুবড়ে পড়বে প্রগতির পথে। তিনি যখন নারী শিক্ষার কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন তখন ব্রাহ্ম সমাজের মুষ্টিমেয় নারীরা শিক্ষার পাঠ নিতে শুরু করেছে মাত্র। বিবেকানন্দ চাইতেন নারীরা শিক্ষিত হয়ে আপন ভাগ্য জয় করুক এবং যথার্থ ভাবে সচেতন হয়ে উঠুক।

বিবেকানন্দ পিছিয়ে পড়া মানুষদের উদ্দেশ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছিলেন, এ প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

॥ ৬ ॥

একালের কবির পরিভাষায় আমরা জানি, —'মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও / মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও / মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।'[৭] বিবেকানন্দও এই অমোঘ নির্দেশ আমাদের সামনে রেখেছেন। দুঃস্থ-আর্ত-পীড়িত মানুষদের সেবার নির্দেশ দিয়েছেন বিবেকানন্দ। রক্তাক্ত চরণে লেপটে যাওয়া আত্যন্তিক অনুভব তাই তিনি জানান, সতীর্থ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে—'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ-বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক? সে ধর্ম না পৈশাচিক নৃত্য? দাদা এটা তলিয়ে বোঝ—এ দৃশ্য ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি।'[৮]

মানবিকতার চরম অপমান একশো বছর আগে এই ভারতবর্ষে যেখানে

দাঁড়িয়েছিল, আজকে তা হাজারো রূপে বেড়েছে। আর্ত-পীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের সংখ্যাধিক্যই শুধু ঘটে নি, সেদিনের মত উচ্চবর্ণের মানুষদের অত্যাচার বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে অবিরত ঘটে চলেছে। জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, হরিজনদের উপর নিগ্রহ—ভূমিহারাদের উপর অত্যাচার প্রকাশ্যে চলেছে। কোথাও জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, কোথাওবা বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হচ্ছে শরীর—বহু রক্ত ঝরিয়ে। বিবেকানন্দ কি এই ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন?

মানুষ ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের অধিক। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' বা 'ঈশ্বরের সন্ধানে তোমরা কোথায় যাচ্ছ, আর্ত, পীড়িত, দুঃস্থ মানুষেরা কি ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা করো।'[৯] এমন কথা বিবেকানন্দই বলতে পারেন।

কায়রো শহরের পথে হাঁটছেন বিবেকানন্দ। সঙ্গে আরো অনেকে। তাঁরা ভুলে এক পতিতা পল্লীতে প্রবেশ করেছেন, ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম কালভে, স্বামীজীর অন্যতমা শিষ্যা, বিবেকানন্দকে বললেন, 'স্বামীজী আমরা পথ ভুল করেছি।' তখন সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। আশপাশের পতিতা নারীরা বিবেকানন্দের উদ্দেশে নানা অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে। বিবেকানন্দ অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'মা তোমরা জানো না তোমাদের স্বরূপ, আর জানো না বলেই নিজেদের এই পথে টেনে নামিয়েছো।' অশ্রুসিক্ত বিবেকানন্দকে দেখে পতিতা নারীরা ছুটে এসে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। স্বামীজীর বস্ত্র চুম্বন করতে করতে ঐ সব নারীরা বলে উঠলো—'আপনি কি ঈশ্বর পুত্র? আপনি কি আমাদের উদ্ধার করতে এসেছেন?' এই বলে তারা কাঁদতে লাগলো, বিবেকানন্দও অশ্রুসিক্ত। বিবেকানন্দের চোখের জল আর ঐ পতিতা নারীদের চোখের জল একাকার হয়ে গেল। এ চোখের জল তো জল নয়, রক্তের ফোঁটা।[১০]

বিবেকানন্দ দীন, দুঃখী, অজ্ঞ, কাতর, পতিত, পদদলিত, শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের জন্য অন্তরে বেদনা বোধ করেছেন বিশেষ ভাবে। তাই কখনও গুরুভাইদের কখনও গৃহী-অনুরাগীদের নির্দেশ দিয়েছেন সংশিষ্টজনেদের সাধ্যমতো দুঃখ নিবারণে এগিয়ে আসার জন্যে। এঁদের জন্য প্রকাশ্যে—গোপনে কত রক্তের ফোঁটা চোখ বেয়ে নেমে এসেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। মানবিকতার চরম লাঞ্ছনা বিবেকানন্দকে ব্যথিত করেছে; দুঃসহ বেদনা তিনি বহন করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন

করে এগিয়ে গেছেন দুঃখী মানুষদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণার্থে। একশো বছর পরেও মানবিকতার সর্বাঙ্গে ক্ষতের চিহ্ন। সেই চিহ্ন একালের মানুষদের তেমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি।

॥ ৭ ॥

বিবেকানন্দই প্রথম ভারতবাসী যিনি আজ থেকে একশো বছর আগে ভারতের পিছিয়ে পড়া অজ্ঞ-কাতর-নিপীড়িত শোষিত মানুষদের ভারতবর্ষ শাসনের আহ্বান জানিয়েছেন, শূদ্র-জাগরণের কথা বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের সেই চিন্তা বাস্তবায়িত হয়নি। বামকৃষ্ণ মিশন নিজেদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ঐ পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে চলেছে। কিন্তু এই কাজটি ব্যাপকভাবে হয়নি, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যদি তা হতো তাহলে ভারতবর্ষের সমগ্র দুর্গতি দূর হয়ে যেতো। আমরা সত্যি সত্যি পেতাম বিবেকানন্দ কথিত নতুন ভারতবর্ষকে।

আজ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত স্কুল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেভাবে ইতিবাচক-চূডান্ত সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পেরেছে তা তো দেশে সার্বিক ক্ষেত্রেই হতে পারতো, কিন্তু যথার্থ মানুষের অভাবে, ত্যাগ আদর্শায়িত জীবনবোধের অভাবে, জীবনে জীবন যোগ করার অনীহায়, সচেতনতার অভাবে এবং ঈর্ষা ও ভেদবুদ্ধির বিকাশে তা হয়ে উঠতে পারেনি। বরং বারেবারেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে তাদের আরব্ধ কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, একশোটি যথার্থ যুবক পেলে তিনি দুনিয়া অর্থাৎ বিশ্বটাকে পাল্টে দিতে পাবতেন। কিন্তু সেদিনও তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ছিল একশোটি যথার্থ মানুষের অভাব। আর আজ প্রায় একশো কোটি মানুষের মধ্যে হাজারটি যথার্থ মানুষ খুঁজে পাওয়া দুস্কর। তবুও সেই অভাবেব মধ্যেই, আমরা বলবো, রামকৃষ্ণ মিশন তাদের কর্মপরিধি ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ রাখেনি, বিবেকানন্দের অভীপ্সা অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে, মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিতে তার সীমায়িত ক্ষমতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক ইতিবাচক-সদর্থক আগ্রহ তারই সাক্ষ্য বহন কবে।

পর্বান্তরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আজ আমরা এই কথা

বলতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের অভীপ্সা, সুকঠিন নেতৃত্ব, হাজারো প্রতিকূলতা পেরিয়ে যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও অগ্রগতি তা নিঃসন্দেহে পরবর্তী আরো কয়েক শতাব্দী অতিক্রমণের শক্তিতে ভরপুর। কোন শক্তিরই তাকে রোধ করার ক্ষমতা নেই। আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বহু মানুষের সংযুক্তি, দেশবিদেশে তার খ্যাতি ও দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এবং অন্যান্য সূত্রে সুযোগ পেয়ে যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে রয়েছেন তাঁদেরও ঋণ শোধের মানসিকতা নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সব মানুষের কর্তব্য—ব্যক্তি স্বার্থের, সাময়িক প্রাপ্তির উর্ধ্বে উঠে রামকৃষ্ণ মিশনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সমবেত মানুষের সদর্থক শক্তির সঞ্চার ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক, কায়িক, আর্থিক, বৌদ্ধিক সংযুক্তি। আর এই সূত্রেই আমরা বিবেকানন্দ অভীপ্সিত নতুন ভারতবর্ষের দেখা পাবো। সেই ভারতবর্ষই পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথ দেখবে। এখন অপেক্ষা শুধু তারই জন্য।

॥ ৮ ॥

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পরে এবং ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পরে আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি তারই একটি চলচ্ছবি আমরা তুলে ধরলাম। ছবিটির সঙ্গে অপলক দৃষ্টি বিনিময় করে মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসে পৌঁছে যাবো যে আর যাই হোক ছবিটি উজ্জ্বল নয়। শত সহস্র চারিত্রিক নৈতিক স্খলন-পতন, অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, অর্থবিত্তের প্রতি লিপ্সা, শঠতা, প্রবঞ্চনা আজ আমাদের অক্টোপাশের মতো জাপটে ধরেছে। এই পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যে ভাবে কাজ করে চলেছে তা তুলনাবিহীন। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, শতবর্ষ পরে রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি পর্বের ইতিহাস রচিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত আলো রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপক স্তরে পৌঁছে দিতে পারছে কি? রামকৃষ্ণ মিশন কি শুধু একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান? প্রশ্ন শুধু ভারতবর্ষকে ঘিরে নয়। কারণ রামকৃষ্ণ মিশন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণ তৈরী হয়ে গেছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। অন্তরের বিষ দিয়ে অস্ত্রগুলিকে শানিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি করে রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের কোথায় পৌঁছে দেবে? সঙ্গত কারণে এ প্রশ্ন ওঠে। অন্তরের গভীর যন্ত্রণা আর বেদনা নিয়ে ক্ষুধাতুর মানুষ সারা ভারতে থিক্ থিক্ করছে। পৃথিবীর সব দেশেই তারা আছে। রণডঙ্কা বাজিয়ে আত্মগর্বী দেশগুলি কব্জা করতে চাইছে সারা বিশ্বকে। সাম্রাজ্যবাদীদের সুচতুর কৌশলে আধ্যাত্মিকতা আজ তলানিতে ঠেকেছে সেখানে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে তীব্র হলাহলের মধ্যে ডুবিয়ে দিশেহারা পাশ্চাত্যের মানুষ। মতান্ধতা আর উন্নাসিকতার মাঝখানে চাপা পড়ে গেছে অগণিত মানুষ মানুষী।

এই ছবি প্রত্যক্ষ করেও বিবেকানন্দ অপেক্ষমান। ঊনচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর পার্থিব শরীর চলে গেলেও তিনি তাঁর একান্ত অনুরাগীদের বলেছিলেন, —'আমি যেদিন তোদের সামনে থাকব না, সেদিন থাকবো তোদের পিছনে, তোরা কাজ করে করে শেষ হয়ে যা। এই আমার আশীর্বাদ।' সেই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ-রামকৃষ্ণ মিশন কাজ করে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বিশ্ব জুড়ে। পর্বান্তরের ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে যে কথা বলতে চায় তা হল, একটি শতাব্দী নয়, আরো বেশ কয়েকটি শতাব্দীর যে কাজ তা ধীরে, সুসংহত ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন করে চলেছে তাতে যুক্ত করতে হবে আমাদের সকলের ইতিবাচক প্রয়াস। বাস্তবিক ক্ষেত্রে যথার্থ মানুষ গড়ার কর্মস্থল রামকৃষ্ণ মিশন, —তা নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়। বৃহত্তম ধর্মবোধের সঙ্গে তার সংযুক্তি। সব ধর্মের সব বর্ণের সব গোত্রের মানুষ-মানুষীদের ভ্রাতৃত্বের অমোঘ বন্ধনে, শাশ্বত ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অনুসরণে, রামকৃষ্ণ মিশন এই পথে পথ হেঁটে পৃথিবী ক্রমমুক্তির পথটিই করবে প্রসারিত। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অব আফ্রিকান স্টাডিজ আয়োজিত 'Vivekananda and Mordernization of Hinduism' শিরোনামে আলোচনা চক্রে উপস্থিত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা সেই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময়ে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং সকল ধর্মের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল হবার আহ্বান জানিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার যে প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যেই নিহিত ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন। ধর্মের হানাহানি নিরীক্ষণ করে সকল ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব জ্ঞাপন ও সুচারু দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিপোষণায় দেশ-দেশান্তরের জনসাধারণের বস্তুগত আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং শিল্প ও মানবিক বিদ্যার বিকাশসাধন সর্বোপরি

'ঐ সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে' একই সঙ্গে আশা, ভাষা এবং অন্নের যোগান যুগিয়ে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন।

ভারতবর্ষের কথা উঠলে আমাদের মনে পড়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ কলকাতা ষ্টার থিয়েটারে নিবেদিতা প্রদত্ত ভাষণের এই লাইনগুলি — 'The mission is to the National life of India... a great symphony of many movements.' সত্যই তো তাই। রামকৃষ্ণ মিশন তিলেতিলে তিলোত্তমা হয়ে সুর মূর্ছনার মধ্য দিয়ে তার কর্মপ্রবাহ প্রসারিত করে দিয়েছে পল্লবিত ভাবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে একশো বছরে যা হয়েছে আগামী একশো বছর অপেক্ষা করছে আরো দ্বিগুণ প্রত্যাশা নিয়ে। যে প্রত্যাশা একই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও মানুষের আত্মজ্ঞানে, আত্মসচেতনতায় পরিপূর্ণ করে তোলার একবুক অভীপ্সা। এই ত্যাগ, এই সেবা, এই আধ্যাত্মিকতা, ধর্মান্তরকরণের মধ্যে দিয়ে নয়, খ্রীস্টীয় সমাজের অনুকরণে নয়, সার্বিক মানুষের উত্তরণের রাঙাপথটির স্বর্ণ স্বপ্ন নিয়ে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে লালিত বামকৃষ্ণ মিশনের কাজ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সকলকে মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই তো আমরা গোটা পৃথিবীকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরতে পারবো। বিবেকানন্দ তাই চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দের নাম একই সূত্রে গ্রথিত — অবিচ্ছেদ্য।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা — ৪১৭, পৃ: ৬৩৪-৩৫
২. স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি — ভগিনী নিবেদিতা, ১৩৮৪ পৃ: ১৪৫-১৪৬
৩. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা — ১১৯, পৃ: ১৩৭
৪. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৯৬, সুলভ সংস্করণ, পৃ: ১২১
৫. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৮৮, পৃ: ১২২
৬. রামকৃষ্ণ মিশন থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা ৯০% সুপ্রতিষ্ঠিত দেশে-দেশান্তরে। এঁদের মধ্যে ৩০% ছাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ২০% ছাত্র নানা কাজে আর্থিক সহায়তা করেন।
৭. মানুষ বড় কাঁদছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৭, পৃ: ৩৬
৮. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা — ৮৮, পৃ: ১২১
৯. পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা, ১৩৪, পৃ: ২১১
১০. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৩৭৩, পৃ: ৩৪৯

পরিশিষ্ট—১

কলকাতায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা দেওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে প্রচারিত আবেদনপত্র

এই আবেদনপত্রটি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে রচিত হয়েছিল এবং হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। বাংলায় প্রচারিত আবেদনপত্রটি নিম্নে মুদ্রিত হল।

॥ ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় ॥

কলিকাতানিবাসী ভাই সকল!

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী, এই দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও নিরন্তর প্রার্থনা।

২। যে মহারোগের ভয়ে বড, ছোট, ধনী, নিধন সকলে ব্যস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের মূর্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতায় অন্যথা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৩। তোমাদের নিকট আমাব সবিনয় প্রার্থনা, অকারণে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থিরচিত্তে উপায় চিন্তা কর, অথবা যাহারা তাহা করিতেছে তাহাদের সহায়তা কর।

৪। ভয় কিসের? কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে বলিয়া সাধারণের মনে যে ভয হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর আর স্থানে প্লেগ যেরূপ রুদ্রমূর্তি হইয়াছিল, ঈশ্বররেচ্ছায় কলিকাতায় সেরূপ কিছুই হয় নাই। রাজপুরুষেরাও আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকূল।

৫। এস, সকলে বৃথা ভয় ছাড়িয়া ভগবানের অসীম দয়াতে বিশ্বাস করিয়া কোমর বাঁধিয়া কার্যক্ষেত্রে নামি, শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি। রোগ, মারীভয় প্রভৃতি তাঁহার কৃপায় কোথায় দূর হইয়া যাইবে।

৬। (ক) বাড়ী, ঘরদুয়ার, গায়ের কাপড়, বিছানা, নর্দমা প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

(খ) পচা বাসি খাবার না খাইয়া টাট্‌কা পুষ্টিকর খাবার খাইবে। দুর্বল শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

(গ) মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারম্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে।

(ঘ) অন্যায়পূর্বক যাহারা জীবিকা অর্জন করে, যাহারা অপরের অমঙ্গল ঘটায়, ভয় কোনকালে তাহাদের ত্যাগ করে না। অতএব এই মহা মৃত্যুভয়ের দিনে, এই সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

(ঙ) মহামারীর দিনে গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত থাকিবে।

(চ) বাজারের গুজবাদি বিশ্বাস করিবে না।

(ছ) ইংবাজ সবকাব কাহাকেও জোর করিয়া টিকা দিবেন না। যাহার ইচ্ছা হইবে সেই টিকা লইবে।

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের পরদা রক্ষা করিয়া, যাহাতে আমাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে, নিজের হাসপাতালে, রোগীদের চিকিৎসা হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ধনী লোক পালাক, আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি। জগদম্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়; মা অভয় দিতেছেন—ভয় নাই! ভয় নাই!!

৭। হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থসাহায্যও সম্ভব।

● বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীভয় নিবারণের জন্য নাম-সংকীর্তন করিবে।...

পরিশিষ্ট—২

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ির দ্বিতলের হলঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও ত্যাগী পার্ষদদের, ভক্ত-অনুরাগীদের সম্মিলিত সভায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ৫ মে তারিখের সভায় মিশনের নামকরণ, কার্য-পরিচালকমণ্ডলী এবং রামকৃষ্ণ মিশন গঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বিষয়ক প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই দ্বিতীয় দিনের সভায় গৃহীত ইংরেজিতে লেখা প্রস্তাবটি নীচে তুলে ধরা হল:

Wednesday, 5th May, 1897, 2nd Meeting of the Association Under the Presidency of Swami Vivekananda, the name, object, method of work of the association and the rules for its guidence were fixed upon. These were the following:

Name: The Ramakrishna Mission.

Object: The object of the society is to propaget the principles profounded by Sri Ramakrishna and illustrated by his own life for the benefit of humanity and to help mankind in the practical application of those principles in their spiritual, intellectual and physical needs.

The Mission: The Mission of this society is to carry on the work, inaugurated by Sri Ramakrishna, of fraterniting the various creeds of the world knowing them to be only phases of one eternal universal religion.

Method of Work: The method of work is starting by centre is different places to train spiritual and secular education and by encouraging arts, industries, science and by popularizing the study of the Vedanta and other system of spiritual thoughts as interpreted by the life of Sri Ramakrishna.

The Work in India: The work in India is by starting centres in the capitals of the empire to train Sannyasins

(ascetics) and Grihasthas (House holders) as educators of the people and to enable this teachers to reach the people by making them visit different parts of the country.

Foreign Work: To send missionaries to various foreign countries to bring the centres already existing in countries outside of India in sympathy and co-operation with those existing in India and to start other centres.

The Rules of the Association: The following rules were unanimously adopted for the guidance of the Calcutta centre of the Mission:

(1) Anyone who believes in the mission of Sri Ramakrishna, who is ready to co-operate for the spread of that mission and who endavours to lead a moral life, would be eligible to the membership of the society, the other members objecting.

(2) The members should pay a subcription not less than eight annas per month unless anyone is specially incapable.

(3) The president of every branch shall have the power of calling meeting through the secretaries and collecting funds through the treasurer.

(4) A meeting should be held every Sunday at 6.30 p.m. at the premises of number 13, Bosepara Lane, Baghbazar.

Swami Vivekananda has been elected the general President of the Ramakrishna Mission.

Swami Brahmananda has been elected the President of the Calcutta Centre of the Mission.

Proceedings book of the First Ramakrishna Mission, Page.4-7

পরিশিষ্ট—৩

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিভাগের সচিবকে প্রদত্ত কলকাতা পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিন্‌টেনডেন্ট চার্লস অগাস্টাস টেগার্টের ঐতিহাসিক রিপোর্ট :

TEGART REPORT

Confidential No. 5481/322-14 I.B.

Intelligence Branch CID
11, Camac Street.
Calcutta, 15th May 1914.

My dear Cassells,

In continuation of my D O. 3967 of the 4th ultimo, I send you, herewith, 5 copies of my note on the Ram Krishna Mission.

I regret that there has been some delay in complying with your request but it was unavoidable Will you kindly acknowledge receipt.

Yours sincerely
C A. Tegart,
(Special Superintendent of Police,
Intelligence Branch)

A. Cassells, Esqr, I.C.S.
Under Secretary to the Govt. of Bengal
Political Department.

Confidential.

THE RAM KRISHNA MISSION

The teachings of the Hindu saint Sri Rama Krishna as expounded by his favourite disciple Swami Vivekananda have attracted in recent years a great deal of attention in India as well as in Europe and America.

In India the attention of the authorities has been particularly drawn to the development of the Ram Krishna Mission, as founded after the death of Sri Rama Krisha by his disciples headed by Swami Vivekananda, as there have been several indications that

the Mission and its followers are connected with the revolutionary side of the recent political upheaval in India, which has convulsed the student community in Bengal, and has more recently still extended its pernicious influennce to even more dangerous ground in the Punjab and Native States of India.

The object of the present note is to outline briefly the origin and growth of the Ram Krishna Mission, more particulary with reference to its political complexion, as referred to above.

I.—SRI RAMA KRISHNA

At the outset it will be necessary to give a brief account of the life and teachings of Sri Rama Krishna.

Rama Krishna, or Gangadhar[1] Chatarji, as he was originally called, was born of humble Brahmin parents in village Kamalpur,[2] in the Hooghly district, about the year 1833.[3] The original name Gangadhar, a name of Vishnu, was given him according to historians of the time, on account of a prophetic dream of his father, to whom, while on a pilgrimage of Gaya, Vishnu appeared, telling him that he, the deity, would be born as his son.

From his earliest years Rama Krishna is reported to have turned his attention to religious matters. Though only educated up to the standard of the local village school he had a remarkably retentive memory and used to engage in theological disputations with the numerous ascetics and religious men who passed through the village in which he lived, on their way down the pilgrim road to Puri. After the death of his father, Rama Krishna, then about 17 or 18 years of age, went with his elder brother, Ram Kumar, to Calcutta.

In the year 1855 Rani Rashmoni, a rich Bengali lady, built the well-known temple at Dakshineswar, a village on the banks of the Ganges, about four miles from Calcutta. The eldest brother of Rama Krishna was appointed to be the chief priest of the temple, and Rama Krishna was shortly afterwards employed as an assistant priest.

At this time, owing to the fervour of his devotional exercises, doubts were entertained by many as to Rama Krishna's sanity. After the regular forms of worship—we are told—he would sit for hours in front of the goddes Kali singing hymns and praying to her as a child till he lost all consciousness of the outer world. Sometimes he would weep for hours because he could not see his mother as perfectly as he wished. His relations,

thinking his imagination would calm down if he were married and had a wife and family to look after, brought him to his native village and married him in the year 1859 to Saradamoni Devi, daughter of Ram Kamal Mukherji,[4] of Jairampur,[5] in the 24-Parganas.[6]

At the time of her marriage Saradamoni, who is still alive, was only six year of age,[7] while her husband was 26.[8] After his marriage Rama Krishna returned to the temple garden at Dakshineswar, and from this time onward is reported to have given himself completely up to religious exercises and meditation. His religious fervour instead of toning down, as his relatives had hoped, increased a thousandfold, and the temple authorities finding that Rama Krishna, owing to the state of his religious feelings, was incapable of performing his duties at the temple, eventually appointed another priest in his place.

A follower of Rama Krishna writing about him at this period of his career says—"The marriage hath been only in name. He saith, 'Mother, O Mother' night and day. Now he is like a stock or stone, or a figure made of wood! Now he is found behaving like a person of unsound mind. At another 'time he behaveth like a child! He hideth himself from the sight of wordly-minded men! He liketh not those who do not love the Lord, nor doth he listen to any words except those of God! He saith without ceasing, 'Mother, O my Divine Mother'!"

Rama Krishna's fame as a religious man spread rapidly throughout Bengal and he was visited by many pandits and disciples, Several of whom looked upon him as the incarnation of Chaitanya, the Godman of Nadia. The leaders of the *Brahma Samaj* with their disciples often visited Rama Krishna at the Dakshineswar *Kalibari*, and their visits were returned by the latter, who frequently saw Keshab Chandra Sen at his own house. At those meetings, it is reported, Rama Krishna spoke for long hours about the Lord, and his audience listened with rapt attention to the words of wisdom which fell from his lips.

Towards the end of his career Rama Krishna appears to have regarded himself as an incarnation of the Deity, and he is now worshipped as such by his disciples. His visions grew more and more and his trances or *Samadhi* became longer and longer in duration. His disciples at his bidding are reported in several

instances to have fallen into similar trances, evidently cases of hypnosis, which resulted in Ram Krishna being credited with supernatural powers.

He is said to have possessed the wonderful power of being able to change a man's thoughts by merely touching his body. In some, it is recorded, this touch produced immediate *Samadhi*, in which they saw visions of gods and goddesses and lost for some time all sensation of the outward world.

He practised *Yoga* or physical discipline to subdue the body, as a result of which he claimed at one period of his life to have remained for six months in perfect union with the absolute Brahman which people seldom reach, and if they reach it they cannot return to their individual consciousness again. His body eventually gave way under this severe treatment, and in the year 1886 at the Dakshineswar *Kalibari* Rama Krishna fell into his final trance,[9] or *Samadhi*, from which he never returned. His remains were cremated in the burning ghat close by, immediately opposite to which, on the other side of the river, the Belur *Math* now stands.[10] In his declining years his wife Saradamoni was in constant attendance on him at the Dakshineswar Temple,[11] ministering to his temporal wants.

Unlike his famous contemporaries, Kesab Chandra Sen and Dayananda Saraswati, who founded new sects with new beliefs, Rama Krishna never claimed to be the founder of a new religion; he simply preached the old religion of India, which was founded on the *Vedas*, and even in preaching that religion and in living the life of a recluse Rama Krishna, we are told, by no means claimed to stand alone.

Professor Max Muller writes of him as follows :

> "Rama Krishna was in no sense of the word an original thinker, the discoverer of a new idea or the propounder of any new view of the world. But he saw many things which others had not seen. He recognised the Divine presence where it was least suspected. He was a poet, an enthusiast, or, if you like, a dreamer of dreams. But such dreams also have a right to exist and have a claim on our attention and sympathy. Rama Krishna never composed a philosophical treatise. He simply poured out short sayings, and the people came to listen to them, whether the speaker was at the time in full

> possession of his faculties, or in a dream or a trance. From all we can learn, it is quite clear that he had, by a powerful control of his breath, and by long-continued ascetic exercises, arrived at such a pitch of nervous excitability that he could at any moment faint away or fall into a state of unconsciousness, the so-called *Samadhi.* ... With Rama Krishna it often happened that when he had fallen into the deep sleep he remained in it so long that his friends were afraid that he would never return to consciousness, and so it was at the time of his death. He had fallen into a trance and he never awoke, but even death could lay hold of his body and his breath only; his Self, no longer his, had of his body and his breath only; his Self, no longer his, had recovered its Brahmahood; had become what it had always been and always will be, the *Atman,* the Highest Self in all its glory, freed from all the clouds of appearances, and independent of individuality, personality, and of the whole phenomenal world."[12]

According to this same writer Rama Krishna, who, as noted above, was a man of very poor education, with no knowledge of Sanskrit or English, distinguished very clearly between Philosophy or *Gnana* (knowledge), and devotion, or *Bhakti,* and he himself was a *Bhakta,* a worshipper of the Deity, much more, than a *Gnanin* or a knower.

II.—THE BELUR MATH AND ITS FOUNDER.

Such was the man whose life and sayings his devoted adherent and favourite disciple Swami Vivekananda eventually proclaimed to India and the Western World and whose followers, both in India and elsewhere, now form a large and rapidly increasing community.

Swami Vivekananda, or Norendra[13] Nath Datta, to call him by his family name, first appears to have come in contact with Sri Rama Krishna about the year 1881. He was the eldest son of the late Babu Biswanath Datta, a Kaisth who practised as an Attorney in the Calcutta High Court, Norendra was born in Calcutta[14] in the year 1863. He was educated in Church of Scotland Mission School at Calcutta[14] and afterwards become a graduate of the Calcutta University.

He had two brothers: Bhupendra Nath Datta, who was one of the original promoters of the notorious *Jugantar* newspaper which sowed the seeds of revolution and anarchy in the minds of the youths of Bengal until its suppression by Government in 1908. Bhupendra Nath was the first of its staff to be convicted of sedition, for which he was sentenced to one year's rigorous imprisonment in 1907. On his release in July 1908, he concealed himself for a time at the Belur *Math*, the headquarters of the Ram Krishna Mission, but shortly afterwards left for America and arrived in New York in August of the same year. In New York, Bhupen put up at the India House and attached himself to Myron Phelps, an avowed opponent of British rule in India. An Indian who has recently returned from America, where he was in touch with the revolutionary party, stated to an officer of the Intelligence Branch that on his way to India he had met Krishna Varma in Paris and learnt from him that Bhupendra Nath Datta, who was a special favourite of Krishna Varma's, was receiving pecuniary help from the latter at the present time. Keeping in the background, this man, it is reported, was probably one of the most dangerous leaders of the revolutionists Bengal, and his relationship with Swami Vivekananda gave him a sort of religious prestige with the fanatical members of the revolutionary party.

Mohendra, Vivekananda's other brother is at present residing in Calcutta. He is a man of independent means who has travelled extensively in Europe, Egypt and Persia. A branch of the Mission is located in his Calcutta residence.

A brief account of Swami Vivekananda's career appears in a note on the Ram Krishna Mission compiled by the office of the Director of Criminal Intelligence in 1909. This note states that after visiting all the holy places in India Swami Vivekananda first came to notice in 1892, when he was touring through the various States in Kathiawar and was entertained by some of the petty Chiefs. His religious lectures did not exercise much influence on his hearers, but it was noted that he took an interest in politics.

Swami Vivekananda went to Madras early in 1893 at the time that it was proposed to hold the Parliament of Religions in Chicago. His lectures attracted much attention and he was selected by

the Hindus of Madras as the fittest man to represent Hinduism at the Parliament Funds were raised for him by the Hindu community, and the Maharaja of Mysore and the Raja of Ramand are said to have contributed.[15]

The Swami reached Chicago in May 1893, but found that the Parliament was not to be opened for some months. In the interval friends came forward and supported him. He made a great impression at the Parliament in September 1893, and henceforth his position as the leading exponent of Vedantism in America was secured. He appears to have travelled very extensively in that country during 1894–95 and to have attracted a considerable amount of attention. He held daily free classes in New York for some months and his so journ there is said to have been eminently successful. The Vedanta Society in this city was founded in 1895 as a result of Swami Vivekananda's lectures during that and the preceding year, and when he left America in 1896 Sarat Chandra Chakrabarti, commonly known as Swami Saradananda, who is at present the Secretary of the Ram Krishna Mission at the Belur *Math*, was brought out from Calcutta to carry on the work. The latter lectured in many places in America, apparently without much success, for he returned to India in 1898.[16] Meanwhile, Kali Chandra Chandra,[17] known as Swami Abhedananda, of Calcutta, who was then lecturing in London, was invited to New York by the Vedanta Society, and he arrived there in August 1897. He lectured in New York and elsewhere throughout the State and organised a Vedanta Society which was incorporated under the States and organised a Vedanta Society which was incorporated under the State law of New York in October 1898 During the next few years, the Director of Criminal Intelligence reports, Swami Abhedananda's lectures attracted greatly increasing audiences, and in May 1904 he still further aroused America's interest in his teachings by arranging to have the society presented along with other religions in the "World's Fair" at St. Louis. In 1905 a *Yoga* class was organised in Brooklyn, and regular weekly meetings were held throughout the season, and in the same year an attempt was made to form a branch at Washington.

In May 1906 Swami Abhedananda sailed for India, leaving Swami Bodananda *alias* Haripada Chatarji, an inhabitant of the

Hooghly district, in charge. In December of the same year he returned to New York, taking with him Swami Parmananda to assist him in his work.

In March 1907 the society purchased No. 135, West Eightieth Street, and removed into these premises, where they have remained ever since. The house is said to be centrally located and to have ample rooms for conducting lectures, classes, library and publication work. It also provides a home for the Swamis in charge.

In 1908 Abhedananda revisited London, where he lectured for six months and established a centre of Vedanta Society. He also lectured in Paris with some little success.

The New York Society, the Director of Criminal Intelligence reports, regards its publication department as one of the most important and claims to have published already nearly 40 books and collected lectures of the Swamis, besides translations from the *Vedas* and other oriental works. It has also established depots for the sale of its publications in Furope and America, as well as in the chief cities in the United States, and it distributes copies of two leading monthly Vedanta magazines, the *Brahmabadin* and the *Awakened India.*[18]

In addition to the centres at New York, Brooklyn and Washington, referred to above, the society had also in 1906 established branches at San Francisco and Los Angeles in California and at Vancouver. The San Francisco branch was managed by Swami Trigunatirtha,[19] whose real name is Sarada Kumar[20] Mitra, of Nandan Bagan, Calcutta. He is still in charge of that centre. There was also in existence in California in 1906 a Home for meditation, then in charge of a Mr. Helbom, who called himself Gurudas Brahmachari, and to-day the students and the Swamis are said to repair at certain seasons of the year to this Home for the practice of meditation. It is possible, the Director of Criminal Intelligence notes, that the manager of the Home may be the same as the American gentleman who was found to be residing at Mayabati in 1908 and whose name was reported as Mr. Heydlom. The donor of the land for this Santi *Asram* in California was one of Swami Abhedananda's lady disciples, who seemed to have formed by far the larger and more enthusiastic section of his admirers. The Director of

Criminal Intelligence writes: —"However spiritual the teachings or the life of Swami Vivekananda may have been, there is no doubt that some false prophets of Vedantism and even some of those who are accepted as genuine Swamis, are attracted to the work in Europe and America by the opportunities it provides for meeting on terms of intimacy with the ladies of the West."

While in America in 1894–95 Swami Vivekananda visited Detroit, Boston, Harvard and Chicago.

In America he had two disciples who were regularly initiated as Swamis of the Mission—

(i) Marie Louise *alias* Swami Abhayananda, a French lady; and

(ii) Leon Sandsbury *alias* Swami Kripananda, a Russian Jew.

In April 1890 Swami Vivekananda left America for England and stayed with Mr. Sturdy, a member of the Theosophical Society of England. Here his preaching also was attended with much success and he made the acquaintance of Professor Max Muller.

From England the Swami went to Zurich to attend the Ethical Conference, and thence to Kiel to pay a visit to Professor Deussen, the German Vedantist, who accompanied him on his return to London.

In December 1896 some hundreds of his admirers held a *conversazione* at the Institute of Painters in Water-Colours in Picadilly to bid him farewell and presented him with an illuminated address.

In 1897 the Swami returned to India accompanied by two Americans, a Mr. and Mrs. Sevier and an Englishman, a Mr. Goodwin, who were said to be his disciples He was given an address of welcome at Colombo on the 15th January 1897 and on the 26th idem was received in state at Pamban by the Raja of Ramand. Mr. Justice Subramaniya Iyer and others gave him an enthusiastic reception at Madras on the 6th February 1897. Swamis Niranchananda[21] and Abhedananda[22] and a Mr. Harrison, said to be a Buddhist, appear to have joined the party at Colombo.

On the 19th February 1897 Swami Vivekananda arrived in Calcutta where he was received with much enthusiasm. An address of welcome was presented to him at a crowded meeting presided over by Raja Benoy Krishna Deb, and it is noteworthy that

members of the National Congress joined in the movement to welcome him on his return. Subsequently at a lecture delivered by the Swami early in March the following members of the Congress were present: —the Hon'ble Mr. P. Ananda Charlu, the Hon'ble Mr. A. M. Basu, the Hon'ble Mr. Guru Prasad sen, Mr. J. Ghosal, Mr. N.N. Ghosh and Mr. Narendra Nath Sen, proprietor of the *Indian Mirror* (Calcutta).

In May 1897 Swami Vivekananda with five others Swamis of the *math* left Calcutta for an extended tour in Northern India. He visited Lucknow, Almora, Dehra Dun, Naini Tal, Bereilly, Sialkote, Lahore, Amritsar and other places.

On his return Swami Vivekananda established himself (in 1898) at Belur on the banks of the Ganges in the Howrah district, and inaugurated the Ram Krishna Mission for preaching practical Vedantism. He built a large two-storied house, where his disciples had free board and lodging and were taught Vedanta Philosophy. The house and the extensive grounds of the Belur *Math* originally belonged to Babu Rasik Lal Chandra, father of Kali Charan Chandra alias Swami Abhedananda, reffered to above.

In 1898 Swami Vivekananda made a second tour in Northern India, accompanied by four Bengali disciples and four English and American ladies. Among the latter were Miss Noble, commonly known as Sister Nivedita, whose history is detailed below, and Mr. Pitcher. They visited Naini Tal, Almora and Kashmir and returned to Calcutta in October of the same year.

Vivekananda's health having broken down he retired for rest to Deoghar. To restore his health he left shortly afterwards for England, accompanied by Miss Noble and Swami Turiyananda *alias* Haripada Chatarji, of Bosepara Lane, Calcutta.

In September 1900 it was reported that after a short stay in England the Swami had gone to America and had been given a splendid reception by his admirers in New York. After delivering a course of lectures there he made lecturing tour through California, where one of his numerous friends gave him 160 acres of land in aid of his mission.

He then sailed for France to attend the Paris Exhibition, where he had been invited to speak before the Religious Congress.

Vivekananda returned to India at the close of the year 1900, but his health again failing from over-work, he was obliged to give up all exertion.

In March 1901 he visited Dacca, and in the following month visited Shillong, where he is said to have been cordially received by Sir Henry Cotton, then Chief Commissioner. After his return to Calcutta he remained quietly at Belur, where he died suddenly on the 4th of July 1902 at the age of 39.

In a letter written shortly before his death he urged that numbers of young Indians should be sent every year to Japan, and deprecated their exclusiveness and adherence to caste obligations which prevented them from crossing the seas.

In the Spacious grounds attached to the Belur *Math* which are open to the public, the followers of Sri Rama Krishna collect daily to receive religious instruction from the resident Swamis and Bramacharis. The grounds contain the temple erected over the spot where Swami Vivekananda was cremated in 1902, which is immediately opposite the cremation ground of his *guru*, Sri Rama Krishna, on the other side of the Ganges. Two rooms in the *math* contain respectively all the personal property of Sri Rama Krishna and Swami Vivekananda, their clothing, beds, cooking utensils and some of their original writings. There is also a chapel attached to the *math* where Sri Rama Krishna is daily worshipped by his faithful disciples.

III.—SWAMI VIVEKANANDA AND THE UNREST IN INDIA.

As regards Swami Vivekananda's attitude towards the revolutionary movement in India, the Director of Criminal Intelligence has noted that there is not much that can be called directly political in the lectures of Swami Vivekananda. He, however, aspired to put all other religions of the world in their proper place as mere aspects of his reading of Hinduism, and could not therefore reconcile his religious teachings with the political domination of the Christians over the Hindus.

In discussing this question it must first be borne in mind that the family of Swami Vivekananda is tainted with sedition in the person of his younger brother, Bhupendra Nath Datta, who has been referred to above. Both brothers had the same object in view—a united India which would ultimately be freed from foreign domination. Bhupendra Nath sought to accomplish his ideal by means of a revolution against the Government established by law, while Vivekananda endeavoured to unity his countrymen

and awaken in them a sense of their power, as exemplified in their ancient history, through the Vedanta philosophy which taught the equality of all men and nowhere laid down the caste restrictions which subsequently grew up and formed the rock which disunited and split up the Indians in such a way as to enable a small number of Englishmen—all of one mind—to govern three hundred millions of his countrymen.

This aspect of the Swami's teachings is apparent from certain speeches and writings of his which it will be convenient to refer to here.

In reply to an address of welcome presented to him on his arrival in Calcutta, as referred to above, Swami Vivekananda urged his hearers to wake up. "Awake," he cried, "arise and stop not till the disired end is reached, young men of Calcutta, arise, awake, for the time is propitious, already everything is opening out before us; be bold and fear not...Arise, awake, for your country needs this tremendous sacrifice. It is the young men that will do it—the young, the energetic, the strong, the well-built, the intellectual—for them is the task and there are hundreds of thousands of such young men in Calcutta." It might be noted here that the highly revolutionary *Liberty* leaflets which have been circulated broad-cast over the greater part of India during the last year commence with this watchword of Vivekananda—"Arise, awake and stop not till the goal is reached."

In the same speech the Swami said that one of the great causes of India's misery and downfall is that she has narrowed herself and gone into her shell. "Therefore we must go out; the secret of life is to give and take. Are we always to sit at the feet of the Westerners to learn everything, even religion?"

In an address entitled "The work before us," which Vivekananda delivered at the Triplicane Literary Society of Madras, the Swami again states that one of the causes which has led to India's degeneration was "the narrowing of our view, narrowing the scope of our action." "What can you expect of a race which for hundreds of years has been busy in discussing such momentous problems as whether we should drink a glass of water with the right hand or the left? What more degradation can there be than that greatest minds of a country have been discussing about the kitchen for several hundreds of years, discussing whether

I may touch you or you touch me, and what is the penance for this touching? The themes of Vedanta, the sublimest and the most glorious conceptions of God and soul ever preached on earth, were half lost, buried in the forest, preserved by a few sanyasins, while the rest of the nation discussed the momentous questions of touching each other, and dress and food ...Then for good or bad, the English coquest of India took place. Of course every conquest is bad, for conquest is an evil. Foreign Goverment is an evil, no doubt, but even through evil comes good sometimes, and the great good of the English conquest is this: England, may the whole of Europe, has to thank Greece for its civilization. It is Greece that speaks through everything in Europe, every building, every piece of furniture has the impress of Greece upon it. European science and art are noting but Grecian. Today the ancient Greek is meeting the ancient Hindu on the soil of India. Thus, slowly and silently the leaven has come, the broadening out, the life-giving, and the revivalist movement, that we see all around us, has been worked out by all these forces together.... This is the great ideal before us, and every one must be ready for it,—the conquest of the whole by India. Nothing less than that, and we must all get ready for it, strain every nerve for it. Let foreigners come and flood the land with their armies. Never mind. Up, India, and conquer the world with your spirituality! Aye, as has been declared on this soil first, love must conquer hatred, hatred connot conquer itself Materialism and all its miseries can never be conquered by materialism. Armies when the attempt to conquer armies only multiply and make brutes of humanity. Spirituality must conquer the West. Slowly they are finding out that what they want is spirituality to preserve them as nations. Thay are waiting for it, they are eager for it."

Another of the same series of Swami's lectures, entitled the 'Future of India', will also repay examination.

In the course of his remarks of this occasion the speaker, addressing his hearers as the 'Children of India', said his object in reminding them about the glories of the past was that out of the past is built the future, "our ancestors were great. We must first recall that. We must learn the elements of our being, the blood that courses in our veins; we must have faith in that

blood, and what it did in the past; and out of that faith and consciousness of past greatness, we must build an India yet greater than what she has been. There have been periods of decay and degradation. I do not attach much importance to them; we all know that. Such periods have been necessary."

"The first plank in the making of future india", the Swami says, "the first step that is to be hewn out of that rock of ages, is this unification of religions. All of us have to be taught that we Hindus—Dualists, qualified Monist or Monists, or any other sects, such as Shaivas, Vaisnavas, Passupatas—all these various denominations have certainly common ideas behind them, and that the time has come when for the well-being of ourselves, for the well being of our race, we must give up all our little quarrels and differences. Be sure these quarrels are entirely wrong. They are condemned by our scriptures, forbidden by our forefathers; and those great men from whom we claim our descent, whose blood is in our veins, look down with contempt on their children quarrelling about minute differences."

The lecturer next proceeds to discuss and refute the theory that the Dravidian races in Southern India differ entirely from the Aryans in Northern India. "The only explanaation", he says, "is to be found in *Mahabharata,* which says that in the beginning of *Satyajug* there was one caste, the Brahmins, and then by differences of occupations they went on dividing themselves into different castes, and that is the only true and rational explanation that has been given. And in the coming *Satyajuga* all the other castes will have to go back to the same condition. The solution of the caste problem in India, therefore assumes this form, not to degrade the higher caste, not to crush out the Brahmin. The solution is not by bringing down the higher but by raising the lower to the level of the higher."

The Swami next discussed the question as to how a comparatively small number of Englishmen rule over three hundred millions of people of India, and attributes this to the fact that each of the three hundred millions has a will separate from the other, while the Englishmen put their wills together. "That means unbounded power. That is how it goes throughout the history of the world. You find in every case compact little nations

always governing and ruling huge unwieldy nations.... All these dissensions must stop."

He urged that secular education should be carried from door to door as they have already carried religion. "That can be easily done. Then the work will extend through these bands of teachers and preachers and gradually we shall have similar temples in every centre until we have covered the whole of India... Now, for that I want young men. It is the young, the strong and healthy, of sharp intellect, that will reach the Lord, says the *Vedas*. This is the time to dicide your future. Will you possess the energy of youth when you are worn out and jaded? ...Rouse yourself therefore, for the time is short. There are greater works to be done than aspiring to become lawyers and picking quarrels and such things. The far greater work is the sacrifice of yourselves for the benefit of your race... Life is short, but the soul is immortal and eternal, and one thing is certain—death. Let us, therefore, take up a great ideal and give up our whole life to it."

The proposals made here by Swami, i.e. sending out bands of preachers throughout India, were subsequently adopted by Barin Ghose and his followers as disclosed during the enquiries into the Maniktola Bomb Case. Reference will also be made later in this report to the use that was made by the revolutionaries in Eastern Bengal of the Swami's command to open centres throughout India.

Another lecture, entitled 'Modern India', is also of interest, as establishing the view of the Swami's teaching enunciated above. On this occasion the Swami did not confine himself to religious subjects, but discussd in somewhat bitter language the present position of the Indians in their own country.

He first of all sketched out briefly the decay of the priestly power in India with the deluge which swept the land by the advent of Buddhism, and the perpetual struggle for supremacy between the priestly and the royal classes, which began from the Vedic times and continued through the ages, till it reached its climax at the time of the Jain and Buddhist revolutions, a struggle which has now ceased for ever. He contiues: —"But at the end of this Muhammadan period, another entirely new

power made its appearance on the arena, and slowly began to assert its powers in the affairs of the Indian world.

> This power is so new, its nature and workings are so foreign to the Indian mind, its rise so inconceivable, and its vigor is so insuperable, that thought India is already wondering at its establishment throughout her length and breadth, she has seen only a small part of its play. The Indians can well understand what this power is.

"We are talking of the occupation of India by England.

"From very ancient time, the fame of India's vast wealth and her rich granaries has enkindled in many powerful foreign nations the desire of conquering her. She has been, in fact, again and again conquered by foreign nations. Then why should we say that the occupation of India by England was something new and foreign to the Indian mind? ...But, the sight of a country, of which the Vaisya (Trading) classes, wealthiest, though they be, were accustomed to pay the most servile reverence, going down on their knees, awe-striken, not only to the King, but to any member of a royal family,—of that country, a handful of Vaisyas coming for the purpose of carrying on trade in a foreign land, far across their native seas and oceans, would, merely by virtue of their shrewd intellect and wealth, gain her ancient and established Hindu and Muhammadan dynasties to their sides, and at last by degrees, make dupes of them, make puppets of them; and not only so, but that they would buy as well the services of the ruling powers of her own, and employ her arms, heroism and wisdom as powerful means for helping the influx of their own riches; —of a country, of which a proud Lord, sketched by the Divine pencil of its greatest poet, warns a common man against his affronteries to a noble man: 'Out, dunghill! darest thou brave a nobleman?' —of that country, the descendant of the mighty noblemen would, in no distant future, condescend, nay regard it as the topmost rung of the ladder of fulfilment of human ambition, to come to India as servants appointed in the service of a body of mercantile men, called the East India Company; —such a sight was, indeed, a novelty unseen by her before!!"

"What shall I say of India? Let alone her Sudra class, —her Brahmans, to whom belonged the acquisition of scriptural

knowledge, are now the foreign professors, her Kshatryas, the ruling Englishmen, and Vaisyas too, the English, in whose bone and marrow is the instinct of trade; so that, only the Sudraness—the beast-of-burdenness—is now left with the Indians themselves. A cloud of impenetrable darkness has at present equally enveloped us all. Now there is neither firmness of purpose nor boldness of enterprise, neither courage of heart, nor strength of mind, neigther aversion to maltreatment by others, not dislike for slavery, neither love in the heart, nor hope, nor manliness; but what we have in India are only deep-rooted envy and strong antipathy against one another, morbid desire to ruin by hook or by crook the weak, and, dog-like, to lick the feet of the strong... But there is hope. In the mighty course of time, the Brahman and the other higher castes, too, are being brought down to the lower status of the Sudras, and Sudras are being raised to higher ranks, Europe, once the land of Sudras, enslaved by Rome, is now filled with Kshatriya valour. Even before our eyes, powerful China, with fast strides, is getting on to Sudrahood, while insignificant Japan, rising with the sudden start of a rocket, is throwing off her Sudra nature, and is invading by degrees the rights of the higher castes. The attaining of modern Greece and Italy to Kshatriyahood, and the decline of Turkey, Spain and other countries, also deserve consideration here.

"Yet, a time will come, when there will be the rising of the Sudra class, with their Sudrahood; that is to say, not like that as at present when the Sudras are becoming great by acquiring the characteristic qualities of the Vaisya or the Kshatriya, but a time will come, when the Sudras of every country, with their inborn Sudra nature and habits,—not becoming in essence Vaisya or Kshatriya, but remaining as Sudras—will gain absolute supremacy in every society."

The following passages in the same speech show the bitterness of spirit in which the Swami regarded the present condition of his countrymen: —

> "To multiply and to have the opportunity of living a precarious from-hand-to-mouth existence, and over and above this, the condition that the religious pursuits of the higher castes may not suffer in any way, is of the highest gain and interest for Indians! For modern India there is no better hope

conceivable; this is the last rung of the ladder of India's life. The present Government of India has certain evils attendant on them and also there are some very great and good parts as well... Of these ideas and thoughts (i.e., those introduced by the English), some are really most beneficial to us, some are harmful, while other disclose, the ignorance and inability of the foreigners to determine what is truly good for the inhabitants of this country... India is slowly and gently awakening from her long deep sleep."

The Swami continues:—

"In the case of an absolute and arbitrary monarchy, the conquered race is not treated with so much contempt by the ruling power. Under such an absolute Government, the rights of all subjects are equal, in other words, no one has any right to question or control the governing authority. So, there remains very little room for special privileges of caste and the like. But, where the monarchy is controlled by the voice of the ruling race, or a republican form of Government rules the conquered race, there, a wide distance is created between ruling and the ruled; and the most part of that power, which, if employed solely for the well-being of the ruled classes, might have done immense good to them within a short time, is wasted by the Government in its attempts and applications to keep the subject race under its entire control... Because some individual Englishman may call us 'native' or 'nigger' and hate us as uncivilised savages, we do not gain or lose by that... But, gradually the idea is being formed in the minds of the English public, that the passing away of the Indian Empire from their sway will end in imminent peril to the English nation, and be their ruin. So, by any means whatsover, the supremacy of England must be maintained in India. The way to effect this, they think, is by keeping uppermost in the heart of every Indian, the mighty prestige and glory of the British nation. It gives rise to both laughter and tears simultaneously, to observe how this ludicrous and pitiful sentiment is gaining ground among the English, and how they are steadily extending their *modus operandi* for the carrying out of this sentiment into practise... When I see Indians dressed in

European apparel and costumes, the thought comes to my mind,—perhaps, they feel ashamed to own their nationality and kinship with the ignorant, poor, illiterate, down trodden people of India! Nourished by the blood of the Hindu for the last fourteen centuries, the Parsee is no longer a 'Native!' Before the arrogance of the casteless, who pretend to be and glorify themselves in being Brahmans, the true nobility of the old, heroic, high class Brahman metls into nothingness! Again, Westerners have now taught us that those stupid, ignorant, low caste millions of India, clad only in a loin cloth, are non-Aryans! They are, therefore, no more our kith and kin! Oh India! With this slander of others, with this base imitaion of others, with this dependence on others, this slavish weakness, this vile detestable cruelty,—wouldst thou with these provisions only scale the highest pinnacle of civilisation and greatness? Wouldst thou attain, by means of thy disgraceful cowardice, that freedom deserved only by the brave and heroic?"

The lecturer concludes by saying 'O Thou Mother of Strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and *make me a man.*"

Further passages in the same strain could be quoted from the Swami's speeches and writngs, but enough has perhaps been said to show how the main principles of the Swami's teachings appealed to the revolutionary party of the present day, and how they have been able to use his sayings and writings to sow the seed of revolution and anarchy in the minds of the Indian youths. Later on in this report it will be shown how the teachings of Arabinda Ghosh, the leader of the Maniktala conspiracy, were modelled on the same lines as Swami Vivekananda's, but with a more definite appeal to force or *Sakti,* which he maintained was necessary for the regeneration of India.

IV.—SISTER NIVEDITA.

It will be convenient to refer here to one of the most important of Swami Vivekananda's disciples, to whom reference has made above, viz,—Miss Noble or Sister Nivedita.

Her connection with the Swami, as one of his favourite disciples, has a distinct bearing on the political side of the Swami's work,

as Sister Nivedita was undoubtedly strongly imbued with nationalistic ideas.

She was born in October 1867 and was of Irish parentage on both sides. Her father, Reverend S. R. Noble, was a congregational minister. She first appears to have met the Swami in 1895, and again when he visited England in the following year. On this occasion she expressed her willingness to help him in his work and eventually sailed with the Swami for India in the early part of 1898. She accompanied the Swami in his wanderings in that year, and when at Almora she was finally convinced of he truth of Swami Vivekananda's teachings and was formally admitted into the order of Ram Krishna and became Sister Nivedita, which means "dedicated," as one of her Indian admirers writes: "Dedicated in very truth to the services of India." She settled down in Calcutta and lived a secluded life at No. 17, Bosepara lane, where she started a Bengali girls' school on the model of a Kindergarten. She dressed in semi-native fashion and went bare-headed and without shoes. She was not looked upon with much favour by the respectable Indians of Calcutta, as from all accounts she did not bear a good moral character and was living in a house with a number of young Bengalis. Her expenses were apparently met by the Ram Krishna Mission.

Her first literary achievement was "Kali the Mother" issued in 1900, and in 1904 she published the "Web of Indian Life." A review of this book in the pioneer of the 12th May 1905 points out that it is nothing more or less than a political pamphlet in disguise, the real object of which is the demonstration that India is a single nation and not a congeries of divided races and nations, and an appeal to that nation to realise its destiny by becoming independent. The reviewer's final criticism on the book is, "Its leading characteristic is cunning and its contents are mischievous." It will be noticed that the ideas here expressed by Sister Nivedita are merely an echo of the teachings of her master, Swami Vivekananda, referred to above.

During the Swami's life time she apparently had several disagreements with him, and on several occasions the Swami rebuked her severely for mixing herself up with politics. She was a staunch advocate of the *swadeshi* movement and adopted

Bande Mataram as the national cry of India. She toured in several parts of Bengal and lectured on the *swadeshi* movement.

In 1907, the *Bande Mataram*, a highly seditious organ, which was eventually suppressed by Government, reported that one of the persons who volunteered to stand surety for the Editor of the *Jugantar*, Bhupendra Nath Datta, was Sister Nivedita.

In the same year she went to Europe for the sake of her health, and in the beginning of the following year, Girindra Nath Mukharji, the well-known revolutionary, was reported to be living with her in London. She returned to India in 1909 and stayed at Bosepara lane. At this time the Ram Krishna Mission authorities repudiated all connection with her and stated that she severed her connection with them some time previous as they objected to her mixing herself up with politics. This matter will be referred to later.

In 1911 her health again gave away from overwork and she was obliged to proceed to Darjeeling for a change. She failed to benefit from the change and eventually succumbed to an attack of dysentry in October of that year.

Early the following year a mémorial meeting in her honour was held in the Town Hall in Calcutta, which was attended by Bipin Chandra Pal, Prabhas Chandra De, and other well-known members of the revolutionary party.

An Indian admirer, discussing Sister Nivedita and her connection with the National movement in India, writes as follows:—

> "Her influence upon the National movement in India, and especially in Bengal, it would be impossible to exaggerate. Two such competent judges as Messrs. Blair and S.K. Ratcliffe estimate that she more than anybody else created a passion for nationality in Bengal in recent times. Mr. Blair is of opinion that 'she probably did more to create an atmosphere of unrest than all the newspapers in the world.' Mr. S.K. Ratcliffe, speaking from intimacy of knowledge, lately wrote in the *Daily News* : —'It was through her spoken and written word that the idea of nationality became a living and absorbing force'."

In discussing Sister Nivedita and her connection with the *Math*, Saradananda, the present Secretary of the *Math*, said recently : —

> "Sister Nivedita wanted to turn the Mission into a political

movement. Swami Vivekananda quarrelled with her on this account, and for some time they were not on speaking terms. For some time before her death Sister Nivedita had separated herself from the Mission and was working on her own."

It has been noted above that the Ram Krishna Mission endeavoured openly to dissociate themselves from Sister Nivedita at the time when the latter made herself conspicuous by throwing in her lot with the Indian Nationalists. That she had actually severed her connection from the Mission was doubted at the time, and a recent publication of the Ram Krishna Mission on the "Women's work in the Mission", as carried out by Sister Nivedita and Sister Christina from the year 1905 to 1912, confirms these doubts, for we find in this pamphlet a generous recognition of the work done by Sister Nivedita in the Mission up to the date of her death; further, the "Sister Nivedita Memorial Committee" collected funds on behalf of the Ram Krishna Mission to "commemorate the hallowed memory of the late Sister Nivedita." Again, in a leading article in the *Bengalee*, which appeared a few days after her death, the writer says:—

"With the National movement in India she was previously in sympathy, and she knew most of the public men and was held in esteem by all who know her. By her death the Ram Krishna Vivekananda Mission, of which she was a most active member, is distinctly poorer."

Sister Christina, referred to above, an American lady, whose name is Miss Greenstile, is still carrying on Sister Nivedita's work among the *pardanashin* ladies in the Ram Krishna Mission School in Bosepara lane.

V.—THE JOURNALS OF THE RAM KRISHNA MISSION.

During his life time the Swami issued a fortnightly journal called the *Udbodhan*, containing articles and instructions on Hinduism. This organ of the Ram Krishna Mission, which is in existence at the present day, has in the main devoted itself to religious matters and does not, as a rule, discuss political subjects. It sets its face against politics and is rather of opinion that the regeneration of India is to be worked by the dissemination of Vedantic teachings among the masses and not by political agitation. Exceptions to its general tone are two articles which

appeared in the latter end of December 1912, of which the following are translations:—

> "You have all been hypnotised. Your rulers tell you that you are low, subjugated and without any strength, and for a thousand years you think yourselves to be a low, useless and defeated people. And constant brooding over such ideas made you what you believed yourself to be. This body of mine is also made of the earth of your own country, but I have not learnt to think of myself like that. Consequently, those very people who used to look down on us are now, by God's will, respecting me like a god. If you all can think that you are possessed of endless power and knowledge and of indomitable energy, and if you can rouse your power, you will be able to become what I am."
>
> "Piping cannot lead men into salvation. What is now wanted is the keen-edged sword and a war to death. It is necessary now to worship Rama with the bow, Mahabir (i.e. Hanuman, the monkey god) and Mother Kali. The worship of the mother requires blood—human sacrifice."

Two English monthly journals entitled *Prabuddha Bharata* and *Brahmavadin* are published by the Mayavati and Madras Branch Missions respectively. They are believed to confine themselves to religious matter.

VI.—THE DEVELOPMENT OF THE RAM KRISHNA MISSION FOLLOWING THE DEATH OF SWAMI VIVEKANANDA.

On the death of Swami Vivekananda, the control of the Mission was vested in Swami Brahmananda, who became president, a post which he still occupies. His real name is Rakhal Das Ghosh, of Basirhat, 24-Parganas. He has been a member of the Mission since the year 1880.

Saradananda Swami, referred to above, became the Secretary of the Mission, a post which he still holds.

In the course of time branch *asrams*, affiliated and controlled by the Central Mission at Belur, were established at—

(1) Muthiganj, Allahabad, attached to which is a *Seva Asram* for affording medical relief to the poor.

Similar institutions were opened at—

(1) Laskar, in Benares City,

(2) Bangsibhat, Brindaban, Muttra,

(3) Konkhal in Saharanpur,

(4) Barisal (Ram Krishna Mission), and

(5) Sargachi in Mushidabad (Mission Orphanage),

While recognised branch centres of the *Math* have been established at the—

(1) Ram Krishna Home, Mylapore, Madras,

(2) Ram Krishna *Asram*, Gol Temple Road, Bangalore City,

(3) Adavatya *Asram*, Benares,

(4) Adavatya *Asram* and Mayavati at Almora, and

(5) Udbodhan and the Holy Mother's Calcutta residence, at Nos. 12 and 13, Gopal Chandra Neogi's Lane, Calcutta.

The holy Mother is Saradamoni Devi, Sri Rama Krishna's wife, whose history has been detailed above.

These institutions are in existence at the present day, and are the only ones for which the authorities at Belur accept full responsibility. In addition to these there are numerous other Ram Krishna *Asrams* throughout Bengal, several of which have applied for affiliation to the Ram Krishna Mission, but have not yet been definitely affiliated. This matter will be discussed in more detail later on.

VII—THE CONNECTION OF THE MISSION WITH THE REVOLUTIONARY PARTY.

Attention was directed to the Mission in 1906, when Abhedananda Swami, referred to above, arrived at Howrah from America. He was met at the Howrah railway station by several members of the extremist party, and was greeted with loud shouts of *"Bande Mataram."* This man published in that year, under the title of "India and Her People," a series of lectures he had recently delivered in America. The book is in many parts objectionable and, in some cases clearly seditious, and has been proscribed under the Press Act by the Government of Bombay.

As already reported, Abhedananda returned to New York in December of the same year, taking with him Swami Premananda to assist him in his work. Abhedananda is still in America and is reported to be in charge of a centre near New York.

During the enquiries into the Maniktala bomb case, the Mission again attracted the attention of the police. Arabinda Ghosh, the

leader of these conspirators, in his defence, said :—

> "At one time I contemplated a large religious movement based on the Vedanta movement and spreading over India, England and America, as I firmly believed, and still believe, that Vedantism is the future religion of the world. With that view I worked hard for a few months and approached many of my friends and acquaintances."

In pursuit of this ideal, Arabinda published in 1904 in Baroda a pamphlet entitled *"Bhawani Mandir,"* which was exhibited in court in the trial of the Maniktala conspiracy case. In this publication Arabinda set out his proposal for the establishment of a temple consecrated to *Bhawani,* the Mother, among the hills. "To all the children of the Mother the call is sent forth to help in the sacred work." Subsequent enquiries led us to believe that Amarkantak, in Rewa, was the actual site which, Arabinda had in view for his temple. *Bhawani,* difined by the writer, is the "Infinite Energy." "She also is *Durga,* She is *Kali,* She is *Radha,* the Beloved, She is *Lakshmi,* She is our Mother and the Creatress of us all." *"Bhawai is Sakti"* (strength).

We in India, he adds, fail in all things for want of *Sakti.* Our energy is a dead thing for want of *Sakti.* Our *Bhakti* (devotion) cannot live and work for want of *Sakti.*

After discussing each of these propositions in detail, the writer arrives at the conclusion that India, therefore, needs *Sakti* alone :—

> "The deeper we look, the more we shall be convinced that the one thing wanting, which we must strive to acquire before all others, is strength—strength physical, strength mental, strength moral, but above all, strength spiritual, which is the one in exhaustible and imperishable source of all the others. If we have strength, everything else will be added to us easily and naturally. In the absence of strength we are like men in a dream, who have hands but cannot seize to strike, who have feet but cannot run.
>
> "India, grown old and decrepit in will, has to reborn."

The writer goes on to show that India can be reborn. That the suggestion that India is decayed, bloodless and lifeless, too weak ever to recover and that the Indian race is doomed to extinction, is a foolish and idle saying. He continues:

"WHAT IS A NATION? THE 'SAKTI' OF ITS MILLIONS."

"For what is a nation? What is our mother country? It is not a piece of earth, nor a figure of speech, nor a fiction of the mind. It is a mighty *Sakti*, composed of the saktis of all the millions of units that make up the nation, just as *Bhawani Mahisha Mardini* sprang into being from the *Saktis* of all the millions of gods assembled in one mass of force and welded into unity. The *sakti* we call India, *Bhabani Bharati*, is the living unity of the *Saktis* of three hundred million people; but she is inactive, imprisoned in the magic circle of *Tamas*, the self-indulgent inertia and ignorance of her sons. To get rid of *Tamas*, we have but to wake the Brahma within.

"IT IS OUR OWN CHOICE WHETHER WE CREATE A NATION OR PERISH"

"What is it that so many thousands of holy men, *Sadhus*, and *Sanyasis*, have preached to us silently by their lives? What was the message that radiated from the personality of Bhagwan Rama Krishna Paramhansa? What was it that formed the Kernel of the eloquence with which the lion-like heart of Vivekananda sought to shake the world? It is this, that in every one of these three hundred millions of men, from the Raja on his throne to the coolie at his labour, from the Brahmin absorbed in his *sandhya* to the Pariah walking shunned of men, God liveth. We are all gods and creators, because the energy of God is within us and all life is creation; not only is the making of new forms creation, but preservation is creation; destruction itself is creation. It rests with us what we shall create: for we are not, unless we choose, puppets dominated by Fate and *Maya;* we are facets and manifestations of Almighty Power.

"INDIA MUST BE REBORN, BECAUSE HER REBIRTH IS DEMANDED BY THE FUTURE OF THE WORLD."

"India cannot perish, our race cannot become extinct, because among all the divisions of mankind it is to India that is reserved the highest and the most splendid destiny, the most essential

to the future of the human race. It is She who must send forth from herself the future religion of the entire world, the Eastern religion which to harmonise all religion, science and philosophies, and make mankind one soul. In the sphere of morality, likewise, it is her mission to purge barbarism (mlecchahood) out of humanity and to *aryanse* the world. In order to do this, she must first fearyanise herself.

"It was to initiate this great work, the greatest and most woderful work ever given to a race that Bhagawan Rama Krishna came and Vivekananda Preached. If the work does not progress as it once promised to do it is because you have once again allowed the terrible cloud of *Tamas* to it settle down on our souls —fear-doubt hesitation suggishness. We have taken—some of us—the *Bhakti* which poured forth from the one, and the *Jnan* us given by the other, but from lack of *Sakti,* from the lack of Karma, we have not been able to make our Bhakti a living thing. May we yet remember that it was *Kali,* who is *Bhawani,* Mother of Strength, whom Rama Krishna worshipped and with whom he became one.

"But the destiny of India will not wait onn the falterings and failings of individuals; the Mother demands that men shall arise to institute her worship and make it universal. To get strength we must adore the Mother of Strength. Strength then and again strength and yet more strength is the need of our race."

Still following the precepts of Vivekananda, Arabinda next referred to the example of Japan, remarking that there is no instance in history of a more marvellous and sudden upsurging of strength in a nation than modern Japan.

> "It was the Vedantic teachings of Oyomei and the recovery of Shintoism with its worship of the national *Sakti* of Japan in the immage and person of the Mikado that enabled the little island empire to wield the stupendous weapons of Western knowledge and science as lighty and invincibly as Arjun wielded the *Gandiv.*"

"INDIA'S GREATER NEED OF SPIRITUAL REGENERATION"

> "India's need of drawing from the fountais of religion is far greater than was ever Japan's for the Japanese had only to revitalise and perfect a strength that already existed.

We have to create a strength where it did not exist before; we have to change our natures, and become new men with new hearts; to be born again."

The writer points out that all great awakenings in India, all her periods of mightiest and most varied vigour, have drawn their vitality from the fountain-heads of some deep religious awakenings.

He concludes by saying that three things are needful at the present time answering to three fundamental laws:—

"I—BHAKTI THE TEMPLE OF THE MOTHER"

"We cannot get strength unless we adore of the Mother of Strength.

"We will, therefore, build a temple to the white Bhawani the Mother of Strength, the Mother of India. We will build it in a place far from the contamination of modern cities and as yet little trodden by man, in a high and pure air steeped in calm and energy. This temple will be the centre from which Her worship is to flow over the whole country; for there worshipped among the hills She will pass like fire into the brains and hearts of Her worshippers. This also is what the Mother has commanded.

II.--KARMA, A NEW ORDER OF BRAHMACHARINS"

"Adoration will be dead and ineffective unless it is transmuted into *Karma.*

"We will, therefore, have a *math* with a new order of *Karma-Yogins* attached to the temple, men who have renounced all in order to work for the Mother. Some may, if they choose, be complete *Sanyasins,* most will be Brahmacharins who will return to the *grihasthasram* when their alloted work is finished; but all must accept renunciation.

"Why For two reasons:—

"(1) Because it is only in proportion as we put from us the preoccupation of bodily desires and interests, the sensual gratifications, lusts, longings, idolences of the material world, that we can return to the ocean of spiritual force within us.

"(2) Because for the development of *Sakti* entire concentration is necessary; the mind must be devoted entirely to its aim as a spear is hurled to its mark; if other cares and longings distract the mind, the spear will be carried out from its straight course and miss the target. We need a nucleus of men in whom the Sakti is developed to its uttermost extent, in whom it fills every corner of the personality and overflows to fertilize the earth. These, having the fire of *Bhawani* in their hearts and brains, will go forth and carry the flame to every nook and cranny of our land.

"III. - JNAN, THE GREAT MESSAGE"

"*Bhakti* and *Karma* cannot be perfect and enduring unless they are based upon *Jnana.*

"The Brahmacharins of the Order will, therefore, be taught to fill their souls with knowledge and base their work upon it as upon a rock. What shall be the basis of their knowledge? What, but the great *So-aham,* the mighty formula of the Vedanta, the ancient gospel which has yet to reach the heart of the nation, the knowledge which when vivified by *Karma* and *Bhakti* delivers man out of all fear and all weakness."

This pamphlet, *Bhawani Mandir,* has been referred to at some length, because we have here in unmistakeable language the teachings of Swami Vivekananda taken up by Arabinda Ghosh, who may be called the founder of the revolutionary movement as it now exists in India, and set out by him, with certain embellishments, as a revolutionary gospel to his fellow-countrymen. Swami Vivekananda's work, in Arabinda's opinion, did not progress, as it once promised to do, from lack of *Sakti,* or strength, and *Karma,* or action. India having been awakened and reborn by the inspiration drawn from the teachings of Vivekananda and Sri Rama Krishna, the united energies of the three hundred millions of her people were to be translated into action to effect her emancipation. An exact parallel is drawn by Arabinda from the marvellous example of Japan. The Swami had himself previously held up Japan as an example to his hearers, but it remained for Arabinda to point out that it was the Vedantic teachings of Oyomei, coupled with the recovery of Shintoism,

with its worship of the national *Sakti* of Japan in the image and person of the Mikado, which led to this sudden "up-surging of strength" which is without a parallel in the history of the world.

Arabinda, however, was not the only one of those implicated in the Maniktala conspiracy who was interested in the teachings of Vivekananda.

The house at Mayavati, near Almora, was always kept hospitably open by the late Swami Swarupanand to all seekers after the truth, Amongst his pupils, who took advantage of his hospitality, were Upendra Nath Banarji, who was sentenced to transportaion for life in the Maniktala case, and Hishikesh Kanjilal, who was sentenced to ten years rigorous imprisonment in the same case. They both admitted their connection with the Asram at Almora, where they were being prepared for initiation into the order of *Sanyasin,* but they left the place long before their term of probation was over. Here they met Ram Chandra Prabhu, of Bombay, Who afterwards harboured some of the Bengal anarchists, when they visited that part of India. Indra Nath Nandi, another member of the anarchist gang, who was eventually acquitted on appeal by the High Court in the same case, was also, on his own showing, connected with this *Asram.*

The *Asram* at that time was under the control of Captain and Mrs. Siever, two of Swami Vivekananda's American disciples. Mr. Siever died in 1900, and Mrs. Siever is still at the head of the *Asram.* The Director of Criminal Intelligence reports that she is said to have been much disgusted to learn that men who had studied at Mayavati had turned out unworthy of the teaching they had received, but she was apparently a sympathiser of nationalism of an extreme type, as before she left India in 1905, she paid a visit to Tilak's wife in Poona. Sedition was not, however, countenanced at Mayavati in her time.

Three other members of the Maniktala conspiracy case were also directly connected with the Ram Krishna Mission, namely, Kunja Lal Shaha, Debabrata Basu and Sachindra Kumar Sen, who were all acquitted. The two latter have now been regularly admitted to the Ram Krishna Mission. The former calls himself Pragyananda, and the latter Sachindra Brahmacharya. They are

reported to have completely renounced their former ideas and companions and devoted themselves entirely to a religious life. Kunja Lal Shaha, was connected with the branch *Asram* at Mylapore in Madras.

Bababhusan Mitra, who was convicted in the Maniktala case, was also a regular frequenter of the Belur *Math*. One of the accused in this case, when under trial, made a statement to the police, in which he referred to Bababhusan's connection with the *Math*.

Further light was thrown on the effect produced in the minds of the revolutionary youths by the teachings at the Belur *Math* at that time by certain searches which were made during the enquires into the Maniktala conspiracy ; these searches also showed the connection which existed between the Calcutta *Anushilan Samiti*, a revolutionary organization which was proscribed by the Goverenment of Bengal in 1910, and the Belur *Math*

In 1908, the premises, No. 117, Amherst Street, known as the National Students Mess, were searched in connection with the Alipur bomb case. The exhibits seized at of this mess prove that several inmates of the mess were members of the *Anushilan Samiti*, and also clearly showed that the mess was a hot-bed of revolutionary and anarchical ideas. A reference to the Calcutta *Anushilan Samiti* occurs in an exercise-book belonging to a student named Kula Chand Singh Ray, Dated 1907, which showed that some 30 students of the National College combined with the members of the *Anushilan Samiti* to act as volunteers at the *Math* on the anniversary of Swami Vivekananda's birthday Another entry in this book mentions an earlier visit to the *Math*, and suggests that the place was intended to be a centre of revolutionary teaching. There is also a record of some remarks by Nirmalananda Swami *alias* Tulsi Charan Datta, of Bosepara Lane, who is now in charge of the Bangalore centre of the Ram Krishna Mission.

Nirmalananda on this occasion urged the necessity for physical exercises and the study of higher Mathematics, but requested his hearers to read the works of Vivekananda, and bring difficult passages to him for explanation. He then proceeded — "We want boys, not the old, boys energetic, not enervated, weak adults. Secure all boys for the work. This *Math* is for your

use. Not to speak of the deliverance of the country, you will be able to deliver the world."

These articles show the two features of the *Anushilan Samiti* system—the study of Vivekananda's works, which were *Anushilan* text books, and the attempt to capture young and impressionable boys.

It may be noted here that this reference to Nirmalananda's teaching was put before Saradananda Swami, the present Secretary of the *Math,* as well as another Swami of the *Math.* Neither of them was able to explain how Kula Chand got this impression from the Swami's teaching; they both thought that his discourse on this occasion must have been misunderstood by the students.

From the papers seized at the search mentioned above it also appears that a party of students went to Belur by boat for the celebration of Swami Vivekananda's birthday anniversary in 1908, the river passage on this occasion called forth the following remarks from one of them, by name Harendra Chandra Pal, as recorded in his diary:—"To-day we all seek to cross over to the other bank of this small river Ganges. When we shall be able to unfurl the banner of independence on the other side of thraldom and make all sides resound with the throbbings of triumphant drum and the cries of *Bande Mataram,* then we should be so very happy. To think of it even in imagination the mind becomes filled with energy and joy."

Another prominent member of the Calcutta *Anushilan Samiti,* who was about this time closely connected with the Belur *Math,* was Jogendra Nath Tagore *alias* Jogen Thakur, a prominent member of the *Jugantar* and *Jubak Mandali-Sarathi* organisations.

Another incident illustrative of the methods by which the members of the revolutionary party seized upon the teachings of Vivekananda Swami and adopted them to suit their own ends, also came to notice about this time. Vivekananda advised his followers to tour in the villages, and attract the attention of the masses by means of magic-lantern lectures. Indra Nath Nandi, referred to above, made an extensive tour in Bengal on behalf of the Maniktala gang, in the course of which he used a magic-lantern to attract the attention of his hearers, on the lines laid down by the Swami. Since that time several other similar instances have been reported.

VIII.--INCORPORATION OF THE RAM KRISHNA MISSION UNDER ACT XXI OF 1860

In April, 1909, the Ram Krishna Mission was duly incorporated under Act XXI of 1860 under the name of the Ram Krishna Mission. The objects of the association, as set out in the memorandum of association, are *inter alia*—

(1) To impart and promote the study of the Vedanta and its principles, as propounded by Sri Rama Krishna, and practically illustrated by his own life, and all comparative theology in its widest form.

(2) To impart and promote the studies of the arts, sciences and industry.

(3) To train teachers in all branches of knowledge, above mentioned, and enable them to reach the masses.

(4) To carry on educational work among the masses.

(5) To establish, maintain, carry on, and assist schools, colleges, orphanges, workshops, laboratories, hospitals, famine-relief works and other educational and charitable works and institutions.

(6) To print and publish, and to sell or distribute gratuitously, or otherwise, journals, periodicals, books or leaflets, that the association might think desirable for the promotion of its objects.

IX.—GROWTH OF VILLAGE ASRAMS.

The Swamis of the Mission at this time toured frequently throughout Begal and Eastern Bengal and Assam where their teaching attracted considerable attention.

Although, with the exception of those named above, the Ram Krishna Mission does not accept responsibility for the control of any other branch *asrams*, several such *asrams* were established in Bengal and Eastern Bengal and Assam which were visited by the Swamis from headquarters when on tour.

A branch *samiti* at Dacca was started as far back as 1898 by Swami Prokashananda *alias* Susil Kumar Chakrabarti, of Naragirja, Bow Bazar, Calcutta, who is now at the San Francisco centre in America, and Swami Birajananda, of the Belur *Math*, who visited Dacca at that time.

This branch ceased to exist in 1905 for lack of interest, but in 1907 it was revived, mainly through the influence of the clerks in the Eastern Bengal and Assam Secretariat. It numbered among its members one Surendra Chandra Basu formerly a political *surveille*, who was suspected in the *Janmastami* stabbing case, an outrage for which the members of the Dacca *Anushilan Samiti*, were responsible.

Branches of the Ram Krishna Mission were also established by the local people at Sabjimahal, Munshiganj, Narayanganj and Bajrajogini, in the Dacca district.

In Murshidabad the Anath *Asram* referred to on page 12 was opened at Sargachi village about the year 1900. It was founded and is still managed by Swami Akhadananda, of the Ram Krishna Mission. This man, Akhadananda *alias* Ganguly *alias* Banarji was born in 1868 in Calcutta, where his younger brother is employed as an overseer in the Calcutta Municipality. Akhadananda has been working since the year 1897 in the Murshidabad district, where the half-educated villagers were at first greatly charmed by his religious lectures; in fact, reports show that he was at one time worshipped as a god by many of the villagers. He worked for some time in Mohulla village. He then settled in the neighbouring village of Sargachi, where he opened the existing Anath *Asram* Orphanage, in which there are at present about 12 boys under his care.

In Hoogly two *asrams* were opened, one at Konnagar and another at Gowarhatta.

In Nadia a branch was opened at Janipur village.

In Bankura town, during the year 1911, a Ram Krishna *Sevasram* was started by a pleader, Mr. C.K. Sen, a follower of Swami Vivekananda, who made himself conspicuous in 1907-08 by organizing meetings advocatin boycott and agitation against the partition of Bengal.

In a Faridpur a Ram Krishna *Sevasram* was opened in 1912. Two of the leading members of this *Sevasram* were political suspects.

During this year a branch of the Ram Krishna Mission was also opened in Agartala, the capital of Hill Tippera State, a well-known retreat for political refugees from Bengal. —

This branch appears to have been established by the members of the revolutionary party in Hill Tippera and was regularly

attended by several well-known suspects including Priya Nath Banarji, who was concerned in the murder of Inspector Nripedra Ghosh in January last, and Nishi Kanta Ghosh, an active organiser in Hill Tippera, who was sentenced to 4 year's rigorous imprisonment in the Barisal conspiracy case.

During this period certain incidents were reported reflecting on the political aspect of the mission which, thougth not directly connected with the growth of the mission, may be conveniently referred to here.

In January 1911, Myron H. Phelps, the American lawyer referred to above, then touring in India, addressed a meeting in the Ram Krishna Hall, Mylapore, Madras, on the educational awakening and the regeneration of India.

In this year we also find Nalini De, a political suspect, who identified himself with the Calcutta branch of the revolutionary movement, living with Brahmananda Swami, the President of the *Math* at Puri, and returning with him to the headquarters of the mission at Belur. This man, Nalini, has now definitely joined the mission, and is undergoing his period of training as a Brahmaachari of the *Math.*

In February 1912 there was a large gathering at the Belur *Math* to celebrate the birthday of Rama Krishna, at which Liyaqat Husan, a paid orator of the revolutionary party, is reported to have sung a highly seditious song urging his hearers to be prepared to serve their country and sacrifice their lives.

At this, and at all similar gatherings at Belur, large mumbers of the revolutionary party are reported to have been present. The authorities of the *math* very reasonably point out that as the grounds are open at all times to the public, who flock there in their thousands of such occasions, the presence of undesirable persons cannot well be obviated. They cannot, however, absolve themselves so easily from the responsibility which necessarily attaches to them for seeing that such persons do not utilise these gatherings for preaching sedition to the assembled multitudes, and do not take any part in assisting the staff of the *math* on such occasions, thereby leading the visitors to believe that they are in some way connected, and or at any rate on friendly terms with the staff of the *Math.*

This matter will be touched upon again later on.

X. - VILLAGE ASRAMS AND THE REVOLUTIONARY MOVEMENT

Although it will be seen from the foregoing that it was generally known that the Ram Krishna Mission was gradually expanding and that it had not divorced itself entirely from politics and undesirable politicians, the extent to which in authorised, or rather bogus village *asrams* had sprung up in Eastern Bengal was not fully realised until the enquires made in 1913 into what is known as the Barisal conspiracy case, in which 36 members of the revolutionary party in Eastern Bengal were eventually placed on their trial, of whom 12 pleaded guilty and were sentenced to transportation and various terms of imprisonment.

These men, for the most part members of the proscribed Dacca *Anushilan Samiti,* banded themselves together, gained recruits with startling rapidity and embarked on an organized career of crime, including murders and dakaities, on the lines laid down by Pulin Das, the notorious captain-general of the Dacca *Samiti.*

At an early stage of this enquiry attention was directed to the procedure adopted in some cases by the leaders of this gang for attracting recruits to their ranks by suggesting that their society was the Ram Krishha Mission, a religious organization, and supressing all reference to its revolutionary aims until the intended victmis were ready to receive such teachings. Further, bogus Ram Krishna *asrams* were opened by them in numerous villages in order to provide meeting places for the conspirators, where they might assemble without attracting undue attention from the police or the villagers.

This procedure was definitely laid down in the "District Organisation Scheme," drawn up for the guidace of the members of the revolutionary party, which was found on the person of Ramesh Chandra Acharya, one of the leaders of this gang, who was subsequently convicted. One of its rules ran as follows:—

> "If the members cannot meet ordinarily in a common place for the discussion of business matter, they shall meet under the pretext of celebrating *harir looth* or some such ceremony."

Enquiries showed that Ram Krishna *asrams* were opened in numerous villages throughout Eastern Bengal with this object in view.

In the course of his depostion in the Barisal conspitacy case, Rajani Das, the approver, stated the *samiti* was referred to in the letters passing from one member to another as the Ram Krishna Mission for fear of detection in case the letters should go astray. In cross-examination Rajani stated, "the name Ram Krishna Mission was used to me when I was first addressed on the subject of joining the *samity.*" He added, "That is how people use to be deceived." "And again, if I feared that a person whom I approached with a view to recruiting him would not listen to me if I spoke of a *Swadeshi samiti,*I would speak to him of a religious body, the Ram Krishna Mission... When I was first approached on the subject of the *samity* I thought I was expected to join a religios society, the Ram Krishna Mission." The approver's statement is strikingly corroborated by the following significant passage taken from a letter written by Jatindra Nath Ray *alias* Fegu, one of the leaders of the Barisal gang, who was convicted in the same case, to Rajani. "Immediately on receipt of this letter you should go on to Patuakhali, and having gone there, see whether you can, by any means, bring anybody to the Ram Krishna Mission. You should make special endeavours."

Another letter of Fegu Ray's written from Dacca to the *samiti* members, stated that a man was being sent from Dacca and they, the members, would know him as he would have a lot of Vivekananda's books in his hands. The man was also to show as a sign a slip bearing "Om Nama Bhagabati Ram Krishna Mission." The contents of the letter showed that this emissary was to take over charge of the Barisal branch of the conspiracy.

Another member of this consipracy, who was largely instrumental in inducing Rajani to join the *Samiti,* gave information that at Abhoynil, another village in the Bakarganj district, a suspicious Ram Krishna Mission had been started. Fegu Ray once told this informant that under the guise of such missions the members of the revolutionary party would have an opportunity of meeting one another and devising means for carrying on their work.

Further information in this connnection came from an absolutely idependent source in Dacca. Basanta Bhattacharji, an old member of the conspiracy, gave information about this time to the police

regarding the doings of this gang, the importance of which information was unfortunately shown by his assassination at the hands of the revolutionary party in Dacca last year. This man, after stating that the object of the *Samiti*, as far as he knew it, was to organise a revolution against the British Government, to drive the British from India and to establish a Hindu administraton in its stead, added, "Every member is in duty bound to collect other people to join this *samiti* by reading Vivekananda's works," and again, in speaking of the places outside Bengal to which members are sent, Basanta, stated, "Madras is the main headquarters where many, in the guise of followers of Vivekananda live, who all belong to this secret society."

"There is a Ram Krishna Mission in Farashganj, Dacca, in the name of Farashganj Ram Krishna Mission. Gyan Ranjan (Gyan Ranjan Chattarji), a member of the society, asked me to go there some three months ago. I went there in the evening and found some *Utshab* was being celebrated there.

"Narendra Nath Sen, Pratul Ganguli, Madan Bhaumik and many others were present in the place. Gyan was also there. We took some refreshment and all then dispersed. Gyan attends this mission almost every Saturday."

Narendra Sen and his two companions, referred to in this report, are three of the most desperate and dangerous members of the present anarchical movement in Bengal.

In a later report, dated the 12th September 1913, shortly before his assassination, Basanta reported that Gyan Ranjan was a regular attendant at the Ram Krishna Mission at Farashganj, Dacca. He also explained how recruits were attracted by the reading of *Ram Krishhna Kathamirta* and Vivekananda's *Karma Yog*.

The house of Debendra Nath Ghosh at Barisal, who was one of the leaders of the conspiracy, contained a Vivekananda Library, with a complete set of Vivekananda's works, a copy of the rules of the Vivekananda Library and a book list of the same. These books which included the *Ram Krishna Kathamirta* mentioned above, were evidently intended for circulation among the members of the gang in Barisal.

More recently still Janaki Nath Ghosh, who was convicted in the Barisal conspiracy case, made a statement in the jail

where he is at present serving his sentence, in which, dealing with the question as to how he came to join the secret society, he said he was urged by Jotin Ray and Ramesh Acharji, two of the leaders of the sociery to join the Ram Krisha Mission.

Further enquiries made in this connection leave no doubt as to the extent to which these village Ram Krisha *asrams* have spread throughout the districts in Eastern Bengal which are mostly deeply tainted with the revolutionary spirit.

One of the most prominent members of the revolutionary party in Eastern Bengal, who was himself at one time an active organiser, but has recently been giving information to the authorities, which has proved to be thoroughly trust-worthy, said *a propos* of the Ram Krishna Mission and its branches in Eastern Bengal :—"As far as I know, the headquarters mission at Belur has no connection with the revolutionary movement. But numerous small Ram Krishna *asrams* have been started throughout Eastern Begal. They were started with honest intentions, but subsequently members of the revolutionary party joined them and these *asrams* are now used to spread the 'idea'. As far as I know practically all the revolutionaries in Eastern Bengal call themselves followers of Ram Krishna, and when opportunity offers they visit the Belur *Math*. All the village *asrams* in Eastern Bengal are equally bad. I cannot say what the total number of these *asrams* is. In Bikrampur there is one in almost every viillage. They are of recent growth, i.e, since 1910. It was Makhan Sen's idea to start village Ram Krishna *asrams.*" Makhan Sen, referred to by this source, became the leader of the revolutionary movement in Eastern Bengal after the deportation of Pulin Das referred to above.

In the latter part of 1913, the attention of the police was again directed to the Ram Krishna Mission in connection with the various parties which were organised by private bodies for work in the districts of Burdwan, Hooghly and Midnapur which had been devastated by the floods caused during the previous rains. Enquiries then made showed that the opportunity thus afforded for gathering together in circumstances which did not arouse the suspicion of the police, was eagerly seized upon by the revolutionary parties, both of Eastern and Western Bengal,

who flocked to the flooded areas in considerable numbers and doubtless utilised the opportunity thus afforded to map out their future plan of campaign. One report showed that Amarendra Nath Chatarji, who was a leader of one of these parties, was endeavouring to open branches of the Ram Krishna Mission in the areas in which he and his party had been working. This man, Amarendra Nath Chatarji, is well-known to the police and the information recently gathered regarding him shows him to be an exceedingly active and dangerous conspirator at the present time.

Questioned regarding this man's conection with the Ram Krishna Mission, Saradananda Swami, the Secretary, repudiated any responsibility for Amarendra Nath's doings on flood-relief work. He, however, admitted that Amarendra Nath obtained financial help from the Ram Krishna Mission to the extent of Rs. 200 for work on the flood relief operations. That Amarendra Nath is at any rate a *persona grata* with the authorities at Belur is also apparent from the fact that we find him assisting them on the occasion of their festivals. This will be referred to later. The Ram Krishna Mission had a party of its own working in the flooded areas under Brahmachari Gyanananda *alias* Gyananda Das Gupta, of Barisal, Saradananda promised to give the names of the members of this party, but was eventually only able to supply the names of four of them. These included the name of one Prionath, full details regarding whom Saradananda was unable to give. It is significant that at the search of No. 296-I, Upper Circular Road in November last, where Amrita Hazra and three others, now under trial in what is known as the Rajabazar bomb case, were arrested in possession of bomb-shells, a slip was found in Amrita's confidential notes in which the name "Prionath Das, Ram Krishna Mission head relief centre, Chandpur, Ishapur police-station, Midnapur," is recorded. This appears to be the Prionath mentioned by Saradananda as a member of this party. He is, according to Saradananda, at present on probation at the *Udbodhan* office and so is connected with the work of the Ram Krishna Mission. (See *Addendum* to this note.)

Amongst the correspondence which was intercepted during the enquiries into the Rajabazar case, the Ram Krishna Mission again

comes to notice in a somewhat suspicious post-card signed "Atul," sent from Mayavati, which runs as follows—

THE PRABUDHA BHARATTA OFFICE
MAYAVATI, LOHAGHAT P.O.,
DISTRICT ALMORA, U.P.,
Dated the 3rd March 1914

Brother Benode,

I have not heard from you for a long time. I hope you will not forget to make me happy by informing me in reply to this letter.

I have suddenly come to the Himalayas from the flood-relief work at Midnapur. The flood-relief work at Midnapur is going on well How are you prosecuting your studies? See that you keep good health. It is good to take exercise regularly How can I describe this place? It is very beautiful and is suitable for the *Sadhus*. This is really suitable for worship, the mind of itself wants to be absorbed in deep meditation. It is beautiful to look at the mountain chains of Barakar from here; the distance from here is 15 or 20 days walk.

I am all right. Make me happy by sending me your good news. Don't inform anybody of my village about the letter. The end.

Your
ATUL. (BRAHMACHARI BHARAT)

To

PRAFULLA MADHAB CHAKRAVARTI

Ashakutir, Rajshahi.

The writer Atul appears to be Atul Chandra Guha, a Dacca man, who joined the Ram Krishna Mission in 1910, and is now at the Mayavati Asram undergoing a period of training prior to his admission as a Brahmachari of the order.

The addressee's name, Prafulla Chakravarti, was found in the cipher lists of *Amrita Hazra* of the Rajabazar case referred to above. He is a Dacca boy who went to Rajshahi, possibly in order to spread revolutionary ideas in Northern Bengal, which was being exploited by Amrita's followers.

The enquires made in connection with the Delhi-Lahore conspiracy case again attracted attention to the Ram Krishna Mission and its branches up-country, particularly the branch at Kankhal which appears to have been used as a regular meeting place by the members of this conspiracy. Rash Behari Basu, the much-wanted absconder in the Delhi conspiracy case, who was a connecting link between the Punjab and Bengal branches of the revolutionary movement, was a member of the Kankhal-Hardwar branch of the Ram Krishna Mission. Photographs of various members of the Mission and literature connected with the same were found in his house in Chandernagore when searched by the police in March last.

At a search made in the house of Raghubir Shrama, who is now under trial in the Delhi-Lahore conspiracy case, a list was found containing the names of several persons to whom copies of the seditious leaflets were to be sent for circulation. It contained the names of persons in different parts of India. Five of these were Bengalis, residents of Calcutta and the surrounding country, and it is significant that four and probably all five are connected with the Ram Krishna Mission. One of them, Abanindra Nath Ghosh, a student of the City College, Calcutta, was a member of the Ram Krishna Mission. During the last Durga *pujas* he stayed in the Ram Krishna *Asram* at Benares and went thence to the Kankhal *Asram* where he is still living with Brahmananda Swami, the present head of the Ram Krishna Mission.

Another one, Nithi Charan Ray, of Howrah, was a constant visitor at the Belur *Math*, and has stopped in the Ram Krishna Mission in Benares and Kankhal.

Sushil Kumer Mitra, third on this list, a nephew of ex-Justice Sarada Mitra, and a member of the Calcutta *Anushilan Samiti*, was also a constant visitor to the Belur *Math*.

Amarendra Nath Chatarji, another of the addressees, is also connected with the Ram Krishna Mission, as detailed above, while the fifth man, Harendra Kumar Bhattacharji, although no definite link between him and the Ram Krishna Mission has been discovered, is reported to be religiously inclined and to have travelled up-country and visited Dehra Dun. It is, therefore, extremely likely that he has also visited the up-country branches of the Ram Krishna Mission.

During this period, 1913-14, two important political suspects, for whom the police had been searching for some time, were eventually unearthed in the Ram Krishna *Asram*, One of them, Baldeo Ray, was located in the Benares *Asram*, whence he proceeded to Knakhal, where he is reported to be staying in the local *asram*.

Satish Chandra Das Gupta, the other wanderer, who disappeared from Eastern Bengal, was eventually located at the *Sevasram* at Benares, were he is working as a compounder in the Mission dispensary.

It also appears from reports received that even up to date the proceedings at Belur and recognised branches on the occasion of important festivals, are not entirely free from objectionable features. For instance, on the seventy-ninth birthday anniversary of Rama Krishna, which was celebrated at Belur on the 1st of March last, in the presence of a very large gathering, it is reported that Amarendra Nath Chatarji and Makhan Sen, who have been referred to above, Jatindra Nath Mukharji and other prominent members of the revolutionary party, were noticed feeding the poor and generally assisting the authorities of the *math* in attending to the welfare of their visitors. Amarendra Nath Chatarji brought a large party of volunteers with him on this occasion and made himself prominent in looking after the numerous visitors on behalf of the authorities of the *math*.

Similar celebrations were held at the different branches of the Ram Krishna Mission in Bengal.

At the celebration in Dacca, *sankirtan* parties (dancing attended with music) were organised, which paraded the streets chanting songs. The procession attracted a great deal of attention and as many as 500 students and young men are reported to have joined it. On the way many of the dancers and singers lost control of themselves, threw away their wrappers and several of them fainted. The *sankirtan* was followed by a *jatra* performance, at which the seditious songs "*Amar desh*" and "*Amar Janmabhumi*" were retailed to an enthusiastic audience.

XI.- THE PRESENT STAFF OF THE RAM KRISHNA MISSION

In an appendix to this report appears a full list of all the

Swamis and Brahmacharis at present employed by the Ram Krishna Mission. The real names and addresses of the Swamis and Brahmacharis, as far as can be ascertained at present, have also been given in each case. Several of these persons have already been referred to in the body of this report.

Number 25 of the list of Swamis is Saradananda *alias* Sarada Chakraborti, the Secretary of the *math*. We have quite recently received information regarding his brother, Naresh Chakrabarti, which shows that he is deeply implicated in the revolutionary movement in America and Europe.

This man has just returned to India after a prolonged residence in America. While there he was a great friend of Surendra Mohan Basu, who is reported to be an extremist of a very virulent type.

Neresh and Surendra appear to have toured together in the Far East, America and Europe, where they passed as delegates of the Hindustan Association of America. They also came in contact with Madame Cama and Krishna Varma, well-known Indian firebrands in Paris. Naresh appears to have admitted, when in Europe, that the educational aims of the Hindustan Association of the United States of America are only a pretext and that the real object is an Indian revolution.

Neresh and Surendra Basu's baggage was searched on arrival in Calcutta and some quasi-seditious literature was found in the box of the latter.

SUMMARY

It will appear from the foregoing that there is evidence to show that the Ram Krishna Mission itself has been used in the past as a revolutionary agency, under the guise of religion and philanthrophy, and that the greatest danger at the present time lies in the unaffiliated *asrams* which have grown up like mushroooms in the affected areas in Eastern Bengal without the knowledge or sanction of the headquarters mission at Belur. In fact, Swami Vivekananda's command to go out and preach the gospel of Sri Rama Krishna and found branch *asrams* throughout India has been taken up by the revolutionaries in Bengal to such good effect that it is evident that, even admitting

the best intentious in the world, the authorities of the mission at Belur are unable to control them.

In the course of several interviews with Saradananda Swami, the Secretary, the gist of the facts noted above was placed before him. He admits frankly that portions of Vivekananda's teachings could be adopted by the members of the revolutionary movement to further their own nefarious ends but, as might easily be supposed, will not admit that the Swami ever intended or thought it likely that they could be so used.

He was not previously aware of the extent to which revolution had been preached through village Ram Krishna *asrams* in Eastern Bengal, but quite realized the danger of such perversion of the teachings of the math, which if allowed to proceed unchecked might imperil the very existence of the *math* itself It was urged upon him that the mission should publicly and in unmistakeable language dissociate themselves from these bogus *ashrams* both in the press and in public gatherings at Belur and other recognised branches, and as a result of this suggestion Saradananda published early in April the following warning in all the leading journals in Bengal...

In this note, as stated at the outset, it is the political aspect of the mission to which attention has mainly been directed and the points against the mission have been set out *seriatim.* The result may be that an impression has inadvertently been conveyed that there is not another and brighter side of the mission's work. To remove any such impression it may be said at once that it is not contended that in its essence the Ram Krishna Mission is anything but what it purports to be, a purely religious body which has undoubtedly done a great deal of good, in a humble way, in affording relief in times of distress, and at all times in giving medical relief graits to the poor at the various *sevasrams* referred to above.

The Swamis, with possibly a few exceptions, do not mix themselves up in political matters. They have stated that they are anxious to exclude political suspects from their mission and have recently given evidence of their good faith in this respect by refusing admission to three members of the revolutionary

party who were anxious to join, probably in order to evade the police and carry on their work under the aegis of the *math.* That the *math* authorities were on their guard against revolutionaries is apparent from a declaration form for intending members issued in 1911, in which the applicant is required to sign a declaration to the followings effect : —"I also declare that I have no connection whatever with any political or any secret body."

On the other hand it has been shown that the ranks of the *math* officials are not free from taint, and it is somewhat disconcerting to find, just at the time of compiling this note, that Saradananda's brother is himslef an active and dangerous revolutionary. It has also been shown that several passages of the teachings of Swami Vivekananda are pregnant with sedition, that their potentialities for evil have been fully realized and taken advantage of by the revolutionary party, that the various recognised *maths* are resorted to by political refugees and that bogus *asrams,* which are nothing but centres for the dissemination of revolutionary doctrines, have sprung up with alarming rapidity in Eastern Bengal.

The authorities at Belur are apparently now fully alive to the dangerous possibilities ahead and are apparently anxious to check this perversion of their teachings as far as possible. How far they are capable of doing so is a matter on which opinions may differ. It need only be said that Saradananda remarked that if Government with all the vast power and machinery at its disposal was unable to check the spread of these revolutionary doctrines, it was hard to expect a few Swamis to stem the tide. Enquires have, however, shown that in the past recruits have been obtained to the revolutionary party by using the name of the Ram Krishna Mission, and that some of these recruits were in the first instance under the impression that they were actually joining this mission. The insidious poision was then gradually injected and when the true nature of the society was eventually revealed to them they were only too ready to remain and endeavour to carry out its aims. This can at any rate be checked by the authorites at Belur if they, in season and out of season, openly dissociate themselves from politics of any kind

and remove from their midst any persons who are tainted with revolutionary sentiments.

C. A. TEGART.
Special Superintendent of Police, Intelligence Branch.
CALCUTTA.
Dated the 22nd April 1915.

● এই রিপোর্টে যে ভুল তথ্যগুলি উল্লেখিত হয়েছে, তার সঠিক তথ্য গ্রন্থকার কর্তৃক নীচে প্রসঙ্গ সূত্রে সংখ্যা ক্রমপরম্পরায় তুলে ধরা হলো।

প্রসঙ্গ সূত্র :

1. শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালেব নাম গঙ্গাধব নয়, গদাধব।
2. শ্রীরামকৃষ্ণ যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার নাম কামারপুর নয় কামারপুকুব।
3. শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নয়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
4. শ্রীমা সারদাদেবীর পিতার নাম বামচন্দ্র মুখার্জী, রামকমল মুখার্জী নয়।
5. শ্রীমা সারদাদেবী জন্মগ্রহণ কবেছিলেন জয়রামবাটী গ্রামে, জয়রামপুরে নয়।
6. জয়রামবাটী বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত, ২৪ পরগণা জেলায় নয়।
7. শ্রীমা সারদাদেবীর যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ৫, ৬ নয়।
8. শ্রীরামকৃষ্ণের তখন বয়স ছিল—২৪, ২৬ নয়। দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, সাধকভাব, নবম অধ্যায়, পৃঃ ১৭৬, ১৩৮৩, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত।
9. ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি ঘটে দক্ষিণেশ্ববে নয়, কাশীপুব উদ্যানবাটীতে।
10. বর্তমান বেলুড় মঠেব বিপরীতে কাশীপুর মহাশ্মশানে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব পূতপবিত্র দেহ পুণ্যাগ্নিতে সমর্পিত হয়। কাশীপুর মহাশ্মশান দক্ষিণেশ্বরের নিকটস্থ ছিল না, ছিল কাশীপুর উদ্যানবাটীর নিকটে।
11. শ্রীমা সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন না।
12. ম্যাক্সমূলার লিখিত প্রথম প্রবন্ধের নাম 'A Real Mahatma'। পরে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি লিখেছিলেন তার নাম—Life and message of Sri Ramakrishna।
13. স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল—নরেন্দ্রনাথ, ইংরেজি বানান—Narendranath, Norendranath নয়।
14. স্বামী বিবেকানন্দ পড়াশুনো করেছিলেন যথাক্রমে বাড়ির পাঠশালায়, মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন (নর্থ), প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ)।

15. উল্লেখিত দক্ষিণ ভারতের ঐ দুই মহারাজা ছাড়া খেতড়ির রাজা অজিত সিংহও অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য করেছিলেন। আলাসিঙ্গা পেরুমলের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল।
16. স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নয়। ১৮৯৭-এর ১৫ জানুয়ারী তিনি কলম্বোর মাটিতে প্রথম পা রাখেন। আর ভারতের মাটিতে পা রাখেন ২৬ জানুয়ারী।
17. স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র, কালীচন্দ্র চন্দ্র নয়।
18. Awakened India নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ইংরেজি পত্রিকার নাম ছিল Prabuddha Bharata। এই নামকরণের অর্থ বোঝাতে Awakend India শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
19. স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের নাম রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে ত্রিগুণাতীর্থ নামে।
20. তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম সারদাকুমার মিত্র নয় সারদাপ্রসন্ন মিত্র।
21. ১৮৯৭-এর ১৫ জানুয়ারী কলম্বো'র মাটিতে স্বামী বিবেকানন্দ পদার্পণের সময় স্বামী নিরনঞ্চনানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম রিপোর্টে উল্লেখিত নিরঞ্জনান্দ।
22. সেই সময় স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু রিপোর্টে তাঁর নাম রয়েছে।

● চার্লস টেগার্টের রিপোর্টের শিরোনামের বানানও ভুল। সঠিক বানান হবে — THE RAMAKRISHNA MISSION।

পরিশিষ্ট—৪

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র

প্রধান কার্যালয়: বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

মোট শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা: ১৩৭

(মিশন: ৫৯, মঠ: ৫৩, মঠ-মিশন একত্রে: ২৫)

(ক) ভারতবর্ষ :

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	কবে আরম্ভ হয়েছে	কবে বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে/ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে
১. আন্দামান	১) পোর্টব্লেয়ার: মিশন	—	১৯৯২
২. অন্ধ্রপ্রদেশ	২) হায়দ্রাবাদ: মঠ	১৯২২	১৯৭৩
	৩) রাজমহেন্দ্রী: মঠ,	—	১৯৫১
	মিশন	—	১৯৫৪
	৪) বিশাখাপত্তনম্: মিশন	-	১৯৩৮
৩. অরুণাচলপ্রদেশ	৫) আলং: মিশন	—	১৯৬৬
	৬) ইটানগর: মিশন	—	১৯৭৯
	৭) নরোত্তমনগর: মিশন	—	১৯৭১
৪. অসম	৮) গুয়াহাটি: মিশন	১৯৩৯	১৯৬৮
	৯) করিমগঞ্জ: মিশন,	১৯১৭	১৯২৯
	মঠ	—	১৯৪৯
	১০) শিলচর: মিশন	১৯২৪	১৯৩৮
৫. বিহার	১১) দেওঘর: মিশন	—	১৯২২
	১২) জামশেদপুর: মিশন	১৯২০	১৯২৭
	১৩) জামতাড়া: মঠ	—	১৯২১
	১৪) কাটিহার: মিশন	১৯২৬	১৯৩১
	১৫) পাটনা: মিশন	১৯২২	১৯২৬
	১৬) রাঁচি: মোরাবাদি: মিশন	১৯২৭	১৯৩০
	১৭) রাঁচি: স্যানেটোরিয়াম: মিশন	—	১৯৫১
৬. দিল্লী	১৮) নিউদিল্লী: মিশন	১৯২৭	১৯৩০
৭. গুজরাট	১৯) লিমডি: মিশন	১৯৬৮	১৯৯৪
	২০) রাজকোট: মঠ	—	১৯২৭

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	কবে আরম্ভ হয়েছে	কবে বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে/ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে
	২১) পোরবন্দর : মিশন	—	১৯৯৬
৮. হরিয়ানা ও পাঞ্জাব	২২) চণ্ডীগড় : মিশন	—	১৯৫৬
৯. কর্ণাটক	২৩) বাঙ্গালোর : মঠ,	—	১৯০৩
	মিশন	—	১৯৯৬
	২৪) ম্যাঙ্গালোর : মঠ	—	১৯৪৭
	মিশন	—	১৯৯১
	২৫) মহীশূর : মঠ	১৯২৫	১৯৩১
	২৬) পোনামপেট : মঠ	—	১৯২৭
১০. কেরালা	২৭) কালাডি : মঠ	১৯৩৬	১৯৪১
	২৮) কোঝিকোড় : মিশন	১৯৩০	১৯৪৩
	২৯) কুইল্যাণ্ডি : মঠ	—	১৯১৫
	৩০) তিরুবন্তপুরুম্ : মঠ	—	১৯১৬
	৩১) পালাই : মঠ	—	১৯২৬
	৩২) ত্রিচুর : মঠ	১৯২৭	১৯২৯
	৩৩) তিরুভাল্লা : মঠ	—	১৯১৩
১১. মধ্যপ্রদেশ	৩৪) রায়পুর : মিশন	১৯৫৭	১৯৬৮
	৩৫) নারায়ণপুর : মিশন	—	১৯৮৫
১২. মহারাষ্ট্র	৩৬) মুম্বাই : মঠ,	—	১৯২৩
	মিশন	—	১৯৩২
	৩৭) নাগপুর : মঠ	—	১৯২৮
	৩৮) পুনে : মঠ	—	১৯৮৪
১৩. মেঘালয়	৩৯) চেরাপুঞ্জী : মিশন	—	১৯৩১
	৪০) শিলং : মিশন	—	১৯৩৭
১৪. ওড়িশা	৪১) ভুবনেশ্বর : মঠ,	—	১৯১৯
	মিশন	—	১৯২০
	৪২) পুরী : মিশন	—	১৯৪৪
	৪৩) পুরী : মঠ	—	১৯৩২
১৫. রাজস্থান	৪৪) ক্ষেত্রী : মিশন	—	১৯৫৯
	৪৫) জয়পুর : মিশন	১৯৭৮	১৯৮৮
১৬. তামিলনাড়ু	৪৬) চিঙ্গেলপট্টু : মিশন	—	১৯৩৬
	৪৭) কোয়েম্বাটোর : মিশন	১৯৩০	১৯৩৪

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	কবে আরম্ভ হয়েছে	কবে বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে/ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে
	৪৮) কাঞ্চিপুবম্: মঠ	—	১৯৩২
	৪৯) চেন্নাই: মঠ	—	১৮৯৭
	৫০) চেন্নাই: (ত্যাগবাজনগব) মিশন	—	১৯৩২
	৫১) চেন্নাই সাবদা বিদ্যালয: মিশন	—	১৯২১
	৫২) চেন্নাই স্টুডেন্টস্ হোম: মিশন (কলেজ)	—	১৯০৫
	৫৩) চেন্নাই বিদ্যাপীঠ: মিশন	—	১৯৪৬
	৫৪) মাদুবাই: মঠ	—	১৯৭৫
	৫৫) নট্টবামপল্লী: মঠ	—	১৯০৮
	৫৬) উট্‌কামাণ্ড: মঠ	—	১৯২৬
	৫৭) সালেম: মিশন	১৯২৮	১৯৪১
১৭. ত্রিপুবা	৫৮) বিবেকনগব, আমতলী: মঠ, মিশন	১৯৬৬	১৯৮৯
	আগবতলা:	১৯৬২	১৯৮৫
১৮. উত্তবপ্রদেশ	৫৯) এলাহাবাদ: মঠ	—	১৯০৮
	মিশন	—	১৯০১
	৬০) আলমোডা: মঠ	—	১৯১৬
	৬১) কন্‌খল: মিশন,	—	১৯০১
	মঠ	—	১৯৮০
	৬২) কানপুব: মিশন	১৯২০	১৯৩১
	৬৩) কিষাণপুব: মঠ	—	১৯১৬
	মিশন	—	১৯৭৪
	৬৪) লক্ষ্মৌ: মিশন,	১৯১৪	১৯২৫
	৬৫) লক্ষ্মৌ: মঠ,	—	১৯৮২
	৬৬) মাযাবতী: মঠ	—	১৮৯৯
	৬৭) শ্যামলাতাল: মঠ	-	১৯১৫
	৬৮) বাবাণসী সেবাশ্রম	১৯০০	১৯০২
	৬৯) বাবাণসী অদ্বৈত: মিশন আশ্রম: মঠ	—	১৯০২
	৭০) বৃন্দাবন: মিশন,	—	১৯০৭
	মঠ	—	১৯৬৫

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	কবে আরম্ভ হয়েছে	কবে বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে/ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে
১৯. পশ্চিমবঙ্গ	৭১) আঁটপুর: মঠ	১৯৬১	১৯৮৬
	৭২) আসানসোল: মিশন	—	১৯২৬
	৭৩) বাঁকুড়া: মঠ,	—	১৯১৭
	মিশন	—	১৯৩২
	৭৪) বারাসত: মঠ	১৯৬১	১৯৮৫
	৭৫) বেলুড় সারদাপীঠ: মিশন	—	১৯৪১
	৭৬) বাগবাজার: (মায়ের বাড়ি: মঠ)	—	১৮৯৯
	৭৭) বরাহনগর: মিশন	—	১৯১২
	৭৮) বড়িশা: মঠ	—	১৯৮৩
	৭৯) বেলঘরিয়া: মিশন	—	১৯১৬
	৮০) কাশীপুর: মঠ	—	১৯৪৬
	৮১) ভবানীপুর (গদাধর আশ্রম): মঠ	—	১৯২১
	৮২) ইনস্টিটিউট অব কালচার: মিশন	—	১৯৩৮
	৮৩) কাঁকুড়গাছি মঠ:	১৮৮৩	১৯৪৩
	৮৪) সেবা প্রতিষ্ঠান: মিশন	—	১৯৩২
	৮৫) চণ্ডীপুর: মঠ	—	১৯১৬
	৮৬) কাঁথি: মঠ	—	১৯১৩
	মিশন	—	১৯২৯
	৮৭) গড়বেতা: মঠ,	—	১৯১৫
	মিশন	—	১৯৫১
	৮৮) ইছাপুর ময়াল: মঠ	—	১৯৯৪
	৮৯) জলপাইগুড়ি: মিশন	১৯২৮	১৯৪১
	৯০) জয়রামবাটি: মঠ,	—	১৯২০
	মিশন	—	১৯৩০
	৯১) কামারপুকুর: মঠ ও মিশন	—	১৯৪৭
	৯২) মালদা: মঠ,	—	১৯২৪
	মিশন	—	১৯৪২

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	কবে আরম্ভ হয়েছে	কবে বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে/ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে
	৯৩) মনসাদ্বীপ : মিশন	—	১৯২৮
	৯৪) মেদিনীপুর : মিশন,	১৯১৪	১৯৩১
	মঠ	—	১৯৮৬
	৯৫) নরেন্দ্রপুর : মিশন	—	১৯৪৩
	৯৬) পুরুলিয়া : মিশন	—	১৯৫৮
	৯৭) রহড়া : মিশন	—	১৯৪৩
	৯৮) রামহরিপুর : মিশন	১৯৫২	১৯৬৬
	৯৯) সারগাছি : মিশন	—	১৮৯৭
	১০০) সরিষা : মিশন	—	১৯২১
	১০১) শিকড়া-কুলীনগ্রাম মিশন	—	১৯৯২
	১০২) টাকী : মিশন	১৯৩১	১৯৩৮
	১০৩) তমলুক : মঠ	—	১৯১৪
	মিশন	—	১৯২৯

(খ) বহির্ভারতে :

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	কবে আরম্ভ হয়েছে	কবে বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে/ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে
১. আর্জেন্টিনা	১০৪) বুয়েনস এয়ারস্ : মঠ	—	১৯৩৩
২. বাংলাদেশ	১০৫) বাগেরহাট : মঠ	—	১৯২৬
	১০৬) বালিয়াটি : মঠ,	—	১৯১০
	মিশন	—	১৯২৫
	১০৭) বরিশাল : মিশন	১৯০৪	১৯১১
	১০৮) ঢাকা : মঠ,	১৮৯৯	১৯১৪
	মিশন	—	১৯১৬
	১০৯) দিনাজপুর : মঠ,	—	১৯২৩
	মিশন	—	১৯১০
	১১০) ফরিদপুর : মিশন	১৯২১	১৯৩৪
	১১১) হবিগঞ্জ : মঠ,	—	১৯২১
	মিশন	—	১৯২৬
	১১২) ময়মনসিং : মিশন	—	১৯২২
	১১৩) নারায়ণগঞ্জ : মঠ ও মিশন	১৯০৯	১৯২২
	১১৪) শ্রীহট্ট : মঠ ও	১৯১৬	১৯২৬
	মিশন	—	—

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	কবে আরম্ভ হয়েছে	কবে বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে/ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে
৩. কানাডা	১১৫) টরেন্টো : মঠ	১৯৬৮	১৯৮৯
৪. ফিজি	১১৬) নাদি : মিশন	১৯৩৭	১৯৫২
৫. ফ্রান্স	১১৭) গ্রেজ (প্যারিস) : মঠ	—	১৯৩৭
৬. জাপান	১১৮) কানসায়া-কেন : মঠ	১৯৫৯	১৯৮৯
৭. মরিশাস	১১৯) ভেকোয়াস : মিশন	—	১৯৪১
৮. নেদারল্যান্ডস্	১২০) আর্মস্টেভান : মিশন	১৯৭১	১৯৯০
৯. রাশিয়া	১২১) মস্কো : মঠ	—	১৯৯৩
১০. সিঙ্গাপুব	১২২) সিঙ্গাপুর : মিশন	—	১৯২৮
১১. শ্রীলঙ্কা	১২৩) কলম্বো : মিশন	১৯২৪	১৯৩০
১২. সুইজারল্যাণ্ড	১২৪) জেনেভা : মঠ	১৯৫৮	১৯৭২
১৩. সংযুক্ত যুক্তরাজ্য (ইউ.কে)	১২৫) বোর্নএণ্ড (লণ্ডন) : মঠ	—	১৯৪৮
১৪. আমেবিকা যুক্তরাষ্ট্র	১২৬) বার্কলে : মঠ	-	১৯৩৯
	১২৭) বষ্টন : মঠ	—	১৯৪১
	১২৮) শিকাগো : মঠ	—	১৯৩০
	১২৯) হলিউড : মঠ	—	১৯৩০
	১৩০) নিউইয়র্ক (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার) : মঠ	—	১৯৩৩
	১৩১) নিউইয়র্ক (বেদান্ত সোসাইটি) : মঠ	—	১৯৯৪
	১৩২) পোর্টল্যাণ্ড : মঠ	—	১৯২৫
	১৩৩) প্রভিডেন্স : মঠ	—	১৯২৮
	১৩৪) স্যাক্রামেন্টো : মঠ	১৯৪৯	১৯৫২
	১৩৫) সানফ্রান্সিসকো : মঠ	—	১৯০০
	১৩৬) সিয়াটল : মঠ	—	১৯৩৮
	১৩৭) সেন্ট লুইস : মঠ	—	১৯৩৮

- উপরোক্ত তথ্য গৃহীত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 'এ্যনুয়াল জেনারেল রিপোর্ট', এপ্রিল ১৯৯৭ থেকে। সর্বশেষ তথ্যও সংযোজিত হয়েছে।
- সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আরো তিনটি শাখাকেন্দ্র ভারতের বিহারে ঘাটশিলা, বহির্ভারতে জার্মানী ও ব্রাজিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট—৫

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ, সহ-অধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের তালিকা

রামকৃষ্ণ মঠ :

ক) স্বামী বিবেকানন্দ 'ট্রাস্ট ডিড' তৈরী করেন ৩০ জানুয়ারী ১৯০১।
'ট্রাস্ট ডিড'-এর রেজিস্ট্রিকরণ: বুধবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০১, হাওড়ায় সদর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস।
স্পেশাল সাব-বেজিষ্ট্রার: রমেন্দ্রলাল মিত্র।

খ) রামকৃষ্ণ মঠেব 'ট্রাস্ট ডিড'-এর প্রথম ট্রাস্টিগণ (সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ) :

১. স্বামী ব্রহ্মানন্দ
২. স্বামী প্রেমানন্দ
৩. স্বামী শিবানন্দ
৪. স্বামী সারদানন্দ
৫. স্বামী অখণ্ডানন্দ
৬. স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
৭. স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
৮. স্বামী অদ্বৈতানন্দ
৯. স্বামী সুবোধানন্দ
১০. স্বামী অভেদানন্দ
১১. স্বামী তুরীযানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন :

গ) রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন: ১ মে ১৮৯৭, বলরাম মন্দির, বাগবাজার, কলিকাতা।
ঘ) রামকৃষ্ণ মিশনের রেজিষ্ট্রিকরণ: ৪ মে ১৯০৯।
ঙ) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম পরিচালন সভার (গভর্ণিং বডি) সদস্যগণ :

১. স্বামী ব্রহ্মানন্দ
২. স্বামী অদ্বৈতানন্দ
৩. স্বামী সারদানন্দ
৪. স্বামী প্রেমানন্দ
৫. স্বামী শিবানন্দ
৬. স্বামী অখণ্ডানন্দ
৭. স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
৮. স্বামী সুবোধানন্দ
৯. স্বামী অভেদানন্দ
১০. স্বামী তুরীয়ানন্দ
১১. স্বামী শুদ্ধানন্দ
১২. স্বামী বোধানন্দ
১৩. স্বামী আত্মানন্দ
১৪. স্বামী সচ্চিদানন্দ-১
১৫. স্বামী বিরজানন্দ
১৬. স্বামী অচলানন্দ
১৭. স্বামী মহিমানন্দ
১৮. স্বামী শঙ্করানন্দ
১৯. স্বামী ধীরানন্দ
২০. স্বামী নির্ভয়ানন্দ

* প্রথম দশজন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ

অধ্যক্ষবৃন্দ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	কতদিন ছিলেন	কার্যকাল (বৎসর—মাস—দিন)
১.	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	১৩.১.১৯০১—১০.৪.১৯২২	২২।১।২৮
২.	স্বামী শিবানন্দ	২৫.৫.১৯২২—২০.২.১৯৩৪	১১।৯।১৬
৩.	স্বামী অখণ্ডানন্দ	১৩.৩.১৯৩৪—৭.২.১৯৩৭	২।৯।২৫
৪.	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	৫.৩.১৯৩৭—২৫.৪.১৯৩৮	১।১।২১
৫.	স্বামী শুদ্ধানন্দ	১৮.৫.১৯৩৮—২৩.১০.১৯৩৮	০।৫।৬
৬.	স্বামী বিরজানন্দ	১৯.১১.১৯৩৮—৩০.৫.১৯৫১	১২।৬।১২
৭.	স্বামী শঙ্করানন্দ	১৯.৬.১৯৫১—১৩.১.১৯৬২	১০।৬।২৬
৮.	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	৬.৩.১৯৬২—১৬.৬.১৯৬২	০।৩।১১
৯.	স্বামী মাধবানন্দ	৪.৮.১৯৬২—৬.১০.১৯৬৫	৩।২।৩
১০.	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	২২.২.১৯৬৬—১৩.৩.১৯৮৫	১৯।০।২০
১১.	স্বামী গম্ভীরানন্দ	৯.৪.৮৫—২৭.১২.১৯৮৮	৩।৮।১৯
১২.	স্বামী ভূতেশানন্দ	২৪.১.১৯৮৯—১০.৮.১৯৯৮	৯।[illegible]।৯
১৩.	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	৭.৯.১৯৯৮—	

সহ-অধ্যক্ষবৃন্দ

১.	স্বামী অদ্বৈতানন্দ	৪.৫.১৯০৯—২৮.১২.১৯০৯
২.	স্বামী শিবানন্দ	২৫.৮.১৯১০—১.৫.১৯২২
৩.	স্বামী অখণ্ডানন্দ	১৯২৫—১২.৩.১৯৩৪
৪.	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	২৯.১১.১৯৩৪—৪.৩.১৯৩৭
৫.	স্বামী শুদ্ধানন্দ	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭—১৭.৫.১৯৩৮
৬.	স্বামী বিরজানন্দ	মে ১৯৩৮—অক্টোবর ১৯৩৮
৭.	স্বামী অচলানন্দ	নভেম্বর ১৯৩৮—১১.৩.১৯৪৭
৮.	স্বামী শঙ্করানন্দ	১৯৪৭ মে—১৯৫১
৯.	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	১৯৪৭—৫.৩.১৯৬২
১০.	স্বামী মাধবানন্দ	১৬.৩.১৯৬২—৩.৮.১৯৬২
১১.	স্বামী যতীশ্বরানন্দ	৪.৮.১৯৬২—২৭.১.১৯৬৬
১২.	স্বামী নির্বাণানন্দ	২২.২.১৯৬৬—৬.৪.১৯৮৪
১৩.	স্বামী ওঁকারানন্দ	২২.২.১৯৬৬—৮.৫.১৯৭৩
১৪.	স্বামী ভূতেশানন্দ	১.৪.১৯৭৫—২৩.১.১৯৮৯
১৫.	স্বামী কৈলাসানন্দ	১.৪.১৯৭৫—১৬.১২.১৯৭৮
১৬.	স্বামী গম্ভীরানন্দ	১.৪.১৯৭৯—৮.৪.১৯৮৫

১৭.	স্বামী তপস্যানন্দ	৯.৪.১৯৮৫ – ৩.১০.১৯৯১
১৮.	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	১.৪.১৯৮৯ – ৬.৯.১৯৯৮
১৯.	স্বামী গহনানন্দ	১৪.৪.১৯৯২ –
২০.	স্বামী আত্মস্থানন্দ	২২.৫.১৯৯৭ –

সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ

			কার্যকাল (বৎসর-মাস-দিন)
১.	স্বামী সারদানন্দ	১২.২.১৯০১–১৯.৮.১৯২৭	২৬।৬।৭
২.	স্বামী শুদ্ধানন্দ	২০.৮.১৯২৭–১২.৪.১৯৩৪	৬।৭।১৪
৩.	স্বামী বিরজানন্দ	১৩.৪.১৯৩৪–১৭.৫.১৯৩৮	৪।১।৫
৪.	স্বামী মাধবানন্দ	১৮.৫.১৯৩৮–৩১.৩.১৯৪৯	১০।১০।১৪
		১.৪.১৯৫১–৬.৩.১৯৬১	৯।১১।৬
৫.	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	১.৪.১৯৪৯ – ৩১.৩.১৯৫১	৯।১১।৬
		৬.৩.১৯৬১ – ২১.২.১৯৬৬	৪।১১।১৬
৬.	স্বামী গম্ভীরানন্দ	২২.৬.১৯৬৬ – ৩১.৩.১৯৭৯	১৩।১।১০
৭.	স্বামী বন্দনানন্দ	১.৪.১৯৭৯ – ৩১.৩.১৯৮৫	৬।০।০
৮.	স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ	১.৪.১৯৮৫ – ৩১.৩.১৯৮৯	৪।০।০
৯.	স্বামী গহনানন্দ	১.৪.১৯৮৯ – ৩১.৩.১৯৯২	৩।০।১৩
১০.	স্বামী আত্মস্থানন্দ	১৪.৪.১৯৯২ – ২১.৫.১৯৯৭	৫।১।৭
১১.	স্বামী স্মরণানন্দ	২২.৫.১৯৯৭ –	

পরিশিষ্ট—৬

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের বিস্তৃত ঠিকানা ও দূরভাষ

Addresses of the Headquarters and Branches of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission

Headquarters
Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission
P.O. Belur Math, Dt. Howrah, West Bengal, 711202, India
PBX Phones: 033-6541144, 654-1180, 654-5391, 654-9581 & 654-9681. Fax: 033-6544346

ANDAMAN

Ramakrishna Mission
Port Blair
Andaman 744104
Phone: 03192-20432

ANDHRA PRADESH

Ramakrishna Math
Ramakrishna Math Marg
Domalguda
Hyderabad 500029
Phones: 040-7633936, 7633937 & 7635545

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Ramakrishna-Vivekananda Nagar
Rajahmundry
Dt. East Godavari 533105
Phone: 0883-73112

Ramakrishna Mission Ashrama
Ramakrishna Beach
Visakhapatnam 530003
Phone: 0891-562561

ARUNACHAL PRADESH

Ramakrishna Mission
P.O. **Along**
Dt. West Siang 791001
Phones: 037832-218, 249 & 349
Fax: 037832-276

Ramakrishna Mission Hospital
P.O.: R.K. Mission
Itanagar 791113
Tele. Add.: AROGYA
Phones: 0360-212263 & 212761

Ramakrishna Mission
P.O. **Narottam Nagar**
Via-Deomali
Dt. Tirap-786629
Tele. Add.: NAROTTAM
Phones: 03786-55236, 55237

ASSAM

Ramakrishna Misssion Ashrama
Ramakrishna Mission Road
Ulubari, **Guwahati**
Dt. Kamrup 781007
Phones: 0361-540760 & 540691

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission Seva Samiti
P.O. & Dt. **Karimganj** 788710
Phone: 03843-2272

Ramakrishna Mission Sevashrama
P.O. **Silchar**
Dt. Cachar 788004
Phone: 03842-33789

BIHAR

Ramakrishna Mission Vidyapith
P.O. Vidyapith
Deoghar 814112
Phone: 06432-22413
Fax: 06432-22360

Ramakrishna Mission
Vivekananda Society
Bistupur
Jamshedpur 831001
Phones: 0657-423795,
430699 & 430700

Ramakrishna Math
P.O. **Jamtara**
Dt. Dumka 815351

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. & Dt. **Katihar** 854105
Phone: 06452-22449 & 23108

Ramakrishna Mission Ashrama
Ramakrishna Avenue
Patna 800004
Phone: 0612-650815

Ramakrishna Mission Ashrama
11-12 Swami Vishuddhananda
Rd. Morabadi, **Ranchi** 834008
Phones: 0651-304970
& 202828
Fax: 0651-207697

Ramakrishna Mission
T.B. Sanatorium
P.O. Ramakrishna Sanatorium
Ranchi 835221
Tele. Add : RECOVERY
Phones: 0651-408737
& 408149

DELHI

Ramakrishna Mission
Ramakrishna Ashrama Marg
New Delhi 110055
Phones: 011-527110 &
7773023
Fax: 011-3544985

GUJARAT

Ramakrishna Mission
Limbdi
Dt. Surendranagar 363421
Phones: 02753-20228 & 20537

Ramakrishna Mission
Vivekananda Memorial
Swami Vivekananda Marg,
Porebondar.
Dt. Junagadh - 360572
Phone: 0286-21244

Ramakrishna Ashrama
Dr. Yagnik Road
Rajkot 360001
Phones: 0281-452000
& 445200
Fax: 0281-452000

HARYANA & PUNJAB

Ramakrishna Mission Ashrama
Sector 15-B, Madhya Marg
Chandigarh 160015
Phone: 0172-549477

KARNATAKA

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
(Shivanahalli)
Bull Temple Road
Bangalore 560019
Phone: 080-6613149

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Mangaladevi Road
Mangalore
Dt. Dakshina Kannada 575001,
Phones: 0824-423412
& 428432

Ramakrishna Ashrama
Yadavagiri
Mysore 570020
Phone: 0821-510535

Ramakrishna Saradashrama
P.O. **Ponnampet**
Dt. Kodagu 571216
Phones: 08274-49040 & 49369

KERELA

Ramakrishna Advaita Ashrama
P.O. **Kalady**
Dt. Ernakulam 683574
Phone: 0484-462345

Ramakrishna Mission
Sevashrama
P.O. Arts & Science College
Kozhikode 673018
Phone: 0495-304191

Ramakrishna Math
P.O. Arunapuram
Palai
Dt. Kottayam 686574
Phone: 0482-212193

Ramakrishna Math
Swami Vivekananda Road
P.O. Melur, Quilandy
Dt. Kozhikode 673319

Ramakrishna Ashrama
Sasthamangalam
Thiruvananthapuram 695010
Phones: 0471-322125, 322453,
326603, 327393 & 327607

Ramakrishna math
Vilanagan
P.O. Puranattukara
Dt. **Thrissur** 680551
Phones: 0487-711719
& 4941231

Ramakrishna Ashrama
Thukalassery
Tiruvalla
Dt. Pathanamthitta 689101
Phone: 04736-23125

MADHYA PRADESH

Ramakrishna Mission Ashrama
(Abujhmarh Tribal Service)
Narainpur
Dt. Bastar 494661
Phone: 07786-52251

Ramakrishna Mission
Vivekananda Ashrama
P.O. Vivekananda Ashrama
Raipur 492001
Phones: 0771-224119, 544959
& 225269

MAHARASHTRA

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Ramakrishna Mission Marg.
Khar (West)
Mumbai 400052
Phones: 022-6494760
& 6464363
Fax: 022-6048568

Ramakrishna Math
Dhantoli
Nagpur 440012
Phones: 0712-523422
& 532690

Ramakrishna Math
131-1A Vitthalwadi Road
Pune 411030
Phone: 0212-440132

MEGHALAYA

Ramakrishna Mission Ashrama
Cherrapunji

East Khasi Hills 793111
Phone: 03637-22242 & 22202

Ramakrishna Mission
Ramakrishna Mission Road
Laitumkhrah
Shillong 793003
Phones: 0364-230079
& 221709

ORISSA
Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Vivekananda Marg
Bhubaneswar 751002
Phones: 0674-432028
& 430059
Ramakrishna Math
Chakratirtha
Puri 752002
Phone: 06752-22479

Ramakrishna Mission Ashrama
Puri 752001
Phone: 06752-22207

RAJASTHAN
Ramakrishna Mission
'C' Scheme, Gautam Marg
Jaipur 302001
Phone: 0141-381704

Ramakrishna Mission
Vivekananda Smriti Mandir
Khetri 333503
Phone: 01593-33312

TAMILNADU
Ramakrishna Mission
Hanumanthaputheri
Chengalpattu 603002
Phones: 04114-26217
& 26536

Ramakrishna Math
16 Ramakrishna Math Road
Post Box 635
Mylapore
Chennai 600004
Phones: 044-4941231
& 4941959
Fax: 044-4934589

Ramakrishna Mission Ashrama
26 Duraiswamy Road
Tyagarayanagar
Chennai 600017
Phones: 044-8283896
& 8283514

Ramakrishna Mission
Sarada Vidyalaya
27 Usman Road
Tyagarayanagar
Chennai 600017
Phone: 044-8280153

Ramakrishna Mission
Students' Home
101 Sir P.S.Sivaswami Salai
Mylapore
Chennai 600004
Phone: 044-4990264

Ramakrishna Mission Vidyapith
45 Oliver Road
Mylapore
Chennai 600004
Phones: 044-4993057
& 4992815

Ramakrishna Mission Vidyalaya
P.O. Sri Ramakrishna Vidyalaya
Coimbatore 641020
Tele. Add: KALVI
Phone: 0422-892676 & 892667
Fax: 0422-892582

Ramakrishna Math
Opp. Govt. Cancer Hospital
P.O. Karaipettai

Kanchipuram
Dt Chengalpattu 631552
Phone 04112 21494

Ramakrishna Math
New Natham Road
Narayanapuram
Madurai 625014
Phone: 0452-45224

Ramakrishna Math
P O **Nattarampalli**
Dt North Arcot 635852
Phones: 04179-42227

Ramakrishna Math
Ramakrishnapuram
Ootacamund
Dt Nilgiris 643001
Phone: 0423-43150

Ramakrishna Mission Ashrama
Ramakrishna Road
Salem 636007
Phone. 0427-419457

TRIPURA
Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
P O **Viveknagar**
Tripura (West) 799130
Phones. 0381-230333
& 230222

Sub-Centre

Ramakrishna Mission
Gangail Road
Agartala
Tripura (West) 799001
Phone: 0381-224024

UTTAR PRADESH
Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Sevashrama
Vijnanananda Marg
Muthiganj
Allahabad 211003
Phone 0532-403369

Ramkrishna Kutir
Bright End Corner
P O & Dist **Almora** 263601
Phone 05962-30667

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Sevashrama
P O Kankhal
Dt. Hardwar 249408
Phones. 0133-416141, 414176
& 422183

Ramakrishna Mission Ashrama
Ramakrishna Nagar
Kanpur 208012
Phone 0512-540673

Ramakrishna Ashrama &
Ramakrishna Mission Ashrama
Kishanpur
P O Rajpur
Dehra Dun 248009
Phone 0135-684355

Ramakrishna Math
Nirala Nagar
Lucknow 226020
Phones: 0522-385561
& 322347
Fax 0522-371694

Ramakrishna Mission
Sevashrama
Vivekananda Puram
Chandganj
Lucknow 226007
Phones: 0522-385574
& 371233
Fax: 0522-385574

Advaita Ashrama
P O **Mayavati**
Via-Lohaghat
Dt Pithoragarh 262524

Calcutta Branch
Advaita Ashrama
5 Dehi Entally Road
Calcutta 700014
Tele Add VEDANTA
Phones 033 2440898
& 2452383
Fax 033-2450050

Vivekananda Ashrama
Shamla Tal
P O Sukhidhang
Via Pilibhit R M S
Dt Champawat 262523

Ramakrishna Advaita Ashrama
Ramakrisna Road, Luxa
Varanasi 221010
Phone 0542 393975

Ramakrishna Mission
Home of Service,
Varanasi 221010, Luxa
Phones 0542 321727
& 320776

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Sevashrama
Swami Vivekananda Marg
P O **Vrindaban**
Dt Mathura 281121
Phones 0565 442310,
443310 & 443838
Fax. 0565-443310

WEST BENGAL
Ramakrishna Math
P.O. Antpur,
Dt Hooghly 712424
Phone Jangipara 54250

Ramakrishna Mission Ashrama
P O **Asansol**
Dt Burdwan 713301
Phone 0341 208373

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Sevashrama
P O & Dt **Bankura** 722101
Phone 03242-51254

Ramakrishna Math
P O **Barasat**
Dt North 24 Pargans 743201
Phone 033 5523514

Ramakrishna Mission
Saradapitha
P O **Belur Math**
Dt Howrah 711202
PBX Phones 033 654 1052
1145, 5892, 8909, 9181, 9281
& 9381

Ramakrishna Math
1 Udbodhan Lane, Bagbazar
Calcutta 700003
Phones 033 5339292,
5542248 & 5542403

Ramakrishna Mission Ashrama
Baranagore, **Calcutta 700036**
Phone 033 5567500

Ramakrishna Math
59 Motilal Gupta Road
Barisha
Calcutta 700008
Phone 033-4478292

Ramakrishna Mission
Calcutta Students' Home
Belgharia
Calcutta 700056
Phone 033 5391564

Ramakrishna Math
90 Cossipore Road
Cossipore
Calcutta 700002
Phone: 033-5573605

Ramakrishna Math
86A, Harish Chatterjee Street
Calcutta 700025
Phone: 033-4554660

Ramakrishna Mission
Institute of Culture
Gol Park
Calcutta 700029
Tel: Add: INSTITUTE
Phones: 033-4641303 (3 lines)
& 4661235 (3 lines)
Fax: 033-4641307

Ramakrishna Math
7 Yogodyana Lane
Calcutta 700054
Phones: 033-3342928 &
3346000
Fax: 033-3346000

Ramakrishna Mission
Seva Pratishthan
99 Sarat Bose Road
Calcutta 700026
Tele: Add: SISUMANGAL
Phones: 033-4753636 (5 lines)
Fax: 033-4754351

Ramakrishna Math
P.O. Math Chandipur
Dt. Midnapore 721659
Phone: 03228-72218

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Sevashrama
P.O. Contai
Dt. Midnapore 721401
Phone: 03220-55069

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission Sevashrama
Garbeta, P.O. Amlagora
Dt. Midnapore 721121
Phone: 03227-65200

Ramakrishna Math
Ichapur, P.O. Mayal-Bandipur
Dt. **Hooghly** 712617

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. & Dt. **Jalpaiguri** 735101
Phone: 03561-22344

Matri Mandir &
Ramakrishna Mission
Sarada Sevashrama
P.O. **Jayrambati**
Dt. Bankura 722161
Phones: 03211-44222 &
0324444-214

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
P.O. **Kamarpukur**
Dt. Hoogly 712612
Phone: 03211-44221

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. & Dt. **Malda** 732101
Phone: 03512-52479

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. Manasadwip
Dt. **South 24-Parganas** 743390

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. & Dt. **Midnapore** 721101
Phones: 03222-63333 & 62760

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. Narendrapur
Dt. **South 24-Parganas** 743508

Phones: 033 4772201 (3 lines)
Fax: 033-4772070

Ramakrishna Mission Vidyapith
P.O. Vivekanandanagar
Dt. **Purulia** 723147
Phones: 03252-22004 & 22235

Ramakrishna Mission Vidyapith
P.O. Rahara
Dt. **North 24-Parganas** 743186
Phone: 033-5532850 &
553-1219

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. Ramharipur
Dt. **Bankura** 722203
Phone: 03241-59235

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O Sargachhi Ashrama
Via–Bhabta
Dt. **Murshidabad** 742134
Phone: 03482-32222

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. Sarisha
Dt. **South 24-Parganas** 743368
Phone: 0317444-222

Ramakrishna Mission
P.O. Sikra-Kulingram
Dt. **North 24-Parganas** 743428
Phones: 031765-204 & 242

Ramakrishna Mission Ashrama
P.O. Taki
Dt. **North 24-Parganas** 743429
Phone: 03217-47225

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Sevashrama
P.O. **Tamluk**
Dt. Midnapore 721636
Phones: 03228-66005 & 66762

ARGENTINA

Hogar Espiritual de Ramakrishna
Gaspar Campos 1149
1661 Bella Vista
Buenos Aires
Phone: 54-1-6660098
Fax: 54-3085175

BANGLADESH

Ramakrishna Ashrama
Bagerhat
Phone: 880-401-253

Ramakrishna Ashrama &
Ramakrishna Mission
Sevashrama
P.O. Baliati,
Dt. **Manikgang**

Ramakrishna Mission
College Road
Barisal
Phone: 880-431-3873

Ramakrishna Math &
Ramakrishna Mission
Ramakrishna Mission Road
Dhaka 1203
Phones: 880-2-9553703
& 9564055

Ramakrishna Ashrama &
Ramakrishna Mission
Dinajpur
Phone: 880-5313262

Ramakrishna Mission Ashrama
Faridpur

Ramakrishna Ashrama &
Ramakrishna Mission Seva
Samiti
Ramakrishna Mission Road
Habiganj 3300
Phone: 880-831-2623

Ramakrishna Ashrama &
Ramakrishna Mission
Mymensingh
Phone: 880-91-55096

Ramakrishna Ashrama &
Ramakrishna Mission
Narayanganj
Dt. **Dhaka**
Phone: 880-671-76447

Ramakrishna Ashrama &
Ramakrishna Mission
Seva Samiti
Meerabazar,
Sylhet

CANADA
Vedanata Society of Toronto
120 Emmatt Avenue
Toronto, Ontario M6M 2E6
Phone: 1-416-245364

FIJI
Ramakrishna Mission
Ashram Road, Post Box 716
Nadi
South Pacific
Phone: 679-702786
Fax: 679-702193

FRANCE
Centre Vadantique Ramakrishna
1 Boulevard Romain Rolland
77220 **Gretz**
Phone: 33-1-64070311
Fax: 33-1-64420357

JAPAN
Nippon Vedanta Kyokai
4-18-1 Hisagi
Zushi-shi 249
Kanagawa-ken
Phone: 81-0468-730428
Fax: 81-0468-730592

MAURITIUS
Ramakrishna Mission
Quinze Cantons,
Vacoas
Phone: 230-6964313

NETHERLANDS
Ramakrishna Vedanta
Vereniging Nederland
De Vlaschaard 57
1183 KM **Amstelveen**
Phone & Fax: 31-20-4410155

RUSSIA
Obschestvo Ramakrishni—
Center Vedanti
Ulitsa Kracnogo Mayaka
House 8, Korp II, Apt. 74
Moscow 113519
Phone: 7-095-31[illegible]2051

SINGAPORE
Ramakrishna Mission
179 Bartley Road
Singapore 539784
Phones: 65-2889077 &
3835741
Fax: 65-2885798

SRI LANKA
Ramakrishna Mission
40 Ramakrishna Road
Colombo 6
Phone: 94-1-588253

SWITZERLAND
Centre Vedantique
9 Chemin des Gravannes
Ch.- 1246 Corsier
Geneva
Phone: 41-22-7512224

UNITED KINGDOM
Ramakrishna Vedanta Centre
Unity House
Blind Lane, Bourne End

Buckinghamshire SL 8 5LG
Cable Add: VEDANTA
Phone: 44-162-852664
Fax: 44-162-8532437

UNITED STATES OF AMERICA

Vedanta Society of Berkeley,
2455 Bowditch Street
Berkeley
California 94704
Phone: 1-510-8488862

Ramakrishna Vedanta Society
58 Deerfield Street
Boston,
Massachusetts 02215
Phone: 1-617-5365320

Vivekananda Vedanta Society
5423 South Hyde Park Blvd.
Chicago,
Illinois 60615
Phone: 1-773-3630027
Fax: 1-773-6677882

Vedanta Society of Southern California
1946 Vedanta Place
Hollywood,
California 90068
Phone: 1-213-4657114
Fax: 1-213-4659568

Vedanta Society
34 West 71st Street
New York, NY 10023
Phone: 1-212-8779197
Fax: 1-212-7694280

Ramakrishna-Vivekananda Centre
17 East, 94th Street
New York,
NY 10128,
Cable Add: RAMAVIVEK,
New York
Phone: 1-212-2891710
Fax: 1-212-8281618

Vedanta Society
1157 S.E. 55th Avenue
Portland,
Oregon 97215
Phone & Fax: 1-503-2353919

Vedanta Society
224 Angell Street
Providence,
RI 02906
Phone: 1-401-4213960

Vedanta Society of Sacramento
1337 Mission Avenue
Carmichael
California 95608
Phone: 1-916-4895137
Fax: 1 916-4893248

Vedanta Society of Northern California
2323 Vallejo Street
San Francisco,
California 94123
Phone: 1-415-9222323
Fax: 1-415-9221476

Vedanta Society of Western Washington
2716 Broadway East. Seattle
Washington 98102
Phone: 1-206-3231228
Fax: 1-206-3291791
E-mail: vedantan @ aol.com

Vedanta Society of St. Louis
205 South Skiner Blvd.
St. Louis
Missouri 63105
Phone: 1-314-7215118
Fax: 1-314-8620990

পরিশিষ্ট—৭

সারণী — ১

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যার্থী সংখ্যা
(১৯৯৬—৯৭ শিক্ষাবর্ষের রিপোর্ট থেকে গৃহীত)

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষাকেন্দ্র	সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	ছাত্রীর সংখ্যা	মোট বিদ্যার্থী
১)	ডিগ্রি কলেজ	৫	৫,৩১৫	–	৫,৩১৫
২)	সংস্কৃত কলেজ	১	৩৪	–	৩৪
৩)	শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ	৫	৭০৭	–	৭০৭
৪)	জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ	৫	১৮৩	৪৩	২২৬
৫)	উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৩	৮,৪১৭	৭,২৫৮	১৫,৬৭৫
৬)	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২	১৭,০৯২	৫,৭৩৯	২২,৮৩১
৭)	নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি	১৩৪	১৬,৯৯৮	১১,৮২৮	২৮,৮১৬
৮)	সংস্কৃত বিদ্যালয়	২	২২০	১৮৪	৪০৪
৯)	পলিটেকনিক	৪	৩,৩৭৮	–	৩,৩৭৮
১০)	কারিগরি বিদ্যালয়	৭	৭৬০	–	৭৬০
১১)	ছাত্রাবাস	৯৭	৮,৩৪১	১,৩৫২	৯,৬৯৩
১২)	অনাথাশ্রম	৫	৭৬২	১০৩	৮৬৫
১৩)	কৃষি শিক্ষাকেন্দ্র	২	২,১৫৫	–	২,১৫৫
১৪)	ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র	২	৬,৭৯৯	৩,০৯৯	৯,৮৯৮
১৫)	কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার	২	৬৫৭	–	৬৫৭
১৬)	অন্ধ শিক্ষাকেন্দ্র	১	১৬৮	–	১৬৮
১৭)	লাইব্রেরী ট্রেনিং সেন্টার	১	১২১	–	১২১
১৮)	গ্রামোন্নয়ন শিক্ষণ কেন্দ্র	৪	১১,৭৫৯	৩,২১২	১৪,৯৭১
১৯)	বয়স্ক, বিধিমুক্ত নৈশ বিদ্যালয় ইত্যাদি	২,৬৩৯	২৯,৪৭৬	২৭,৮০৭	৫৭,২৮৩
২০)	নার্সেস ট্রেনিং সেন্টার	৫	–	৪০৮	৪০৮
২১)	পোস্ট গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা ট্রেনিং কোর্স	১	–	–	৪৮

সারণী — ২

পশ্চিমবঙ্গের রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত দশটি বিদ্যালযের মাধ্যমিক পরীক্ষার বিগত দশ বছরের ফলাফলের পরিসংখ্যান : (১৯৮৫–৯৪), (পাশের % হার ও স্থানাধিকাব)

বিদ্যালয়	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
১) রহড়া	১০০	১০০	১০০ (২য়,৭ম,১৩শ)	১০০ (১ম,১৯শ)	১০০ (৭ম,৯ম,১৩শ, ১৪শ,১৫শ)	১০০ (১৩শ)	১০০ (১০ম)	১০০ (৯ম,১৩শ, ১৫শ)	১০০ (৫ম,১১শ)	১০০
২) নরেন্দ্রপুর	১০০ (২য়,৫ম, ৭ম,১৩শ)	১০০	১০০ (১০ম)	১০০ (২য়.৩য়,৫ম, ১০ম,১৪শ)	১০০ (৪র্থ,১১শ, ১২শ)	১০০	১০০ (১০শ,১৪শ, ২০শ)	১০০ (৪র্থ,৭ম,১৬শ)	১০০ (৪র্থ,৮ম,১৫শ)	১০০
৩) পুরুলিয়া	১০০ (৪র্থ,১০ম, ১১শ,১৩শ, ১৫শ,২০শ)	১০০ (২য়,৭ম, ১৩শ,১৯শ)	১০০ (২য়,৬ষ্ঠ,৭ম, ১০শ,১১শ)	১০০ (৭ম,১১শ, ১৬শ,১৭শ, ১৯শ)	১০০ (২য়,৫ম, ১১শ,১৫শ)	১০০ (১ম,২য়, ৩য়,৪র্থ,৬ষ্ঠ, ১০শ,১১শ, ১২শ)	১০০ (১ম.৩য়, ৬ষ্ঠ,৭ম)	১০০ (১ম,৯ম, ১১শ,১৪শ, ১৮শ)	১০০ (২য়,৩য়,৬ষ্ঠ, ৭ম,৯ম, ১১শ,১২শ, ১৩শ,১৮শ)	১০০
৪) বরাহনগর	৯৯.৩	১০০	১০০ (১১শ)	১০০	১০০	১০০ (৮ম,১৯শ)	১০০	১০০	১০০	১০০
৫) মেদিনীপুর	১০০	৯৮.৩	১০০	১০০	১০০	১০০	৯৮.৭	১০০	১০০	১০০
৬) মালদহ	১০০	১০০	১০০ (৯ম)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০ (৬ষ্ঠ,৮ম)	১০০	১০০

সারণী — ২

পশ্চিমবঙ্গের রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত দশটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার বিগত দশ বছরের ফলাফলের পরিসংখ্যান : (১৯৮৫—৯৪), (পাশের % হার ও স্থানাধিকার)

বিদ্যালয়	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
৭) আসানসোল	৯৫	১০০	৯৮	৯৯	৯৮.৬	৯৭	৯৬	৯৮.৪৫	১০০	১০০
৮) সারগাছি	৯৮.৪	৯২.৩	১০০	৯২.৩	৯৭	৯৭.১	৯৬	১০০	১০০	১০০
৯) টাকি	১০০	৯৬.৭৭	৯৫.২৪	৯৭.৭৩	৯০.৭৪	১০০	৯৭.৪	১০০	১০০	১০০
১০) কামারপুকুর	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
পর্ষদে স্থানাধিকার	(২য়,৪র্থ,৫ম,৭ম,১০ম,১১শ,১৩শ,১৫শ,২০শ)	(২য়,৭ম,১৩শ,১১শ)	(২য়,৬ষ্ঠ,৭ম,৯ম,১০ম,১১শ,১৩শ)	(১ম,২য়,৩য়,৫ম,৭ম,১০ম,১১শ,১৪শ,১৬শ,১৭শ,১৯শ)	(২য়,৪র্থ,৫ম,১১শ,১২শ,১৫শ)	(১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৬ষ্ঠ,৭ম,৮ম,৯ম,১০ম,১১শ,১২শ,১৩শ,১৪শ,১৫শ,১৯শ)	(১ম,৩য়,৬ষ্ঠ,৭ম,১০ম,১৩শ,১৪শ,২০শ)	(১ম,৪র্থ,৬ষ্ঠ,৭ম,৮ম,৯ম,১০ম,১১শ,১৪শ,১৬শ,১৮শ)	(২য়,৩য়,৪র্থ,৬ষ্ঠ,৭ম,৮ম,৯ম,১১শ,১২শ,১৩শ,১৫শ,১৮শ)	(৫ম,১১শ)

- শেষ কয়েকটি বছর অর্থাৎ ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি এগিয়ে রয়েছে।

১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উপরিল্লিখিত সব কটি বিদ্যালয়ের শতকরা পাশের হার ১০০। প্রথম ২০ জনের মধ্যে স্থানাধিকার করেছে — ৫ম, ৯ম, ১১দশ (২), ১৩দশ (২)

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐসব বিদ্যালয়গুলিতে পাশের শতকরা হার ১০০।

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দেও ঐসব বিদ্যালয়ের পাশের শতকরা হার ১০০। এবং বিদ্যালয়গুলি থেকে সম্মিলিতভাবে শিক্ষার্থীরা ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়াও সরিষা (দুটি বিদ্যালয়), কামারপুকুর, কাটিহার, মনসাদ্বীপের রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়গুলির উল্লিখিত বছরগুলির মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুরূপভাবেই ভাল হয়েছে। প্রতিবছর স্টার অর্থাৎ ৭৫% নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় ৮০%। ১৯৯৭ সালে নরেন্দ্রপুর ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি (Narendrapur Blind Boys Acaademy)'র ফলাফল অত্যন্ত ভালো হয়েছে। ৪ জনের মধ্যে ৪ জনই ১ম বিভাগে পাশ করেছে এবং ৩ জনের শতকরা মোট নম্বর ৭৫এরও বেশি।

সারণী — ৩

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান : ১৯৮৫—৯৪

(পাশের % হার ও স্থানাধিকার)

স্থান	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
নরেন্দ্রপুর	১০০ (৩,৪,৬, ৮,১২শ)	৯৯ (৭,১১,১২, ১৩,১৪,১৫; ১৭,১৮শ)	১০০ (২,৪,৯, ১৫,১৭শ)	১০০ (১৪শ)	৯৯ (২,৪,৫, ৬,৭,৯, ১২,১৪, ১৫,২০শ)	১০০ (১,৩,৬, ৮,১০,১১, ১২,২০শ)	১০০ (১৩,২০শ)	১০০ (১,৩,৬, ৮,১০,১১, ১২,২০শ)	১০০ (৫,৮, ১৬,১৭)	৯৯ (৫,১৭শ)
বিদ্যামন্দির বেলুড় (সারদা পীঠ)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৯৯ (১৩শ)	৯৯ (১৯শ)	১০০	১০০	১০০
রহড়া	১০০	৯৮.৯	৯৮.৯	৯৮.৮	৯৬.৭	৯৭.৯ (৪র্থ)	১০০ (১১শ)	৯৮.৯ (১৬শ)	৯৭.৯ (১৩শ)	১০০ (১৭শ)
সংসদে স্থানাধিকার	(৩,৪,৬, ৮,১২শ)	(৭,১১,১২, ১৩,১৪,১৫, ১৭,১৮শ)	(২,৪,৯, ১৫,১৭শ)	(১৪শ)	(২,৪,৫,৬, ৭,৯,১২, ১৪,১৫,২০শ)	(১,৩,৫,৭, ১০,১৫,১৭, ১৯,২০শ)	(১৩,২০)	(১,৩,৬, ৮,১০,১১, ১২,২০শ)	(৫,৮,১৩,১৬, ১৭,২০শ)	(৫,১৭শ)

- ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কলেজগুলির সম্মিলিত ফল যথেষ্ট ভালো। শতকরা পাশের হারও ১০০। ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ২০ জনের মধ্যে নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয় থেকে ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম স্থান এবং বেলুড় বিদ্যামন্দির থেকে ১২তম ও ১৫তম স্থান অধিকার করেছে ছাত্ররা। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ১৫শ স্থান অধিকার করেছে। সামগ্রিক পাশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত অন্যান্য মহাবিদ্যালয়গুলির ফলও উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনের মধ্যে নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয় থেকে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান অধিকার করেছে ছাত্ররা। ১ম বিভাগে পাশের হারও, মোট শতকরা পাশের হারের বিচারে সমগ্র পশ্চিমবাংলার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।
- সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্লিষ্ট বছরের 'এ্যানুয়াল জেনারেল রিপোর্ট' থেকে।

সারণী – ৪

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি কলেজের দশ বছরের পরীক্ষার ফলাফল ১৯৮৫–৯৪ :
(পাশের % হার ও স্থানাধিকার)

স্থান	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
নরেন্দ্রপুর	৮৭	৮৬ (১১ জন)	৯০ (৪ জন)	৯৩ (৪ জন)	৯২ (৪ জন)	৯০ (৫ জন)	৯১ (৪ জন)	৯৪	৮৮ (৭ জন)	৯৪ (৩ জন)
বিদ্যামন্দির বেলুড় (সারদা পীঠ)	৮৯.৪	৯২.৫	৯০	৯০	৮৫.১	৯৬.৩	৮৭.২	৮৬.৭	৭৮.৮	৮৫.৭ (১ জন)
রহড়া	১০০	১০০ (১ জন)	১০০	৯৬ (৪ জন)	৯৪ (১ জন)	৯১	৯৭ (২ জন)	৯৪	৯৩ (১ জন)	৯৪
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানাধিকার		(১২ জন)	(৪ জন)	(৮ জন)	(৫ জন)	(৫ জন)	(৬ জন)		(৮ জন)	(৪ জন)

● ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্নাতক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মহাবিদ্যালয়গুলির সম্মিলিত ফলাফল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট তিন বছরে ক্রমপরম্পরায় ম্যাথমেটিক্সে ১ম স্থান (১৯৯৫), স্ট্যাটিসটিকসে ১ম ও ৪র্থ স্থান, কেমেস্ট্রিতে ১ম ও ২য় স্থান, ফিজিক্সে ৪র্থ স্থান, ম্যাথমেটিক্সে ২য় স্থান (১৯৯৬), স্ট্যাটিস্টিক্সে ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৮ম, ৯ম স্থান এবং ম্যাথমেটিক্সে ১ম স্থান (১৯৯৭) অধিকার করেছে ছাত্ররা। বেলুড় বিদ্যামন্দির থেকে কেমিস্ট্রিতে ২য় স্থান (১৯৯৫), কেমিস্ট্রিতে ৭ম, ৮ম ও ১০ম স্থান, ফিজিক্সে ৭ম স্থান, ম্যাথমেটিক্সে ১ম, ৩য় (৩) ও ৭ম স্থান (১৯৯৬) কেমিস্ট্রিতে ১ম, ২য়, ফিজিক্সে ২য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ম্যাথমেটিক্সে ৪র্থ, ৫ম, ৭ম স্থান (১৯৯৭) অধিকার করেছে ছাত্ররা। অন্যান্য বিষয়ের এবং রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের ফলাফলও প্রশংসনীয়।

● তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বছরগুলিতে প্রকাশিত 'এ্যানুয়াল জেনারেল রিপোর্ট' থেকে।

পরিশিষ্ট—৮

ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন : একটি সমীক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম অনুরাগ ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর সঙ্গে নিবিড় সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন অসংখ্য ইসলাম প্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মৌলবী, ফকির, প্রবীণ-নবীন, গৃহবধূ, শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও আরও অনেকে। সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা জর্জর ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সকল ধর্মের ব্যক্তিদেব কাছে সমানভাবে গ্রহণীয়। সামাজিক সম্প্রীতির মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা শতবছর আগে সেই নিরাভরণ আপনভোলা ব্যক্তিটি যত নিপুণ ও নিখুঁতভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন আধুনিক শিক্ষিত সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনেতাবাও তা অনুভব কবতে পারছেন না। তাই ব্যক্তির সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা যেমন জরুরি তেমনই আবশ্যিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নামাঙ্কিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম কাজ শুরু করেছিল আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার বছরেই দুর্ভিক্ষপীড়িত মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মানসিকতা নিয়ে। তারপর সেই সেবা কাজ বিগত শতবর্ষে পল্লবিত ভাবে প্রসাবিত হয়েছে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও বহির্ভারতে। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তির এই পুণ্যক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনেব গুরুত্ব কতটা তা জানার আগ্রহ স্বভাবতই টগব প্রাণেব উষ্ণতা নিয়ে জেগে ওঠে। সেই আগ্রহ সামনে বেখে আধুনিক প্রজন্মের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীর প্রত্যয়জ্ঞাত হওয়ার জন্য এক সমীক্ষা সংগঠিত হয়েছিল (১৯৯৭—৯৮) আর্থিক বর্ষে। এই সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলার (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও মালদহ) বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ইসলাম প্রতিনিধিদের সামাজিক স্তর বিন্যাসে অবস্থিত দশটি গোষ্ঠীর (মৌলবী, ফকির, বয়স্কব্যক্তি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, গৃহবধূ, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমজীবী) প্রতিনিধিদের কাছ থেকে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতি জেলায় ইসলাম প্রতিনিধিদের ঐ দশটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছিল। নমুনা সংখ্যা যথেষ্ট রাখা হয়েছিল যাতে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ নিখুঁত

হয়। এই সমীক্ষায় ব্যাপকসংখ্যক ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ মতামত পাওয়া গেছে। সমীক্ষাপত্রে প্রশ্নগুলি দুটি পর্বে রাখা হয়েছিল — নৈর্ব্যক্তিক ও বিবরণমূলক। আলোচনার সুবিধার জন্য সমীক্ষা পত্রের উত্তর পর্বভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের বিশ্লেষণ:

সমীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপর্বে ছ'টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। সেগুলি হল — ১) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে পরিচিত আছেন কি না? ২) শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট কোন পুস্তক পাঠ করেছেন কি না? ৩) জানেন কি শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম সাধনা করেছিলেন এবং তাঁর গুরু ছিলেন ইসলাম সাধক ওয়াজেদ আলি খান? ৪) জানেন কি শ্রীমা সারদাদেবী মুসলমান পুরুষ ও নারীকে সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করতেন সকলের সামনে? কুখ্যাত ডাকাত আমজাদ খাঁ তাঁর অন্যতম স্নেহধন্য সন্তান? ৫) স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সঙ্গীত গুরু ছিলেন ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ এবং তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন মহম্মদ সরফরাজ হোসেন? ৬) জানেন কি রামকৃষ্ণ মিশন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে?

নৈর্ব্যক্তিক পর্বের প্রশ্নের উত্তরসমূহকে সারণী-১ এর পরিসংখ্যানে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাতে লক্ষ্য করা যায় যে, মুসলমান সমাজে প্রায় সকলেই শতকরা ৯৩.২০ জন শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতা সকলের নেই। শতকরা পঞ্চাশেরও কম সংখ্যক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত পুস্তক পাঠ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক ঘটনা জানেন শতকরা ৫৪.৩১ জন। শ্রীমার ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ে সংবাদ রাখেন অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক ব্যক্তি, শতকরা ৪০.৭৯ থেকে ৪৬.৫৮ জন। এই সমীক্ষায় বিশেষ লক্ষ্য করা গেছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সম্বন্ধে অনেকে অভিজ্ঞ হলেও শ্রীশ্রীমার মহামানবী প্রকৃতি তাঁদের কাছে যথার্থ উন্মোচিত নয়। এবং আরও লক্ষণীয় যে, ঐ সম্প্রদায়ের শতকরা পঞ্চাশজন রামকৃষ্ণ মিশনের উদার অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির কথা অবগত নন।

প্রাপ্ত উত্তর বিশ্লেষণে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হল যে, ঐ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার মাত্রা ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীর

নামেব সঙ্গে ইসলাম সম্প্রদাযের সকল গোষ্ঠীই পবিচিত হলেও ফকির ও গৃহবধূদেব ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতাব মাত্রা খুব কম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পুস্তক পাঠেব তালিকায় লক্ষণীয়, সরকারী কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরাই অধিক অভিজ্ঞ। শ্রীবামকৃষ্ণের ইসলামপ্রীতি বিষয়ক তথ্য সর্বোচ্চ মাত্রায় অবগত আছেন সবকারী বিষয়ক কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষকগোষ্ঠী। শ্রীমা সাবদাদেবীর ইসলাম সম্প্রীতির ঘটনার অভিজ্ঞতায় শীর্ষে আছেন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী (শতকরা ৭১.৪৩ জন) এবং পরবর্তী গোষ্ঠী হল, সরকারী কর্মচাবী (শতকরা ৬৬.৬৭ জন)। স্বামী বিবেকানন্দের ইসলাম সম্প্রীতিব তথ্য সর্বোচ্চ মাত্রায অবগত সরকাবী কর্মচাবীবৃন্দ (শতকরা ৬৬.৬৭ জন) এবং পরবর্তী গোষ্ঠী হল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ (শতকরা ৬৬.৫০ জন)। রামকৃষ্ণ মিশনেব অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে যাঁবা সচেতন, মাত্রানুসারে তাঁদের সাজালে পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ দাঁড়ায়,—ব্যবসায়ী (শতকরা ৮৫.৭২ জন), শিক্ষক-শিক্ষিকা (শতকরা ৭৫ জন), সবকারী কর্মচারী (শতকবা ৬৬.৬৭ জন) এবং মৌলবী (শতকরা ৬৬ জন)।

ঘটনাব ধারা থেকে অনুমিত হওয়া যায় যে, মুসলমান সম্প্রদায়েব শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক অভিজ্ঞতা বর্তমান। অন্যান্য গোষ্ঠীব প্রতিনিধিবা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দেব নামের সঙ্গে পবিচিত হলেও তাঁদেব ভাবাদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন। এবং সেই আলোচনার ধারায় যেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য তা হল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীর প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীব সামাজিক সংযোগ সূত্র এই অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশেষ শর্ত হওয়াব দাবি রাখে।

ইসলাম প্রতিনিধিদের বিবরণমূলক উত্তরের বিশ্লেষণ

সমীক্ষাপত্রে বিবরণমূলক প্রশ্ন বাখা হয়েছিল পাঁচটি। তাঁর প্রথমটি হল—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ধারণা, দ্বিতীয়টি—শ্রীশ্রীমার প্রসঙ্গে ধারণা, তৃতীয়টি—স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ধারণা, চতুর্থ প্রশ্ন ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক তথ্য প্রচার কি কোনো বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে? এই পর্বের মতামত ও বিশ্লেষণী পরিসংখ্যানকে সাজানো হয়েছে সারণী ২-এ।

'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ইসলাম প্রতিনিধিদের ধারণা' প্রশ্নে ইসলাম প্রতিনিধিদের যে উত্তর পাওয়া গেছে তার মধ্যে ইতিবাচক উত্তবদাতা

হলেন শতকরা ৭৭.৪৬ জন। ইতিবাচক মন্তব্যের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিরা হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকাবর্গ। এবং এর পরবর্তী গোষ্ঠী হিসাবে লক্ষ্য করা যায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ইসলাম প্রতিনিধিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতামতের মধ্যে বিশেষ প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়। মৌলবীগোষ্ঠী বলেন, 'তিনি একজন মহাপুরুষ—সমস্ত জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল মানুষের মহৎ কর্ম' (শেখ গিয়াসউদ্দীন, বর্ধমান); 'তাঁর নামে কিছু বলার সাহস নেই' (ফিরোজ খাঁ, মুর্শিদাবাদ)। আফসার ফকির (মুর্শিদাবাদ) ও জাহাঙ্গীর ফকির (নদীয়া) মন্তব্য করেন, 'শুনেছি তিনি উদার ছিলেন।' বয়স্ক ব্যক্তিদের অনেকেই তাঁকে, 'উত্তম মানুষ' (সৈয়দ মহম্মদ, মুর্শিদাবাদ), 'সৎ মানুষ' (মহাসিন আলি, মালদহ) ও 'সর্ব ধর্মের সাধক' (কাজী আবদুল শুকুর, হুগলি) বলে অভিহিত করেছেন। যদিও অনেকেই জানিয়েছেন, ভাল জানি না। শিক্ষক-শিক্ষিকা গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই তাঁর সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ। দু-একজন সিদ্ধান্তে বিরত হলেও হুগলির শেখ মসারুল হোসেন ও সরিফুল হক জানান, 'তিনি সৎ পুরুষ—উদার মানবপ্রেমিক; সহজ-সরল-অনাড়ম্বর গৃহস্থ সন্ন্যাসী; তাঁর কথা যদি আমরা পালন করি তাহলে আমাদের সৎকর্মে উদ্দীপনা আসবে।' বর্ধমানের শেখ রফিফুল আলমের সিদ্ধান্ত হল, 'তিনি মহাপুরুষ, ধর্মের গোঁড়ামি তাঁতে ছিল না।' খুব দৃঢ়তার সঙ্গে মালদহের অহিদুল শেখ জানালেন, 'উনার সম্বন্ধে কিছু বলা মানেই উনাকে ছোট করা।' অধ্যাপিকা ডঃ নাসিমাবানু খান (কলকাতা) বললেন, 'হিন্দু ধর্মের বড় সাধক ও কালীর উপাসক বলেই জানি।' সরকারী কর্মচারীদের কেউ কেউ মন্তব্যে আড়ষ্ট হলেও নির্ভিক কণ্ঠে একাধিক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে জানালেন যে তিনি 'মানবতাবাদের প্রচারক' (মহম্মদ এস. হোসেন, কলকাতা), 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক' (শেখচাঁদ মিঞা) ও অবতার (মহঃ আহবাব, হুগলী)। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনেকেই মন্তব্য করলেন, 'তিনি সিদ্ধ সাধক ও মহাপুরুষ ছিলেন' (আরাফত হোসেন, হুগলী; ডালিম শেখ, মালদহ; আসিফ ইকবাল, বর্ধমান, আনিসুল হক, হাওড়া)। বীরভূমের মহঃ সাহেব আলি জানালেন, 'তাঁর কাছে ধর্মের থেকেও বড় মানুষ।' হুগলির শেখ আনিসের রহমান জানালেন 'রামকৃষ্ণকে মানলে অর্থাৎ ওঁর চরিত্র অনুসরণ করলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির চিড় ধরার কথা নয়।' গৃহবধূদের অধিকাংশের বক্তব্য হল তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তবে বর্ধমানের আফসারা বেগম জানালেন, 'উনি খুব বড সাধক ছিলেন বলেই জানি।'

মুর্শিদাবাদের রওশাল আরা বেগম বললেন, 'ওনার মত মহামানব হয় না।' ছাত্রগোষ্ঠীর অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অবগত। তাদের কাছে তিনি 'মহামানব' (সুবার শেখ, মালদহ), 'সর্বধর্মে বিশ্বাসী পরমপুরুষ' (হিসাবউদ্দীন মল্লিক, হুগলি), 'এক জ্ঞানী সাধক', (শেখ এক্তিয়ারউদ্দীন, হুগলি) ও 'এক আদর্শ মানুষ', (লাল মহম্মদ, মুর্শিদাবাদ)। কিছু ছাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাদের অনভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করলেও বর্ধমানের ছাত্র শেখ সহিদুর রহমান জানালেন, 'হিন্দুধর্মকে সুন্দর, পবিত্র ও সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন; তিনি সকল ধর্মকে সমান ভালবাসতেন।' ছাত্রীগোষ্ঠীর অনেকেই সবিনয়ে জানিয়েছেন, 'তিনি পরমপুরুষ' (কাজী সাহানারা, হুগলি), 'মহৎ পুরুষ' (হোসেনরা ইয়াসমিন, বর্ধমান; উসতারা বেগম, মুর্শিদাবাদ)। কিছু ছাত্র যদিও সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেছেন, 'ভাল জানি না' তবু অধিকাংশ ছাত্রীই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অত্যন্ত সরব। হাজেরা খাতুনের (হুগলি) কাছে, 'তিনি হিন্দুধর্মের প্রচারক'; ঐ বক্তব্য সমর্থন করে ছাত্রী আজিনা খাতুন (হুগলি) বলেন, 'তিনি অন্য ধর্মের ব্যক্তিদের ভিন্ন চোখে দেখতেন না'। স্মরণীয় মন্তব্য পাওয়া গেল আনোয়ারা বেগমের লেখনীতে; 'ভারতীয় ঋষিদের পূর্ণ বিকশিত রূপ; বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ।' শ্রমজীবী মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি' (শেখ সুলতান আলী, হুগলি), 'সকলকে সমান চোখে দেখার মানুষ' (শেখ নুরুল ইসলাম, নদীয়া) ও 'বড় সাধক' (শেখ ওয়াজেদ আলী, হাওড়া)। বীরভূমের মীর আবদুল রসিদ জানালেন, 'তিনি সব ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।'

এই পর্বের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে ইসলাম প্রতিনিধিদের ধারণা। এ প্রসঙ্গে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৫৭.৭৫ জন।

শ্রীমা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রশ্নে বেশির ভাগ মৌলবী ব্যক্তি জানালেন, 'বিশেষ কিছু জানি না'। কিন্তু বীরভূমের আবদুল রসিদ খাঁ বললেন, 'তিনি রামকৃষ্ণের স্ত্রী'। অন্যান্য মৌলবীবৃন্দ মন্তব্য করলেন, 'বিশ্বজননী' (ইসলাম হক্‌, হুগলি) ও 'মহৎপ্রাণের নারী' (হাসান ইমান, বর্ধমান)। ফকির গোষ্ঠীর অধিকাংশই জানালেন যে, তাঁর সম্বন্ধে তাঁদের কিছু জানা নেই, বয়স্ক ব্যক্তিগণ খুব সরল উত্তর পরিবেশন করেছেন। প্রায় সকলেই জানিয়েছেন, 'তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী' (মুর্শিদাবাদের সৈয়দ মহম্মদ নুরল হকের মন্তব্যে বিশেষ প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্ন সত্তা!' শিক্ষক-শিক্ষিকা গোষ্ঠী শ্রীশ্রীমা

প্রসঙ্গ ভালভাবেই অবগত। তাঁরা নানা বিশেষণে ভূষিত করেন মা-সারদাকে।

'পরমত-সহিষ্ণু পল্লীনারী'—বললেন শেখ মোসারফ হোসেন; অহিদুল শেখের কাছে তিনি 'বিশ্বজননী', শেখ মহম্মদ ইউনুস জানালেন, 'আদর্শস্থানীয় মা' এবং ডঃ নাসিমাবানু খানের (কলকাতা) দৃষ্টিতে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী ও সহসাধিকা'। বর্ধমান জেলার সাওলানা এম.এ খান মোজাহেবী একটু বিস্তৃতভাবে জানালেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী এবং মমতাময়ী মা, গরীবদুঃখীর দুঃখ মোচনে খুব চিন্তিত হতেন তিনি'। সরকারী কর্মচারী গোষ্ঠীর অনেকেই—'বেশি কিছু জানা নেই' বলে মন্তব্য করলেও তাঁকে 'ধর্মনিরপেক্ষ মহিলা', 'ভারতের সাধিকা' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের পরিপূরক ব্যক্তিত্ব' বলে উল্লেখ করেছেন শেখ রেজাউল ইসলাম (হুগলি), শেখ চাঁদ মিঞা (হাওড়া) ও মহম্মদ আহবাব (হুগলি)। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছ থেকে কিছু নেতিবাচক উত্তর পাওয়া গেলেও প্রত্যয়সমৃদ্ধ উত্তর দিয়েছেন অনেকেই। 'তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ও সাধনসঙ্গী', বলেছেন আসিফ ইকবাল (বীরভূম); 'সতী-সাধ্বী স্বামীপরায়ণা মহিলা' বলে মন্তব্য করেছেন আনিসের রহমান (হুগলি) এবং 'বড় সাধিকা' বলে ঘোষণা করেছেন শেখ ইউনুস (মেদিনীপুর)। গৃহবধূদের শতকরা সত্তরজন মন্তব্যে বিরত রইলেন। তাঁরা সম্ভ্রমে জানিয়েছেন, 'তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানি না।' ইতিবাচক উত্তরদাতাদের মন্তব্য হল,—'তিনি রামকৃষ্ণের পত্নী' (বেগম সানোয়ারা, হুগলি) ও 'সর্ব ধর্মের সাধিকা' (আবসারা বেগম, বর্ধমান)। ছাত্রদের মধ্যেও সংগৃহীত নমুনায় শ্রীশ্রীমার প্রসঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। যাঁরা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন তাঁদের কাছে তিনি 'বিশ্বজননী' (হিসাবউদ্দীন, হুগলি) ও 'মহৎ প্রাণের এবং উদার হৃদয়ের নারী' (ইদ্রিস আলী, নদীয়া); ছাত্রীদের মধ্যে ফিজা হোসেন (কলকাতা) জানান, 'তিনি জাতিভেদ মানতেন না'; আর্জিনা খাতুনের (হুগলি) মন্তব্য,—'সকল ধর্মের মানুষকে সমান চোখে দেখতেন'। 'তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন' বলে উত্তর দিয়েছেন হোসেনারা ইয়াসমিন (বর্ধমান) ও রিজিয়া মল্লিক (বাঁকুড়া)। শ্রমজীবী গোষ্ঠীর অনেকেই তাঁদের অনভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। সপক্ষেও উত্তর দিয়েছেন কেউ কেউ (হুগলির শেখ সুলতান আলী), হাওড়ার শেখ ওয়াজেন আলী ও মেদিনীপুরের মান্নান আলী সাহা)। তাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় হল 'উদারচেতা মহিলা'। সেই হিসাবে বাঁকুড়ার ইমতাজ আলী খাঁর বক্তব্য বিশেষ স্মরণীয়: 'সাবদা মা মহৎ নারী এবং তাঁর কাছে জাতিভেদ, হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ ছিল না।'

এই পর্বের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম প্রতিনিধিদের শতকরা ৬৪·৭৯ জন ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। স্বামীজী সম্পর্কে মৌলবীদের বক্তব্য,—'স্বামীজী দেশপ্রিয় নেতা ছিলেন।' (আবুল রসিদ খাঁ, বীরভূম) ; 'তিনি মহাপুরুষ — সকল ধর্মের সমন্বয়সাধন করেছিলেন' (হাসান ইমান, বর্ধমান) এবং 'মানবধর্ম প্রচার করেছিলেন' (ইমানুল হক, হুগলি)। ফকির সম্প্রদায়ের কম সংখ্যক ব্যক্তিই স্বামীজী সম্পর্কে অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত হল, 'তিনি মহৎপ্রাণের ব্যক্তি।' বয়স্ক ব্যক্তিদের ধারণা, 'তিনি মহাপুরুষ; রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ও মানবিক আদর্শের শিক্ষক।' শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর মধ্যে স্বামীজী প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ মাত্রায় ইতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়। অধ্যাপিকা নাসিমাবানু খান জানালেন, 'স্বামীজী মানবধর্মের প্রচারক।' মালদহের অহিদূল শেখের মন্তব্য,—'স্বামীজী নেতা ও সিদ্ধ সাধক।' 'সর্বজীবে সমভাবাপন্ন মতের প্রচারক' বলে মন্তব্য করলেন সরিফুল হক (হুগলি)। বর্ধমানের শেখ মহম্মদ ইউনুস জানালেন, —'রামকৃষ্ণদেবের বহিঃপ্রকাশ স্বামী বিবেকানন্দ।' মহম্মদ সেফাতুল্লার মন্তব্য বড় উজ্জ্বল —'তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজেছিলেন।' সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বামীজী প্রসঙ্গে বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'— বাণী স্মরণ করেছেন হুগলির অন্তর মণ্ডল। তাঁর আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন শেখ চাঁদ মিঞা (হাওড়া)। মহম্মদ এস. হোসেন (কলকাতা) তাঁকে 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রচারক' বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে স্বামীজীর প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়। 'তিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী — তাঁর বাণী কর্মে উদ্দীপনা যোগায় এবং পৃথিবীকে চিনতে শেখায়'— বললেন শেখ আনিসের রহমান (হুগলি)। স্বামীজীর মধ্যে 'ধর্মজ্ঞান ও মানবসেবা'র প্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন মহঃ সাহের আলি (বীরভূম)। আসিফ ইকবালের বক্তব্য হল,—'তিনি সকল ধর্মের ও মতের ঊর্ধ্বে'। গৃহবধূ গোষ্ঠী তাঁকে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বলেই জানেন। ছাত্র গোষ্ঠীর অভিজ্ঞান ভাল হলেও গভীরতা কম। তাদের চোখে তিনি, 'সমানাধিকারের প্রবক্তা' (ইদ্রিস আলি, নদীয়া) ও 'অসাধারণ নেতা' (লালমহম্মদ, মুর্শিদাবাদ)। ছাত্রীগোষ্ঠীও স্বামীজী প্রসঙ্গে সচেতন মন্তব্য করেছে। তাদের চোখে তিনি, 'ভালবাসা ও মৈত্রীর প্রচারক' (ফিজা হোসেন),. 'মহাপুরুষ' (আজিনা খাতুন) ও 'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী' (রিজিয়া

মল্লিক)। শ্রমজীবী জনগণও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে অনভিজ্ঞ নন। তাঁদের চোখে তিনি 'ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি', 'রামকৃষ্ণের ভক্ত', 'যত মত তত পথ-এর প্রচারক' (মান্নান আলী, শেখ সুলতান আলী ও এস. ওয়াজেদ আলী)।

চতুর্থ প্রশ্নে ছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন প্রসঙ্গে মন্তব্য'। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে ইতিবাচক উত্তরদাতাদের সংখ্যা শতকরা ৬০·৫৬ জন। মৌলবী গোষ্ঠী মিশন প্রসঙ্গে জানান,—'শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান' (শেখ গিয়াসউদ্দীন, হুগলি), 'নিয়ম শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা সেখানে যথেষ্ট এবং মুসলমানদেরও অধিকার দেন' (হাসান ইমান, বর্ধমান) এবং 'দেশের প্রিয় সন্তান তৈরির জায়গা' (ফিরোজ খাতুন, মুর্শিদাবাদ)। আবার অনেকে জানিয়েছেন 'ধারণা স্পষ্ট নয়, তবে এটা বুঝতে পারি যে মিশন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে দরিদ্র ও আর্তের সেবায় নিয়োজিত।' ফকির গোষ্ঠীর মতামত হল,—'শুনেছি সব ধর্মের লোক সেখানে যায়''। বয়স্ক ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই ধারণা, 'মিশন একটি উন্নত শিক্ষাদান কেন্দ্র' (কাজা আবদুল শুকুর, সৈয়দ মহম্মদ নুরল হক প্রমুখ)। শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর বক্তব্য তীক্ষ্ণ। তাঁদের উত্তরে মিশনের এক উজ্জ্বল চিত্র পরিব্যাপ্ত—'এটি একটি সৎ প্রতিষ্ঠান' (অহিদুল শেখ), 'এখানে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলে ঠাঁই পায়' (সরিফুল হক), 'এখানে সকল ধর্মের চর্চা হয় এবং সবল চেতনা গঠনের উৎকৃষ্ট পীঠস্থান' (শেখ মহম্মদ ইউনুস)'। ডঃ নাসিমবানু খান 'এটি একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' বলে অভিহিত করেছেন। সরকারী কর্মচারীদের অধিসংখ্যক ব্যক্তি ইতিবাচক উত্তর দেন। তাঁরা বলেন 'সর্বজনীন ধর্মের মিলন মন্দির' (মহম্মদ এস হোসেন), 'রাজনৈতিক ছাপমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্র' (শেখ রেজাউল ইসলাম), 'মানবধর্মের প্রচারক' (মহম্মদ আহবাব)। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও এই প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে সরব। তাঁরা মিশনকে 'সৎসঙ্গ' ও 'জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান' রূপে দেখেন। হুগলির শেখ মতিয়ার রহমান জানালেন, 'মিশনে কোন ভেদাভেদ নেই, আমাদের ছেলেমেয়েরাও মিশনে পড়ে'। গৃহবধূদের মধ্যে নেতিবাচক উত্তরই প্রধান। তবে আফসারা বেগম বলেছেন, 'পড়াশোনা শেখার আদর্শ প্রতিষ্ঠান'। ছাত্রগোষ্ঠীর উত্তরে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা, শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে বিধৃত। কয়েকটি ছাত্রের নেতিবাচক উত্তর খুব অগভীর—'মিশনে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেরই স্থান আছে তবে বর্তমানে সকলে সমানভাবে অধিকার পায় না।' ছাত্রী গোষ্ঠীও মিশনের নিয়ম

শৃঙ্খলা, শিক্ষা, সেবার প্রসঙ্গে মুখর। শ্রমজীবী ব্যক্তিরা জানালেন,—'মিশন খুব সেবাপরায়ণ, এখানে নিয়মশৃঙ্খলা খুব; বিপদে এঁরা সকলকেই সাহায্য করেন।'

এই পর্বের শেষ প্রশ্ন ছিল,—'শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতির প্রচার কি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে?' এই প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য উত্তর এসেছে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে। এতে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৭৪ জন। ইতিবাচক উত্তরদাতাদের মধ্যে সচেতন সমর্থক শতকরা ৫৭ জন এবং সংশয়ক্লিষ্ট সমর্থক শতকবা ১৭ জন। সচেতন সমর্থক উল্লিখিত দশটি গোষ্ঠীর মধ্যেই বর্তমান। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় গোষ্ঠী শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং পরবর্তীক্রমে অবস্থান করছেন ব্যবসায়ীগণ শ্রমজীবী গোষ্ঠী ও ছাত্র-ছাত্রী গোষ্ঠী। কাজেই সম্প্রীতির এই উদ্যোগের আহ্বান সমাজের গবিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেব কণ্ঠে বিধৃত। সচেতন সমর্থক মৌলবী গোষ্ঠী জানান, 'এ প্রচাব নিশ্চিত সফল হবে'। ফকির গোষ্ঠী বলেন, 'হ্যাঁ, এ উদ্যোগে ভাল ফল হবে।' বয়স্ক ব্যক্তিগণের কণ্ঠে আশ্বাসেব সুর,—'এ উদ্যোগ নিশ্চিত সাফল্য পাবে।' সবকারী কর্মচারীগণের কণ্ঠ আরও জোরাল,—'এ পথ সম্প্রীতিব ভূমিকা নিতে পারে, এ পথই এখন একমাত্র পথ।' ব্যবসায়ীগণের লেখনী সম্ভাবনাময় প্রত্যয়ে উজ্জ্বল,—'এ উদ্যোগে অবশ্যই বিশেষ ফল পাওয়া যাবে।' ইতিবাচক মন্তব্যে গৃহবধূদের সংখ্যা কম হলেও তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে,—'এ প্রচাব এক কার্যকরী উদ্যোগ।' ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমজীবী মানুষ সকলেই দৃঢ়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সাফল্য জানান।

সংশয়ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মুখ্যত 'হতে পাবে' বলে মন্তব্য টেনেছেন। এঁদেব মধ্যে আছেন মৌলবী, ফকির, বয়স্ক ব্যক্তি, গৃহবধূ ও কিছু ছাত্র-ছাত্রী।

নেতিবাচক উত্তরগুলি এই প্রকল্পের এক স্মরণীয় তথ্য। নেতিবাচক উত্তরদানকারী মৌলবী প্রতিনিধি জানালেন, 'হ্যাঁ, ভূমিকা নিতে পারে, তবে সব ক্ষেত্রে সফল হবে না। কারণ সাধারণ মানুষের রামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ে ভাল জ্ঞান নেই।' সংশয়ান্বিত ব্যবসায়ী প্রতিনিধি জানালেন, 'উল্লেখযোগ্য ফল তো হয়নি।' গৃহবধূরা বিনয়ের সঙ্গেই ঘোষণা করলেন,—'বিশেষ কোন ধারণা নেই, কি হবে জানি না।' ছাত্র-ছাত্রী গোষ্ঠীব দোটানা মন্তব্য,—'হয়তো হতে পারে।' শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের নিস্পৃহ উত্তর,—'ঠিক বলতে পারব না।'

উপসংহার

এই অধ্যায় আগের সমীক্ষা অভিযানের মূল্যায়ন টানার জন্য স্থিরকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সর্বাগ্রে সচেতন হওয়া দরকার সমীক্ষাপত্রের উত্তরদাতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে। যদিও আমরা মুসলমান সমাজের দশটি গোষ্ঠীকে নির্বাচন করেছি—মুখ্যত তাঁরাই সমাজের চালচিত্র ধরে রেখেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর সকলের মন্তব্য নিয়েই আমরা সিদ্ধান্ত টানতে আগ্রহী।

সমীক্ষাপত্রের প্রশ্নসমূহ দুটি পর্বে থাকলেও সেখানে তিনটি উদ্দেশ্য প্রোথিত। প্রথম উদ্দেশ্য—নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক তথ্য ঐ সমাজের ব্যক্তিগণ জানেন কি না তা দেখা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ঐ সমাজের প্রতিনিধিদের শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে কিরূপ ধারণা তা অবগত হওয়া। তৃতীয় উদ্দেশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ইসলাম সম্প্রীতির প্রচার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে কি না—সে ব্যাপারে ঐ সমাজের মতামত নেওয়া।

এই ত্রিমুখী প্রশ্নের উত্তরধারা বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে, রামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক তথ্য প্রচারে সম্মতি জানিয়েছেন অধিক সংখ্যক ইসলাম প্রতিনিধি। এই সমীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, ইসলাম প্রতিনিধিদের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দুই-ই প্রবল। তবে শ্রীমা প্রসঙ্গে তাঁদের জানার পরিধি তুলনামূলকভাবে খুবই কম। ইসলাম প্রতিনিধিবৃন্দের অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জানেন—অনেকেই তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বিষয়ে সচেতন। অথচ তাঁর বিস্ময়কর জীবনী ও অমৃতময় বাণীর অভিজ্ঞতা অস্বচ্ছ মনে হয়। ধারণা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টজনের সামগ্রিকভাবে এই সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে মুসলমান সমাজ নিবিষ্টচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুধাবন ও অনুসরণে আগ্রহী। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষের ইতিহাস সেই কথাই বলে।

এই সমীক্ষা প্রসঙ্গে আগত কিছু ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে জানানো যায় রামকৃষ্ণ মিশন পূর্বেও ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এবং বর্তমানেও মিশন এই আদর্শেরই বাহক। অনেকের ধারণা যে, রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যায়তনগুলিতে কেবল হিন্দু ছাত্ররাই পঠন-পাঠন করে; কিন্তু সে ধারণা সত্য নয়। বহু মুসলমান ছাত্র রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যায়তনে পাঠরত এবং

ঐ সমস্ত বিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষেব ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে।

এই সমীক্ষায় যে চিত্রটি বিশেষভাবে উন্মোচিত তা হল, ইসলাম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আগ্রহ। কিন্তু তাঁদের পরিপূরক অভিজ্ঞতা-বর্ধক পুস্তক সরবরাহ ও প্রচারাভিযানের অপ্রতুলতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কাজেই ঐ জাতীয় উদ্যোগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মুসলমান সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-সচেতনতা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয় যে শ্রমজীবী ব্যক্তিদের বিশেষ অংশ পুস্তকপাঠব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যতার সম্পর্কে অবহিত। এই সমীক্ষা থেকে উপলব্ধ হয যে, এ দেশে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃতির আদান-প্রদান অবশ্যই এক কার্যকরী ও প্রায়োগিক ভূমিকা নিতে পাবে এবং ভবিষ্যতে তা নেবেও। আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত শতবর্ষ সেই ইঙ্গিত উজ্জ্বল ভাবে বহন করে।

● সমীক্ষা পত্রেব নমুনা পবেব পৃষ্ঠায় দেওযা হল।

একটি সমীক্ষাপত্রের নমুনা
উত্তরদাতা : শ্রমজীবী ইসলাম প্রতিনিধি

নাম — শেখ ওয়াজেদ আলি
ঠিকানা — বেলুড়, হাওড়া
বৃত্তি — মৎসজীবী

প্রশ্ন (প্রথম পর্ব)	উত্তর
১) শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেছেন কি না?	হ্যাঁ
২) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক কোন পুস্তক পড়েছেন কি না?	না
৩) জানেন কি শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম সাধনা করেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে গুরু ছিলেন এক ইসলাম সাধক?	হ্যাঁ
৪) জানেন কি শ্রীমা সারদাদেবী মুসলমান পুরুষ ও নারীদের সন্তান জ্ঞানে স্নেহ করতেন সকলের সামনে?	না
৫) জানেন কি বিবেকানন্দের সঙ্গীতগুরু ছিলেন এক মুসলমান ওস্তাদ?	না
৬) জানেন কি রামকৃষ্ণ মিশনে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা হয়?	হ্যাঁ

প্রশ্ন (দ্বিতীয় পর্ব)	উত্তর
১) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কিরূপ?	তিনি খুব বড় সাধক ছিলেন।
২) শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে আপনার ধারণা কিরূপ?	তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী ও কালীভক্ত ছিলেন।
৩) স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনার ধারণা কিরূপ?	তিনি রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন।
৪) রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে আপনার ধারণা কিরূপ?	খুব ভাল জায়গা। মুসলমানেরাও সেখানে যায়।
৫) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক প্রচার কি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে কোন বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে?	তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ছিলেন। তাঁরা পরমগুরু। সেই হিসাবে গুরুত্ব পেতে পারে।

সারণী সংখ্যা ১ : ইসলাম প্রতিনিধিদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন প্রসঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক অভিমতের বিশ্লেষণ (শতকরা মাত্রা)

	শ্রীরামকৃষ্ণ নামের অভিজ্ঞতা		পুস্তকপাঠের অভিজ্ঞতা		রামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতির অভিঃ		শ্রীশ্রীমার ইসলাম সম্প্রীতির অভিঃ		স্বামীজীর ইসলাম সম্প্রীতির অভিঃ		রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের অভিঃ	
	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−	+	−
১) মৌলবী	১০০.০০	—	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	২০.০০	৮০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০
২) ফকির	৬৭.৬৭	৩৩.৩৩	—	১০০.০০	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	—	১০০.০০	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	—	১০০.০০
৩) বয়স্কব্যক্তি	৮৭.৫০	১২.৫০	৩৭.৫০	৬২.৫০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	২৫.০০	৭৫.০০	৫০.০০	৫০.০০
৪) শিক্ষক	১০০.০০	—	৮৭.৫০	১২.৫০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৭৫.০০	২৫.০০
৫) সরকারী কর্মচারী	১০০.০০	—	৮৩.৩৩	১৬.৬৭	১০০.০০	—	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩
৬) ব্যবসায়ী	১০০.০০	—	২৮.৫৭	৭১.৪৩	৭১.৪৩	২৮.৫৭	৭১.৪৩	২৮.৫৭	৫৭.১৪	৪২.৮৬	৮৫.৭২	১৪.২৮
৭) গৃহবধূ	৭৭.৭৮	২২.২২	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	২২.২৩	৭৭.৭৭	১১.১১	৮৮.৮৯	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭
৮) ছাত্র	১০০.০০	—	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৫০.০০	৫০.০০	৩৭.৫০	৬২.৫০
৯) ছাত্রী	১০০.০০	—	৬২.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৬২.৫০	৫০.০০	৫০.০০	২৫.০০	৭৫.০০
১০) শ্রমজীবী ব্যক্তি	১০০.০০	—	৩০.০০	৭০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৩০.০০	৭০.০০	৪০.০০	৬০.০০
সামগ্রিক =	৯৩.২০	৬.৮০	৪৭.২২	৫২.৭৮	৫৪.৩১	৪৫.৬৯	৪০.৭৯	৫৯.২১	৪৬.৫৮	৫৩.৪২	৫০.৬৫	৪৯.৩৫

সারণী সংখ্যা ২ : ইসলাম প্রতিনিধিদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন প্রসঙ্গে অভিমতের বিশ্লেষণ (শতকরা মাত্রা)

ইসলাম প্রতিনিধিবৃন্দ	শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে		শ্রীশ্রীমা-সারদা প্রসঙ্গে		স্বামীজীর প্রসঙ্গে		রামকৃষ্ণ মিশন প্রসঙ্গে		শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রতি প্রচার		
	+	−	+	−	+	−	+	−	ইতিবাচক প্রত্যয়যুক্ত	ইতিবাচক সংশয়যুক্ত	নেতিবাচক
১) মৌলবী	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৪০.০০	২০.০০	৪০.০০
২) ফকির	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	১০.০০	৯০.০০	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৮০.০০	২০.০০	—
৩) বয়স্ক ব্যক্তি	৭৫.০০	২৫.০০	৭৫.০০	২৫.০০	৭৫.০০	২৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৭৫.০০	—	২৫.০০
৪) শিক্ষক শিক্ষিকা	৯০.০০	১০.০০	৮০.০০	২০.০০	৮০.০০	২০.০০	৮০.০০	২০.০০	৭০.০০	২০.০০	১০.০০
৫) সরকারী কর্মচারী	৮৩.৩৩	১৬.৬৭	৫৩.৩৩	৪৬.৬৭	৭৩.৩৩	২৬.৬৭	৮৩.৩৩	১৬.৬৭	৭০.০০	১৫.০০	১৫.০০
৬) ব্যবসায়ী	৮৭.৫০	১২.৫০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৭৫.০০	২৫.০০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৫০.০০	৩৫.০০	১৫.০০
৭) গৃহবধূ	৫০.০০	৫০.০০	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৫.০০	৫০.০০	১৫.০০
৮) ছাত্র	৮৩.৩৩	১৬.৬৭	৩৭.৫০	৬২.৫০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৬২.৫০	৩৭.৫০	৭০.০০	১৫.০০	১৫.০০
৯) ছাত্রী	৭২.৭৩	২৭.২৭	৭২.৭৩	২৭.২৭	৬৩.৬৪	৩৬.৩৬	৪৫.৪৫	৫৪.৫৫	৬৫.০০	২৫.০০	১০.০০
১০) শ্রমজীবী ব্যক্তি	৮০.০০	২০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	২০.০০	২০.০০
সামগ্রিক =	৩৭.৪৬	২২.৫৪	৫৭.৭৫	৪২.২৫	৬৪.৭৯	৩৫.২১	৬০.৫৬	৩৯.৪৪	৬১.৫০	২২.০০	১৬.৫০

পরিশিষ্ট

চার আনা পয়সা দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের
বছর আগে, একশো বছর পর তার

RAMAKRISHNA

Income & Expenditure Account

Previous Year Rs.	INCOME	Schedule
7,26,90,758	Donations	
26,75,25,176	Grants from: Government	
2,28,40,342	Public Bodies	
18,75,17,854	Fees and Charges	
9,93,17,000	Income for Investments	H
5,93,80,033	Income from Sales	I
97,36,883	Other Income	J
3,19,73,433	Closing Stock	C
75,09,82,019		
	EXPENDITURE	
32,55,12,105	Establishment Expenses	
7,18,63,466	Boarding Expenses	
2,04,40,039	Relief and Welfare Expenses	K
4,00,48,757	Educational and Cultural Expenses	L
3,76,13,943	Medical Expenses	L
2,23,25,494	Grants to Beneficiaries/Project Expenses (Rural Development)	
5,11,59,507	Purchases and Production Expenses	N
62,03,371	Seva and Celebration Expenses	
5,09,87,768	Other Expenses	O
2,92,13,394	Opening Stock	O
9,56,14,175	Surplus carried down	C
75,09,82,019		
9,56,14,175	Surplus brought down	
60,84,546	Receipts towards previous year's deficit	
13,104	Profit on sale of Investments	
61,64,370	Profit on sale of Capital Assets	
10,78,76,195		
3,47,08,822	Transfer to different funds for capital expenditure during the year	P
2,786	Loss on sale of/written-off Assets	P
7,31,64,587	Net Surplus transferred to Balance Sheet	
10,78,76,195		

This is the Income & Expenditure Account reffered to in our report of even date.

6, Church Lane, Calcutta-700 001
The 28th August, 1997

RAY & RAY
Chartered Accountants

— ৯ (ক)

প্রথম ত্রাণকার্য শুরু হয়েছিল একশো

আর্থিক চিত্র : আয় ও ব্যয়ের হিসাব

M I S S I O N

for the year ended 31st March, 1997

Educational & Cultural Rs.	Medical Rs.	Rural Development Rs.	General & Other Services Rs.	Total Rs.
3,28,31,273	1,52,98,416	63,25,700	3,01,87,909	8,46,43,298
24,10,71,475	2,00,85,661	2,28,83,077	27,62,545	28,68,02,758
1,94,54,402	4,37,160	15,77,699	4,27,775	2,18,97,036
10,91,99,195	9,38,26,695	21,23,207	1,00,69,695	21,52,18,792
3,95,55,538	2,63,74,040	58,85,963	4,70,66,325	11,88,81,866
3,05,12,337	6,71,896	1,67,03,374	1,71,87,335	6,50,74,942
40,30,448	5,17,660	56,243	53,36,250	99,40,601
1,51,46,365	75,12,301	47,04,736	70,72,409	3,44,35,811
49,18,01,033	16,47,23,829	6,02,59,999	12,01,10,243	83,68,95,104
26,19,24,031	7,68,29,697	1,41,29,490	1,08,83,951	36,37,67,169
5,59,46,091	1,03,34,704	39,72,442	1,04,62,533	8,07,15,770
23,69,420	33,39,980	19,61,955	99,64,279	1,76,35,634
3,70,88,407	40,42,099	30,52,002	19,51,615	4,61,34,123
23,12,109	3,59,59,397	35,33,576	10,78,607	4,28,83,689
2,12,69,479	--	29,90,973	75,654,	2,43,36,106
2,34,83,360	21,16,890	1,47,70,537	1,41,30,251	5,45,01,038
29,04,614	1,17,794	97,151	31,24,149	62,43,708
3,67,01,830	1,19,87,344	32,02,249	72,83,687	5,91,75,110
1,46,81,601	62,97,754	48,11,769	61,82,309	3,19,73,433
3,31,20,091	1,36,98,170	77,37,855	5,49,73,208	10,95,29,324
49,18,01,033	16,47,23,829	6,02,59,999	12,01,10,243	83,68,95,104
3,31,20,091	1,36,98,170	77,37,855	5,49,73,208	10,95,29,324
22,28,070	25,49,097		65,548	48,42,715
—	22,755	—	-	22,755
1,10,62,771	1,26,943	2,55,877	22,94,754	1,37,40,345
4,64,10,932	1,63,96,965	79,93,732	5,73,33,510	12,81,35,139
2,41,33,761	1,25,19,172	36,21,240	47,15,571	4,49,89,708
12,864	—	--	1,558	14,422
2,22,64,307	38,77,793	43,72,528	5,26,16,381	8,31,31,009
4,64,10,932	1,63,96,965	79,93,732	5,73,33,510	12,81,35,139

Belur Math
Howrah - 711 202

SWAMI SMARANANANDA
General Secretary

পরিশিষ্ট

আর্থিক স্থিতিপত্র

RAMAKRISHNA

Balance Sheet as

Previous Year Rs.	FUNDS AND LIABILITIES	Schedule			Current Year Rs.
	Funds				
52,05,32,73	Land and Building Fund			58,16,75,829	
19,73,71,079	Movable Properties Fund			20,92,03,174	
44,76,84,658	Endowment & Permanent Fund			49,88,75,223	
6,85,73,119	Development Fund			7,27,76,452	
	General Funds :				
10,42,92,241	General		13,24,64,254		
11,09,95,141	Educational and Cultural		12,15,88,416		
1,05,03,110	Medical		87,54,184		
1,65,29,366	Rural Development		2,03,11,548		
24,23,19,858				28,31,18,402	
3,68,34,66	Relief Fund			4,65,58,955	
11,42,41,766	Other Funds			13,15,41,472	
1,62,75,57,872				1,82,37,49,507	
9,86,95,572	Provident/Benefit Fund			9,58,05,239	
1,01,51,501	Gratuity Fund			95,15,615	
1,72,64,04,945					1,92,90,70,61
	Liabilities				
59,75,597	Loans and Advances	E		80,78,406	
3,76,36,879	Deposits	F		3,23,72,578	
83,94,716	Creditors			97,31,951	
2,97,58,335	Others	G		3,10,22,137	
8,17,65,527					8,12,05,072
1,81,81,70,472					2,01,02,75,433

This is the Balance Sheet in terms of our report of even date.

6, Church Lane, Calcutta-700 001
The 28th August, 1997

RAY & RAY
Chartered Accountants

Notes :

1. Ramakrishna Mission being a charitable and Philanthropic organisation carries out activities for the uplift of mankind without having any objective of monetary gain. In this context, it is felt that the Accounting Standards prescribed by the Institute of Chartered Accounts of India are not applicable to such institutions.

—৯ (খ)

১৯৯৬—১৯৯৭

MISSION

at 31st March, 1997

Previous Year Rs.	PROPERTIES AND ASSETS	Schedule	Current Year Rs.	
63,11,77,112	Fixed Assets	A		70,94,75,146
1,03,19,80,455	Investment (at cost)	B		1,12,91,86,504
99,48,426	Loan and Advances (considered good)			53,51,310
	Current Assets			
30,58,460	Stock of Sundry Materials		40,35,273	
3,19,73,433	Closing Stock (at actual or estimated cost)	C	3,44,35,811	
1,08,62,255	Deposits		93,94,840	
34,90,802	Debtors (considered good)		30,68,771	
1,23,25,477	Other Receivables		1,70,92,854	
8,33,54,052	Cash and Bank Balances	D	9,82,34,924	
14,50,64,479				16,62,62,473
1,81,81,70,472				2,01,02,75,433

Belur Math
Howrah - 711 202
West Bengal

SWAMI SMARANANANDA
General Secretary

2. Interest Income and Retirement Gratuity have been generally considered in the accounts on cash basis.

পরিশিষ্ট

বিগত একশো বছরে রামকৃষ্ণ

RELIEF REPORT OF HUNDRED YEARS

Year	Cyclone	Drought	Famine	Flood
1896-97			Murshidabad	
1897-98			Dinajpur, S P , 24 Pgs	
1899-00			Kisengarh	Bhagalpur
1904-05				
1905-06				
1906-07			Noakhali, Sylhet, Tripura, 24 Pgs	
1908-09			Murshidabad, Puri	
1909-10				Hooghly, Midnapore
1912-13				
1913-14				Bankura, Burdwan, Hooghly, Howrah, Midnapore
1914-15				–do–
1915-16			Balasore, Bankura, Cachar, Dhaka etc	Cachar, Noakhali, Tripura
1916-17			Contd	Ballia, Burdwan, Faridpur, Benaras
1917-18				Burdwan, Cachar
1918-19				Rajsahi, Mathura
1919-20	Barisal, Dhaka, Faridpur, Khulna		Bankura, Manbhum, Puri, S P , Tripura	Mathura
1920-21			Puri	Cuttack, Midnapur, Puri Amhertst (Burma)
1921-22				Amharst (Burma)
1922-23			Khulna	Bankura, Faridpur, Hooghly, Midnapur, Rajsahi
1923–24	Ganjam			Arrah, Patna
1924–25	–do–			Bhagalpur, Vrindaban, British Malabar, Cochin, Coimbatore, Dehradun, Mathura, Rishikesh, Saharanpur Salem, Tanjore, Travancore, Trichinopolli
1925–26				
1926–27	Faridpur		Midnapore & S P	Akyab (Burma), Bombay, Madras, Midnapore
1927-28	Nellore			Balasore, Kaira
1928-29			Bankura, Dinajpur	
1929-30				Cachar, Nowgang, Sylhet
1930-31				Midnapore

—১০

মিশনের ত্রাণকার্যের বিস্তৃত বিবরণী
OF RAMAKRISHNA MISSION

Fire	Medical	Refugee	Rehabilitation	Other
	Calcutta (Plague)			Darjeeling (EQ)
	Bhagalpur (Plague)			
	–do–			Dharmsala (EQ)
	Sagar, Bhagalpur (Plague)			
	Tehri (Cholera)			
	Sagar			
Puri	Sagar			
Puri	–do–			
Murshidabad, Vrindaban	Howrah (Cholera)			
	Sagar, Balasore etc (Influenza)			
Midnapore	–do–			Bengal (Cloth)
Puri	–do–			Faridpur (Water S C Reh)
	(Influenza) Manbhum etc			
	–do–			Chandpur (Coolie) (Water S C Reh)
Jessore Murshidabad	–do–			
Puri, Manbhum, 24 Pgs	–do–			
Burdwan, Birbhum, Kamrup, Manbhum	Sagar, Jalpaiguri (Cholera) Lahore (Plague) & Rohtak			
Manbhum	Sagar, Hooghly & Purnea (Cholera)			
Puri	Malda & Purnea (Cholera)			
Mathura, Murshidabad, Puri, 24 Pgs				
24 Pgs				
	Burdwan (Cholera)			
Manbhum	Purnea (Cholera)			Pegu (Burma) (EQ) Allahabad (K Mela) Dhaka (Riot) etc

Year	Cyclone	Drought	Famine	Flood
1931-32			Nadia, Rangpur	Dhaka Mymensingh, Pabna
1932-33	Mymensingh		Mymensingh, Pabna	
1933-34				Cuttack Midnapore, Puri
1934-35	Tanjore			
1935-36	24 Pgs		Bankura, Burdwan, Sylhet	Bankura, Burdwan, Hooghly
1936-37	Guntur		Bankura, Birbhum, Khulna, M P , S P	Arakan (Burma), Kanpur, Malda
1937-38				Cuttack & Puri
1938-39	Ganjam & Puri			Dhaka, Faridpur, Malda, Murshidabad
1939-40	Dhaka		Kathiawa	Birbhum, Kathiawar, Midnapur, Sind
1940-41	Backerganj & Malabar		Kathiawar	Midnapur
1941-42				Surat, Sylhet
1942-43	Balasore, Midnapur 24 Pgs			Burdwan
1943-44	–do–			
1944-45				
1945-46			Bankura & Hooghly	
1946-47				Cachar Chittagong
1947-48				Contd
1948-49				
1949-50				
1950-51	Amalapuram & Tuni (E Godavari) Bhimavaram (W G)			Saurashtra
1951-52	–do–		Darbhanga & Purnea	
1952-53			24 Pgs , Royalaseema	
1953-54			Ahmednagar, Poona	East & West Godavari, Darvanga
1954-55				Coochbehar Dhaka, Darbhanga, E & W Godavari Faridpur, Jalpaiguri, Lakhimpur, Purnea
1955-56	Ramnad & Tanjore			Azamgarh, Cuttack, Dhaka, Darbhanga, Dhubri, Goalpara, Malda, Ramnad, Tanjore
1956-57	–do–			
1957-58	–do–			Nellore
1958-59				Batticaloa (Sri Lanka)
1959-60				Burdwan, Cachar, Howrah, Kamrup, Kutch, Midnapur, Surat, 24 Pgs
1960-61				–do– & Balasore, Cuttack, Saurashtra
1961-62				Balasore, Cuttack, Saurasthra

Fire	Medical	Refugee	Rehabilitation	Other
Bankura, Puri				
Bankura, Birbhum, Jessore etc				
				North Bihar (EQ)
Bankura Birbhum, Manbhum	Midnapore (Cholera)			
	Midnapore (Small Pox)			
Puri	Bankura (Small Pox)			
Birbhum, Manbhum	Almora (Cholera)			Hardwar (K M)
Birbhum, Burdwan etc				
Birbhum, Puri	Sonargaon (Malaria)			Dhaka (Riot)
	Murshidabad (Cholera)			
		Silchar, Chitagong, Dimapur, Noakhali, Pandua		Calcutta (A R P Relief)
	Habiganj & Sylhet (Malaria)	-do-		-do- (75 Relief Centres)
	Champaran (Cholera)	-do-		-do-
				Chandpur, Dhaka, Bankura (Test), Noakhali, Patna, Sylhet, Tripura (Riot)
		Kurukshetra		-do-
		W B		-do-
		-do-		-do-
	Midnapur (Malaria)	Assam, Bihar, E B		Lakhimpur (E Q)
		Tripura, W B		Hardwar (KM)
		-do-		Lakhimpur (EQ)
		Cachar, Hooghly, Malda		
				Kutch (E Q)
				Kutch (E Q), Dhaka (Scarcity), Ramnad (Riot)
				Colombo (Riot)
Bankura				
		W B		
		W.B		

Year	Cyclone	Drought	Famine	Flood
1962-63				Crangore Madras Tanjore Tripryar, Barhiya
1964-65				
1965-66	Uchipalli & Rameswaram			Cachar
1966-67		Banda Mirzapur, Hazaribagh		-do-
1967-68	Cuttack	-do-, Monghyr Santhal Parganas		Delhi Midnapore
1968-69	-do-	-do-, Bankura, Malda, Purulia, Dhenkanal		Delhi, Midnapore, Calcutta Cachar Hooghly etc
1969-70	Chirala (A P)			Surat Malda, Murshidabad
1970-71	-do-	Purulia		Calcutta, Hooghly Howrah, 24 Pgs
1971-72	Pattamundai & Chandiagari (Cuttack)	-do-		24Pgs Contai Howrah Murshidabad Malda Monihari Patna
1972-73		Bankura, Purulia, Bihar, Thane Dt of Jahawar Taluk (Maharasthra)		Coimbatore Mandavalli (Tamil Nadu) Cachar (Assam)
1973-74		Saurashtra Gangapur & Karagi in Karnataka		Midnapore (W B) Sonamura (Tripura), Puri (Orissa)
1974-75				Contai, Kardaha (W B), Darbhanga Laheriasarai, Manihari (Bihar) Dhubri (Assam)
1975-76		Purulia Orissa		Karimganj Patna Midnapore 24 Pgs
1976-77	Patharpratima (24 Pgs) Bhavnagar			Silchar Karimganj Dharmanagar Kailasahar Kamalpur Itahar (W Dinajpur) Patna Baroda
1977-78	Gollapalem Dwarka, Irali Malakayalanka Palakayatippa in Andhra Pradesh, Manapparai and Alangudi in Tamil Nadu, Bhaitgarh (Contai)	Purulia		Ghatal Jorhat, Khowang Hatikhal Contai, Bhadia, Chandmari Panchthupi, Kandi Jahangirpuri
1978-79	Puranabandh Goda (Keonjhar Orissa)			Howrah Hooghly, Calcutta, 24 Pgs., Burdwan, Bankura Murshidabad, Midnapore of W B Allahabad in U P, Naogachhia, Hayaghat Katihar (Bihar) Roop Nagar, Buddha Jayanti Park (Delhi)

Fire	Medical	Refugee	Rehabilitation	Other
		Kurud & Katihar Banpur, Gede etc		
				Jammu & Kashmir (Distress), Kurud, Katihar
				-do-
				Koynanagar (E.Q.), Ranchi (Riot)
				Bankura & Midnapore (Cloth), Koynanagar (E.Q.), Midnapore (Rep. of Sch.), Ranchi (Riot)
		Basirhat, Hasnabad, Taki		
			Kumarkhali (Khulna)	Silchar (Riot)
			Bhoyan in Panchmahal (Gujrat)	
R Udayagiri (Orissa)				1. Midnapore, 24 Pgs., Purulia, Bankura, Coochbehar & Jalpaiguri (Gruel Kitchen) 2 Bankura, Midnapore, Malda, Coochbehar, 24 Pgs. in W.B. & Jamtara (Bihar) (Scarcity Relief) 3 Bankura (Test Relief) 4 Katihar (Cheap canteen)
			Maner (Patna)	
	Purna Kumbha Mela at Allahabad, Karimganj & Silchar, Sagar Mela in 24 Pgs (S)		Maner Block of Patna, Panisagar in Tripura	Bangladesh Relief and Rehabilitation at Dhaka, Narayanganj, Bagerhat, Dinajpur, Barishal and Sylhet
West Siang (Arunachal Pradesh)	Sagar Mela (24 Pgs.)		Panisagar in Tripura, Andhra Pradesh, Tamil Nadu	Bangladesh Relief at Dhaka, Narayanganj, Bagerhat and Dinajpur
Tirap Dt. (Arunachal Pradesh)	Sagar Mela, Daspur, Purnal, Agunshi and Bagnan		At Divi Taluk of Krishna District and at Bapatla in Andhra Pradesh & in Tamil Nadu	Dandakaranya Deserter Relief at Kharagpur and Howrah Rly Stn Bangladesh Relief in Dhaka, Narayanganj, Bagerhat and Dinajpur

Year	Cyclone	Drought	Famine	Flood
1979-80	Nellore and Prakasham (A P), Ranguya, Pathaghat etc (Meghalaya)	Purulia and Ramharipur (W B), Ramgarh, Khetri and Singhana (Rajasthan)		Bankura, Calcutta, Howrah, Hooghly, Murshidabad, 24 Pgs , Midnapore (W B), Kutch and Morvi (Gujrat)
1980-81	Nadia (W B)	Jamshedpur (Bihar), Khetri, Ramgarh, Singhana (Rajasthan), Arambagh, Jayrambati, Ramharipur, Purulia (W B)		Srikakulam (A P), Katihar, Lalganj, Matihari (Bihar), Kutch (Gujrat), Gunupur and Muniguda (Orissa), Kaliachak, Nurpur, Mahanandatala, Manikchak (W B)
1981-82	24 Pgs (W B), Saharpada and Patna in Keonjhar Dist (Orissa) for Tarnado Relief	Nattarampalli (Tamil Nadu)		Jaipur, Chaksu, Lalsot, Tehsils (Rajasthan)
1982-83	Darmikhal, Patban etc (Assam), Cuttack (Orissa), Bhavnagar and Amreli (Gujrat)	Malda, Purulia (W B)		Jaipur, Tonk (Rajasthan), Allahabad (U P), Cuttack and Puri Dist (Orissa)
1983-84	Tornado Relief in Gaighata Block of North 24 Pgs (W B)	Bankura, Purulia (W B), Nattarampalli (Tamil Nadu)		South Tripura, Konkan (Maharashtra), East Godavari and Visakhapattanam (A P), Rajkot, Junagadh (Gujrat)
1984-85	Nellore (Andhra Pradesh), Madras (Tamil Nadu)			42 villages Karimganj (Assam), 28 villages Saharsha, 15 villages Katihar (Bihar), 25 villages Cuttack (Orissa), Cherapunjee (Meghalaya), 45 villages (Tripura) 16 villages Gorakhpur & Deoria (U P), 13 dists of W B viz , Howrah, Hooghly, Burdwan, Malda, 24 Pgs
1985-86		Rajkot (Gujrat), Madras (Tamil Nadu)		Manasadwip (W B), Bhubaneswar (Orissa), Silchar, Karimganj (Assam), Dhaka (Bangladesh)
1986-87		Bomnay & Pune (Maharashtra), Rajkot (Gujrat), Bangalore (Karnataka)		Rajahmundry (A P), Midnapore, Howrah, Murshidabad, 24 Pgs (W B)

Fire	Medical	Refugee	Rehabilitation	Other
Mugulla (A P) Along (Arunachal Pradesh)	Sagar Mela (24 Pgs)		Divi Seema in Krishna Dist and at Bapatla in A P Abhayaban and Nischintaneer Hooghly (W B) Vamalia Morvi (Gujrat)	Riot relief at Jamshedpur in Bihar Disturbances Relief at Guwahati (Assam) Shillong (Meghalaya) Bangladesh Relief in Dhaka Narayanganj Bagerhat Dinajpur
	Ganga Sagar Mela		Bali Dewanganj Malda (W B) Gunupur (Orissa) Srikakulam (A P) Vanalia Lalbaugh (Gujrat)	Disturbance relief in Neharbari & Rangapalli (Assam) & at Agartala Anandanagar etc (Tripura) Earthquake Relief at Baitadi Naukote etc in Nepal Bangladesh Relief at Dhaka Narayanganj Bagerhat and Dinanjpur
Ngenu Nogna Chinhan and Dadam (Arunachal Pradesh)	Ardha Kumbha Mela at Allahabad (U P) Sagar Mela (W B)		Bali-Dewanganj of Hooghly and Kaliachak of Malda (W B) Gunupur (Orissa)	Distress Relief in Hooghly District (W B) Winter Relief at Khetri Jasrapur Baghor (Rajasthan) Riot relief at Bihar Shariff (Bihar)
	Ganga Sagar Mela in W B		Hooghly Malda Bankura (W B) Srikakulam (A P) Gunupur (Orissa)	Disturbance Relief at Alipurduar (W B) and at Abhaypukhri Dhola etc (Assam)
	Ganga Sagar Mela and Chemaguri	Mandapam at Rameswaram (Tamil Nadu)	New Jagatpur of Hooghly Gaighata of 24 Pgs (W B) Srikakulam (A P) Kolhapur (Maharashtra) Junagadh (Gujrat)	Disturbances Relief at Dangi Camp at Alipurduar (W B) and at Khairabari Camp in Assam Winter Relief in Murshidabad Midnapore and Hooghly District (W B)
	Ganga Sagar Mela & Chemaguri 24 Pgs (W B)	Mandapam (Tamil Nadu)	Shimultala (Nadia) Thakurnagar (24 Pgs) Singhee (Birbhum) Khatra (Bankura) (W B) Pataghat Shella Bazar (Meghalaya) Junagadh (Gujrat)	Disturbances Relief in New Delhi Earthquake Relief in Cachar (Assam) Riot Relief in Thane and Bhiwandi (Maharashtra) Winter Relief in Rahara 24 Pgs
Visakhapattanam (A P)	Ganga Sagar Mela	Madras (Tamil Nadu)	Thakurnagar W B	Gas Disaster Relief in Bhopal M P Distress relief in Meghalaya
Along & Narottam Nagar (A P) Nattarampalli (Tamil Nadu)	Gangasagar Mela 24 Pgs	Chakma Refugees (Tripura) Sri Lanka Refugee (Tamil Nadu)	Sapuipara (Howrah) Thakurnagar (24 Pgs) W Godavari (A P) Tumkur (Karnataka) Junagadh (Gujrat)	Disturbances relief in Orissa Distress relief in M P

Year	Cyclone	Drought	Famine	Flood
1987 88		Rajkot (Gujrat) Pune (Maharashtra) Bikaner (Rajasthan) Barmer (Rajasthan) Ganjam (Orissa)		Nalbari Barpeta (Assam) Malda W Dinajpur Jalpaiguri Murshidabad Hooghly Howrah (W B) Dhaka Dinajpur Mymensingh (Bangladesh) Patna Katihar (Bihar)
1988 89	24 Pgs (W B) Khulna (Bangladesh)	Bikaner Barmer (Rajasthan) Ganjam (Orissa) Junagadh Jamnagar Surendranagar (Gujrat) Narattampalli (Tamil Nadu)		Rajkot (Gujrat) Nawgong (Assam) Shella (Meghalaya) Malda W Dinajpur (W B) Dhaka Faridpur Barisal Narayanganj Bagerhat Chandpur Baliati habiganj Dinajpur Nilphaman (Bangladesh) Delhi
1989 90	Tornado relief at Manikganj Bagerhat (Bangladesh) Nellore (Andhra Pradesh)			Cachar Karimganj (Assam) Midnapore (W B) Raigad (Maharasthra) Panchmahal (Gujrat)
1990 91	Vizag Guntur (Andhrapradesh)			43 Villages at Bhavnagar Surendranagar Vadodara Kheda Panchmahal (Gujrat) Madras (Tamilnadu) 14 Villages Ganjam (Orissa)
1991 92	Chittagang Cox sbazar Dinajpur Rangpur (Bangladesh)	Bhuj Kutch Panchmahal (Gujrat)		Silchar Karimganj Cachar Kamrup (Assam) Madras (Tamil Nadu) Cuttack Puri (Orissa) Nagpur (Maharasthra) Malda W Dinajpur Murshidabad (W B) Dinajpur (Bangladesh)
1992 93	Mymansingh Netrakona Jamalpur Kishoreganj Tangail Sherpur Bagerhat Sadar Moralganj Dinajpur (Bangladesh) (For Tornado) Rameswaram Kanyakumari Chidambarana (Tamil Nadu)	Khetri (Rajasthan) Solapur (Maharashtra) Jamnagar Surendranagar Panchmahal Rajkot (Gujrat) Garhwa (Bihar)		Kutch (Gujrat) Purulia (W B) Trivandram (Kerala)

Fire	Medical	Refugee	Rehabilitation	Other
Narottam Nagar (A P) Bagman Calcutta Malda (W B) Bhubaneswar (Orissa) Katihar (Bihar) Bolangir (Orissa) Nomuk (A P)	Gangasagar Mela 24 Pgs	Sri Lanka (Tamil Nadu)	Dinajpur Dhaka (Bangladesh) Maner (Bihar)	Disturbances Relief in Meghalaya
W Siang (Arunachal Pradesh) Bankura (W B) Rajmundry Visakhapatnam (Andhra Pradesh) Bilaspur Puri (Orissa)	Gangasagar Mela (W B)		Maner Monghyr (Bihar) Shella (Meghalaya) 24 Pgs (W B)	Madhubani Monghyr and Darbhanga (Bihar) (E Q)
Vizag (Andhra Pradesh)	Gangasagar Mela (W B)		Midnapore Bankura (W B) Manikganj Tangail (Bangladesh) Panchmahal (Gujrat)	Distress relief at Itanagar (Arunachal Pradesh) Hooghly Bankura for winter-relief (W B) Distress relief at Shella (Meghalaya)
Karimganj (S) (Assam)	Gangasyar (W B)	Sri Lanka (Refugee (Tamil Nadu)	Kolhapur (Maharashtra) Vizag Guntur (Andhra Pradesh) Bhavanagar (Gujrat) Dhaka Manikganj (Bangladesh)	
Puri (Orissa) Singhbhum (Bihar) Visakhapatnam (Andhra Pradesh)	Narainpur (M P) (Cholera) Gangasagar (W B) Allahabd (U P) (Magh Mela)		Chittagong Dinajpur (Bangladesh)	Distress relief at 24 Pgs (N) Jalpaiguri (W B) Uttarkashi (U P) (E Q) Khetri (Rajasthan) (Distress)
Bankura (W B) Puri (Orissa) Delhi	Gangasagar Mela (W B) Deviaburichi Thalaivasal (Tamil Nadu) (Leprasy)		Uttarkashi (U P) Jalpaiguri Purulia (W B)	Distress relief in Moscow (Russia) Khetri (Rajasthan) (Distress) Salem (Tamil Nadu) (Distress) Then Garwal (U P) (E Q) Calcutta 24 Pgs (S) (W B) (Disturbance) Howrah (W B) (Winter)

Year	Cyclone	Drought	Famine	Flood
1993-94	Murshidabad (W B) (for Tornado) Pandicherry and Nagapattinam (Tamil Nadu)	Palamau (Bihar) Jamnagar (Gujrat)		Kamalpur Kailasahar Kumarghat (N Tripura) South and West Tripura Agartala Karimganj (Assam) Alipurduar Jalpaiguri Midnapore Hooghly 24 Pgs (N) Coochbehar (W B) Chandigarh Ropar (Punjab)
1994-95		Jamnagar Surendranagar (Gujrat)	Plague relief in Surat (Gujrat)	Surendranagar Rajkot (Gujrat) Puri (Orissa) W Singhbhum (Bihar) Madras (Tamil Nadu) Batticaloa (Sri Lanka)
1995-96	North and South Pgs (W B)			24 Pgs (N) Hooghly Midnapore Coochbehar Jalpaiguri Malda Dinajpur (S) Murshidabad Birbhum Nadia (W B) Delhi East and West Khasi Hills (Meghalaya) Dhaka 30 Villages in Dinajpur (Bangladesh)
1996-97	Tangail (Bangladesh) (for tornado) Panchmahal (Gujrat) & West East Godavari (Andhra Pradesh)	Rajkot Panchmahal (Gujrat)		Jodhpur Khetri (Rajasthan) Madras (Tamil Nadu) Jalpaiguri Hooghly Malda Howrah 24 Pgs (N) (W B) Junagarh Bharatpur (Gujrat) Prakasham Cuddapah (Andhra Pradesh)
1997 upto Sept	East Godavari (Andhar Pradesh) Cox sBazar Chittagong (Bangladesh) Hooghly (W B)	Panchmahal (Gujrat)		Mahesana Surendranagar (Gujrat) Silchar (Assam) Midnapore 24 Pgs (S) (W B) Puri (Orissa)

* E Q = Earth Quake

Fire	Medical	Refugee	Rehabilitation	Other
Malda E Calcutta (W B) Vishakapatnam (Andhra Pradesh) Karimganj (Assam)	Gangasagar Mela (W B)	Sri Lanka (refugee) (Colombo)		Disturbance riot relief at Nowgang (Assam) Ahmedabad (Gujrat) (riot) Bombay (riot) and Latur (E Q) (Maharasthra) Khetri (Rajasthan) (Distress) Hooghly (W B) (Distress) Pithogora (U P) (Landslide) Tamil Nadu (Distress)
Subansiri (Arunachal Pradesh) Puri (Orissa) Calcutta (N) 24 Pgs (N) (W B)	Allahabad (U P) (Magh Mela) Gangasagar Mela (W B)			Jalpaigun (Distress relief) Hooghly Bankura 24 Pgs (N) Murshidabad (winter relief) (W B)
Narattamnagar (Arunachal Pradesh) Puri (Orissa) Salt Lake Calcutta (W B)				Panchmahal (Gujrat) (Distress) Howrah Bankura (W B) (Distress) 24 Pgs (N) Howrah Hooghly Jalpaigun (W B) (Winter) Jamtara (Bihar) (Distrss) Ranchi (Bihar) (Winter)
West Siang (Arunachal Pradesh) Murshidabad Bankura South Calcutta (W B) East Khasi Hills (Meghalaya) East Godavari (Andhra Pradesh)	Gangasagar Mela (W B)		Panchmahal (Gujrat) East Godavari (Andhra Pradesh) Batticaloa (Sri Lanka)	Panchmahal (Gujrat) (Distress) Khetri Jasarpur Loyel Nalpur (Rajasthan) Quilandy (kerala) (Distress) Howrah (W B) (Distress) East Khasi Hills (Meghalaya)
Puri (Orissa) East Godavari (Andhra Pradesh) Calcutta (N) W B	Magh Saptami Mela in Konark (Orissa)		Hooghly (W B)	Jabalpur (Madhya Pradesh) (E Q) Distress relief Murshidabd (W B)

পরিশিষ্ট—১১

১৯৭৫–৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৯৬–৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আর্থিক বছরে ত্রাণকার্যে ব্যয়িত আর্থিক চিত্র

Summary of Primary Relief Expenditures in India from 1975-76 till 1996–97

Year	Cash Expenses	Value of Goods Distributed In Addition	Total
	Rs.	Rs.	Rs.
1975-76	1,44,134.40	—	1,44,134.40
1976-77	2,54,973.52	3,76,550.00	6,31,523.52
1977-78	5,83,495.92	1,17,818.00	7,01,313.92
1978-79	8,23,623.00	25,91,696.00	34,15,319.00
1979-80	6,65,489.00	31,66,147.00	38,31,636.00
1980-81	8,28,685.25	6,01,009.50	14,29,694.75
1981-82	4,62,658.05	94,952.35	5,57,610.40
1982-83	27,12,692.19	27,30,531.68	54,43,223.87
1983-84	8,48,771.72	9,20,558.85	17,69,330.57
1984-85	27,18,150.41	14,06,601.04	41,24,751.45
1985-86	13,83,403.91	10,95,366.00	24,78,769.91
1986-87	48,23,211.94	14,53,644.52	62,76,856.46
1987-88	53,26,377.83	9,92,833.43	63,19,211.26
1988-89	43,92,392.96	20,09,053.00	64,01,445.96
1989-90	12,55,342.74	6,19,489.00	18,74,831.74
1990-91	15,61,192.39	14,22,597.14	29,83,789.53
1991-92	46,41,388.18	34,27,152.40	80,68,540.58
1992-93	22,08,637.73	7,22,816.00	29,31,453.73
1993-94	42,87,149.35	21,58,223.56	64,45,372.91
1994-95	21,66,403.77	5,51,947.00	27,18,350.77
1995-96	35,65,224.00	38,75,000.00	74,40,224.00
1996-97	41,27,080.00	8,28,898.00	49,55,978.00

পরিশিষ্ট—১২

রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্ট ডীড ও নিয়মাবলীর প্রতিলিপি

A

EXTRACTS FROM THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE RAMAKRISHNA MISSION

REGISTERED ON THE 4TH MAY, 1909, UNDER ACT XXI OF 1860, REGISTRATION NO 1917/3 FOR 1909-10 REVISED ACCORDING TO WEST BENGAL ACT XXVI OF 1961

1 a) The name of the Association is **THE RAMKRISHNA MISSION.** It may also be spelt as **RAMAKRISHNA MISSION.**

* * * * *

2 The objects of the Association are:

(a) To impart and promote the study of the Vedanta and its principles as propounded by Sri Ramakrishna and practically illustrated by his own life, and of Comparative Theology in its widest form

(b) (i) To impart, promote and undertake the study of and research in the arts, Sciences, technologies and industries, in all their branches, both basic and applied

(ii) To undertake scientific research in the area of medical sciences.

(c) To train teachers in all branches of knowledge above-mentioned and enable them to reach the masses

(d) To carry on educational work among the masses

(e) To establish, maintain, carry on and assist schools, colleges, universities, research institutions, libraries, auditoriums, orphanages, workshops, laboratories, hospitals, dispensaries, houses for the aged, the infirm, the invalid and the afflicted, relief and rehabilitation works, and any other educational, medical, cultural and social welfare

service activities and training institutions and charitable works and institutions of a like nature.

(f) To print and publish and to sell or distribute, gratuitously or otherwise, journals, periodicals, books or leaflets that the Association may think desirable for the promotion of its objects.

(g) To carry on any other work which may seem to the Association capable of being conveniently carried on in connection with and calculated directly or indirectly to promote any of the before-mentioned objects.

B

EXTRACTS FROM THE RULES AND REGULATIONS OF RAMAKRISHNA MISSION

1. The Association is established for the purposes expressed in the Memorandum of Association and its Headquarters as well as the registered office is at Belur Math, District Howrah, West Bengal, India.

Members and Associates

2. (a) All followers, whether lay or monastic, of the Paramahamsa Ramakrishna may be members of the Association, if elected at a meeting of the Association or nominated by the Governing Body hereinafter mentioned, provided that all the Trustees for the time being of the Indenture of Trust dated the 30th day of Jannuary, 1901, usually called the Trust Deed of the Belur Math, shall be ex-officio members of the Association.

(b) A person intending to be a member shall sign a declaration form as given below and submit to the General Secretary an application, in a form prescribed by the Association and he shall be proposed by a member of the Association and seconded and supported by at least two members of the Governing Body.

Member's Declaration Form

(i) I look upon Sri Ramakrishna as an illustration and embodiment of the Religion Eternal, whose life and teachings help one to understand the plan and purpose of all the religions of the world and their underlying truth and harmony.

(ii) I look upon all religions as paths to God, and shall try to live in peace and fellowship with the followers of all religions.

(iii) I have full sympathy with all the objects of the Ramakrishna Mission as set forth in Memorandum of Association and I will actively co-operate with the work of the Mission.

(c) All persons irrespective of colour, creed or caste sympathising with all or any of the objects of the Association, may be associates, if elected at a meeting of the Association or nominated by the Governing Body.

* * * * *

3. Monastic members shall not be required to pay any admission fee or any subscription.
4. Every lay member and every associate, unless exempted thereform in writing by the Governing Body, shall pay in advance an admission fee of Rs. 10 and thereafter an annual subscription of Rs 50 in case of the former, and similarly, an admission fee of Rs 10 and an annual subscription of Rs. 30 in case of the latter.
5. The annual subscription may be commuted by the Governing Body on payment of Rs 1,000 for every lay member and Rs 750 for every associate.
6. (a) Connection of members and associates with the Association shall cease by resignation, death, removal or non-payment of dues for two years, but shall be capable of renewal

in such manner as the Governing Body may from time to time decide.

7. Members shall be entitled to:
   (a) Vote at all meetings of the Association, use the library attached to the Math at Belur in the district of Howrah and reside at the Math temporarily subject to rules and regulations prescribed by the Math authorities.
   (b) Attend all classes formed by the Association for the instruction of its members and receive individual instruction whenever practicable.
   (c) Receive all publications of the Headquarters of the Association at a special discount of 25 per cent on the published price.
   (d) Mofussil members shall be entitled to receive the proceedings, reports and leaflets published by the Association on application.
8. Associates shall have all the privileges of members except the right to vote at meetings.

নির্দেশিকা